চলন্ত নির্মাণ

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

সংবেদী পাঠক
অশোক সেনকে

মুখবন্ধ

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত *ভাবনার ভাস্কর্য*-নামাঙ্কিত আমার প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমালোচনার সংকলনটি বহু পাঠকের সমাদর লাভ করে। পরবর্তী কালে আমার নানান ফাইলে ঐ জাতীয় রচনার পাহাড় জ'মে উঠেছে। প্রত্যেকটি লেখাই কোথাও না কোথাও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাদের দুই মলাটের মধ্যে জড়ো ক'রে নতুন বই বার করবার অবসর পাই নি। অনুরাগী পাঠকরা বহুদিন ধ'রে আমাকে অনুরোধ করছেন এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে। মূল রচনাগুলির প্রতিলিপি আমার দেরাজেই থাকে, ছাপা রূপগুলি নানা পত্রিকায় বিকীর্ণ হয়ে বিরাজ করে। লেখাগুলি আমি নিজে জড়ো ক'রে গুছিয়ে কিছু সম্পাদনা না ক'রে দিলে বই বার হবার জো নেই, কেননা এই দায়িত্বটি নিতে পারেন এমন কেউ আমার হাতের কাছে নেই।

একজন প্রবন্ধকারের চিন্তা যে ঠিক কিভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অভিঘাতে, বিভিন্ন ঘটনার ধাক্কায়, বিভিন্ন সম্পাদকীয় চাহিদা মেটানোর চেষ্টায়, বিভিন্ন বই প'ড়ে বা বিভিন্ন বিতর্কের জটাজালে জড়িয়ে প'ড়ে ক্রমশঃ বিবর্তিত হয়ে ওঠে, সেই প্রক্রিয়ার যথার্থ ছবিটি তাঁর ইতস্ততঃ প্রকাশিত রচনাসমূহ গ্রন্থিত না হওয়া পর্যন্ত ফুটে ওঠে না। যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের সেই বৌদ্ধিক হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়াটিকে বুঝবার একটা দরকারও নিশ্চয় পাঠকসমাজে থাকে, কেননা যাঁরা লেখেন এবং যাঁরা পড়েন (এই দুই দল অবশ্যই পরস্পরকে বাদ দিয়ে নয়) তাঁদের একটা চলন্ত মিথস্ক্রিয়াও ওখানে নিহিত থাকে। সেই লক্ষ্যে বর্তমান বই, *চলন্ত নির্মাণ*, সংকলিত হলো; ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর দে-কে। যাঁরা আমাকে চিনতে চান, বুঝতে চান, এই বই তাঁদের জন্য। এই পর্যায়ে আশির দশক কাভার ক'রে নব্বইয়ের দশকের ভিতরে ঢোকা গেছে। ভবিষ্যতে পরবর্তী পর্যায় প্রকাশিত হতে পারবে।

বর্তমান পর্যায় থেকে আমাকে বাধ্য হয়ে নানা প্রকাশ্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে; সেই সব বিতর্ক নিঃসন্দেহে আমার ভাবনাকে গড়তে সাহায্য করেছে। কখনও কখনও এক-একটা বিষয়কে আশ্রয় ক'রে পরম্পরশৃঙ্খলিত রচনার মাধ্যমে রীতিমতো ক্রমপরিণতিশীল 'ডিসকোর্স' গ'ড়ে উঠেছে বললে ভুল হয় না। কখনও বা আমাকে অবস্থান করতে হয়েছে ঝড়ের নাভিকেন্দ্রে। প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই বইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। তদুদ্দেশ্যে কয়েকটি ছোট ছোট তর্কের স্ফুলিঙ্গও এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হলো; কেবল সেই রচনাগুলিই নেওয়া হলো, যেগুলির মধ্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, এবং ক্ষুদ্র হলেও যাদের মধ্যে একটা প্রাবন্ধিক স্বভাব বা মেজাজ ধরা পড়ে।

যে-ধরনের বানানপদ্ধতিতে স্বস্তি বোধ করি আমার নিজের জবানিতে তাই অনুসরণ করেছি; যখন অন্যদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি, বা আমারও কোনো পূর্বপ্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তখন সেই সব রচনার প্রকাশিত পাঠে যেরকম বানান পেয়েছি তা রক্ষা করেছি। জ-এর নীচে একটি ফুটকি দিয়ে ইংরেজী z-এর ধ্বনি এবং দুটি ফুটকি দিয়ে 'measure', 'pleasure' ইত্যাদি শব্দের অন্তঃস্থ ব্যঞ্জনবর্ণটির ধ্বনি অথবা ফরাসী 'genre' শব্দটির আদিতে বা 'collage' শব্দটির শেষে যে-ধ্বনি) বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সর্বত্র পারলাম কিনা জানি না, তবে একটা চেষ্টা করেছি। বিশ্বায়নের এই যুগে বহু বহিরাগত শব্দ দুর্বার স্রোতে আমাদের ভাষায় প্রবেশ করছে এবং করবেই। আমাদের এই লিপি, যা এমনিতেই সুন্দর, তার প্রকাশক্ষমতাকে অটুট রেখে, খর্ব না ক'রে, প্রয়োজনমতো কোথাও কোথাও তাকে বরং আরেকটু বর্ধিত করলে ক্ষতি কী? জ়াঁর' বা 'কোলাজ়' এখন বাংলা শব্দ: সাহিত্য বা শিল্পকলার আলোচনায় এদের বাদ দিয়ে আমরা এগোতে পারি না। সে-ক্ষেত্রে এদের উচ্চারণ যদি আরেকটু যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারি তবে আখেরে আমাদেরই লাভ। লাতিন-মার্কিনদের স্প্যানিশ উচ্চারণে z-ধ্বনি স-এরই মতন, কিন্তু স্পেনের স্প্যানিশভাষীদের উচ্চারণে তা শ্রুতিগোচর হয় একটা নরম থ'-এর মতো। সেই বিশেষ ধ্বনিটি বোঝাতে 'থ়' ব্যবহার করলাম। এই বইয়ের ক্যামেরা-রেডি কপি তৈরি করেছি লাইনোটাইপের বাংলা কীবোর্ড লে-আউট ব্যবহার ক'রে এবং লণ্ডনের শ্রীমাইক মিয়র-এর (Mike Meir) লিখিত সফ্‌ট্‌ওয়্যার Executive Bengali-র সাহায্যে। এ ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

এর আগে বই-সমেত আমার নানা প্রকাশিত রচনায় রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টাইন বান্ধবীর নামটি 'ভিক্‌তোরিয়া' বানানে পরিবেশিত হয়েছে। বিদেশী v-ধ্বনির জন্য কোনো নতুন চিহ্নের প্রয়োজন হয়তো আছে, তবে সে-কথা আপাততঃ থাক। 'ক' আর 'ত'-এর যুক্ত রূপটিকে ওভাবে হসন্ত চিহ্ন দিয়ে ভেঙে লেখার আসল কারণ ছিলো এই যে তখন আমি সাধারণ টাইপরাইটারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতাম এবং সেখানে 'ক্ত' লিখতে কসরৎ করতে হতো: প্রথমে 'ও' টিপে, তার পর তার মাথায় মাত্রা বসিয়ে, তার পর তাতে কর্ণসংযোজন করতে হতো। কম্পিউটারে যুক্তাক্ষর রচনা করা সহজতর। আজকাল তাই ও নামটা পারলে 'ক্ত' দিয়েই লিখি। অবশ্য আমার একটি বইয়ের নামোল্লেখে— যেখানে ঐ মহিলার নাম রয়েছে— সেখানকার বানানই রক্ষিত হয়েছে।

রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের স্থানকাল এবং নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে রচনাকালও সরবরাহ করেছি। প্রয়োজনানুসারে নতুন টীকা, কোথাও বা কিছু ভূমিকা যোগ করেছি। সম্পাদনার সেই সব খুঁটিনাটির মধ্যেও পাঠকরা একটা চলিষ্ণু প্রক্রিয়ার আদল পাবেন।

সূচী

চারটি সমকালীন উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, *সোনার হরিণ নেই*, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম খণ্ড ২৮.০০, দ্বিতীয় খণ্ড ২২.০০।
শংকর বসু, *শৈশব*, ধ্রুপদী, ১২.০০।
মহাশ্বেতা দেবী, *শ্রীশ্রীগণেশমহিমা*, করুণা প্রকাশনী, ১৬.০০।
বিমল কর, *সংশয়*, মণ্ডল বুক হাউস, ১০.০০।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ উপন্যাসটি হাতে তুলে নিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলাম নারী-পুরুষের এনকাউন্টার বিষয়ে বাঙালী ক্লিশের ইঁটপাটকেলে। 'সেখানে সুখ ছিল। ভোগ ছিল। মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখের তারায় আগুন ছিল। সে-আগুনে ব্যভিচারের প্রশ্রয় ছিল। রমণীর অকরুণ ইশারায় মণিদার পুরুষকার বাপী তরফদারের পিঠে চাবুক হয়ে নেমে আসেনি।' 'বয়স্ক রতন বণিকের ওই তরতাজা বউটা ঠারেঠোরে তাকাতে জানে।' 'গৌরী বউদিও চোখের সামনে সেদিন তাজা জ্যান্ত পুরুষ দেখেছিল একটা। তার চোখের আগুনে পতঙ্গ পোড়ে না। ... গৌরী বউদির চোখের আগুনে ব্যভিচারের প্রশ্রয়।' মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর খবর শুনে উত্তেজিত কমলা বণিক 'একপিঠ খোলা চুল, ঢিলে-ঢালা বেশ-বাস' নিয়ে বাপী তরফদারের সঙ্গে আলোচনা করতে ছুটে এলে 'নিজের অগোচরে বাপী তরফদারের দুচোখ তার মুখে বুকে ওঠানামা' করে; কমলা 'খসা আঁচলটা সজোরে বুকের ওপর দিয়ে পিঠের দিকে ছুঁড়ে' দিয়ে 'ছদ্ম ঝাঁঝে' ব'লে ওঠে, 'খুব যে পরের বউকে সামনে বসিয়ে চোখের সাধ মেটানো হচ্ছে— অ্যাঁ?' প্রথম সতেরো পাতার মধ্যেই এ-জাতীয় পাঠককে-প্রশ্রয়-দেওয়া লেখনী-ছলাকলা আমাকে নিরাশ করে। ক্রমশঃ জানতে পারি যে নায়ক বাপী তরফদারের ভিতরে 'মানুষের খোলসে ঢাকা' একটা 'হিংস্র অবুঝ জানোয়ার' আছে, মিষ্টি-নাম্নী বালিকার প্রতি তার কৈশোরের দুর্বার আকর্ষণে ঘা খেয়ে, সেজন্যে বাপের কাছে চাবুকের মার খেয়ে বাপীর যৌনতা ক্রোধ আর হিংস্রতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে: নারীকে মনে হয় 'অপমান আর হতাশার আক্রোশ উজাড় করে জাহান্নমে ডুবিয়ে দেবার মতো এক রমণীয় আধার'; বাল্যকালীন সেই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার ফলে বাইশে পৌঁছেও তার 'একটা বয়েস চৌদ্দয় আটকে আছে'। গরিব কেরানীর ছেলে বাপী জাঁদরেল ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় 'ফ্রম র‍্যাগ্‌স্ টু রিচেস্'-মার্কা পথে; তৎসঙ্গে বাল্যের দয়িতাকে দখল করার ব্যাপারে সে প্রথমে কাঠগোঁয়ার, পরে ইয়াগোর মতো চক্রান্ততৎপর। তার বিভিন্ন পরিচিতাদের সে যেভাবে এখানে সেখানে খুঁজে পায়— রাস্তাঘাটে, বিমানবন্দরে, গণৎকারের দরবারে— তা আমাকে চমৎকৃত করে, কারণ

আমি নিজে মানুষের ভিড়ে চেনা মুখ ওভাবে খুঁজে পাই না বড় একটা; অবশ্য এতে আশুতোষবাবুর প্লট গড়গড় ক'রে এগিয়ে চলে। আরও কতগুলো কৌশল আমার বড় সহজ মনে হয়েছে: বাপীকে জিতিয়ে দেবার জন্যে মিষ্টির প্রথম স্বামী অসিত চ্যাটার্জিকে একটি মেরুদণ্ডহীন, অপদার্থ পুরুষ বানানো হয়েছে; বাপীর পরস্ত্রীকাতরতার প্রতিতুলনায় সন্তু চৌধুরী আর গৌরী বউদির সম্পর্কটাকে অযথা নোংরা ক'রে দেখানো হয়েছে; রণজিৎ চালিহাকে খাড়া করা হয়েছে একটি মার্কামারা ভিলেন হিসাবে, এবং তাকে জব্দ করার জন্যে রেশমাকে মেলোড্রামাটিক ভঙ্গিতে বলি দেওয়া হয়েছে। উপরের আক্ষেপগুলি এই কারণে যে আশুতোষবাবুর লেখায় সত্যিকারের বাহাদুরিও আছে। তাঁর কথকতার ক্ষমতা সুস্পষ্ট; জমজমাট গল্পের স্রোতে কখনো ভাঁটা পড়ে না, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের বনের লোকেশনে ঘটনাগুলির একটি নিজস্ব আকর্ষক ক্ষমতা আছে। যেখানে ঐ পরিবেশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আবু, দুলারি, রেশমা, হারমা, গায়ত্রী রাই, উর্মিলা রাই, অভিসারিকা হস্তিনী বনমায়া ইত্যাদি, সেখানে লেখক নায়কের চরিত্রটাকে দরকাঁচা পর্যায়ে রেখে দিলেন কেন?

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের লেখা শংকর বসুর বইটি। চরিত্রকল্পনায় *পথের পাঁচালী*-র সামান্য প্রভাব প'ড়ে থাকতে পারে। সন্থু আর সরি যেন নতুন অপু-দুর্গা, অন্ন নতুন সর্বজয়া। উদ্বাস্তু-কলোনির পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটির যে-বৈশিষ্ট্য সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা তার ভাষার এফেক্টসচেতনতা। এখানে 'মোষের চামড়ার মতো অন্ধকার পানাপুকুর ভাঙতে ভাঙতে উঠে আসে', 'পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরো একটা জীবন নড়েচড়ে' ওঠে 'অজস্র ভাঙা ছায়া, মরা ডাল আর খিন্নতা নিয়ে', 'বয়স্করা বিভিন্ন অবস্থায় গপ্‌পো, ঝগড়া বা পুরনো দুঃখের জাবরে জিভের আগায় ইতিহাস সচল রাখে।' সংলাপে-স্বগতোক্তিতে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার নিপুণ ব্যবহারে উদ্বাস্তু জীবনের পিছুটানকে কাহিনীর অঙ্গে সুন্দরভাবে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাষাই এ উপন্যাসটির জোর, আবার ভাষাতেই তার দুর্বলতাও। যখন লেখক তাঁর নিজের জবানিতে চরিত্রদের মস্তিষ্কে চিন্তা চাপান, তখন চিন্তক ও চিন্তার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য প্রায়ই প্রকট। সন্থু যখন ভারতবর্ষের মানচিত্রকে দ্যাখে দু'-হাতওয়ালা কামিজের আকারে, যেটির বুক-পকেটে গচ্ছিত রয়েছে বাংলাদেশ, তখন লেখককে বাহবা দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পরক্ষণেই যখন পড়ি: 'অথচ তার বিশ্বস্ত জ্ঞানে সুলতান আলম স্ট্রিট কি পুরো বাংলাদেশে কীলকের মতো প্রোথিত নয়?'— তখনই 'কীলক' এবং 'প্রোথিত' শব্দদুটিতে আমি অন্ততঃ হোঁচট খাই, এই কারণে যে তারা সন্থুর চিন্তাজগতের খাঁটি প্রতিনিধি নয়। 'সন্থুর শান্ত ও ক্রমিক বড় হওয়ার কুসুম-কণ্টক বিন্যস্ত অধ্যায়ে শনিগ্রহ রূপে অন্ন যাকে গণ্য করে থাকে, নির্দয় শাপান্তে অন্ন যাকে খল ও অশুভ বলে চিহ্নিত করেছে': অন্ন-প্রসঙ্গে এমন ভাষা আমার কানে অস্বাভাবিক ঠেকে। 'বরং গ্রহণের খাদ্য যে অমঙ্গল, তা সমগ্র জীবন বয়ে বেড়াতে হবে, ঐ মানুষটির ভবিতব্য তখন উচ্ছিষ্টভোজী, অন্ধ পরিব্রাজক, অমঙ্গল তার কপালে স্থায়ী ও গভীর রেখা এনে দেবে': চন্নুর মার মস্তিষ্ককোষে ভাবনার এ কেমন ছাঁদ? তা ছাড়াও সাধারণভাবে লেখকের স্টাইলটাকে আমার বড় বেশী চেষ্টিত, কষ্টকল্পিত, অলীকপন্থী মনে হয়েছে। আমি নিজে

পরীক্ষানিরীক্ষার সপক্ষে, এবং ব্যাকরণের নিয়মও যে কখনও কখনও ভেঙেচুরে ফেলতে হয় তা সর্বান্তঃকরণে মানি, কিন্তু আলোচ্য বইটির ভাষাগত এক্সপেরিমেন্টের সফলতা বিষয়ে আমার মনে বারে বারেই সংশয় জেগেছে। 'অম্ল অতীত গৌরব বলে যায় নিঃস্পৃহ, অথচ সাবলীল': এখানে বাংলার বাংলাত্বটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভাষাকে প্রায়ই প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে জড়ানো-পাকানো করা হয়েছে,— এমন নয় যে চরিত্রদের কোনো দুর্বার কবিত্ব বা ভাবুকত্ব প্রকাশের অজুহাত ছিলো। গদ্যে এই জটিলতা কী উদ্দেশ্যে? পেঁচিয়ে বলার জন্য কবিতা তো আছেই, নয় কি?

শংকর বসুর শৈলীর বিপরীত কোণে মহাশ্বেতা দেবীর ধারাল, সপ্রতিভ বাচনভঙ্গি। তাঁর কাহিনীদুটিতে বিহারের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ভালো-মন্দের, শোষক-শোষিতের শ্বাসরোধকর সংঘর্ষ ফিল্মী কায়দায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে: সময় এখানে থেমে-থমকে থাকে না, যেমন থাকে রেফিউজি কলোনিতে। আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ে 'ওয়েস্টার্ন' নামে খ্যাত যে-ফিল্মগুলি, কখনও কখনও তাদের কায়দার কথা মনে পড়েছে আমার। ব্যঙ্গকৌতুকে লেখিকা অপরাজেয়: বাঢ়া গ্রামে খাটা পায়খানা বানানোর উপাখ্যানটি দারুণ হয়েছে; রক্তচাপ এবং করোনারি অ্যাটাক বিষয়ে মেদিনীর উক্তি— 'জীবন্ত দেওতা ঘরে আছে, আংরেজী বিমার হবে কেন?'— আমার অনেক দিন মনে থাকবে। মহাশ্বেতা দেবীব বিদ্রূপ বিদ্যুৎগতি ও লক্ষ্যভেদী: সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ-কর্তৃক নারীর যৌন শোষণ কয়েকটি নির্ভুল আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। হিন্দী আর বাংলা ক্রমাগত মেশানোর ফলে কখনও কখনও অদ্ভুতরসের সৃষ্টি হয়েছে মনে হয়। 'পাঠিয়ে দিও' অর্থে 'ভেজে দিও' কাহিনীর লোকেশনে বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা আমার জানা নেই, কিন্তু আমার কানে বিসদৃশ ঠেকে; 'গঙ্গাকে ভেজে দে' শুনলে আমি তাকে কড়াইয়ে গরম তেলে নিপতিত দেখি। 'তপ্ত আশায় শীতল জল ঢেলে দিলো'-তে ইংরেজী ইডিয়মের তর্জমা অর্থকে খাবি খাওয়ায়। 'শক্তিমানতা' কেন, 'শক্তিমত্তা' কেন নয়?

আলোচ্য বইগুলির মধ্যে বিমল করের উপন্যাসটিতে বৌদ্ধিক উপাদান সব থেকে বেশী। পরিপার্শ্ব কলকাতার অফিসপাড়া এবং নাগরিক নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন, যেখানে 'মরা আলোর সঙ্গে সন্ধ্যের ময়লা জড়ানো', যেখানে কদাচিৎ 'ফিকে বসন্ত তার ফেলে যাওয়া রুমাল' কুড়িয়ে নেয়, যেখানে 'পাগলের সংখ্যা হই-হই করে বেড়ে যাচ্ছে ... গাঁজারও ডিম্যাণ্ড খুব', যেখানে ছোকরা বেয়ারা নগেন হঠাৎ খেপে গিয়ে তার অফিসের বাবুকে ছুরি মেরে দেয়। নায়ক স্বর্ণ রুগ্ণা মায়ের একমাত্র সন্তান, মায়ের মৃত্যুর আগে ও পরে বাবার রক্ষিতার যত্নে মানুষ। সে নিঃসঙ্গ, কম্যুনিকেশনে অপটু; অফিসে ব'সে থাকতে তার ভালো লাগে না, 'ফাঁকা ফাঁকা লাগে', তাই সে হাঁটতে বেরিয়ে যায়। সে মানুষের কাছে আসতে চায়, রাস্তায় অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, কিন্তু মেয়েদের সাহায্য করতে গেলেই তারা ভাবে সে কোনো মতলব নিয়ে এসেছে। বীণাদি বাঁচতে চায়, সে যক্ষ্মার সঙ্গে লড়াই ক'রে সেরে উঠেছে, একটা নির্ভরের খোঁজে স্বর্ণর দিকে হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু স্বর্ণ শেষ পর্যন্ত সে-নির্ভর দিতে পারে

না। বীণা মনে করে যে স্বর্ণ চিলেকোঠার মানুষ, টঙের মানুষ। স্বর্ণর মনে হয় যে তার বারো আনাই সে বীণাদিকে বোঝাতে পারলো না। স্বর্ণর অনেক আত্মবিশ্লেষণ সত্ত্বেও তার সত্তার কেন্দ্র কেমন যেন আবছা, অধরা থেকে যায়। স্বর্ণ তার নাম সত্ত্বেও ফ্যাকাসে, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে, তার মধ্যে হ্যামলেটীয় দ্বিধার একটা পাণ্ডুর ছায়া আছে।

একটি প্রশ্ন: সাহিত্যগ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠববিধানে বাঙালী প্রকাশকেরা এত বীতস্পৃহ কেন? একটি বইয়েও লেখকের জীবনসংক্রান্ত কোনো তথ্য বা বিজ্ঞপ্তির ব্লার্ব পেলাম না। একটি বই পড়তে গিয়ে বাঁধাই খ'সে এলো, আরেকটির কতগুলি পাতায় আঠার কাজ, তা ছাড়া বহু দৃষ্টিকটু ছাপার ভুল নজরে পড়েছে। 'শূণ্যে', 'পুণর্বার', 'গ্লালি' এবংবিধ শব্দ অসহ্য। সমাসবদ্ধ শব্দকে ভেঙে ছাপার প্রবণতাটাও— যথা 'রাজপুত প্রধান গ্রামে', 'পুরুষ প্রবৃত্তি'— বাংলার প্রকৃতিবিরোধী এবং দৃষ্টির পক্ষে পীড়াদায়ক। *শ্রীশ্রীগণেশমহিমা* বইটিতে যে একটি নয়, দুটি কাহিনী আছে, তা-ও কোথাও জানাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি প্রকাশক।

আনন্দবাজার পত্রিকা, জুলাই ১৯৮১

[এই লেখাটির প্রকৃতপক্ষে আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধসংকলনে যাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু সে-বই তৈরি করবার সময়ে এটির কোনো কপি খুঁজে পাই নি। এটির কোনো মূল কপি আমার কাছে রক্ষিত নেই। মনে হয় কলকাতায় ব'সে লেখা; হাতে লিখে প্রেসে জমা দিয়ে থাকবো। দৈবাৎ একটি পুরোনো ফাইলে ছাপা গ্রন্থসমালোচনাটির কর্তিকা পেয়ে গেলাম। বোঝা যাচ্ছে যে ১৯৮১-এর জুলাইয়ে ছাপা হয়েছে, কিন্তু সঠিক তারিখটা কাটা পড়েছে।]

মানুষ ও তার প্রযুক্তি

['প্রাযুক্তিক সমাজে মানুষ' এই শিরোনামে প্রখ্যাত হিন্দীভাষী সাহিত্যিক সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়নের একটি প্রবন্ধ বাংলা অনুবাদে বেরোয় *জিজ্ঞাসা*-র ৫ : ২ সংখ্যায়। 'প্রাযুক্তিক' বিশেষণটি লাগসই কিনা সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই: কেউ কেউ হয়তো বলবেন 'প্রযৌক্তিক' শ্রেয়ঃ। সে যাই হোক, প্রবন্ধটিতে ভাববার বিষয় যথেষ্টই ছিলো, এবং কোনো কোনো অংশের ভাবনার সঙ্গে (যেমন "দূষণ", "অরণ্যনিধন", "প্রচুর-শক্তি-সাপেক্ষ ব্যবস্থাবিন্যা:স"-নামাঙ্কিত অংশগুলির) আমার নিজের চিন্তার পর্যাপ্ত সহরণনও ছিলো, কিন্তু অন্যান্য অংশে তাঁর বক্তব্য আমাকে এতটাই উদ্বেজিত করে যে আমি তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করতে ব'সে যাই। আমার বক্তব্য পরের সংখ্যার 'আলোচনা' বিভাগে ছাপা হয়। (ঐ পত্রিকায় চিঠিপত্রের বিভাগটিকে 'আলোচনা'ই বলা হতো— আলোচনার মূল্য সম্পর্কে সম্পাদক শিবনারায়ণ রায় অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।) আমার ধারণা আমার চিন্তার একটা স্থায়ী দিক সেখানে ধরা পড়ে। সেই বিবেচনায় লেখাটি যৎসামান্য সম্পাদনা ক'রে এখানে সংকলিত হলো।]

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন তাঁর 'প্রাযুক্তিক সমাজে মানুষ' প্রবন্ধটির শেষে স্বীকার করেছেন যে প্রযুক্তিবিরোধিতার পক্ষে কোনো চূড়ান্ত যুক্তি নেই, কুড়ুল থেকে শুরু ক'রে গরুর গাড়ি এবং চরকা পর্যন্ত সবই প্রযুক্তি, এবং মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবার কোনো আশা যাদের ছিলো না তাদের কাছে সম্মানজনক জীবনযাপনের সম্ভাবনাকে পৌঁছে দিয়েছে প্রযুক্তিই। তা-ই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাস্য : আলোচনাটাকে তিনি আরও গভীরে নিয়ে গেলেন না কেন ? আমি তো প্রবন্ধটিতে আলোচিত বিষয়ের উপরে কোনো নতুন আলোকপাত, সে-সম্পর্কে কোনো নতুন বিশ্লেষণ, যুক্তির কোনো পরিচ্ছন্ন বিন্যাস বা পরিণতি পেলাম না। প্রযুক্তিবিস্তারের কোন্ দিকগুলি সদর্থক, কোন্ দিকগুলি নঞর্থক, তা নিয়ে কোনো সূক্ষ্ম বিচারবিবেচনা না ক'রে, তর্কগুলোকে কোনো দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না ক'রে নিয়ে তিনি কেবলই প্রযুক্তির ভয়ংকর প্রকৃতি সম্পর্কে কতগুলো গল্প বলেছেন, কতগুলি সামান্যীকরণকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এবং প্রযুক্তিবিরোধী গোঁড়ামির কতগুলি আপ্তবাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। মানবপ্রজাতির মঙ্গল সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠা নিশ্চয়ই অকপট, কিন্তু তর্কগুলিকে ঠিকভাবে পেশ না ক'রে প্রযুক্তিকে কেবল এলোপাতাড়িভাবে বাড়ি মারলে কার কী উপকার হবে ?

প্রযুক্তিকে আমাদের জীবন থেকে যদি একেবারে বাদ দিতে হয়, তা হলে তো হাললাঙল, কাপড়চোপড়, ঘরবাড়ি, হাঁড়ি-কড়াই, হাতা-খুন্তি, ঝাঁটা-বালতি, ওষুধবিষুধ,

বইখাতা, কাগজকলম, আলনা-দেরাজ সমস্তই ফেলে দিয়ে ন্যাংটো হয়ে গুহায় ফিরে যেতে হয় এবং গাছের ফল আর মরা জানোয়ারের কাঁচা মাংস খেয়ে প্রাণধারণ করতে হয়। লেখক নিশ্চয়ই আমাদের সেই অতি-আদিম অবস্থায় ফিরে যেতে বলছেন না। মনে হয়, তিনি ঠিক যা বলতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট করতে পারেন নি, বরং লেখাটিতে ফুটে উঠেছে বর্তমান অবস্থার একটা সুসমঞ্জস মূল্যায়নের পরিবর্তে প্রাচীন নিশ্চয়তাগুলিকে আঁকড়ে ধরবার প্রয়াস।

সমস্যা প্রযুক্তিকে নিয়ে নয়, তাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করবো তাই নিয়ে। মানুষের সব কর্মকাণ্ডেই লাভ-লোকসানের একটা ব্যাপার থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে: প্রযুক্তির সুচিন্তিত প্রয়োগের দ্বারা মনুষ্যসমাজের মোটের উপর লোকসান হবে, না মোটের উপর লাভ হবে?

সুচিন্তিত প্রয়োগের উপরে অবশ্যই জোর দিতে হবে। মানুষের জন্যেই প্রযুক্তি, প্রযুক্তির জন্যে মানুষ নয়, এই মূল লক্ষ্যটাকে দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট রাখতে হবে। 'ক' দেশের প্রযুক্তির হুবহু নকল 'খ' দেশের পক্ষে উপযোগী না-ও হতে পারে, সে-জাতীয় কথা মনে রাখতে হবে। প্রযুক্তিগত প্রগতির নাম ক'রে পরিপার্শ্বের দূষণ, অরণ্যনিধন, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বিলোপসাধন, জ্বালানির বা বিদ্যুতের অপচয়: এগুলি নিশ্চয়ই কখনোই কাম্য হতে পারে না। দেশে-বিদেশে সুন্দরলাল বহুগুণার মতন ইকলজি-সচেতন অক্লান্ত কর্মীদের উদ্যম আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সক্রিয় সমর্থন দাবি করে।

কিন্তু শ্রীযুক্ত বাৎস্যায়নের চিন্তায় যন্ত্র স্বভাবতঃই হিংসাধর্মী, প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ অনিবার্যতঃই হিংসাভিত্তিক, হিংস্র। কেন? আদিম পুরুষ পাথরের অস্ত্র তৈরি ক'রে তা দিয়ে পশু শিকার করতো ব'লে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব যন্ত্রই তো মারণাস্ত্র নয়। শিকড়বাকড় খুঁড়তে গিয়ে আদিম নারী যে-খুরপি ব্যবহার করতো তারই সূত্রে নাকি কৃষিকর্মের উদ্ভাবন, এমন কথাও তো পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন, এবং সে-প্রযুক্তি তো মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকরই। আমার মতে প্রযুক্তি একটা নিউট্রাল ব্যাপার। চুল আঁচড়াবার জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছে চিরুনি; এখন চিরুনির দাঁত দিয়ে আমি যদি কাউকে ব্যথা দেবার চেষ্টা করি, সেটা কি চিরুনির দোষ? একটা ধারাল ছুরি দিয়ে তরকারিও কাটতে পারি, মানুষও খুন করতে পারি,— সেটা আমার উপরে নির্ভর করছে,— তার জন্যে ছুরিটাকে গালি দিয়ে কী লাভ? প্রযুক্তিকে আমরা মানুষের সেবায় নিযুক্ত করবো, না আমাদের হিংসার বা ক্ষমতালিপ্সার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবো, তা আমাদের উপরেই নির্ভরশীল। হিংসা, ক্ষমতালিপ্সা, আগ্রাসিতা: এগুলির বীজ মানবপ্রজাতির উভয়বল উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের মধ্যেই নিহিত। প্রযুক্তি এদেরকে জন্ম দেয় নি, সৃষ্টি করে নি। মানুষের মাথায় যখন খুন চাপে তখন সে হাতের কাছে যা পায় তা-ই দিয়েই খুনোখুনি করে, কোনো বিদগ্ধ হাতিয়ার লাগে না। এই যে ভারতে ১৯৮৪-র নভেম্বরের গোড়ায় দিনকয়েকের মধ্যে হাজারখানেক মানুষ খুন হয়ে গেলো, দেশটি প্রযুক্তিতে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বর্তী হওয়া সত্ত্বেও সেই খুনোখুনিকে কি এড়ানো গেলো? আধুনিক মারণাস্ত্র যে-কালে ছিলো না, সে-কালেও 'কুরুক্ষেত্র করতে'

মানুষের কি বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়েছে? হ্যাঁ, ঠিক, প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, মানুষের রণাস্ত্রগুলিও তত ভয়ংকর হয়ে উঠছে, কিন্তু একই সঙ্গে মানুষের সদর্থক সম্ভাবনাগুলিও যে বিকশিত হয়ে উঠছে সে-কথা আমরা মনে রাখতে চাই না কেন? তার কারণ কি এই যে ভালোমন্দর বাছবিচার আমরা করতে চাই না, শুভাশুভের দ্বন্দ্বে মানুষের ন্যায্য এবং অনিবার্য দায়িত্বকে স্বীকার করতে চাই না? আমরা কি কেবলই ভয়ের শিকার? আমাদের নিজেদের হিংসাবৃত্তিকে কেন আমরা অভিক্ষিপ্ত করবো আমাদেরই তৈরি সাধনীর উপরে?

এক টুকরো মাটিতে ফুল ফোটাবার চেষ্টা করুন। মাটিতে যত সার দেবেন, তত আপনার ঈপ্সিত ফুলের চারাগুলোর যেমন উন্নতি হবে, আপনার অবাঞ্ছিত অন্যান্য নানাবিধ চারারও (যাদের বীজ মাটিতে সর্বদাই লুকিয়ে থাকে) তেমনি শ্রীবৃদ্ধি হবে। কেননা সার নিরপেক্ষ, সব উদ্ভিদের সেবা করতেই সে প্রস্তুত। প্রযুক্তি ঐ সারের মতন। তার দ্বারা আমাদের মধ্যে যা অশুভ তাকে যেমন উস্‌কে দেওয়া যায়, তেমনি তার সাহায্যে মানুষের মঙ্গলকেও বিপুলভাবে মূর্ত ক'রে তোলা যায়। আমাদের বাগানে আমরা কী ফলাবো তা আমাদেরই সিদ্ধান্ত; আগাছার চাষও করা যায় বৈকি। আর যদি ফুল বা সবজি চাই, তা হলে আগাছাগুলো যেই মাথা তুলবে অমনি নির্মমভাবে তাদের উপড়ে ফেলতে হবে,— কষ্ট স্বীকার ক'রে, দিনের পর দিন; এর কোনো বিকল্প নেই।[১]

শ্রীযুক্ত বাৎস্যায়ন লিখেছেন, প্রযুক্তিবিদ্যা এক পাইকারী একরূপতা সৃষ্টি করে, যে-ব্যবস্থায় মানুষ নামহীন, পরিচয়হীন; প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের প্রাতিজনিক একান্ততাকে পুরোপুরি নষ্ট করতে উদ্যত; প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে মানুষ শুধু অ-ব্যক্তি নয়, সে 'অপর মানুষের অপর মানুষ', তার নিজের নিজত্ব ব'লে কিছু নেই,— প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের নরক। এই সব পাইকারী সামান্যীকরণের ভিত্তি কী? এগুলির মূল্য কতটা?

তিনি বলেন, প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত দেশগুলিতে মানবসমাজ সুখী সমাজ নয়। কোন্ সমাজ সুখী? সুখ কাকে বলে? প্রযুক্তির ঐসব দোষের প্রতিতুলনায় প্রযুক্তিতে অনুন্নত এমন কোন্ দেশের কথা তিনি আমাদের বলতে পারেন যেখানে আছে সব-পেয়েছি-র সমাজ, যেখানে সুখ বেশী, যেখানে মানুষের অস্মিতার মূল্য বেশী, যেখানে প্রতিটি মানুষ সৃষ্টিশীল প্রাতিস্বিকতায় উদ্ভাসিত, প্রত্যেকে পুরোপুরি ব্যক্তি, কেউ কারও নরক নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বর্গ? কোথায় সে-ইউটোপিয়া, বা কবে ছিলো সেই সত্যযুগ? মনে হয়, পারিবারিক ভূমিকাসমূহ দ্বারা শাসিত যে-সমাজ, তার সম্পর্কে লেখকের একটা মোহ আছে। তিনি কি জানেন না যে ঐ ধরনের সমাজ একদিকে যেমন ব্যক্তিকে একটা নিরাপত্তা দেয়, তেমনি অন্যদিকে তার ব্যক্তিত্বকে খর্বও করে, জাঁতায় পেষে?

তিনি লিখেছেন, প্রযুক্তি-উন্নত সমাজে 'নিরাপত্তা আর কর্তৃত্বের ধারণাসহ সমাজান্তর্ভুক্তির প্রকৃত ভিত্তি সরে যায়, এবং আমরা তখন বিকল্প খুঁজি বিমূর্ত কল্পনার স্তরে। গোটা প্রজাতির সঙ্গে একটা তাত্ত্বিক সম্পর্ক কল্পনা করে নিই— সেখানেই নিরাপত্তা এবং কর্তৃত্বের আশ্বাস রয়েছে, ধরে নিই। সেখানেই খুঁজি সমাজান্তর্ভুক্তির ধারণা। কিন্তু এই

সব বিমূর্ত ধারণার ভিত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত নেই। এদের সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বরং সম্পূর্ণত নঞর্থক।'

এর বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলা যায়। প্রথমতঃ, নিরাপত্তা, কর্তৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি ধারণা প্রযুক্তি-উন্নত সমাজগুলির পারিবারিক জীবন থেকে একেবারে মুছে গেছে এমন ভাবা ভুল। ধারণাগুলির কালোপযোগী পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু পরিবর্তিত আকারে তারা এখনও সক্রিয়। দ্বিতীয়তঃ, মাতৃদেবী, পিতৃদেব, পতিদেবতা, সতী : এগুলিও অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন, বিমূর্ত ধারণা, যাদের দ্বারা ঐতিহ্যিক হিন্দু পারিবারিক জীবন চালিত হতো। এই পয়েন্টটা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। হিন্দু বিবাহের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর এক ইংরেজী প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> Therefore, from their earliest years, the husband as an idea is held up before our girls, in verse and story, through ceremonial and worship. When at length they get this husband, he is to them not a person but a principle, like loyalty, patriotism, or such other abstractions which owe their immense strength to the fact that the best part of them is our own creation and therefore part of our inner being.

অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন দ্বারা চালিত নয় কোন্ সমাজ? গোটা প্রজাতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পতিদেবতার ধারণার চাইতে বেশী বিমূর্ত, বেশী তাত্ত্বিক কি? আসলে এগুলি একই সঙ্গে বিমূর্ত ও মূর্ত, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্ক শুধুমাত্র তাত্ত্বিক, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত হতে যাবে কেন? পতিব্রতা হিন্দু নারী যেমন তাঁর আরাধ্য দেবতা ('আইডিয়াল') আর বাস্তব স্বামীটিকে ('রিয়াল') এক এবং অভেদাত্ম ক'রে নিতে জানতেন, আমরাও তেমনি মানবপ্রজাতির ধারণাটিকে আমাদের চেনাজানা মানুষদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। প্রজাতির সাক্ষাৎ আরও পাই দেশে-দেশে কালে-কালে মানুষের সৃষ্টিতে,— তার শিল্পে সাহিত্যে, দর্শনে বিজ্ঞানে। এই নৈকট্যবোধ কি শুধুই বিমূর্ত? এ কি নয় আত্মীয়তার বন্ধন? এই বৃহৎ অন্তর্ভুক্তিচেতনাই কি সময়ের দাবি নয়, এবং স্বয়ং শ্রীযুক্ত বাৎস্যায়নও কি তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুসারে সেই চেতনার দাবি মেনেই প্রবন্ধটি লেখেন নি? ('মানবপ্রজাতির প্রতি গভীর আনুগত্যবোধই আমার প্রযুক্তিবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার একমাত্র কারণ।') এখানে তাঁর চিন্তা কি অন্তর্বিরোধ দ্বারা চিহ্নিত নয়?

তিনি লিখেছেন, আজকাল পশ্চিমী জগতে একটা প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায় : 'হাউ ডু ইউ রিলেট?' অনুমান করি, এটি তিনি মার্কিন মুলুকে শুনে থাকবেন, কেননা ইয়োরোপে এটি সাধারণ নয়,— আমি তো কখনো শুনি নি। মানুষ জটিল জীব : সে যূথচারীও বটে, একলাও বটে। নিঃসঙ্গতা বা বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ নানা, এবং এগুলি পুরোনো দিনের সমাজেও ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে যে-সব ব্রাহ্মণ বিধবারা গর্ভবতী হয়ে প'ড়ে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেন তাঁদের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের হিসাব কে

রেখেছে? বিচ্ছিন্নতাবোধ যদি কোনো আলাপ-আলোচনার প্রধান থীম হয়, তা হলে 'হাউ ডু ইউ রিলেট' প্রশ্নটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এবং কানে আসতে পারে, কিন্তু গড়পড়তা মানুষ হাটে বাজারে পরস্পরকে এ প্রশ্ন করে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যন্তরে এটি একটি মৌল দার্শনিক জিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে এমন ভাবলে বাড়াবাড়ি হবে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধও আবশ্যিকভাবে বেড়ে যাবে এমন কোনো গাণিতিক নিয়ম নেই, বরং সর্বদা দেখছি প্রযুক্তি মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে কিভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে। শ্রীযুক্ত বাৎস্যায়ন একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ মার্কিন অধ্যাপকের কথা বলেছেন, যিনি টেলিভিশন-রেডিও-ফোন-ফ্রিজ সব কিছু হাতের কাছে নিয়ে বহুতল বাড়ির উপরের দিকের একটি তলায় একলা একটা ফ্ল্যাটে থাকেন, এবং চার বছরের মধ্যে একবারও সেখান থেকে বেরোন নি। কিন্তু তিনি যখন ফ্ল্যাট থেকে কখনো বেরোন না, তখন তাঁর হাটবাজার নিশ্চয়ই কেউ ক'রে দেয়, নয়তো দোরগোড়ায় তার ডেলিভারি হয়। হয়তো বা হপ্তায় দু'-একবার কোনো পরিচারিকা বা স্বেচ্ছাসেবিকা তাঁর দেখাশোনা করতে আসেন। মোট কথা, পরিবারশাসিত সমাজের ভিতরে একজন ইন্দিরঠাকরুনের যে-জীবন, তার চাইতে এই বৃদ্ধের জীবন শ্রেয়ঃ।

ভারতীয় সমাজে কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিঃসঙ্গতায় অর্থাভাবে অপমানে অনাদরে অবহেলায় প্রযুক্তির অভাবজনিত নানা অসুবিধা ভোগ করতে করতে তাঁদের জীবনের শেষ দিনগুলিকে কাটান। আমি প্রায়ই ভাবি, সে-অবস্থার তুলনায় আমার ইংরেজ শাশুড়ীর জীবন ঢের ভালো। তিনি বিধবা, তাঁর ৭৬ বছর বয়স হয়েছে, নিজের বাড়িতে একা থাকেন। তিনি এমনিতে স্বাধীনতাপ্রিয়, কারও মুখাপেক্ষী হওয়া মোটেও পছন্দ করেন না, কিন্তু তার মানে এ নয় যে রোগশয্যায় উপনীত হলে তিনি আমাদের অথবা আমার ভাশুরের পরিবারের সাহায্য নেবেন না। পাশ্চাত্য সমাজে প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে দ্যাখে না, সন্তানেরা বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করে না : এই স্টিরিওটাইপগুলি ভারতে চালু হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের অভ্যন্তরে দু' দশক বাস করার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি, এবং বলা প্রয়োজন মনে করি, যে এ কথা সাধারণভাবে সত্য নয়। একজন উদাসীন প্রতিবেশী বা সন্তানের পাশে দশজন সহৃদয় প্রতিবেশী এবং কর্তব্যপরায়ণ সন্তানের দেখা মিলবে। হয়তো এদের সহৃদয়তা বা সেবার আঙ্গিকটা ভিন্ন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলি এ-সব দেশে উধাও হয়ে গেছে এমন মনে করা নিতান্ত হাস্যকর। বরং উন্নত প্রযুক্তি মানবিক সম্পর্কগুলিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে এবং মর্যাদা দিয়েছে। মানুষে মানুষে সহযোগিতার এবং সহানুভূতির সামাজিক শাখাপ্রশাখা এখানে দূরবিস্তৃত। আমার শাশুড়ীর জীবনে খানিকটা নিঃসঙ্গতা অবশ্যই আছে,— বৈধব্যের কারণে,— কিন্তু তাঁর জীবন অন্য নানা দিকে এমনভাবে পূর্ণ, প্রযুক্তি-অনুন্নত সমাজে যেমনটা সম্ভব নয়। তিনি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বৃদ্ধদের জন্য বড় হরফে ছাপা বই ধার ক'রে এনে পড়তে পারেন, ফোনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারেন, বাসে চেপে তাঁদের বাড়িতে যেতে পারেন, শরীর খারাপ বোধ হলে ডাক্তারকে টেলিফোন করতে পারেন অথবা একই শহরে তাঁর বড় ছেলের

বাড়িতে ফোন করতে পারেন, প্রতিবেশিনীকে বাজার ক'রে দিতে বলতে পারেন, নাতনীকে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের ওষুধটা এনে দিতে বলতে পারেন,— অর্থাৎ কিনা, যদি বাস-বিদ্যুৎ-টেলিফোন-হাসপাতাল-কেমিস্ট সচল থাকে, তা হলে যুদ্ধ অনেকটাই জেতা হয়ে যায়। আধুনিক প্রযুক্তি বার্ধক্যের অনেক প্রতিবন্ধের অবশ্যই মোকাবিলা করে, বৃদ্ধদের স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, পরবর্তী প্রজন্মের সেবার উপরে একেবারে নির্ভরশীল ক'রে রাখে না, জীবনোপভোগক্ষমতাকে নিঃসন্দেহে দু'-এক দশক বাড়িয়ে দেয়। এ দেশের টুরিস্ট বাসগুলি ঠাকুমা-দিদিমাদের দ্বারা সর্বদা ঠাসা থাকে, সান্ধ্য পাবের আসর বৃদ্ধদের আড্ডায় জমজমাট থাকে। আমার শাশুড়ী প্রতি বছর কোনো-না-কোনো বান্ধবীর সঙ্গে বৃটেনের বাইরে ইয়োরোপের অন্য কোনো দেশে ছুটি কাটাতে যান, এবং এই সেদিন পর্যন্ত তিনি সপ্তাহে একবার একটি সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করতে যেতেন, যেখানে তিনি তাঁর চাইতেও বয়সে বড় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবাযত্ন করতেন। এত সব কথা এজন্য বলছি যে এই সক্রিয়, উপভোগক্ষম, মানবিক আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ জীবন প্রযুক্তি-অনুন্নত সমাজের নয়, প্রযুক্তি-উন্নত সমাজেরই দান। হরিনাম জপ করতে করতে মৃত্যুর দিন গোনার চাইতে এ অবস্থা শ্রেয়ঃ নয় কি ?

প্রযুক্তি যে মানুষে মানুষে যোগকে কিভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে তার জীবন্ত উদাহরণ কি নয় এই চিঠিই ? শ্রীযুক্ত বাৎস্যায়নের প্রবন্ধটি হিন্দী থেকে একজন বাংলায় তর্জমা করেছেন ; বাংলা পত্রিকায় ছাপা অক্ষরের মাধ্যমে তা অনেক বাঙালীর কাছে পৌঁছেছে ; কলকাতা থেকে বিমানডাকে পত্রিকাটি পেয়ে আমি এই সমালোচনাটি লিখতে ব'সে গেছি ; বিমানডাকে সেটি কলকাতায় যাবে ; সম্পাদক মহাশয় সেটিকে ছাপলে সেটি অনেকের দ্বারা পঠিত হবে। মানুষের চিন্তার সঙ্গে মানুষের চিন্তার এই যে দ্রুত, ব্যাপক এবং যোজন-অতিক্রামক যোগ,— এ কি প্রযুক্তি ছাড়া সম্ভব হতো ?

বস্তুতঃ, যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিক করে না ; বরং উল্টোটাই সত্য : যে-সমাজে যন্ত্রপাতির অভাব, দেখা যাবে যে সে-সমাজে প্রজাবর্গই যন্ত্রতুল্য, দাসতুল্য, সেখানে মানুষই যন্ত্রের কাজ করে, সেখানে যন্ত্রপাতির বদলে সর্বসাধারণই শাসকদের জন্যে যন্ত্রবৎ কর্মরত। যে-সময়ে প্রযুক্তি ততটা উন্নত হয় নি, সে-যুগে কী ছিলো ব্যক্তিমানুষের নাম-দাম-পরিচয়, কতটুকু ছিলো তার নির্বাচনের পরিধি ? কী ছিলো সাধারণ মেহনতী মানুষের মূল্য ? সে-কালে শূদ্র কি ছিলো না সেবাযন্ত্র, ধনোৎপাদনযন্ত্র ? নারী কি ছিলো না সেবাযন্ত্র, সন্তানোৎপাদনযন্ত্র ? মানুষ কি ছিলো না তার সমাজনির্ধারিত ভূমিকার দাস ?

প্রকৃতি নয়, প্রযুক্তিই নারীমুক্তির জননী। প্রযুক্তিই মেয়েদের মুক্তি দেয় পুরুষদের রোবট হবার ভূমিকা থেকে এবং সন্তানোৎপাদনযন্ত্রত্ব থেকে, তাদের সামনে নির্বাচনের ক্ষেত্রটাকে বিস্তৃততর ক'রে তোলে। প্রযুক্তিই সমাজে নারীপুরুষসাম্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে, বাস্তবায়িত করে।

হ্যাঁ, আজকের দিনের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নঞর্থক উদ্দেশ্যদের চরিতার্থ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান সদাবিস্ময়কর উন্নতিকে যেভাবে ব্যবহার করে,

তার মধ্যে বিপদ আছে। কিন্তু সে-বিপদকে রুখতে হলে আমাদের চিন্তাকে আরও অনেক স্বচ্ছ করতে হবে। ইংরেজী ইডিয়ম অনুসারে, শ্রীযুক্ত বাৎস্যায়ন বাচ্চাকে স্নান করানোর নোংরা জলটার সঙ্গে বাচ্চাটাকেও ফ্লাশ্ আউট ক'রে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আজকের ব্যাপার নয়, প্রাচীন প্রযুক্তির হাত ধ'রে অনেক আগেই তার অভ্যুদয় ঘটেছে। বর্ণধর্ম, সামন্ততন্ত্র, অক্ষৌহিণী, চার্চ, সাম্রাজ্য, ঠগীদস্যুসম্প্রদায়, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি : এ সমস্তই বৃহৎ সংগঠন। যা-কিছু প্রযুক্তি যে-কোনো সময়ে প্রাপণীয় ছিলো, সে-সমস্তই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করেছে। এ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক লজিকমাত্র। এবং তাত্ত্বিক বিবেচনায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানও মূলতঃ নিউট্রাল, তার দ্বারা ভালো-মন্দ-মাঝারি সবরকমের কাজ সম্পাদিত হতে পারে। রেড ক্রস, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অক্সফ্যাম, সেইভ্ দ্য চিল্ড্রেন : সবই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, এবং কল্যাণনিবেদিত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ; এদের কল্যাণ-আঙুলের আঁকশি ছুনিয়াজোড়া। এদের ছাড়া আমাদের চলবে কী ক'রে ? চলবে না, চলে না।

ধ্বংসাত্মক বৃহৎ সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপকে রুখতে হলে যে-সব কল্যাণাত্মক প্রচেষ্টা লাগবে সেগুলিকেও সুবৃহৎ প্রচেষ্টা হতে হবে। পারমাণবিক সর্বনাশের সম্ভাবনা কি কোনো একলা মানুষের প্রতিবাদে বা কোনো 'সুপারম্যান'-এর বীরোচিত নায়কোচিত উদ্যোগের দ্বারা দূর হবে ? না কি তার জন্যে কোটি-কোটি মানুষকে হাত মেলাতে হবে ? এবং সেই বিপুল উদ্যোগ কি আজকের প্রযুক্তিবিদ্যা, আজকের প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম, বিরাট গণপ্রচার, সমগ্র প্রজাতি সম্পর্কে স্বজাতি-বোধ ইত্যাদি ছাড়া সম্ভব হবে ? যখন আমাদের ডাক শুনে কেউ আসে না, তখন আমাদের সাময়িকভাবে একলা চলতেই হয়, নিজের দীপশিখাটাকে জ্বালিয়ে রাখতেই হয়, কিন্তু তা এজন্যে নয় যে একটা দীপ সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে। তা করতে হয় এজন্যে যে একদিন ঐ একটা দীপ থেকে আরও অনেক অনেক দীপ জ্বালানো যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান আমাদের বৈশ্বিক মাপেই করতে হবে, এবং মানুষ তো চিরকালই তার মূল্যসমূহের নির্মাতা, তবে ভয়টা কিসের ?

১ এই অংশ প্রথম লেখার কুড়ি বছর পর মনে হচ্ছে এখানে একটি টীকা যোগ ক'রে দেওয়া ভালো, নয়তো কেউ কেউ আমার বক্তব্যকে ভুল বুঝতে পারেন। ফুলের চারা, সবজি, আগাছা— এগুলো নেহাৎ উদাহরণই, তার বেশী কিছু নয়। বাগানের শৌখিন গাছ ভালো, আগাছা খারাপ— এমন কোনো কথা ওখানে বলতে চাই নি। প্রকৃতির রাজ্যে গাছ আর আগাছায় কোনো তফাৎ নেই। তফাৎটা আমরা মানুষরাই করি, যখন আমরা উদ্যানপালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই।

নভেম্বর ১৯৮৪
জিজ্ঞাসা ৫ : ৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৯১ [১৯৮৪-৮৫]

বহুমাত্রিক নারী-আন্দোলনের অভিমুখে

[এই প্রবন্ধটির আদি রূপ রচনা করি ইংরেজীতে, ১৯৭৯ সালে, অধ্যাপিকা করবী সেনের অনুরোধে। রচনা করি তাঁর পরিকল্পিত একটি প্রবন্ধসংকলনের জন্য, যেটি অবশেষে গত ১৯৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করেছে।* *জিজ্ঞাসা*-র সম্পাদক সেই প্রবন্ধটি দেখে সেটির একটি বাংলা রূপ তৈরি করতে আমাকে অনুরোধ করেন। বর্তমান উদ্যোগ তার ফল। নিজের পুরানো প্রবন্ধজাতীয় লিখনের ভাষান্তর নিজে করা কতকাংশে কৌতুকজনক, কতকাংশে অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা। আদি প্রবন্ধটি রচনা করার পর যে-সাত বছর কেটে গেছে সে-সময়ে আমার জীবনাভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন বা ভাবনার ধারা থেমে থাকে নি, আরও প্রবাহিত হয়েছে। মূল ধারণাগুলি মোটের উপর অপরিবর্তিত থাকলেও ঝোঁকের ব্যাপারে তারতম্য হওয়াই তো স্বাভাবিক। একই বিষয়ে যদি তখন না লিখে এখন লিখতে বসতাম, তা হলে ঝোঁকগুলো নিশ্চয়ই একটু অন্যভাবে পড়তো, হয়তো সমস্ত জিনিসটাকেই একটু অন্যভাবে সাজাতাম-গোছাতাম। অন্য কেউ অনুবাদ করলে আলাদা কথা, কিন্তু এ কাজ নিজে করতে গেলেই এখানে-সেখানে নতুন ক'রে মন্তব্য করতে প্রবৃত্তি হয়। অথচ আমি সময়ের সাক্ষ্যে এতটা বিশ্বাসী যে তখনকার আমি আর এখনকার আমি-তে একেবারে জগাখিচুড়ি হয়ে যাবে সেটাও আমার কাছে অসহ্য। অগত্যা আমি একটি কাজ করেছি: প্রথমে আদি প্রবন্ধটির বক্তব্যকে বাংলায় পরিবেশন করেছি, তার পর কিছু অতিরিক্ত বক্তব্য যোগ করেছি। বর্তমান লিখনের প্রথম তিনটি ভাগ মোটামুটিভাবে প্রাক্তন লিখনকে অনুসরণ করে। সর্বত্র আক্ষরিক তর্জমা করার বাধ্যতা অনুভব করি নি। কয়েকটি ছোটখাট অদলবদল এবং সংযোজন করেছি, যেগুলি তখনও করতে পারতাম। চতুর্থ ভাগে যোগ করেছি এখনকার পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিছু নতুন কথা।] (*জিজ্ঞাসা*-য় প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশের সময়ে মুখবন্ধস্বরূপ এই অংশটি ছিলো ; এটি অপরিবর্তিত রাখা হলো।— ২০০৪)

॥১॥

তুমি যথেষ্ট দিন বালিকা থেকেছো
যথেষ্ট দীর্ঘ বেণী বেঁধেছো

* Karabi Sen (ed.), Her Story: *An Anthology of Studies in Women's Problems*, foreword: Indira Gandhi, Prajna Publications, Calcutta, 1985; আমার প্রবন্ধটির নাম : 'Towards a Multi-Dimensional Women's Movement'।

এখন থেকে অপেক্ষা করবে
হাট থেকে শ্বশুরের ফেরার জন্য
ক্ষেত থেকে স্বামীর ফেরার জন্য
বন থেকে ভাশুরের ফেরার জন্য
আঁধার কারাগার
তোমার বাহুর উপরে ভারী লোহা
মাথার উপরে ভারী বোঝা
আঁধার কারাগার তোমার স্বামী
ভারী লোহা তোমার শিশু
ভারী বোঝা তোমার গৃহ

ঐতিহ্যিক সমাজে নারীর অস্তিত্বের বন্ধনদশা সম্পর্কে এই মর্মস্পর্শী সাক্ষ্যটি হচ্ছে ম্যাসিডনিয়ার একটি লোকগীতিকা।[১] এই গানের বক্তব্যকে আমরা যদি কয়েক মুহূর্ত অনুধাবন করি, তা হলে আমাদের একটি কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয় : যে আমাদের সময়ের নারী-আন্দোলন কোনো স্থানীয়, ঊনজনসমর্থিত হুজুগ বা ক্ষণস্থায়ী হিড়িক নয়, হতে পারে না, বরং তা হচ্ছে মানবিক বিবর্তনের কাহিনীতে একটি অবশ্যম্ভাবী পর্যায়। বহু শতাব্দী ধ'রে আমাদের প্রজাতি প্রধানতঃ শৃঙ্খলিত থেকেছে টিঁকে থাকার শর্তগুলির সঙ্গে, প্রজনন আর আহার-অন্বেষণের সঙ্গে ; মেয়েদের দাসত্ব ছিলো সেই প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত,— এমন একটা ভূমিকা, যেটাকে বোধ হয় এড়ানো যেতো না, কিন্তু তা-ই বা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে কে ? অধিকাংশ পুরুষের কাছেই জীবন ধরা দিয়েছে রুক্ষ রূপে, যার অন্তর্গত সেই জাতের কৃষিকার্যের হাড়ভাঙা মেহনত, যার দ্বারা কোনোমতে প্রাণধারণ করা চলে, যার অন্তর্গত যুদ্ধের বিপদ ; যা-কিছু উদ্বৃত্ত তা গেছে একটা ছোট, বিশেষাধিকারভোগী গোষ্ঠীর দখলে। অধিকাংশ মেয়ের কাছে জীবন ধরা দিয়েছে রুক্ষতর রূপে। কিন্তু ইতিহাসের কাপড়ের বুনটে আমরা দেখতে পাই একটা আশার সুতোকে,— একটা উজ্জ্বল সুতো, যেটাকে কিছুতেই ছিঁড়ে ফেলা যায় না, যেটা ক্রমাগতই নিজেকে জড়াতে থাকে ধূসর আর কালোর সঙ্গে : আমরা দেখি যে প্রকৃতি চেতন হয়ে ওঠে, বিশ্লেষণ করে, পরীক্ষা করে, নিজেকে বোঝার চেষ্টা করে, নিজের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপের উপরে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ খাটাতে শেখে। অন্য যে-কোনো নিপীড়িত গোষ্ঠীর মুক্তির মতন মেয়েদের মুক্তিও এই প্রক্রিয়ার অংশ, যে-প্রক্রিয়ায় আমাদের জিজ্ঞাসার বৃত্তি আমাদের পরিপার্শ্বকে পাকড়াও ক'রে তাকে বদলে দেয়, তার উপরে নিজের ছাপ মারে। দেয়ালের গায়ে যা লেখা হয় তা ক্রমশঃ দেয়ালের সঙ্গে মিশে যায়, দেয়াল হয়ে যায়। এই আন্দোলন নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ এমন কোনো লক্ষ্য নয় যেখানে পৌঁছতে পারলেই আমাদের সব ঝামেলা চুকে যাবে, আমাদের প্রজাতি নিজেকে মুক্ত করার জন্য ক্রমাগত যে-উদ্যম ক'রে চলেছে এ হচ্ছে তারই অঙ্গ। আন্দোলন : প্রত্যেকের জন্য আরও সাচ্চা স্বাধীনতার অভিমুখে, মেয়েদের

জন্য, পুরুষদের জন্য, শিশুদের জন্য, সব জাতি এবং সব দেশের জন্য। আমাদের এই শিকল-ভাঙা সম্পর্কে আশাবাদী এবং হাঁ-ধর্মী ছাড়া আর কী হওয়া যায় ?

বৃহত্তর অর্থে এই আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ। সংকীর্ণতর অর্থে সেই আন্দোলনের কথা ভাবছি যার বয়স এক দশক মাত্র। কিন্তু এই এক দশকের মধ্যেই এই আন্দোলন দুনিয়ার উপরে বেশ একটা অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। বলাই বাহুল্য, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এই অভিঘাতের পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন,— যন্ত্রশিল্পপ্রধান দেশগুলিতে একরকম, প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর এলাকাগুলিতে আরেকরকম,— কিন্তু তা সত্ত্বেও সব সমাজেই এমন সব বীজ উপ্ত হয়েছে, যেগুলি একদিন না একদিন অঙ্কুরিত হবে, গাছ হয়ে উঠবে, ফল ফলাবে। এ এমন এক আন্দোলন যা শ্রেণীনিরপেক্ষ, এবং যেমন দারিদ্র্যের অবস্থাতে প্রাসঙ্গিক তেমন প্রাচুর্যের অবস্থাতেও প্রাসঙ্গিক, যেমন প্রাসঙ্গিক 'ধনতান্ত্রিক' দেশগুলিতে তেমন প্রাসঙ্গিক 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলিতেও।

বাংলাদেশের একটি গ্রামে গরিব চাষীদের আর মেয়েদের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন এক ওলন্দাজ দম্পতির লেখা একটি বই সম্প্রতি পড়েছি।[২] গ্রামটির আসল নাম গোপন রেখে তাঁরা তার নাম দিয়েছেন 'ঝগড়াপুর'। ঝগড়াপুরের ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কৌতূহল অনুভব করেছি এই কারণে যে সে-গ্রাম নাকি মেহেরপুর থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে, অবিভক্ত বাংলার যে-মেহেরপুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার নিজের কতকাংশে মিঠে শৈশবস্মৃতি। এই বইয়ের যাবতীয় প্রতিন্যাসের সঙ্গেই যে আমি সায় দিতে পারি এমন কথা বলতে পারি না, কেননা এর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে কিছুটা আলাদা, কিন্তু এটা দেখে আশ্বস্ত বোধ করছি যে যাঁরা তৃতীয় দুনিয়াতে পরিবর্তন আনার ব্রতে মৌলভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ তাঁরা অবশেষে মেনে নিচ্ছেন যে পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলিতেও মেয়েদের আন্দোলনের ভূমিকা বিনিশ্চায়ক।

> আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম যে গরিব চাষী আর সচ্ছল চাষীদের মধ্যেকার ক্ষমতার সম্পর্ক, স্থানীয় রাজনীতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবো, কিন্তু ক্রমশঃ আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে আরেক ধরনের প্রভুত্ব, যেটা মেয়েদের উপরে পুরুষদের প্রভুত্ব, সেটাও শোষণের একটা মূল দিক বটে। সুতরাং আমরা এই সম্পর্কগুলিকে উত্তরোত্তর আরও বেশী ক'রে আমাদের অবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলাম। তার ফলে মেয়েদের নিয়ে বইয়ের এই স্বতন্ত্র অংশটি গ'ড়ে উঠেছে। গোড়ার দিকে নারীশোষণের সমস্যাটাকে আমরা যে ততটা গুরুত্ব দিই নি তার প্রধান কারণ আমাদের পুরুষঘেঁষা চিন্তাপদ্ধতি ; তার মানে মোটেও এ নয় যে সমস্যাটা প্রান্তিক বা গৌণ। বরং তার উল্টোটাই ঠিক : গ্রামটিতে থাকাকালীন আমরা আবিষ্কার করলাম ঐ সমস্যাটা কী পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে কী আন্দাজ জড়িত। আমরা যখন গরিব চাষীদের অবস্থার মৌল পরিবর্তনের কথা ভাবি, অধিকতর সাম্যের কথা ভাবি,

> তখন সেই সংগ্রামে মেয়েদের ভূমিকা কী হবে সেটা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য .....
>
> ..... শ্রেণীসংগ্রাম আর নারীমুক্তিসংগ্রাম দুটোকে একই সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে।

আমার সম্প্রতি পড়া আরেকটি বইয়ে,— ছোটদের জন্য লেখা একটি গল্পে, যেটি লিখেছেন চীনা বংশসম্ভূত একজন থাই মহিলা,— পাই একই বাণী : যে থাইল্যাণ্ডের চাষীদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে মেয়েদের একটা বিনিশ্চায়ক ভূমিকা নিতে হবে।[৩]

ঝগড়াপুরের মেয়েদের দুর্গতিগুলির যে-ফিরিস্তি লেখকরা দিয়েছেন সেটা আমাদের অপরিচিত নয়। এখানে মেয়েরা দু' দফায় শোষিত, গরিব লোক হিসাবে এবং স্ত্রীলোক হিসাবে। ঘরের ভিতরে তথা বাইরে তাদের অবস্থা নিশ্চিতভাবেই হীন, এবং সে-হীনাবস্থাকে দৃঢ়তর করে এবং প্রতিষ্ঠা দেয় ইসলাম (লেখকদ্বয়ের অবস্থানকালে ঝগড়াপুরে মাত্র একটিই হিন্দু পরিবার অবশিষ্ট ছিলো)। একটি কঠোর পর্দাপ্রথা এখানে বলবৎ। মেয়েরা সরাসরি চাষের কাজ করে না বটে, কিন্তু তা ছাড়া আর সমস্তই তারা করে : সন্তানপালন, যাবতীয় গৃহকর্ম এবং চাষবাসের সহায়ক অন্যান্য কাজ। একটি দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে, যেখানে যন্ত্রশিল্পযোজনা আরম্ভ হয় নি, এ সমস্ত কাজই ক্লেশকর শারীরিক পরিশ্রম দাবি করে। ঝগড়াপুরের মেয়েদের জবানবন্দি অনুসারে : 'আমাদের ঘর সাফ করতে হয়, কাপড়চোপড় কাচতে হয়, ধান সিদ্ধ করতে হয়, ধানের খোসা ছাড়াতে হয়, চাল শুকাতে হয়, গম পিষতে হয়, ভাত রাঁধতে হয়, বাচ্চাদের আর পালিত পশুদের দেখে রাখতে হয়, আমাদের সারাটা দিন মেহনত করতে হয়।' ট্র্যাজেডি এই যে গ্রামের পুরুষরা এই সব কাজকে উৎপাদক মেহনত ব'লে স্বীকারই করে না, তাদের কোনো মূল্য দেয় না। এই সব কাজ করা থেকে মেয়েরা কোনো সমাদর বা সম্মান পায় না।

ঝগড়াপুরে বিবাহ অবশ্যই একটা অর্থনৈতিক চুক্তি। স্ত্রী হচ্ছে তার স্বামীর সম্পত্তি, ক্রীতদাসী : সে তার স্বামীর জন্য রাঁধবে, তার সন্তান— বিশেষতঃ পুত্রসন্তান— পেটে ধরবে, এবং সর্বভাবে তাকে সাহায্য করবে, কিন্তু সম্মান পাবে না।

> মেয়েরা তাদের স্বামীদের দ্বারা যৌনভাবে শোষিত হয়, কেউ কেউ অন্য পুরুষদের দ্বারাও। পুরুষদের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য যৌন সামগ্রী হওয়াই তাদের প্রধান ভূমিকা। পুরুষরা একটি মেয়েকে ব্যক্তি হিসাবে দ্যাখে না, দ্যাখে প্রধানতঃ একটি স্ত্রীশরীর হিসাবে। স্ত্রীলোকের নিজের যৌন প্রয়োজন স্বীকৃত নয়; সে নিষ্ক্রিয় ও সংযত থাকবে এটাই ধ'রে নেওয়া হয়। ফলে অনেক স্ত্রীলোকই যৌন ব্যর্থতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত এবং যৌন চিন্তাভাবনা দ্বারা আচ্ছন্ন। তাদের যৌন প্রয়োজনগুলিকে তারা মেটাতে বাধ্য হয় অন্য, অপ্রত্যক্ষ উপায়ে, যেমন সে-বিষয়ে কথা ব'লে আর ঠাট্টাতামাশা ক'রে। অনেক স্ত্রীপুরুষই গোপন সম্পর্কে জড়িত, এবং এই সব সম্পর্ক থেকে গরিব চাষী ঘরের মেয়েদের কিছু

> বাড়তি আয় হয়। এই সব সম্পর্ককে ততক্ষণই মেনে নেওয়া হয়, যতক্ষণ এগুলি কোনো খোলাখুলি আলোচনার বিষয়বস্তু না হয়, কিন্তু যদি জানাজানি হয়ে যায়, যেমন কোনো মেয়ে গর্ভিণী হয়ে গেলে পরে, তা হলে সকলে মিলে অপরাধীদের বিষয়ে নির্লজ্জভাবে কথা বলতে থাকে এবং গ্রামের আদালত তাদের সাজা দেয়। যদি কোনো ধনী জমিদার এমন কোনো মেয়েকে গর্ভিণী ক'রে থাকে, যে-মেয়ে তার স্ত্রী নয়, তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-জমিদারের সাজা হবে না, কেননা দণ্ড এড়াতে হলে যে-ক্ষমতা থাকা চাই সেটা তার যথেষ্টই আছে।

সংক্ষেপে, ঝগড়াপুরের মেয়েদের কোনো মূল্য নেই। কখনও কখনও তাদের মারা হয় লাঠি, ইঁট, তামার হাতা বা অন্যান্য জিনিস দিয়ে। স্বামীদের উপরে তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জন্য তারা খোলাখুলিভাবে প্রতিবাদও করতে পারে না।

অথচ এই ভয়ংকর টানাপড়েনের মধ্যেও আশার একটা উজ্জ্বল সুতোকে দেখতে পাওয়া যায়। ঝগড়াপুরের মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মর্যাদার অভাবকে মেনে নিয়ে, সে-অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নিজেদের নির্যাতনকে অন্তঃস্থ ক'রে নিয়েছে,—কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। মেয়েদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া হয় বৈকি, গোপনে তথা প্রকাশ্যে তারাও কিছুটা প্রতিবাদ করে বৈকি; অতএব 'পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত' এখানেও লভ্য। যদি আদৌ সম্ভব হয় তা হলে তারা বহু সন্তানের জন্ম বন্ধ করতে চায়, রোজা মানা বন্ধ করতে চায়, স্বামীর হাতে মার খাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। একটি মেয়ে নাকি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে; এটা তার প্রতিবাদ; এইভাবে তার প্রতি যে-অন্যায় করা হচ্ছে তার দিকে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার দুর্দশার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে বা আত্মহত্যা করার ভান করতে পারে। একটি মেয়ে তার স্বামীর সামনেই শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করে: 'আমার স্বামী? কে সে? তুমি কি জানো না যে আমার স্বামী নেই?' ওলন্দাজ পর্যবেক্ষকদ্বয় মনে করেন যে প্রতিবাদের এই স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে সেই সূচনাবিন্দুস্বরূপ, যেখান থেকে গরিব চাষী ঘরের মেয়েদের সংঘবদ্ধ করা যেতে পারে। তারা যে প্রতিবাদের একটা চেষ্টা করে, এ থেকেই বোঝা যায় যে তারা তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের প্রয়োজন অনুভব করে। কাজেই এই সব ইশ্যুর সাহায্যে মেয়েদের দলবদ্ধ করা যায়, যাতে তারা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে এবং সেখান থেকে বৃহত্তর ইশ্যুগুলিতে পদার্পণ করতে পারে। তাদের প্রতিবাদগুলিকে প্রকৃত কার্যের দিকে প্রবাহিত ক'রে দেওয়া যায়। যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। ঝগড়াপুরের অনেক মেয়েই বহু সন্তানের জন্ম বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। জন্মনিরোধক ব্যবহারের সাহায্যে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ যে সত্যিই এড়ানো যায় এটা যখন তারা বুঝতে পারে, তখন অনেকেই এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় এবং একটা-কিছু করতে চায়। এই বিন্দু থেকে যাত্রা ক'রে পৌঁছনো যায় বৃহত্তর কার্যক্রমে, যা থেকে আসবে মৌল সব পরিবর্তন।

অর্থাৎ তৃতীয় দুনিয়ায় যে-কোনো র‍্যাডিকাল আন্দোলনে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি চাবি-ইশ্যু হয়ে উঠতে পারে। মেয়েদের পক্ষে তাদের শরীর এবং উর্বরতাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন করাটা হচ্ছে নিজেদের জীবন এবং ভাগ্যকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন করার অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ। এ হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা গঠিত সেই পিভট্ বা স্থিরকেন্দ্র, যাকে ঘিরে মুক্তি-কার্যক্রমের বাকি অংশটা আবর্তিত হতে পারে। ক্যাথলিক চার্চ এ কথাটা খুব ভালোভাবেই জানে এবং সেজন্যই পরিবার-পরিকল্পনার যে-কর্মসূচী সত্যিই কার্যকর হতে পারে তার বিরোধিতা করে। চার্চ জানে যে এটা হচ্ছে এমন একটা পদক্ষেপ, যাকে মুক্তভাবে ঘটতে দেওয়া গেলে তা পুরানো নিয়ামনকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে। আমি নিশ্চিত যে লাতিন আমেরিকার সংগ্রামে পরিবার-পরিকল্পনা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইশ্যু হয়ে দাঁড়াবে।

এ ব্যাপারটা এমন এক বিন্দু যেখানে ব্যক্তি-নারীর স্বার্থ এবং তৃতীয় দুনিয়ার তথা সমগ্র দুনিয়ার প্রকৃত দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ এসে মেশে। এক সময়ে আমাদের টিঁকে থাকার জন্য একটা উচ্চ জন্মহারের দরকার ছিলো, কিন্তু এ মুহূর্তে তার উল্টোটাই সত্য। এই সত্যের মুখোমুখি হওয়ার মানে হচ্ছে জীবনের প্রতি একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা, এবং সেটা আমাদের করতেই হবে। বিজ্ঞান একটা অপরিহার্য মাত্রা। অন্যান্য মাত্রাও অবশ্যই আছে।

বলতে চাইছি যে মানুষের অন্য যে-কোনো সংগ্রামের মতন মেয়েদের আন্দোলনকেও বহুমাত্রিক হতে হবে, একমাত্রিক হলে চলবে না। বিজ্ঞান সেই মাত্রাদের অন্যতম। আধুনিক বিজ্ঞানকে রূপ দিতে, মানুষের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাকে প্রয়োগ করতে আমাদের দীর্ঘ সময় লেগেছে বটে, কিন্তু এই প্রয়োগকে যখন একবার সক্রিয় ক'রে দেওয়া যায় তখন তা আপনিই গতিবেগ সঞ্চয় ক'রে দাসোচিত মনোবৃত্তির কবল থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। মানুষের অবস্থার উন্নতিবিধান করতে পারে এমন কোনো প্রযুক্তি যদি একবার লভ্য হয়, তবে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে,— সেটাই তার রীতি,— এবং আমার ধারণা এটা ভালোই। কয়েক বছর লাগুক, বা কয়েক দশক, আজ না হোক কাল, একদিন না একদিন নতুন উদ্ভাবনটা জয়ী হবেই, এবং কুসংস্কারের, ভ্রান্ত ধারণার, নিষেধের যত রাশীকৃত বাধা সব কিছুকে হিঁচড়ে এগিয়ে যাবে একটা ভারী হিমবাহের মতন।

এক মাত্রা থেকে আমরা পৌঁছে যাই আরেক মাত্রায়, কেননা মানুষের সব কিছুই পরস্পরসম্পৃক্ত। তৃতীয় দুনিয়াতে জন্মনিয়ন্ত্রণের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে অনেক ব্যাপার : মেয়েদের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা, শিক্ষার অভাব, উচ্চ শিশুমৃত্যুহার, অযন্ত্রায়িত কৃষিকার্যে চাষীদের পুত্রনির্ভরশীলতা, বার্ধক্যে সন্তাননির্ভরশীলতা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যুগপৎ সক্রিয় হতে হবে। সেখান থেকে রাজনীতি একটি সংক্ষিপ্ত পথ। এই সব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে রাজনৈতিক ক্রিয়া লাগবে, ফলে উন্নতিশীল দুনিয়ায় মেয়েদের আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে বাধ্য। যে-সব ক্রিয়াকলাপ মানুষদের মেরুবিপরীত দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ ক'রে ফ্যালে

তাদের চাইতে যেগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটায় তাদের উপরেই আমি নিজে বেশী আস্থা রাখি বটে, কিন্তু যে-সব এলাকায় মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে, যেখানে জীবন অসহনীয়ভাবে নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছে, সেখানে তেমন কোনো আদর্শ বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হতে পারে। সন্দেহ নেই, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কৌশলের প্রয়োজন হবে।

যেখানে কোনো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে সেখানে সেই কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হওয়া এড়ানো যাবে না। জন্মনিরোধের সব পদ্ধতি সকলের পছন্দ হবে না। ব্যক্তির বিবেক, গোষ্ঠীর প্রয়োজন, দুটোরই দাবিদাওয়া আছে। কিছু বিতর্ক হবেই, এবং তা থেকে আন্দোলনে আসবে একটা নৈতিক মাত্রা। গর্ভপাত বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ চলতে থাকবেই, যতদিন না জন্মনিরোধে কোনো যুগান্তকারী নতুন কৌশল সে-তর্ককে অবান্তর ক'রে দেয়,— যা হবেই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নতুন উদ্ভাবনের সাহায্যে ঐ জাতের তর্ককে বাইপাস্ ক'রে এগিয়ে চ'লে যাওয়াই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাতিস্বিক গতিপথ।

কিন্তু স্ত্রীপুরুষ যদি প্রেম না করে তা হলে আর জন্মনিয়ন্ত্রণ দিয়ে কার কী হবে। যখন যৌন সম্পর্ক কেবল সন্তান উৎপাদনের উপায় নয়, যখন আলিঙ্গন করলেই গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কা নেই, যখন গর্ভাবস্থামাত্রই মৃত্যুর গন্ধ বয়ে আনে না, তখন মানুষের যৌনতাকে দিয়ে আমরা কী করবো? এক দিকে তপস্বীরা আর পিউরিটানরা, অন্য দিকে কবিরা আর আনন্দান্বেষীরা, এই দুই দলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে যে-লড়াই চলছে তাকে আর হয়তো টিঁকিয়ে রাখা যাবে না: মানুষের যৌনতাকে হয়তো মুক্তি দিয়ে দিতে হবে খেলা আর আনন্দের জন্য, স্ত্রীপুরুষের শারীরিক-মানসিক-আত্মিক মিলনের জন্য। এইভাবে আমরা পৌঁছে যাই মেয়েদের সংগ্রামের মধ্যে অন্য যে-সব মাত্রা আছে সেগুলোতে: শিল্পকলার, কবিতার, মরমী সাধনার মাত্রাগুলোতে। (তপস্বীরা আর পিউরিটানরা সম্ভবতঃ বিবর্তিত হয়ে পৌঁছবে প্রযুক্তিবিশারদ কোনো জাতে, যাদের সব অথবা প্রায়-সব শক্তি নিয়োজিত হবে রোবট এবং মহাকাশযান নির্মাণে!)

আমার ধারণা স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক একটা গভীর, আশ্চর্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাবে, শেক্সপীয়রকথিত সমুদ্র-পরিবর্তনের মতন, এবং রূপান্তরিত হবে বিচিত্র, সমৃদ্ধ, নতুন কোনো পদার্থে। মেয়েরা আর পুরুষরা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবে, যেমন তারা এখনই আসতে আরম্ভ করেছে, বিভিন্ন ধরনের সখ্য, সাহচর্য এবং সহযোগিতার জন্য। একজনের সঙ্গে আরেকজনের সেই রুদ্ধদ্বার সম্পর্ক,— ঈর্ষা, স্বার্থপরতা আর পারস্পরিক স্বত্ববোধ যার লক্ষণ,— তার জায়গায় আসবে আরও খোলাখুলি সব সম্পর্ক, যেখানে একজন অন্যজনের প্রকৃত বৃদ্ধির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।[৪] এর ফলে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের এবং মেয়ের সঙ্গে মেয়ের পুরানো শৈলীর যৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতারও ক্ষয় হবে; পুরুষদের মধ্যে আরও টেনশনমুক্ত ভ্রাতৃত্বের এবং মেয়েদের মধ্যে অনুরূপ ভগিনীত্বের উদয় হবে। একই প্রক্রিয়ায় সমলিঙ্গ প্রেম সম্পর্কে যে-সব নিষেধ আছে সেগুলিও মনে হয় শিথিল হবে।

হয়তো প্রেম ঝেড়ে ফেলবে পাপ এবং যন্ত্রণার সঙ্গে তার প্রাচীন সম্পর্ককে : কারও আর নিজেকে মনে হবে না অপরাধী, আহত, বা প্রত্যাখ্যাত,— যেটা একটা হর্ষদায়ক সম্ভাবনা। বিবাহ বলতে আমরা এখন যা বুঝি এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার : দুটোই গভীরভাবে বদলে যাবে। এ সমস্ত সম্ভাবনার আলোচনা শুনলে কারও কারও মনের মধ্যে অসম্ভব আতঙ্কের উদয় হয়, যেন পরিচিত নকশাগুলি বদলে গেলেই দেখা দেবে কোনো নারকীয় নৈরাজ্য। কিন্তু একটা সময় তো ছিলো যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বর্তমান আকারে আমাদের মধ্যে ছিলো না। এগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নিত্য নয় : তারা সদা পরিবর্তমান। মেয়েদের পক্ষে বাধ্যতামূলক একগমন হচ্ছে মূলতঃ সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান : তার সঙ্গে আমাদের মানবিক প্রকৃতির, প্রকৃত স্বভাবের কোনো আবশ্যিক যোগ নেই। পুরুষরা চিরকালই নিজেদের জন্য সংরক্ষিত ক'রে রেখেছে একাধিক সম্পর্কের অধিকার : সেটা হতে পারে, যেমন কোনো কোনো সমাজে, সম্পূর্ণ বৈধভাবে বিবাহপ্রতিষ্ঠানেরই অভ্যন্তরে, দারবৈচিত্র্যের মাধ্যমে, অথবা, যেমন প্রায় সর্বত্রই, বিবাহের বাইরে, এবং সেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের দরুন পুরুষদের তেমন কোনো সামাজিক কলঙ্ক অর্সে না। ঠিক, কেউ কেউ এটা চাইতেই পারে যে তাদের জীবনের কেন্দ্রে থাকবে একটি একগামী সম্পর্ক, কিন্তু সেটিকে হতে হবে তাদের নিজস্ব নির্বাচন, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো আদর্শ নয়। অন্যরা হয়তো অন্যরকম সিদ্ধান্ত নেবে। প্রায়ই লোকেরা মানবিক প্রেম সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলে যেন তা কোনো ছোঁয়াচে অসুখ, যাকে হাসপাতালের বিশেষ ওয়ার্ডে পৃথকভাবে আটকে রাখতে হবে, অথবা যেন তা কোনো স্বত্বের সম্পর্ক, যাকে বিধিবদ্ধ চুক্তির সাহায্যে বজায় রাখতে হবে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ প্রেম কোনো ব্যাধি নয়, যাকে দমন ক'রে রাখতে হবে, কোনো জড়সামগ্রীও নয়, যাকে বণ্টন করলে তা ক'মে যাবে। ভারতবর্ষে অনেক শতাব্দী ধ'রে সীতাকে নারীত্বের আদর্শরূপে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই নানাভাবে প্রশংসনীয়, কিন্তু সচ্চরিত্রের একটাই মাত্র ছক চিরকালের জন্য কার্যকর হতে পারে না, এবং হয়তো দ্রৌপদীর সদ্-গুণগুলির অনুশীলনও আমাদের পক্ষে দরকারী আর মানানসই হয়ে উঠবে।

মেয়েদের আন্দোলনের ফলে কোষ-পরিবারের ক্ষয় ত্বরান্বিত হতে বাধ্য। সন্তানপালনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই জাতের পরিবারের সীমাবদ্ধতা এখন সমাজতত্ত্বে বহুস্বীকৃত। শিশুপালনের কাজে গোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয়। আবারও বলা দরকার যে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারই এর একমাত্র বিকল্প নয় : অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষাও করতে হবে। এ সমস্তর মানে মোটেও এ নয় যে আমরা পরস্পরের জন্য কম ভাববো অথবা যাদের আমরা ভালোবাসি— আমাদের সন্তানরাও এদেরই অন্তর্গত— তাদের প্রতি আমাদের আর কোনো কর্তব্য থাকবে না। মোটেও তা নয়, বরং মনে হয় যে আমরা গ'ড়ে তুলবো বৃহত্তর পরিধির মানুষদের সঙ্গে আরও অকপট, দীর্ঘস্থায়ী এবং শুশ্রূষাপরায়ণ সব সম্পর্ক, এবং অন্যদের সন্তানরাও সেই বৃত্তের অন্তর্গত হবে। ঐভাবেই আমরা এগোতে পারি আরও সত্যিকারের প্রীতিসিক্ত, মানবতাবাদী সমাজের দিকে, যুদ্ধের অবসানের

অভিমুখে। কোনো সন্দেহ নেই, একটি সমস্যার সমাধানের ফলে অন্য কোনো সমস্যা উন্মোচিত হবে। তখন আরেক দফা কাজ ক'রে নতুন সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। কিন্তু সেটা তো আমাদের অস্তিত্বেরই পরিস্থিতি। অন্তহীন সতর্কতা এবং পরিশ্রম ব্যতীত কোনো স্বাধীনতা হয় না।

॥২॥

মেয়েদের আন্দোলনকে যে একটা বহুমাত্রিক সংগ্রাম হয়ে উঠতে হবে এই কথাটাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছি। আমাদের লাগবে : বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রতি ছেদহীন মনোযোগ ; পরিবর্তনকে, মেনে নেবার দিকে একটা উন্মুক্ততা ; গভীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহের অভিমুখে অগ্রসর হবার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয়,— সংঘবদ্ধ চেতনা, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং নানাবিধ ক্রিয়াকৌশল ; ব্যক্তিমানুষের সেই বিবেকিতা ও সৎসাহস, যাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের রূপান্তরসাধন, যাতে আমরা নিজেরা নিজেদের তরফে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারি, অন্যরা তার জন্য প্রস্তুত না হলেও, এই ভরসা রেখে যে আমরা তাদের যতটা পারি বুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো, আর যদি থাকে আস্থা, সক্রিয় ভালোবাসা, কল্পনা এবং অধ্যবসায়, তা হলে এ দিকে অনেক দূরই এগোনো যায় বটে। আমাদের এক দিকে যেমন লাগবে আরও অনেক নিবেদিত কর্মী, যাঁরা মেয়েদের দাবিদাওয়া এবং সুযোগসুবিধা নিয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলন করবেন, তেমনি অন্য দিকে লাগবে আরও বাস্তবধর্মী এবং নমনীয় চিন্তা, লাগবে শিক্ষা-কর্মসংস্থান-বিবাহ-জন্মনিরোধ-শিশুপালন ইত্যাদি নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গভীরতর স্তরের সংলাপ। যাঁদের আমরা ন্যায্যতঃই মনে করতে পারি একই সাধারণ সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন গোত্রের কর্মী, তাঁদের মধ্যে আছেন : সেই বিজ্ঞানীরা, যাঁরা আরও নিরাপদ, আরও কার্যকর জন্মনিরোধের ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যান ; সেই সব ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী, হেল্‌থ্‌ ভিজিটর, যাঁরা উন্নততর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধিকে গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেন ; পার্লামেন্টের সেই সদস্যরা, যাঁরা মেয়েদের এবং শিশুদের অধিকারগুলিকে উন্নততর আইন দ্বারা রক্ষা করবার জন্য আন্দোলন করেন ; সেই সব আইনজীবী, যাঁরা মার-খাওয়া স্ত্রীদের এবং তাঁদের শিশুদের স্বার্থরক্ষা করতে সহায়তা করেন ; অফিস এবং কারখানার সেই সব কর্মদাতা, যাঁরা খণ্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা করেন এবং কাজের জায়গায় বাচ্চাদের জন্য নার্সারির ব্যবস্থা করেন ; সেই সব শিক্ষকশিক্ষিকা, যাঁরা ছাত্রদের গার্হস্থ্য বিধি এবং ছাত্রীদের কাঠের কাজ শেখাতে রাজি ; সেই সব মা-বাবা, যাঁরা তাঁদের ছেলেদের শেখাতে রাজি যে কেবল শক্ত হলে চলবে না, নরমও হতে হবে, এবং মেয়েদের শেখাতে রাজি যে কেবল নরম হলে চলবে না, শক্তও হতে হবে ; সেই পুরুষ, যিনি তাঁর স্ত্রী কন্‌ফারেন্সে গেলে তাঁদের বাচ্চাটিকে দেখে রাখতে লজ্জা পান না, এবং সেই নারী, যিনি স্বামীর তত্ত্বাবধানে বাচ্চা রেখে কন্‌ফারেন্সে এসেছেন ব'লে অপরাধবোধে ভোগেন না ; সেই সব শিল্পী-লেখক-

বুদ্ধিজীবী, নতুন নীতিবোধকে এখনই এবং এখানেই জীবনে রূপ দেবার সৎসাহস যাঁদের আছে, মুক্তদৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত যুবকযুবতীদের নতুন এক প্রজন্মকে গ'ড়ে তুলতে যাঁরা সাহায্য করেন; এবং আরও অনেকে। ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্যই নারী-আন্দোলনের সাফল্যের চাবিকাঠি। এই আন্দোলনে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু দেবার আছে, এবং বৈচিত্র্য যে সুস্থ বিবর্তনের একটি অপরিহার্য শর্ত সে-কথা তো জীববিজ্ঞানীমাত্রই আমাদের বলবেন।

নারী-আন্দোলন পাশ্চাত্য জগতেই সব থেকে বেশী আত্মচেতনা এবং বিশ্লেষক ক্ষমতায় পৌঁছেছে। আমাকে একজন মার্কিন মেয়ে একটি বই পড়তে দিয়েছেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেইশজন মেয়ে,— লেখিকা, শিল্পী, বিজ্ঞানী, গবেষিকা,— তাঁদের জীবন এবং কাজ সম্বন্ধে কথা বলেছেন।[৫] মেয়ে হওয়াটা তাঁদের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ ক'রে তাঁদের কর্মজীবনকে, এবং যে-সব সমস্যা দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন কিভাবে সেগুলির সমাধানের চেষ্টা করেছেন: এই বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা অকপটভাবে আলোচনা করেছেন। এই মর্মস্পর্শী বইটিতে দু' ধরনের সংগ্রামেরই প্রতিবেদন আছে: যে-সংগ্রাম আমাদের বাইরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিন্যাসদের সঙ্গে, এবং যে-সংগ্রাম আমাদের নিজেদের ভিতরকার সেই সব মানসিক প্রতিন্যাসের সঙ্গে, যেগুলি আমাদের শৃঙ্খলিত ক'রে রাখে, যেমন ঔদাসীন্য, হীনম্মন্যতা, ভীরুতা; কিন্তু বইটি হতাশা থেকে আশা নির্মাণ করে বটে। পড়তে পড়তে আমি কখনও উল্লসিত বোধ করেছি, কখনও বা চোখে জল এসেছে: মনে হয়েছে যেন আমি জঙ্গলের ভিতরে কোনো নিঃসঙ্গ যোদ্ধা, যে বেতারে শুনছে জঙ্গলের অন্যান্য দুর্গম দূরস্থিত অংশ থেকে তেইশজন সহযোদ্ধার কণ্ঠস্বর। কখনও এই নারীর জীবনের এই লড়াই, কখনও ঐ নারীর জীবনের ঐ লড়াইয়ের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পেরেছি। পড়া যখন শেষ করলাম, মনে হলো রেডিওটা যেন হঠাৎ নীরব হয়ে গেলো, আমি আবার একলা হয়ে গেলাম।

কতগুলি কাহিনী অবিশ্বাস্য ও ট্র্যাজিক, তবু সেগুলি নিশ্চয়ই সত্য। ইভ্‌লিন ফক্স কেলার নামে একজন পদার্থবিজ্ঞানী এবং নাওমি ওয়াইস্টাইন নামে একজন মনোবিজ্ঞানী মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, বিশেষতঃ হার্ভার্ডের, বিজ্ঞানবিভাগগুলিতে মেয়েদের সংগ্রাম সম্পর্কে যে-প্রতিবেদন রেখেছেন, তা প'ড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের, বিশেষতঃ হার্ভার্ডের লোকেদের, লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া উচিত।

ব্যাপক বেকারত্ব এবং উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে সুযোগের অভাবের কারণে পাশ্চাত্য জগতের নারী বুদ্ধিজীবীরা আজকাল যে-সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলি সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় দর্শনের অধ্যাপিকা আমেলি অক্সেনবার্গ রর্টি-র লেখাটিতে। বৃটেনে দীর্ঘকাল বাস করার ফলে আমি নিজে এই সব সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছি; হয়তো ভারতের পেশাদার মহিলারা এখনও এই অসুবিধাগুলিকে ততটা তীব্রভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করেন নি।

> সত্যি কথাটা এই যে মোটামুটিভাবে একই ক্ষেত্রে কাজ করছেন এমন সহকর্মীদের নিয়মিত সান্নিধ্য অধিকাংশ লোকের পক্ষেই জরুরী ; সেটা যে কেবল একটা নির্ভর তা-ই নয়, সেটা একটা মৌল প্রয়োজন। এমন কি যেটাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নিঃসঙ্গ কাজ সেটারও প্রায়ই একটা সামাজিক মাত্রা থাকে ; শেষ অণুচ্ছেদটা লেখা হয়ে গেলে উঠে গিয়ে কাউকে দেখাতে হয়, থিসিসটা কোনো সংশয়বাদী সেমিনারের সামনে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হয়। আসল কাজ ওভাবেই হয়, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ পরিবেশে নয়। ... একজন বুদ্ধিজীবীর লাগে সেই পুষ্টি, যা আসে সহকর্মীদের সঙ্গে জীবনযাপন থেকে।

নিঃসঙ্গতার এমন এক পরিস্থিতির অভ্যন্তর থেকে বৌদ্ধিক কাজ করতে বাধ্য হওয়া, যেটা চাওয়া হয় নি, উপর থেকে চাপানো হয়েছে,— অর্থসাহায্য ছাড়া, কারও উৎসাহদান ছাড়া, সংলাপ ও আলোচনার উদ্দীপন ছাড়া, সহকর্মীদের ও ছাত্রছাত্রীদের সমাদর ছাড়া, এবং নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যতের উন্নতি করা যাবে এমন কোনো আশা ছাড়া,--- এ এক অবস্থা যার সঙ্গে পশ্চিমের অনেক উচ্চশিক্ষিত মেয়েই আজকে পরিচিত। আমি নিজেও এর সঙ্গে পরিচিত।

আমেলি রর্টি আরও দেখান কিভাবে স্ত্রীর পেশাঘটিত নৈরাশ্যের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়। কোনো মেয়ে নিজস্ব কর্মজীবনের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়লে ব্যক্তিগত জীবনে তাকে যে কত বড় দাম দিতে হতে পারে, তার বিয়ে যে ভেঙে যেতে পারে, এ কথাটা এই গ্রন্থের সমগ্রতায় পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে।

এই বিন্দু থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে আলোচনাটাকে বিস্তৃততর ক'রে আরও বলা যায় যে ঐ জাতীয় ঘটনা আবশ্যিকভাবে কেবল স্বামীর স্বার্থপরতার পরিণাম নয়। স্বামী অথবা স্ত্রী অথবা দুজনেই যদি খুব বেশী ক্লান্তি বা নৈরাশ্যে ভোগে, তা হলেই অবস্থাটা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। যে-সব পেশাদার দম্পতিদের ছোট বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে, তারা প্রায়ই এই অবস্থার শিকার। যেখানে স্বামী উদারচিত্ত এবং সহযোগী, স্ত্রীর সংগ্রামে তাকে সাহায্য করতে মনোযোগী, সেখানেও দুজনের সম্পর্ক ঠিক সেইভাবে ক্ষ'য়ে যেতে পারে, যেভাবে ক্ষ'য়ে যায় জেলখানার ভিতরে দুজন বন্দীর সম্পর্ক অথবা মানসিক হাসপাতালের ভিতরে দুজন রোগীর সম্পর্ক। হয়তো বজায় থাকে সৌহার্দ্য, পরস্পরসহিষ্ণুতা এবং ক্ষমাশীলতা, কিন্তু বাষ্পীভূত হতে থাকে প্রেমাকর্ষণের জাদু। এটা একটা কঠিন সমস্যা, যাকে মোটেই খাটো ক'রে দেখা উচিত নয়।

সম্প্রতি আমি অক্সফোর্ডের একটি ক্লিনিকে বাংলাদেশী মেয়েদের জন্য দোভাষীর কাজ করেছি কয়েকবার। এই মেয়েরা যদিও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পান নি এবং তাঁদের ডাক্তারদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা চালাতে পারেন না, তবুও মাতৃভাষাতে তাঁরা যথেষ্টই স্পষ্টবাদিনী। আমি সহানুভূতিশীল কয়েকটি প্রশ্ন করায় একটি মহিলা একেবারে আগ্নেয়গিরির মতন ফেটে পড়লেন তাঁর অসন্তোষজনক যৌন জীবনের ক্ষোভগুলির

উদ্‌ঘাটনে। যারা শৈশব থেকেই দুঃখকে মুখ বুঁজে মেনে নেবার শিক্ষা পেয়েছে তারাই যদি এরকম বিক্ষুব্ধ বোধ করে, তা হলে জীবনের কাছ থেকে যাদের প্রত্যাশা আরও অনেক বেশী তারা যে জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলিতে গোলমাল বাধলে ক্রুদ্ধ এবং তিক্ত বোধ করবে সেটা কি বিচিত্র ?

আমাদের মনে রাখতে হবে যে অতীতে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের ভিতরে কোনো গণ্ডগোল বাধলেই— কোনো বোঝাবুঝির অভাব ঘটলেই, কোনো টেনশন দেখা দিলেই— সবরকমের আপস করতে বলা হতো মেয়েটিকেই। সমস্যা সমাধানের সেটাই ছিলো প্রায় একমাত্র উপায়। ঐরকম একটি অবস্থার একটি চিরায়ত, অবিস্মরণীয় চিত্র এঁকেছেন কালিদাস তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলের পঞ্চম অঙ্কে। তাঁর অঙ্কনে আছে প্রশংসনীয় সংযম, স্বচ্ছতা এবং নারীর জন্য গভীর সমবেদনা। দৃশ্যটার দিকে দ্রুত দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক।

দুর্বাসার শাপের ফলে রাজা দুষ্যন্ত চিনতে পারছেন না শকুন্তলাকে, যাকে তিনি গোপনে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধর্ব মতে এবং যে এখন গর্ভিণী অবস্থায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। কণ্বমুনির দুই শিষ্য, শার্ঙ্গরব আর শারদ্বত, শকুন্তলার ভ্রাতৃস্থানীয় দুই যুবক, রাজার বক্তব্য একবর্ণ বিশ্বাস করে না, কিন্তু তবুও তারা মনে করে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিধানকে বলবৎ করা ছাড়া তাদের বেরোবার আর কোনো পথ নেই। গোপন প্রেমের মূঢ়তা আর রাজবংশীয়দের শঠতা সম্পর্কে কিছু ক্রুদ্ধ ও তিক্ত বক্তব্য রাখার পর তারা ঠিক করে যে তাদের ভগিনীপ্রতিমাকে রাজার কাছেই রেখে যেতে হবে। রাজা হচ্ছেন গিয়ে স্বামী : তিনি স্ত্রীকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পারেন ; তাকে কাছে রাখতে পারেন, ত্যাগও করতে পারেন। শকুন্তলা ব্যথিত বোধ করে ; শুধু যে তার প্রেমিক-স্বামীই তাকে ছলনা করছে তাই নয়, তার বাড়ির লোকেরাও তাকে ত্যাগ করতে উদ্যত। সে কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থানোন্মুখদের অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। পিসীমাস্থানীয়া গৌতমী কষ্ট পান, থামেন, এবং ক্রুদ্ধ যুবকদ্বয়কে অনুরোধ করেন শকুন্তলার প্রতি আরও মমতাময় হতে : মেয়েদের ঐক্যবোধের একটি মর্মস্পর্শী মুহূর্ত। শার্ঙ্গরব ফিরে দাঁড়ায় এবং ভ্রাতৃসুলভ, পিতৃসুলভ, পিতৃতান্ত্রিক রোষের সঙ্গে নির্মমভাবে শকুন্তলাকে আক্রমণ করে : 'কিং পুরোভাগে স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বসে ?' শকুন্তলা কাঁপতে থাকে। মার্কিন ফেমিনিস্ট শুলামিথ ফায়ারস্টোন তাঁর *দ্য ডায়ালেক্‌টিক অফ সেক্স* বইয়ে[৮] বলেছেন যে আজকের দিনে প্রেমই হচ্ছে সেই পিভট্ বা স্থিরকেন্দ্র, যাকে ঘিরে আবর্তিত হয় নারীর লাঞ্ছনা ; কিন্তু এটা কি কেবল আজকের ঘটনা, এটা কি বরাবরই হয় নি ? শকুন্তলা রাজার সঙ্গে গোপনে প্রেম ক'রে ইতঃপূর্বেই নিজের 'স্বাতন্ত্র্য' একবার দেখিয়েছে ; এখন আরেকবার তার 'স্বাতন্ত্র্য' খাটিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাইছিলো বেচারী ; কিন্তু তার 'ভাইয়েরা' কি আর তা হতে দেবে ? তাদের মতে পরিবারকে সে যথেষ্টই বিপর্যস্ত করেছে, আর নয়। শার্ঙ্গরবের বক্তব্য পরিষ্কার : রাজা যে-ইঙ্গিত করছেন তা-ই যদি সত্য হয়, তবে অমন মেয়েকে দিয়ে বাপের কী হবে, কিন্তু শকুন্তলা যদি মনে মনে জানে যে সে শুদ্ধ এবং সত্যবাদিনী, তা হলে, বলা বাহুল্য, 'পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্'। টেনশন বাড়তে থাকে। রাজা আবার বলেন যে এই মেয়েটিকে তিনি কখনো বিয়ে

করেন নি। শার্ঙ্গরব ইঙ্গিত করে যে রাজা পরবর্তী কোনো আসক্তির কারণে ইচ্ছে ক'রেই শকুন্তলাকে বিস্মৃতিতে ঠেলে দিয়েছেন। দুষ্যন্ত বলেন যে তিনি মহা ফাঁপরে পড়েছেন : বিভ্রান্তি কি তাঁর, না মেয়েটিই মিথ্যা কথা বলছে? নিজের স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করবেন, না অপরের স্ত্রী বা প্রেমিকাকে গ্রহণ করবেন? তিনি উপদেশ চান পুরোহিতের কাছে। পুরোহিত, সাধারণ বুদ্ধির মান্য প্রতীক, দেন আপাততঃ যা বিচক্ষণতম উপদেশ : বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত মেয়েটিকে তাঁর বাড়িতে রেখে বাচ্চাটিকে ভালো ক'রে দেখে নেওয়া দরকার। তিনি শকুন্তলাকে নিয়ে চ'লে যাবার পর নেপথ্যে ঘটে এক অলৌকিক ঘটনা। শকুন্তলার প্রকৃত জননী অপ্সরা মেনকা কন্যার লাঞ্ছনাকে মোটেই অত দূর গড়াতে দেবেন না; তিনি তাকে পৌঁছে দেন সুদূর এক স্বর্গীয় আশ্রমে, যেখানে শকুন্তলা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সন্তান প্রসব করবে, রাজপুত্রকে মানুষ করবে, যেখানে তার দীর্ঘ দুঃখময় চিত্তশুদ্ধির পর শাপান্ত হবে এবং দম্পতির পুনর্মিলন ঘটবে। (অপ্সরারা প্রাচীন জগতে উইমেন্স লিব্-এর প্রতীক : তাঁরা নিজেরা মুক্ত স্ত্রীলোক তো বটেই, তপস্বীদেরও তপস্যার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, যে-সূত্রে শকুন্তলার নিজের উৎপত্তি। তা ছাড়া অভিজ্ঞানশকুন্তলে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা-গৌতমী-মেনকা-সানুমতীর আচরণের মধ্যে মেয়েদের সলিডারিটির বেশ একটা থীম লক্ষ্য করা যায়; বঞ্চিতা হংসপদিকার গানও সেখানে একটি সুর যোজনা করে।)

আমি ইচ্ছে ক'রেই শকুন্তলার সমস্যার উপরে স্থান ব্যয় করলাম, এইজন্য যে ন্যায্য কারণে বিখ্যাত এই সংস্কৃত নাটকটির পঞ্চমাঙ্কে মেয়েদের প্রতি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিশিষ্ট প্রতিন্যাস ও বক্তব্যের উপরে ভালোভাবেই আলোকসম্পাত করা হয়েছে, এবং একই সঙ্গে নাট্যকার আমাদের ভিতর থেকে টেনে বার করেন নায়িকার প্রতি নির্দ্বিধ সহানুভূতি। যে-সব সমস্যা নিয়ে আজকের দিনে আমরা আলোচনা করি, তাদের কিছু কিছু বেশ পুরানোই বটে এবং কয়েক শতাব্দী ধ'রে লেখকদের এবং অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা স্বীকৃত ও চিত্রিত। 'কিং পুরোভাগে স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বসে?' এবং 'পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্' : এই নীতি দুঃসহ অবস্থাতেও মেয়েদেরকে দিয়ে গেলানো হয়েছে। কিন্তু আজকের অনেক মেয়ে— তাঁরা হতে পারেন মার্কিন বুদ্ধিজীবী বা বৃটেনে আগত বাংলাদেশীর স্ত্রী— স্রেফ বলছেন : 'হ্যাঁ, আমি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করারই চেষ্টা করছি; না, এই অবস্থা আমি মেনে নিতে পারছি না।'

ফিরে আসা যাক আধুনিক মেয়েদের কর্মজীবন প্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলিতে। সেই তেইশজন মার্কিন মেয়ের একজন, ডায়না মিচনার, একজন আলোকচিত্রশিল্পী, যে-সাক্ষ্য দিয়েছেন তা সত্যিই আমার মনকে নাড়া দেয় :

> আমার ধারণা আমি যে সর্বদা ব্যক্তিগত নৈরাজ্যের সঙ্গে লীলাখেলা করি তার কারণ আমার জীবনে সব কিছু পরস্পরসংসক্ত। আমি একটা কাজ থেকে অন্য কাজে চ'লে যাই কোনো নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম না ক'রেই। আমি যা, বা যা হবার চেষ্টা করছি, তার প্রত্যেক অংশ প্রাণধারণ করে আমার গৃহের মধ্যে।

কাপড় কাচার জায়গা আর রান্নাঘরের মাঝখানে আমার ডার্করুম, শোবার ঘরের এক কোণে আমার শুটিং-এর স্টুডিও ; গৃহ আর পরিবারের খোলস ত্যাগ ক'রে নিজের কাজের নিভৃত নির্জনতার ভিতরে প্রবেশ করতে আমার কষ্ট হয়। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়ে, ব্লকটার চার দিকে কয়েকবার হেঁটে নিয়ে, ফের 'ফোটোগ্রাফার' হিসাবে বাড়িতে ঢুকে কাজ করার চেষ্টা করেছি আমি। কৌশলটা কখনও কখনও কাজ দেয়, সব সময় দেয় না।

সকালবেলাটাই কঠিনতম সময়। ঘুম থেকে উঠে নিজেকে মনে হয় ফাঁকা, গাছের ছায়াদের মতন ওজনবর্জিত ; মনে হয় সব কিছু অবোধ্য, নিবিড় জলরাশির মধ্যে ভাসমান। ... আমার বাচ্চাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ; ওরা আমাকে সোজা টেনে আনে দিনের মধ্যে। আছে আলিঙ্গন আর সুপ্রভাত, প্রাতরাশ আর সংজ্ঞানির্ণয়,— আমি তিনটে-পনেরোতে বাড়ি ফিরছি, আজকে আমার বাঁশীর ক্লাস আছে, আজ সন্ধ্যায় কি তুমি কোথাও যাবে ? ওদের স্কুলে যাবার উত্তেজনা,— হয় তর্ক, নয় হাসি, কিংবা ছুটোছুটি, কিন্তু সর্বদাই পথের দিকে একটা প্রাচুর্যমণ্ডিত, উৎসুক গতি। আমি ওদের জন্য খুশী : ওরা রাতটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। ওরা চ'লে গেলে পর আমি তৈরি হই পরবর্তী উত্তেজনার জন্য,— আমার স্বামী। আমরা একসঙ্গে প্রাতরাশ সারি। এটা প্রায়ই একটা চিত্তবিক্ষোভসৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান। আমি চুপ ক'রে থাকি। অনেকবার মৃদুহাস্য করি। দৈনিক কর্মসূচীর ছোটখাট বিনিময়গুলির উপরে মনঃসংযোগ করি। আমি চাই যে ও তাড়াতাড়ি চ'লে যাক ; আমার ফোটোগ্রাফির কাজ সম্পর্কে ও কোনো প্রশ্ন করে তা আমি চাই না ; আমার ভয় করে যে ও আমার দৃষ্টির অন্তরায় হবে। ও বেশী অন্তরঙ্গ হলে আমি একদম নরম আর নির্ভরশীল হয়ে পড়বো এবং ব'লে ফেলবো : "আমাকে ছেড়ে যেও না। আমার ঈর্ষা হয়,— তোমার অফিস আছে, লোকজন আছে। আমি কোথাও যেতে চাই ; আমি আজকে একলা কাজ করতে চাই না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, আমি লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবো, মিনতি করছি ...।"

আমি তো আর সেই ছোট্ট মেয়েটা হয়ে থাকতে চাই না, যে নরম, প্রত্যাশী, যে রূপকথার আর খেলার সাথীদের স্বপ্নে বিভোর। তা ছাড়া আমি তো কর্তব্য নির্বাচন ক'রে ফেলেছি। তবু কাজের সেই প্রথম প্রভাতী আলিঙ্গনে পৌঁছনো একটা ভীতিকর ব্যাপার। বাড়ির আর সকলে যে-যার সংকেত পেয়ে চ'লে গেছে কোনো-না-কোনো সমাজ-অনুমোদিত গন্তব্যস্থলে, আমাকে একলা তৈরি ক'রে নিতে হবে আমার গন্তব্যস্থল। দরজার কাছে ফাঁকা জায়গাটায় হাঁটতে ভয় করে। এ সেই আমার ভিতরকার ভয়ংকর মেয়েলী ব্যাপার— আমাকে-ছলনা-ক'রে-ত্যাগ-ক'রে-গেছে মনোভাব— যা আমাকে ঈষৎ ক্লান্ত করে, মনে হয় বেশ হতো যদি আমার প্রেমিক, আমার স্বামী আমার নির্বাচনের বোঝাটা

> নিজের ঘাড়ে তুলে নিতো। যা আরও খারাপ,— মধ্যে মধ্যে আমি চ'লে যাই একেবারে শৈশবের এলাকায়, এক মুহূর্তের জন্য ফের সেই ছোট্ট মেয়েটা হয়ে যাই, যে রাত্রিবাস গায়ে সিঁড়িতে ব'সে কাঁপতো, শুনতে পেতো নীচে বড়রা কিরকম কথা বলছে, যে ভয়ংকরভাবে চাইতো যে কেউ তাকে আবিষ্কার করে, আলিঙ্গন করে, দলের মধ্যে টেনে নেয়। প্রায়ই আমার স্বামীর শেষ চুম্বনের পরে, দরজাটা বন্ধ হবার পরে আমার মধ্যে জেগে ওঠে সেই বালিকা। তাকে দূর করবার একমাত্র উপায় হলো আমার দৈনিক গানটি গাওয়া : ক্যামেরা তোলো, তার শাটার ক্লিক্ করো, নিজের কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে বিশ্বাস করো, অন্য আজে-বাজে জিনিসে মাথাটা ভর্তি কোরো না ... কেউ তোমার বিচার করছে না। কাপড়ের স্তূপ আর বাসনগুলোর ভিতর দিয়ে পিছলে যেতে যেতে ঐ কথাই আমি নিজেকে বলি, এবং একটা কুমির যেমন রোদ পোহাবার জন্য নিজেকে ডাঙায় ঠেলে তোলে, আমিও তেমনি নিজেকে ঠেলে তুলি আমার কাজের মধ্যে।

দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম,— ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এই সব স্বীকৃতির যা তাৎপর্য তার জন্য। উপরের অণুচ্ছেদগুলি আমি যখন প্রথম পড়ি, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি। আমার নিজের কোনো কোনো অনুভূতির ছায়াকে এখানে দেখতে পেয়েছিলাম, চিনতে পেরেছিলাম ইংল্যাণ্ডের একটি শহরতলিতে আপন গৃহের দুর্গে আটক লেখিকা হিসাবে আমার নিজের অবস্থাকে। আমার নিজের কোনো কোনো সমস্যা আরেক ধাপ জটিল, যেহেতু আমি এখানে বিদেশ থেকে আগত, এবং অন্ততঃ অর্ধেক সময় চেষ্টা করছি বাংলায় লিখতে, যে-ভাষা চার দিকে শুনতে পাই না, যে-ভাষায় লেখকবৃত্তি আমাকে উদ্বায়ুগ্রস্তভাবে নির্ভরশীল ক'রে তোলে উড়ো ডাক মাধ্যমে আসা পাঠক-প্রতিক্রিয়ার একটি শীর্ণ, মন্থর স্রোতের উপরে। ডাক আমার প্রাণধারণের সেই ভঙ্গুর লাইন, যার উপরে নির্ভর করার ক্লেশটা বড্ড বেশী।

আমার ইংরেজ স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় অক্সফোর্ডে প্রাক্-স্নাতক ছাত্রাবস্থায়। ভারতে এক বছর অধ্যাপনা করার পর সেখানে অধ্যাপকীয় কর্মজীবনের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্ভাবনাকে ত্যাগ ক'রে যখন ইংল্যাণ্ডে তার সঙ্গে থাকতে এলাম তখন সে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ছাত্র। আমার মা এবং তার মা দুজনেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তার ডক্টরেটের থিসিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার যেন বাচ্চা না হয়। আমি সে-পরামর্শ মেনে নিয়েছিলাম। আমার স্বামী যে-ছাত্রবৃত্তি পেতো তার পরিপূরণে আমি লণ্ডনের একটি স্কুলে খণ্ডকালীন কাজ নিলাম : ব্রাইটনে (যেখানে থাকতে হতো) কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারি নি। সপ্তাহে তিন দিন ব্রাইটন থেকে উত্তর লণ্ডনে যেতাম এবং আসতাম : যেতে-আসতে চার ঘণ্টা। আমাকে পড়াতে হতো কেবল প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রীদেরকে ; পড়াশোনার মান খুবই উন্নত ছিলো সেই স্কুলটিতে, এবং বস্তুতঃ যে-

পর্যায়ে পড়াতাম প্রাক্‌-স্নাতক পর্যায়ের সঙ্গে তার বড় একটা তফাৎ ছিলো না। আমি সে-কাজ খুবই উপভোগ করতাম এবং ছাত্রীদের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিলো। তখনও পর্যন্ত আমি এমন কোনো ক্ষেত্রের সন্ধান পাই নি যেখানে আমার নিজের গবেষণা করতে স্পৃহা হয়। ঢের বেশী অনুভব করতাম বাংলায় লেখার তাগিদ। লিখতামও,— কবিতা এবং গদ্য,— এবং সেসব নিয়মিত বেরোতো *দেশ* পত্রিকায়। ব্রাইটনে আমাদের সংসার ছিলো একখানা ঘরের মধ্যে, এবং *দেশ*-এ 'বিদেশের বই' স্তম্ভে যে-বইগুলো নিয়ে লিখতাম সেগুলো প্রায়ই ট্রেনে ব'সে পড়তাম। এই অভিজ্ঞতার পর আমি অনায়াসেই ইংল্যাণ্ডে প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষিকারূপে নিজের কর্মজীবনকে সুদৃঢ় করতে পারতাম, কিন্তু কাজটা ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে গেলাম পশ্চিম ক্যানাডায়, যেখানে ভূমিষ্ঠ হলো আমাদের প্রথম সন্তান। এর কিছু বাদেই শুরু হলো আমার বিদ্রোহ, আমার কর্মজীবনের অবস্থার বিরুদ্ধে। আমি বুঝতে পারলাম যে আমারও স্নাতকোত্তর কাজ করা দরকার, যাতে আমি বিদ্যাজগতের জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। তত দিনে আমি গবেষণা করবার মতো বিষয়বস্তু পেয়ে গেছি, কিন্তু তার মালমশলা ইংল্যাণ্ডেই সুলভতর, অতএব সে-দেশে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম। আমার স্বামী আমার পরিকল্পনায় সহানুভূতিশীল হয়ে তার নিজের অ্যাকাডেমিক কেরিয়র অন্বেষণকে ডক্টরেট-পরবর্তী পর্যায়ে মুলতবি রাখলো এবং আমরা ফিরে এলাম অক্সফোর্ডে, যাতে আমি সেখানকার গ্রন্থাগারগুলির সম্পদ ব্যবহার ক'রে গবেষণা করতে পারি। আমি স্নাতকোত্তর ছাত্রীরূপে নাম লেখালাম ২৯ বছর বয়সে, যখন আমাদের প্রথম সন্তানটির বয়স দু' বছর আর দ্বিতীয়জনের বয়স মাত্র আট মাস। বস্তুতঃ, দ্বিতীয়জনকে কোনোমতে স্তন্যপানের অভ্যাস ছাড়িয়ে গেলাসে দুধ খেতে শিখিয়ে স্নাতকোত্তর কার্যক্রমের প্রাথমিক বক্তৃতাগুলিতে গেলাম। এবারে আমার স্বামী অক্সফোর্ড অঞ্চলের একটি স্কুলে পড়াতে লাগলো, কিন্তু আয়রনি এই যে ব্রাইটনে থাকাকালীন বিবাহিত ছাত্র হিসাবে ও যে-সরকারী ছাত্রবৃত্তি পেতো, বিবাহিতা ছাত্রী হিসাবে আমি তার থেকে ক্ষুদ্রতর বৃত্তি পেতে লাগলাম। এর কারণ সে-সময়কার ইংল্যাণ্ডের ছাত্রবৃত্তিবিতরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সরকারী নিয়মাবলী। একজন বিবাহিতা ছাত্রী যদি কোনো কর্মরত পুরুষের স্ত্রী হতো, তা হলে তার স্বামীর আয় যত অল্পই হোক না কেন তাকে দেওয়া হতো অন্যদের বৃত্তির— অর্থাৎ একজন অবিবাহিতা ছাত্রীর, অথবা যে নিজে ছাত্রী এবং যার স্বামীও ছাত্র তার, অথবা কোনো বিবাহিত বা অবিবাহিত ছাত্রের বৃত্তির— অর্ধেকমাত্র। বিবাহিত ছাত্ররা নির্ভরশীল স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য কিছু অতিরিক্ত ভাতার দাবিদার হতে পারতো, কিন্তু একজন বিবাহিতা ছাত্রীর পক্ষে অন্যদের সঙ্গে বৃত্তির সমতা পাওয়া সম্ভব ছিলো একমাত্র তখনই যখন তার স্বামী একদম বেকার, অর্থাৎ বেকার ব'সে থাকতে রাজি। আমি লণ্ডনের শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে এ নিয়ে কিছুটা লড়াই করেছিলাম (মার্গারেট থ্যাচার তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন) এই আবেদন জানিয়ে যে হয় আমাকে পুরো বৃত্তিটা দেওয়া হোক, নয়তো আমার বাচ্চাদের নার্সারি বিদ্যালয়ের মাইনেটা আমাকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সে-মুহূর্তে আমি নিজে কোনো দাবি

আদায় করতে পারি নি,— সরকারের বক্তব্য ছিলো অনড়ভাবে এই যে স্ত্রীদের যাবতীয় দায় স্বামীদেরই বহনীয়, বিবাহিতা ছাত্রীরা যে কিছুমাত্র বৃত্তি পায় সেইটাই তাদের মহাসৌভাগ্য,— কিন্তু এর কয়েক বছর বাদে, আমার নিজের ছাত্রাবস্থা শেষ হয়ে যাবার পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিস্তর সংঘবদ্ধ লড়াই ক'রে এই অন্যায়ের অবসান ঘটায়। বৃটেনে ১৯৭৫ সালের 'সেক্স ডিস্‌ক্রিমিনেশন অ্যাক্ট' চালু হবার আগে পর্যন্ত জীবনের নানা ফাঁকে ফোকরে এই ধরনের খুচরো লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়বার কোনো প্রকৃত আইনগত ভিত ছিলো না। আমার বৃত্তির টাকা আমি কখনো 'চোখে দেখার' সুযোগ পেতাম না : চেকগুলি আসামাত্রই সাংসারিক নিত্যপ্রয়োজনের কোনো-না-কোনো অগ্নিশিখা তাদের গ্রাস করতো। আমাদের ছেলেরা যে-প্রাতঃকালীন প্রাইভেট নার্সারি স্কুলটিতে যেতো তার পরিচালিকা সরকারী কর্তৃপক্ষের চাইতে ঢের বেশী সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং ওদের ফীটা একটা নামমাত্র অঙ্কে কমিয়ে দেন। স্কুলটি সরকারী হলে তা অবৈতনিকই হতো বটে, কিন্তু আমি যে-শহরতলিতে থাকতাম (এবং এখনও থাকি) সেখানে কোনো সরকারী নার্সারি স্কুল ছিলো না এবং শহরের ভিতরে থাকি না ব'লে সেখানকার সরকারী নার্সারি স্কুলে আমাদের ছেলেদের ঢোকানো সম্ভব হয় নি।

স্নাতকোত্তর গবেষণা করতে লাগলাম কঠিনতম পথ ধ'রে : পায়ের কাছে ছোট দুটি শিশু, তাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো, ন্যাপি কাচা এবং শুকানো, এ সমস্তর সঙ্গে সঙ্গে। এই বছরগুলিতে আমি অত্যন্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, কাজ করবার তাগিদকে কোনোভাবে পক্ষাহত হতে দিই নি। ঠিক করছি কি ভুল করছি ভেবে, দুশ্চিন্তা ক'রে মন খারাপ করার সময় ছিলো না তখন। দৈনিক জীবনকে কঠিনভাবে নিয়মশৃঙ্খলিত ক'রে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রোবটের মতো খেটে যেতাম। নার্সারি স্কুল, বাড়ি আর লাইব্রেরির মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতাম, বিছানার চাদরসমেত সমস্ত কাপড়চোপড় বাথটবে কাচতাম, দু'-তিনবার খাওয়ার মতন রান্না একবারে ক'রে রাখার চেষ্টা করতাম, আর বাচ্চারা যখন মেঝেতে ব'সে খেলনাপত্র ছড়িয়ে খেলা করতো তখন দৃঢ়চিত্তে নিজে বই পড়তাম এবং নোট নিতাম। অনেক মূল্যবান বই লাইব্রেরি থেকে বাড়িতে এনে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম ব'লেই কাজটা আদৌ এভাবে করা সম্ভব হয়েছিলো। প্রথম ছ'মাস কয়েকটি লেক্‌চার, ক্লাস ইত্যাদিতে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিলো ; ঐ সময়ে একজন স্থানীয়া মহিলা কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাদের বাচ্চাদেরকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখে রাখতেন। তার পর তিনি নিজে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন এবং কাজটা ছেড়ে দেন। অতঃপর আমরা আর কোনো সহায়িকা নিয়োগ করতে পারি নি, আমাদের সামর্থ্যই ছিলো না। বলা বাহুল্য, ঘরের তথাকথিত 'মোটা' কাজগুলোও আমাদেরই করতে হতো ; এখানে তো গ্রাম-বস্তি-ঝুপড়ি থেকে আসা সস্তা মেহনত নেই। বিচিত্র সব শিফ্‌টে কাজ করতাম এবং জীবনযাপন করতাম আমরা। যেমন, কোনো দুপুরবেলাকার চিত্র : ছোট ছেলে দিবানিদ্রা দিচ্ছে, বড়জন খেলছে, তাদের বাবা বাড়ির বাইরে রুটি রোজগার করছে, আমি বাড়িতে পড়াশোনা করছি। একই দিনের সন্ধ্যাবেলা : বড় ছেলে নিদ্রাভিভূত, ছোটজন দিবানিদ্রা

দিয়ে উঠে চাঙ্গা হয়ে বাপের সঙ্গে 'নাইট লাইফ' যাপন করছে, অর্থাৎ কিনা 'লেগো' দিয়ে খেলছে, আর আমি বেচারী লাইব্রেরিতে ব'সে যে-সব বই বাড়ি নিয়ে যেতে দেয় না সেগুলোকে নিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত ধস্তাধস্তি করছি। কয়েকটি বছর আমাদের দুজনেরই কঠিন সংগ্রামের পর আমাদের সন্তানরা শারীরিক-মানসিক দু' দিক দিয়েই শক্তপোক্ত স্কুলবালকে পরিণত হলো এবং আমার ডক্টরেটটিও উপার্জিত হলো। এর বছরখানেক বাদে আরও কিছু পড়াশোনার পর থিসিসটির ঘষা-মাজা শেষ ক'রে তা থেকে একটি প্রকাশযোগ্য বইও দাঁড় করানো গেলো, যেটি যথাসময়ে বিচক্ষণ সমালোচকদের সমাদরও লাভ করেছে বটে। কিন্তু ঠিক যে-উদ্দেশ্যে ডক্টরেট লাভের জন্য জীবনের কতগুলি মূল্যবান বছর ব্যয় করলাম সেটি— অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে প্রত্যাবর্তন— ঠিক আর হয়ে উঠলো না। তার কারণ নানা ও পরস্পরজটাবদ্ধ: উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়-খাতে সরকারী অর্থনিয়োগের নির্মম সংকোচন, লিঙ্গগত বর্ণগত ও অন্যান্য বর্গের বৈষম্য ইত্যাদি। মনে হয়, আমার গবেষণার ক্ষেত্রটি কিছু পরিমাণে আন্তর্বিদ্য হয়ে যাওয়ায় সুবিধা হয় নি: যাঁরা নিজেরা সোজা সড়ক ধ'রে চলতে ভালোবাসেন তাঁরা অন্যদের চারণবৈচিত্র্যের সমঝদার হন না; ইংরেজীর লোকেদের মতে আমার কাজটা ইতিহাসঘেঁষা, ইতিহাসের লোকেদের মতে আমি মূলতঃ ইংরেজীরই লোক ইত্যাদি। আমি যে-অধ্যাপিকার তত্ত্বাবধানে কাজটা করেছিলাম তিনি ছিলেন কুনো এবং বিশ্ববিদ্যালয়জগতের জটিল রাজনীতিতে নিতান্ত অপারদর্শী; তিনি নিজের ছাত্রছাত্রীদের যথোপযুক্তভাবে 'ধাক্কার মদত' দিতে পারতেন না। সংক্ষেপে, কোনো চাকরি বা ফেলোশিপ জোগাড় করা গেলো না এবং পোস্টডক্টরেট গবেষণা করার সংকল্পও ত্যাগ করতে হলো। সুযোগসুবিধার ত্বরিত সংকোচনই নিশ্চয় এ অবস্থার শিকড়-কারণ। অল্প জায়গায় অনেক লোক ভিড় ক'রে দাবি আদায় করার চেষ্টা করতে থাকলে বিবিধ বৈষম্যের বিষ বাড়তেই থাকে। বৃটেনে আমার প্রজন্মের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে নারীপুরুষনির্বিশেষে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা যে-সব পেশাগত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যৌবন আরম্ভ করেছিলেন ঠিক সেগুলি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করার সুযোগ পান নি। অনেককেই অনেক পুরানো পরিকল্পনা থেকে স'রে আসতে হয়েছে। আমরাও সেই দলের মধ্যেই প'ড়ে গেছি। নৈরাশ্যের বা আধা-নৈরাশ্যের এই অবস্থাতেই মনের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির পচ ধরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান ক'রে আমি আরেকটি গবেষণাগ্রন্থ রচনা করতে পারবো কিনা তা একমাত্র সময়ই বলতে পারবে।

ভারতে এক বছর অতিথি-অধ্যাপকরূপে কাটানোর পর পূর্ণকালীন লেখকজীবন গ'ড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হয়েছি। ব্যাপার হলো, বিদ্যাচর্চা করতে হলে যেমন গ্রন্থাগার, গবেষণার অনুদান, সহকর্মী, ছাত্রছাত্রী, পাঠচক্র ইত্যাদির পুষ্টি লাগে, তেমনি সৃষ্টিশীল কাজ করতে গেলেও লাগে জীবনের প্রত্যক্ষ পুষ্টি, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া, কাছে থেকে অন্যদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ, 'সাধারণ' বন্ধুবান্ধব তথা সহশিল্পীদের সান্নিধ্য ও সমালোচনা। একজন কবির বা ঔপন্যাসিকের লাগে অনুপ্রেরণা ও

উদ্দীপনা, সমাদর ও ভালোবাসা ; লাগে থেকে থেকে জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, অভিজ্ঞতার নদীতে অবগাহন, আবার থেকে থেকে তা থেকে স'রে এসে নিভৃত পরিবেশে সৃষ্টির অবকাশ, স্মৃতির রোমন্থন, আহৃত অভিজ্ঞতার গাঁজন ও কেলাসন। দু' জাতের ক্রিয়াকলাপেরই সুযোগ চাই, নয়তো তাঁকে পাকড়াও করবে বিষাদ, কর্মক্ষমতার পক্ষাঘাত ; শেষ পর্যন্ত মনের ভাঙনও হতে পারে।

শিল্পীর জীবন কোনোকালেই সহজ ছিলো না ; নারী শিল্পীর জীবন কঠিনতর ; আমার ক্ষেত্রে দেশান্তর আরেক মাত্রা জটিলতা সৃষ্টি করে। দেশান্তরিত শিল্পী হবার অনেক বাহ্য সমস্যা আছে ; সেগুলির মধ্যে যাচ্ছিই না, কেবল একটা মৌল জটিলতার কথা এখানে বলছি। এই জটিলতার আঁটিটা হচ্ছে এই যে আমি ক্রমশঃ একজন পুবে-পশ্চিমে মেলানো মানুষ হয়ে উঠেছি। আমি যে-বয়সে পশ্চিমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি তখন আমার একটা পূর্ণাবয়ব ভারতীয় আত্মপরিচয় তৈরি হয়ে গিয়েছে,— সদর্থক অর্থে,— অথচ ভারতীয় 'টাবু' বা 'কম্‌প্লেক্স'গুলি তখনও মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠবার বিশেষ সুযোগ পায় নি ; যদি এগুলির কিছু আমার মধ্যে থেকে থাকে তা হলে মনে হয় সেগুলি কালক্রমে ঝ'রে গেছে। পশ্চিমের কাছ থেকে আমি অনেক মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছি, কিন্তু যেগুলি পাশ্চাত্য 'টাবু', 'কম্‌প্লেক্স' বা 'হ্যাং-আপ্' সেগুলি গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজনই কখনো অনুভব করি নি। বৃটিশ সমাজ যে আমাকে পুরোপুরি স্বীকার করে নি, আমি যে তার সঙ্গে পুরোপুরি মিশ খেয়ে যাই নি, সেই ব্যাপারটাই আমাকে এসব গ্রহণ করতে দেয় নি, তার অন্তরায় হয়েছে। ফলতঃ আমি বাধ্য হয়েছি 'বিশুদ্ধ' থাকতে ; উভয় সংস্কৃতি থেকেই যা সম্মানার্হ মনে করেছি তা নিয়েছি, অর্থাৎ কেবল সদর্থক লক্ষণগুলিকে, এবং দুই দুনিয়ারই নঞর্থক লক্ষণগুলিকে খুব বেশী হৈচৈ না ক'রে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি নির্ভর করি আমার নিজস্ব কোলাহল-না-করা এই প্রত্যয়ের উপরে যে নঞর্থক দিকগুলি একদিন খ'সে যাবে এবং সদর্থক দিকগুলি মিলিত হবে। এই আস্থা আমাকে দেয় একটা ভয়ংকর ভিতরকার স্বাধীনতা, যাকে আমি বিরাট মূল্য দিই, যা একই সঙ্গে আমাকে করে একাকী (কেননা অস্মিতায় যারা আমার মতন, যাদের সঙ্গে আমি ঠিক ক'রে ভাববিনিময় করতে পারি, তারা সংখ্যায় খুব কম) এবং যা পুষ্টি জোগায় আমার স্বপ্নদেরকে, এই যেমন বহুমাত্রিক নারী-আন্দোলনের একটা রঙিন, হয়তো কিছু বেশী রঙিন, স্বপ্নকে।

॥৩॥

আমার স্বভাবটা যেরকম সেরকম ব'লেই আমি চাই যে আমাদের স্বাধীনতাকে আমরা গ্রহণ করি 'মাধুর্য এবং আলোক'-এর সঙ্গে, প্রকৃতিস্থ মন নিয়ে এবং ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে, যে-দ্বেষ ও তিক্ততা অন্যান্য স্বাধীনতা-আন্দোলনকে খর্ব করে তাদের বাদ দিয়ে। গোঁড়ামি, চরমপন্থা, ঘৃণা, আগ্রাসিতা : এগুলি আমার চোখে নব-নব শিকলমাত্র, যত শীঘ্র সম্ভব বর্জনীয়, অন্য মুভমেন্টগুলি থেকে গ্রহণীয় নয়। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে আমাদের চাষ করতে

হবে প্রীতির সম্পর্ক, বৈরিতার নয়। এটা কোনো শত্রুপক্ষকে উচ্ছেদ করার জন্য সংগ্রাম নয়। আমরা তো পুরুষদের উৎখাত করতে চাইছি না, চাইছি পারস্পরিক শোষণ বা দমনকে বাদ দিয়ে তাদের সঙ্গে আরও ন্যায্য, সুসমঞ্জস, ফলপ্রসূ সহাবস্থান। কেবল রণসংগীত গাইলেই হবে না, প্রেমের গান কিভাবে গাইতে হয় তা-ও মনে রাখা চাই। শান্তি যখন আসবে, তখন জয় দিয়ে আমরা কী করবো যদি প্রেমের গান কিভাবে গাইতে হয় তা ভুলে গিয়ে থাকি? এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ফেমিনিস্ট লেখিকাদের মধ্যে কাউকে কাউকে অন্যদের থেকে বেশী প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রাণনাশক্তির অধিকারিণী ব'লে মনে হয় আমার।

যেমন, কেইট্ মিলেট-এর *সেক্সুয়াল পলিটিক্স* বইখানা[৭] পাশ্চাত্য সাহিত্যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের একটি দীপ্ত নগ্নীকরণ, কিন্তু এমন নির্মম যে মুখে একটা বিশ্রী স্বাদ রেখে যায়। এ বই পড়ার পর একজন মেয়ের মনে হতে পারে যে এর পর তার পক্ষে আর কোনো পুরুষকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। এ বই থেকে আমরা কয়েকটা তিক্ত সত্যকে শিখে নিতে পারি, তার পর বইটাকে ফের শেল্‌ফে তুলে রাখতে হয়, নয়তো আমাদের নিজেদের ভালোবাসবার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অপরপক্ষে তাঁর ইউটোপিয়ার চিত্রণে সায়েন্স ফিক্‌শনের কিছু আজব ছোঁয়া থাকা সত্ত্বেও শুলামিথ ফায়ারস্টোনের *দ্য ডায়ালেক্‌টিক অফ সেক্স* বইখানাকে, আগেই যার উল্লেখ করেছি, আমার বরাবরই মনে হয়েছে চিত্তাকর্ষক এবং উদ্দীপক। তাঁর লেখার মধ্যে আছে উপলব্ধি, সমবেদনা, এবং একটি গুণ যাকে 'অপাপবিদ্ধতা' ছাড়া আর কোনো নাম দিতে পারি না এবং যেটিকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করি। অনেক যৌন টাবু ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যাবে এবং প্রেম বহুরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করবে, তাঁর এই প্রত্যয়ের আমিও অংশীদার।

সম্প্রতি যে-দুটি বই প'ড়ে বিশেষ অনুপ্রাণনা পেয়েছি সে-দুটি হলো আনাইস্ নিন্-এর *ইন ফেভার অফ দ্য সেন্সিটিভ ম্যান অ্যাণ্ড আদার এসেজ়* এবং *আ উমান স্পীক্‌স্* (তাঁর ভাষণ-সেমিনার-সাক্ষাৎকারের একটি সংকলন)।[৮] এই বইদুটিতে পৃথিবীর প্রতি এমন একটা উষ্ণ আর সানুকম্প প্রতিন্যাস প্রকাশ পেয়েছে যা আমার মনকে চাঙ্গা আর সতেজ করেছে। নিন্ বাস্তববাদী বটে, আশাবাদীও বটে। সাম্প্রতিক কতগুলি প্রবণতা সম্পর্কে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি আশা রাখেন। তিনি আমাদের অনুরোধ করেন হতাশ না হতে, আত্মবিশ্বাস রাখতে, কিভাবে বাধা অতিক্রম করতে হয় তা শিখে নিতে, এবং দুনিয়াকে বারবার আমাদের স্বপ্ন অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা ক'রে যেতে। তিনি আমাদের প্ররোচিত করেন এই আন্দোলনকে আমাদের জীবনের মধ্যে মূর্ত করতে,— এখনই, এই মুহূর্তে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আনতে হবে গভীরতার মাত্রা, সেখানে আমাদের গভীর হতে শিখতে হবে, যাতে সেই জীবনযাপন থেকে আমরা সম্পদ আহরণ ক'রে আনতে পারি আমাদের সামূহিক অস্তিত্বের সমৃদ্ধিকল্পে। তিনি আমাদের অর্জন করতে বলেন সেই সূক্ষ্ম মানবিক কলাকে, যা দোলনের কলা, পরস্পরের দিকে ঈষৎ দোলায়িত হতে পারার আর্ট; তিনি আমাদের বলেন কবির চোখে, মরমী চোখে, ভালোবাসার চোখে পৃথিবীর দিকে তাকাতে; তিনি জানেন যে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় জাদুর, ইন্দ্রজালের একটা মাত্রা।

একেকসময় নিন্ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে অধৈর্যভাবে, তাড়াহুড়ো ক'রে বিদায় দিয়ে দেন ; তার কারণ খুব সম্ভব এই যে তিনি এই মাত্রাটিকে গভীরভাবে তলিয়ে দ্যাখেন নি। বিজ্ঞান আর কবিতা ভিন্ন পথ অবলম্বন ক'রে দৌড় দিয়ে আবার কিভাবে এক জায়গায় এসে মিলিত হয় তা তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নি বোধ হয়। অপিচ, আমার ধারণা, তৃতীয় দুনিয়ায় এ আন্দোলনের রাজনৈতিক মাত্রাটা যে কতটা জরুরী তা তিনি পুরোপুরি বুঝে ওঠেন নি। এই দুনিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বল্পতাই হয়তো এর কারণ। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতাগুলির জন্য আমরা তাঁকে পরিহার করতে পারি না। বহুমাত্রিক সংগ্রামের সারই হচ্ছে এই যে মূল্যবান যে-কোনো মাত্রা আমাদের নাগালের মধ্যে আসবে তাকেই আমরা কাজে লাগাবো, তার সদ্ব্যবহার করবো। তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলিকে মেনে নেবার পরও এই বইদুটি থেকে আমরা অনেক কিছু শিখে নিতে পারি।

> মেয়েদের প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি যে ক্রিয়াশীল ... সে-কথার স্বীকৃতিতে আমাদের পৌঁছতে হবে, সেই প্রকৃতির প্রয়োজনগুলিকে আমাদের মেনে নিতে হবে, সেই স্বভাবের মধ্যে যে কত বৈচিত্র্য থাকে তা আমাদের জানতে হবে, এবং তার প্রতি একটা সানন্দ প্রতিন্যাসে আমাদের পৌঁছতে হবে, বুঝতে হবে যে তা প্রকৃতিরই অংশ,— একটা ফুলের বৃদ্ধির মতো, জোয়ারভাঁটার মতো, গ্রহদের গতিবিধির মতো স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়দের ক্রিয়াকে জানতে হবে প্রকৃতি ব'লে, যার মধ্যে আছে আনন্দের আর আবেশের সম্ভাবনা। ... আমরা এখনও উৎপীড়ক শুচিবায়ুর শাসনাধীন। মেয়েরা যৌনতার বিষয়ে লিখলেই সেটা মুক্তি হয়ে যায় না। [প্রায়ই] তারা লেখে পুরুষদের মতোই নীচ মনোবৃত্তি নিয়ে, ব্যাপারটাকে খর্ব ক'রে। তারা আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে লেখে না।
>
> আমাকে একবার প্রশ্ন করা হয়, যে-পুরুষরা কাঁদে তাদের সম্বন্ধে আমার কী অভিমত, এবং আমি জবাব দিয়েছিলাম যে যে-পুরুষরা কাঁদে তাদের আমি ভালোবাসি, কেননা সে-কান্না থেকে বোঝা যায় যে তাদের অনুভূতি ব'লে একটা জিনিস আছে। যেদিন মেয়েরা তাদের তথাকথিত পুরুষোচিত গুণগুলিকে এবং পুরুষরা তাদের তথাকথিত নারীসুলভ গুণগুলিকে স্বীকার করবে, সেদিন মেনে নেওয়া হবে আমাদের স্বভাবের উভলিঙ্গতাকে, মেনে নেওয়া হবে যে আমাদের মধ্যে অনেকরকমের ব্যক্তিত্ব থাকে, পূর্ণতাপ্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকে আমাদের অনেক দিক। একটি মেয়ে সাহসী হতে পারে, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হতে পারে, হ্যাঁ,— এ সমস্তই হতে পারে সে। এবং যে-নতুন মেয়েটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে সে-মেয়েটি ভারী চমৎকার, বড় প্রেরণা-উদ্দীপক। আর আমি তাকে ভালোবাসি।

আমরা প্রত্যেকেই বহন করি শৈশবের বকেয়াস্বরূপ কিছু কিছু উদ্বেগের বীজকে, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ এবং বৎসল সামঞ্জস্যে জীবনযাপন করবার স্থিরপ্রতিজ্ঞা সব বাধাকেই অতিক্রম করতে পারে,— এক শর্তে, যদি আমরা সমগ্রের মধ্যে আমাদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলির জন্য জায়গা ক'রে নিতে পারি। এই নতুন দম্পতিদের যখন পর্যবেক্ষণ করি, যখন দেখি তারা কিভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান করছে, যেগুলির জন্ম নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন চেতনা থেকে, তখন আমার মনে হয় হয়তো বা আমরা এমন একটা মানবতান্ত্রিক যুগের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছি যখন যুদ্ধবিগ্রহ না ক'রে বিভিন্ন বৈষম্যের এবং অসাম্যের দূরীকরণ সম্ভব হবে।

... আমরা যদি গভীর স্তরে জুয়া খেলি, আমাদের ভিতরকার গভীর এবং খাঁটি অংশটাকে দান করি, তা হলে তা নষ্ট হতে পারে না। আমরা নষ্ট হতে পারি না।

... গুরুতর আঘাত থেকে আসে মানুষে অবিশ্বাস, কেননা একজন মানুষ তোমাকে ঘা দিতে পারে, পরিত্যাগ করতে পারে, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তবু আমি বলবো যে পারক্যবোধের দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার চাইতে, দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ককে ছিন্ন ক'রে ফেলার চাইতে পরিত্যক্ত হবার বা বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষ্য হবার ঝুঁকি নেওয়া লক্ষগুণ শ্রেয়ঃ। কেননা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে আশ্রয় নিলে আমাদের মৃত্যু ঘটে ... হৃদয়াবেগগত মৃত্যু।

... আমাদের জীবন যে-দিকেই এগোক না কেন, সে-দিকেই যেন আমরা টাবু দূর করতে পারি, এটাকেই আমার মনে হয় চমৎকার। আমার মতে, নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া উচিত একটিই মাত্র জিনিসের উপরে,— ভালো না বাসার উপরে।

... আমাদের মধ্যে ভালোবাসবার যত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে তাদের সবগুলিকেই যেন আমরা জীবনে রূপ দিতে পারি।

... আমার কাছে একমাত্র অপরাধ হচ্ছে ভালো না বাসা। সুতরাং তোমরা ভালোবাসাকে যেমন রূপে পাবে তেমন রূপেই তার চর্চা করবে। তা সে যে-কোনো রূপ নিক না কেন। কারণ আমি মনে করি যে এইটেই আসল,— ভালোবাসা।

আজকের পৃথিবীতে ভালোবাসার নীতি প্রচার করা যথেষ্ট সৎসাহসের ব্যাপার। নিন্ বিশ্বাস করেন যে মেয়েদের উপরে ঐতিহ্য যে-সব বাঁধাবাঁধি চাপিয়েছে, যে-গার্হস্থ্য এবং পারিবারিক ভূমিকা পালন করতে তাদের বাধ্য করেছে, সে-সব থেকে খুব ভালো একটা জিনিস জন্ম নিয়েছে :

পুরুষরা কারবার করেছে জাতীয় স্তরে, পরিসংখ্যানের স্তরে, বিমূর্ত ইডিওলজির স্তরে। নারীর জগৎটা যেহেতু যা ব্যক্তিগত তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, সেহেতু সে ছিলো বেশী মনুষ্যগুণান্বিত। এখন যখন সে সেই সীমানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে, সে যেন পৃথিবীতে এনে দিতে পারে মানুষদের ব্যক্তিগত মূল্য সম্পর্কে খানিকটা চেতনা, কিছুটা সমানুভূতি আর সহানুভূতি, এই আমার আশা।

... আমার আশা নারী এই মূল্যবোধগুলিকে টেনে আনবে আমাদের সময়ের মুখ্য থীমগুলির মধ্যে, ভাবনার প্রধান বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে। আমি আজকালকার মহিলা সমালোচকদের এবং মহিলা আইনজীবীদের লক্ষ্য করছি, এবং একটা তফাৎ দেখতে পাই। যারা কেবল পুরুষদের নকল করেছে এবং যেখানে পৌঁছেছে সেখানে কেবল অনুকরণের দ্বারা পৌঁছেছে, তাদের কথা ভাবছি না। ভাবছি সেই মেয়েদের কথা, যারা তাদের নারীত্বকে সত্যিই বজায় রেখেছে। যেমন, মহিলা আইনজীবীরা মানবিক পরিস্থিতিটাকে বেশী গুরুত্ব দেন। একটা বই কী পদ্ধতিতে লিখিত হওয়া উচিত সে-বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামতকে মহিলা সমালোচকরা ততটা জাহির করেন না, বরং লেখক কী বলতে চাইছেন সেইটে তাঁরা শোনার চেষ্টা করেন। অনেক শতাব্দী ধ'রে শ্রবণের আর গ্রহণের— গ্রহিষ্ণুতার— পরিশীলন যেমন কতকাংশে সীমাবদ্ধতা তেমনি একটা গুণও বটে।

আমি যখন বাংলায় পাশ্চাত্য বইয়ের সমালোচনা লিখি, তখন ঠিক এটাই করার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি এমন সব বইয়ের বিষয়ে লিখতে, যাদের বিষয়ে আমার সদর্থক কিছু বলার আছে, এমন সব লেখককে নিয়ে, আমার পাঠকদের সামনে যাঁদের আমি 'তুলে ধরতে' আগ্রহী। লেখক কী বলতে চাইছেন তা শোনার জন্য সাধ্যমতো সযত্ন চেষ্টা করি। তার মানে এ নয় যে আমি আমার মনের সমালোচক বৃত্তিগুলিকে শিকেয় তুলে রাখি : তার মানে নেহাৎ এই যে যাঁদের সমালোচনা করছি তাঁদের গুণগুলি সম্পর্কে মনটাকে আরও খোলা রাখি। পুরুষ সমালোচকরা— এবং যে-মহিলা সমালোচকরা পুরুষদের আঙ্গিককে বিনা প্রশ্নে অনুকরণ করেন তাঁরা— নতুন, পরীক্ষামূলক কাজকে যাচাই করার সময়ে কখনও কখনও বেশ নির্মম হতে পারেন, নির্মাণপদ্ধতি সম্পর্কে নিজেদের ধারণাগুলিকে অন্যদের কাজের উপরে চাপাতে বড্ড বেশী ব্যগ্র হতে পারেন।

আমি যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতপ্রবাসী বৃটিশ নরনারীদের জার্নাল ও স্মৃতিচারণা নিয়ে আমার স্নাতকোত্তর কাজটি করছিলাম, তখন আমি চেয়েছিলাম এই লেখকদের বক্তব্যকে সযত্নে শুনতে : চেয়েছিলাম যে আমি বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের মতো নিজের মত জাহির করবার আগে এঁরা যেন আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন। আমার কাজের পদ্ধতিটাকে পুরুষ অধ্যাপকদের কাছে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমি কখনও কখনও বেশ অসুবিধায় পড়তাম। আমার মনে আছে তাঁদের

মুখে একটা প্রশ্ন শুনতে শুনতে আমার কান প'চে গিয়েছিলো (প্রশ্নটা ইংরেজীতেই রাখছি, নয়তো শ্লেষটা স্পষ্ট হবে না) : 'হোয়াট ইজ় গোয়িং টু বি দ্য থ্রাস্ট্ অফ ইওর থিসিস ?' এর যথার্থ এবং রসিক জবাব হচ্ছে স্রেফ এই যে আমি যেহেতু মেয়ে সেহেতু আমার থিসিসে 'থ্রাস্ট্' ছিলো না, ছিলো কেবল সর্বত্র বিকীর্ণ তরঙ্গমালা। বর্তমান প্রবন্ধ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

নিন্ জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের, লেখিকাদের, আমাদের অনুভবগুলিকে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে, স্বজ্ঞাগুলিকে আরও ব্যক্ত করতে হবে ; 'মৃদু ফোকস্' বা 'বিকীর্ণ চেতনা'র স্ত্রীসুলভ যে-ক্ষমতা আমাদের নিজস্ব তার সদ্ব্যবহার করতে হবে ; নারী হওয়ার অর্থ আমরা যেন অনুবাদ ক'রে পুরুষকে বোঝানোর চেষ্টা করি, আমাদের বিশ্ববীক্ষাকে আমরা যেন পুরুষদের সামনে উপস্থাপন করতে উদ্যোগী হই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুরুষরা আতঙ্ক, নির্বেদ আর পারক্যের বিষয়ে লিখছে ব'লেই আমাদেরও যে ওসব বিষয়ে লিখতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমরা যদি মানবিক সম্পর্কে আনন্দকে জেনে থাকি, তা হলে তা নিয়ে লিখতে যেন লজ্জা না পাই। আমাদের যে-দিকটা 'হ্যাঁ' বলতে চায়, উৎসব করতে চায়, সেটা দেখাতে যেন সংকোচ বোধ না করি।

আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে নারী-আন্দোলনকে ভারতের কিছু বিশেষ দেয় আছে। সেটা আমাদের গর্বেরই বিষয়।

এমন নয় যে ভারতে মেয়েদের অবস্থার উন্নতিসাধনে বহুসংখ্যক সাধারণ কোঠার জরুরী কাজ করবার নেই। অনেক আছে; তাদের কিছু কিছু আগেই উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের মধ্যেও অনেক ঝগড়াপুর আছে; সেটা কোনো আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার মতো ব্যাপার নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ভারতের হাতে আছে এমন একটা চাবি যার সাহায্যে ঝগড়াপুরের পরিস্থিতির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা যায় : সেটা হলো আমাদের প্রাক্-পিতৃতান্ত্রিক, পেগান, অর্ধনারীশ্বরধর্মী ঐতিহ্য, যেটাকে আমরা ততটা নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করি নি, যতটা করেছে অন্যান্য অনেক সংস্কৃতি, যেমন বিশুদ্ধভাবে ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলিম ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে লালিত সংস্কৃতিগুলি। এমন একটা অতীতের সঙ্গে ভারতের এখনও অপরোক্ষ, অটুট সম্পর্ক রয়েছে, যার কাছ থেকে অন্যান্য অনেক সংস্কৃতি ইচ্ছে ক'রে স'রে এসেছে। ভারতে বরাবরই দেখা গেছে দুটো দিকের মধ্যে একটা টেনশন : এক দিকে পিতৃতন্ত্র, অনুশাসন এবং কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, অন্য দিকে স্ত্রীসুলভ প্রতিবাদ, প্রশ্ন এবং বিদ্রোহ ; এক দিকে তপস্বীর বৃত্তি, অন্য দিকে মদনোৎসবপ্রীতি ; এক দিকে নারীস্বভাব সম্পর্কে ভীতি, অন্য দিকে তার কাছে আত্মসমর্পণ। আমাদের শিল্পে সাহিত্যে ধর্মাচারে এই বিততি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। হাজার হোক, পৃথিবীর আর কোথায় এখনও আরাধকরা সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরকে কল্পনা ক'রে থাকে জননীরূপে (ঈশ্বরের জননীরূপে নয়, স্বয়ং পরা মাতা হিসাবে, যেটা আলাদা ব্যাপার), অথবা প্রেমিকরূপে ? সন্দেহবাদীরা যা-ই বলুন, এই লক্ষণ আমাদের সংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট স্বাদে অন্বিত করে, তাকে দেয় মেয়েদের আন্দোলনের নতুন, অর্ধনারীশ্বরধর্মী মানসলোকের প্রতি একটা ঈর্ষণীয় উন্মুক্ততা, যে-গুণের

অভাব পাশ্চাত্য জগতের সংস্কৃতিগুলি-সমেত আধুনিক অনেক সংস্কৃতির মধ্যেই খুব প্রকট। আমার কাছে এটা আনন্দের বিষয় বটে।

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ইতোমধ্যেই অনেক ঘা খেয়েছে। কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণে স্ত্রীস্বাধীনতার দিকে যে-ঝোঁকটা এসেছিলো সেটা যথেষ্ট র‍্যাডিকাল ছিলো না। আমি মনে করি যা হয়েছিলো তা ভালোই, ঠিক দিকে পদক্ষেপ। সতীদাহের যুগে বা বিধবাবিবাহ যখন নিষিদ্ধ ছিলো সে-সময়ে আমরা নিশ্চয়ই ফিরে যেতে চাই না। আমাদের সময়ের কাছে এগিয়ে এসে বলা যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় যে-সব দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে তাদের মধ্যে আমরা ফিরে যেতে চাই না। যদি অন্ততঃ কোনো কোনো সংগ্রামের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেটা আনন্দের কথা, আর যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো উচিত, তার জন্য কাজ করা উচিত। ঝগড়াপুরের বৃত্তান্ত পড়ার সময়ে আমার থেকে থেকে মনে হয়েছে যে সেখানকার মেয়েদেরকে তুলনীয় শ্রেণীর হিন্দু মেয়েদের চাইতে রুক্ষতর পরিবেশের মধ্যে জীবনধারণ করতে হয়। মুসলিম পিতৃতান্ত্রিক কানুন ঝগড়াপুরের মেয়েদের সামাজিক এবং ধর্মীয় সম্মেলনেও অংশ নিতে দেয় না, তাদের ব্যক্তিগত চলাফেরাকে ড্রাগনতুল্য কঠোরতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং মনে হয় না যে সেখানে সক্রিয় মাতৃত্বের প্রতি তেমন কোনো ধর্মীয় অথবা লৌকিক অর্হণার মনোভাব, অথবা মরমী প্রেমের চর্চার তেমন কোনো ঐতিহ্য, যা মেয়েদের অন্ততঃ কিছুটা ক্ষতিপূরক মাননা দিতে পারে।

এই সব সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক কারণে নারী-আন্দোলনের দিকে আমাদের যে-আভিমুখ্য তা অন্যদের থেকে ভিন্ন হবে। এগুলির প্রাজ্ঞ সদ্ব্যবহার কাম্য। ভারতের একজন বিচক্ষণ অবেক্ষক, রিচার্ড লানয়[৮] মন্তব্য করেছেন :

> ভারত এখন যে-কঠিন অবস্থার মুখোমুখি তা সত্ত্বেও এবং অনেক শতাব্দীর ইচ্ছাকৃত বিযুক্তি, আত্মমগ্নতা এবং ভাববিহ্বলতা সত্ত্বেও ভারতীয় মনের ঐক্যবদ্ধ চেতনা অপরিবর্তনীয়ভাবে ছিন্ন হয়ে যায় নি। সন্দেহ নেই, এক এবং অভিন্নের প্রতি প্রায় আবেশিক মনোযোগ ভারতকে নিক্ষিপ্ত করেছে জটিলতার ঘূর্ণির মধ্যে ; একই সময়ে তার যাবতীয় মহৎ কীর্তির পিছনে ক্রিয়াশীল সেই ঐক্যবদ্ধ বেদিতা। অতএব এই প্রত্যাশা যুক্তিযুক্ত যে সমসাময়িক সমস্যাদের উপরে তার মনের এই বৃত্তিকে সক্রিয় ক'রে তুলে ভারত আপনাকে সংকটমুক্ত করবে।

নারী-আন্দোলনেও আমাদের আনতে হবে এই ঐক্যবদ্ধ বেদিতা।

পশ্চিমের রশ্মির নীচে দ্বিশতাব্দীব্যাপী নিরাবরণ অবস্থা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পসাহিত্যে হৃদয়াবেগ, সহজ প্রবৃত্তি, স্বজ্ঞা প্রভৃতির প্রকাশ, আনন্দ ও বেদনার অভিব্যক্তি, অচেতন, গীতধর্মী, 'স্ত্রীসুলভ' স্বপ্ন-আঙ্গিকের অন্বেষণ নিবিদ্ধ হয়ে যায় নি। আশা করি তা

কখনো হবে না, কেননা তা হলে সেটা হবে একটা নিষ্ফল মাত্রা। যাদের উপরে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার প্রভাব সমধিক সেই বাঙালীদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এই ঘটনার উজ্জ্বল, আশাব্যঞ্জক নিদর্শন। আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ঋদ্ধি গ্রহণ করেছি, কিন্তু পশ্চিমের দ্বিবিভাজনপ্রবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় বেদিতার প্রতি আমাদের আভিমুখ্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছি। এটা দ্রষ্টব্য কালকের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, অথবা আজকের রবিশঙ্কর বা সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে। বাঙালী লেখকরা অর্ধনারীশ্বর চৈতন্যকে কখনো প্রত্যাখ্যান করেন নি। আমাদের পুরুষ লেখকরা যখন পাশ্চাত্য কায়দার আতঙ্ক-নির্বেদ-পারক্যের থীমগুলি অনুশীলন করেন, তখনও নিজেদের 'স্ত্রীসুলভ' দিকটার উদ্ঘাটন করতে তাঁরা লজ্জা পান না। তাঁরা কখনো সম্পূর্ণভাবে একজন হেনরি মিলার বা নর্মান মেইলর হয়ে উঠতে পারেন না, মোড় নিয়ে ফিরে আসেন রোমান্টিকতায়। মূলতঃ তাঁরা এখনও 'অনুভূতিশীল পুরুষ': তাঁরা এখনও তাঁদের লেখার মধ্যে স্বপ্ন দেখতে, ভালোবাসতে, হাসতে এবং কাঁদতে পারেন। এজন্য তাঁদের উপরে আমি আস্থাশীল। কখনও কখনও আমি তাঁদের সমালোচনা করি এজন্য যে তাঁদের মধ্যে দেখতে পাই বড্ড বেশী ভাবালুতা, কিশোরস্বভাব, বৌদ্ধিকতার অভাব, কিন্তু আমি এটা জানি যে যে-কোনো বয়সের কষা সিনিক হওয়ার চাইতে আশায় ভরা, রোমান্টিক কিশোর হওয়া ঢের বেশী ভালো।

এবং একজন দেশান্তরিত ভারতীয় লেখিকা হিসাবে আমি যে পশ্চিমে প্রায় দু' দশক ধ'রে টিঁকে থাকতে পেরেছি তার কারণ বোধ হয় নিহিত এইখানেই। আমার পাঠকদের কাছ থেকে আমি যে-ভালোবাসা আর সমাদর পাই সেটাই আমাকে পথ চলতে সাহস দেয়। আমার ধারণা, বাঙালীরা, এবং সাধারণভাবে ভারতীয়রা, বাক্‌পটু মেয়েদের বিরুদ্ধে নন। বরং মনে হয় যে অমন মেয়েদের তাঁরা পছন্দই করেন, তারিফই করেন। আমি আমার আন্তর্জাতিক, পুবে-পশ্চিমে মেলানো দৃষ্টিকোণ থেকে (আগে যেমন বুঝিয়েছি) যা বলতে চাই তা ব'লে যাই, এবং তাঁরা শোনেন। আমার ভাবনাগুলিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন, নিন্দাবিদ্ধ করেন না। তাঁরা আমাকে বলেন যে বিভিন্ন পাশ্চাত্য প্রভাবের আত্মীকরণ সত্ত্বেও আমি যা-কিছু লিখি তা গভীরভাবে ভারতীয়, অত্যন্ত বাঙালী। এ প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে এই আশাকে সঞ্চারিত করে যে ভারতে শিক্ষিত মেয়েরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন।

সব থেকে বড় কথা: আমাদের আশা হারালে চলবে না। আমাদের ভূমিকাকে আমরা যেন এলিটিস্ট আখ্যা দিয়ে খর্ব না করি। শিক্ষিত মেয়েদের সহযোগিতা করতে হবে সুযোগবঞ্চিতাদের সঙ্গে। লেখাপড়া শিখে কী লাভ, যদি আমাদের থেকে কম বাক্‌পটু বোনেদের সাহায্য করতে না পারি! যা আমাদের চাই তা অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের জোট-বাঁধা ঐক্য নয়, তা হলো জীবনের সর্বস্তর থেকে এমন সব ব্যক্তিদের সমাবেশ, যাঁরা সক্রিয়ভাবে মেয়েদের সমস্যাগুলির আলোকপ্রাপ্ত সমাধান অন্বেষণ করছেন। বাঁধা মত চাই না, চাই আরও সংলাপ।

নারী-আন্দোলনের লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই রচনাটিকে লিখলাম নিজের জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, ব্যক্তিগত নিবন্ধের রূপে, নিছক অ্যাকাডেমিক পেপার হিসাবে নয়। এবং ইংরেজীতে লিখছি ব'লে আমার স্বভাবতঃ উচ্ছল, রঙিন, রূপকপ্রিয়, স্ত্রীসুলভ, ভারতীয়, বাঙালী শৈলীর উপরে অযথা কাঁচি চালানোর চেষ্টা করি নি।

॥৪॥

আমার ১৯৭৯ সালে লেখা ইংরেজী প্রবন্ধটির বাংলা রূপান্তর এতক্ষণে শেষ হলো। এবার এখনকার পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিছু অতিরিক্ত কথায় আসছি। প্রবন্ধটি যদি ১৯৮৬ সালে লিখতে বসতাম, তা হলে আর কী-কী বাড়তি কথা এর অন্তর্ভুক্ত করতাম?

নিশ্চয়ই বিশেষ জোর দিতাম আজকের দিনের নতুন শান্তি-আন্দোলনে, বিশেষতঃ পারমাণবিক রণসজ্জার বিরোধী আন্দোলনে, এবং প্রাকৃতিক সংরক্ষণের সপক্ষে ও তার দূষণের বিপক্ষে যে-আন্দোলন সেখানে মেয়েদের ভূমিকার উপরে। অন্ততঃ শান্তির সপক্ষে মেয়েদের সংগ্রাম এ শতাব্দীতে মোটেও নতুন নয়, কিন্তু পশ্চিমে এই সব ইশ্যুতে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটা নতুন গতিবেগ এবং প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করেছে। মার্কিন লেখিকা মেরেডিথ ট্যাক্স এবং ইংরেজ লেখিকা কিম্ ট্যাপ্‌লিন-এর যে-দুটি প্রবন্ধ *জিজ্ঞাসা*-র জন্য ইতঃপূর্বে অনুবাদ করেছি (যথাক্রমে *জিজ্ঞাসা* ৬ : ৩ ও ৮ : ১ সংখ্যায়) সে-দুটিতে এই নতুন উদ্দীপনার স্বাক্ষর স্পষ্ট। গ্রীনহাম কমনের মেয়েরা যে শান্তি-যোদ্ধা হিসাবে একটা নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। ক্ষমতার লড়াইয়ের ভিতরে না গিয়ে, ক্ষমতা দ্বারা দূষিত না হয়ে কিভাবে ক্ষমতার রাজনীতির নাগপাশ থেকে নিজেদের এবং অন্যদের মুক্ত করা যায়, এটি এই নতুন আন্দোলনগুলির পক্ষে একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা। এর ব্যবহারিক সমাধান সহজ নয়, তবে এর তাত্ত্বিক ভিতটা আলোচনা-পুনরালোচনা দ্বারা ক্রমশঃ দৃঢ়ীকৃত হচ্ছে।

আমি এই লাইনগুলি লেখার মাত্র কিছু দিন আগে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু ঘটেছে বৃটেনের উল্লেখযোগ্য ফেমিনিস্ট ভাবুক এবং শান্তিসংগ্রামী ডোরা রাসেল-এর। পুরুষদের দ্বারা রচিত এবং পুরুষালী মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত সভ্যতার ভয়ংকর সংকটগুলির মৌল বিশ্লেষণে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দ্বিতীয়া পত্নী ডোরা রাসেলের মূল্যবান অবদান এখনও পর্যন্ত ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে নি। এই চিন্তাশীল মহিলাটির খ্যাতি নানাভাবে তাঁর জগদ্বিখ্যাত প্রথম স্বামীর খ্যাতির ছায়ায় প'ড়ে গেছে তো বটেই, উপরন্তু তাঁর বিশ্লেষণ সত্যিই এত মৌল ও গভীর যে অন্ততঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্গত, ক্ষমতাশালী ভূমিকাগুলিতে অবতীর্ণ পুরুষদের পক্ষে তা গলাঃধকরণ করা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সত্তরের দশকের নতুন নারী-আন্দোলনের কাছ থেকে তিনি কেন যে যথাসময়ে আরও অনেক স্বীকৃতি লাভ করেন নি তা আমার কাছে বড় একটা স্পষ্ট নয়।

এই নয়া আন্দোলনে যে-সব কথা বলা হয়েছে তাদের সারমর্ম ডোরা রাসেল বহু দিন আগে থেকে বারে বারেই ব'লে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি নারী ব'লেই তাঁর কথা কেউ মন দিয়ে শোনে নি এবং গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে তা ব্যাপক প্রচার লাভ করে নি ; ফলতঃ নয়া আন্দোলনটি যখন দানা বাঁধে তখন তার মুখপাত্রীদের চেতনায় তিনি বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন না। আশির দশকে তিনি অবশেষে সেই মনোযোগ পাচ্ছেন যা তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিলো। পশ্চিমকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার সংকটসমূহের বিশ্লেষণে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে। কৌতূহলী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত ডোরা রাসেলের একটি প্রবন্ধসংগ্রহের দিকে, যেখানে তাঁর সাতান্ন-বছর-ব্যাপী ভাবনাবিবর্তনের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় ; বিশেষতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই সংকলনের অন্তর্গত 'পুরুষদের দুনিয়ায় : মেয়েদের রাহুগ্রাস' নামে একটি মূল্যবান নিবন্ধের দিকে, যেটি তিনি রচনা করেন ১৯৬৫ সালে।[১০]

ডোরা রাসেলের লেখা প'ড়ে আমার মনে হয় না যে ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যবদ্ধ বেদিতা বা সে-সভ্যতার অভ্যন্তরে পিতৃতন্ত্র আর নারীপ্রকৃতির মধ্যবর্তী বিততি সম্পর্কে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী লেখা যে তাঁর মনে কোনো দাগ কেটেছিলো তা-ও মনে হয় না। সেকালে রাবীন্দ্রিক মানবতন্ত্র প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার যে-প্রাবরণের আড়ালে সাধারণতঃ আত্মপ্রকাশ করতো তা সম্ভবতঃ ডোরা রাসেলদের মতো নিরীশ্বরবাদী মানবতন্ত্রীদের আকর্ষণ করতে পারতো না। (ক্যাথলিক ঐতিহ্যের গোঁড়ামিকে প্রত্যাখ্যান করলেও সে-ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে লালিতা আর্জেন্টাইন ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর মানসিক আভিমুখ্য অবশ্যই ভিন্ন ছিলো।) সে যা-ই হোক, ডোরা রাসেল তাঁর প্রাতিস্বিক নারীবুদ্ধি দ্বারা বিচার-বিবেচনা ক'রে বারে বারে পৌঁছেছেন একটি সিদ্ধান্তে : চাই আরও ঐক্যবদ্ধ বেদিতা, চাই সামগ্রিক, বাস্তবমুখী প্রজ্ঞা ; যে-বুদ্ধি কেবল বিমূর্ত চিন্তাদের জগতে বিচরণ করে এবং স্বজ্ঞা, হৃদয়াবেগ, সহজ প্রবৃত্তিদের বাদ দেয় তার চর্চা বিপজ্জনক। অনুভবের স্পর্শ-বাঁচানো এই শেষোক্ত বুদ্ধি একঝোঁকা পুরুষালী সভ্যতার আত্যন্তিক সংকটের শিকড়-কারণ, ফলতঃ সংকটমোচনের কার্যকর উপায় অন্বেষণের পথে বিরাট অন্তরায়ও বটে। ডোরা রাসেলের মতে এই সংকট থেকে তাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ নারীবুদ্ধির শুভংকর হস্তক্ষেপ।

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর আরেকটি বইয়ে[১১] ডোরা যে-সিদ্ধান্তকে অভিব্যক্ত করেন তা যুগপৎ উদাত্ত আহ্বান এবং অপরাজেয় আশা :

> পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক কোণকানাচে যে-সব অনিষ্টকে লোকে পরিকল্পনা করছে এবং মেনে নিচ্ছে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে এবং অনুরোধের সুরে লেখা, যেমনটি চেষ্টা করেছি এই বইয়ে, কঠিন কাজ বটে। আমি নিশ্চিত যে আমাদের মুক্তির একমাত্র এবং শেষ আশা হচ্ছে মেয়েদের

কণ্ঠস্বর, যা তাদের হৃদয়ের বক্তব্যকে ঘোষণা করবে, এই পৃথিবীতে প্রাণের প্রতিরক্ষায় উচ্চরবে চীৎকার করবে।

প্রাণের প্রতিরক্ষায় মেয়েদের আর্ত কণ্ঠস্বর কী ক'রে গণ-আন্দোলনের চরিত্র অর্জন করতে পারে তার খুঁটিনাটি আমাদের চিন্তনীয়। এ তো কেবল মেয়েদের আন্দোলন নয়, এ হচ্ছে লিঙ্গনির্বিশেষে প্রত্যেকের ভাববার বিষয়, মানবসভ্যতার প্রতিরক্ষার জন্য আন্দোলন, মানবপ্রজাতির টিঁকে থাকার জন্য সংগ্রাম। মেয়েদের দিক থেকে একটা নতুন প্রবর্তনা আসছে, কিন্তু এ লড়াইয়ে পুরুষদের মিত্রপক্ষ করতে না পারলে মেয়েদের জয় অসম্ভব। বলা বাহুল্য, যে-সব মহিলা প্রথাসিদ্ধ উপায়ে রাজনীতি করেন কিন্তু কল্যাণকর নারীপ্রজ্ঞা দ্বারা অনুপ্রাণিত নন, তাঁদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো পথপ্রদর্শন প্রত্যাশা করা বৃথা।

একেকসময় মনে হয়, লড়াইটা মূলতঃ আশার সঙ্গে নৈরাশ্যেরই। আশা রাখাই তো বেঁচে থাকার লক্ষণ। আশার শিকড় শুকিয়ে গেলে কর্মের কোনো শাখায় কুঁড়ি ধরতে পারে না। সন্দেহ নেই, পৃথিবীতে সদর্থক-অভিপ্রায়-ধারীরাই সংখ্যায় বেশী, কিন্তু উনজনদের নঞর্থক ক্রিয়াকলাপের বিষদাঁতকে যে কিভাবে অকেজো ক'রে দেওয়া যেতে পারে সেটা প্রায় প্রত্যেক সমাজেই একটা বড়রকমের সমস্যা।

একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষণ এই যে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে মৌল চরিত্রের রাজনৈতিক প্রতিবাদের সঙ্গে মেয়েরা সক্রিয়ভাবে নিজেদের জড়াতে আরম্ভ করেছেন। চিলিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করছেন। আর্জেন্টিনায় বর্তমান গণতন্ত্রের পূর্ববর্তী অনাচারের যুগে নাগরিকদের গ্রেপ্তার হয়ে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার যে-ভয়াবহ সমস্যা ছিলো, তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছেন 'উধাও-হয়ে-যাওয়া মানুষদের' ('লস্ দেসাপারেসিদোস্') মা-দিদিমা-ঠাকুমারা। তাঁরা এখনও সেই অনাচারের উৎসসন্ধানে এবং অপরাধীদের আদালতে আনার চেষ্টায় তৎপর।

ভারতে মেয়েদের মঙ্গলসংক্রান্ত কতগুলি সামাজিক ইশ্যুতে মেয়েরা সচেতনতর এবং সক্রিয়তর হয়ে উঠছেন ব'লে মনে হয়। পণপ্রথা চিরকালই নানা অনিষ্টের উৎস ছিলো, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যৌতুকঘটিত হত্যা এবং আত্মহত্যা ভাইরাসদের আত্মপরিবর্তনের মতোই এক নূতন, ব্যাপক অনিষ্টের মূর্তি ধারণ করেছে। এই অনিষ্টের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম অপরিহার্য তার নেতৃত্বে ভারতের শিক্ষিত মেয়েরা একটি মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে সমর্থ। যে-মেয়েরা প্রায় সর্বহারা তাঁরাও যে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কতগুলি ক্ষেত্রে উচ্চারণের সামর্থ্য অর্জন করছেন তা বোঝা যায়। সম্প্রতি আনন্দ পট্টবর্ধনের তৈরি একটি তথ্যচিত্রে বোম্বাই শহরের ঝুপড়ি থেকে উচ্ছিন্ন মেয়েদের রীতিমতো প্রতিবাদমুখর হতে দেখলাম।

ইংরেজী প্রবন্ধটি লেখার সময়ে আমি *নোটন নোটন পায়রাগুলি* লেখার মধ্যে মগ্ন ছিলাম। তখনও আমি ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর ফেমিনিস্ট-পরিচয় বা শান্তিসংগ্রামী-পরিচয় আবিষ্কার করি নি; করলে অবশ্যই লেখাটিতে তার ছাপ থাকতো। এ ব্যাপারে আমার

সম্প্রতি প্রকাশিত মিশ্র আঙ্গিকের বাংলা বইটিতে (*রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*) যথেষ্ট লিখেছি ব'লে এখানে আর তার পুনরুক্তি করছি না।

স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের যে-সমুদ্র-রূপান্তরের সম্ভাবনা ইংরেজী প্রবন্ধটিতে কল্পনা করেছিলাম, সহৃদয় পাঠকরা *নোটন নোটন পায়রাগুলি*-তেও যে-ভাবনার নানা স্পন্দন অনুভব করবেন, সে-প্রসঙ্গেও ডোরা রাসেল একজন প্রাসঙ্গিক ও সহমর্মী ভাবুক। এই দূরদৃষ্টিসম্পন্না মহিলা তাঁর দীর্ঘ, নিরলস জীবনের নানা পর্যায়ে সর্বদাই যেন তাঁর সমকালের থেকে বেশ কয়েক দশক এগিয়ে ছিলেন। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *হাইপেশিয়া*, ১৯২৭ সালে প্রকাশিত *দ্য রাইট টু বি হ্যাপি*, এবং ১৯৩২ সালে প্রকাশিত *ইন ডিফেন্স অফ চিল্ড্রেন* তিনটি আশ্চর্য বই।[১২] এই রচনাবলী মেয়েদের অধিকারগুলিকে মানবতান্ত্রিক এবং মুক্তিধর্মী কাঠামোর মধ্যে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেয়। আহার, আশ্রয়, শিক্ষা ইত্যাদির অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা যে সন্তোষজনক কাজ করবার অধিকার, ভালোবাসবার অধিকার, যৌন তৃপ্তির অধিকার, মা হবার অধিকার, সংক্ষেপে সর্বাঙ্গীণ মানবিক আত্মপ্রকাশের অধিকার দাবি করতে পারে, এবং এ সমস্ত যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের ঐতিহ্য-অনুমোদিত কাঠামোগুলির মধ্যে আবশ্যিকভাবে লভ্য নয়, এই কথাগুলি তিনি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে জোর দিয়ে অথচ ভারী মনোজ্ঞ শৈলীতে বলেছিলেন। শিশুদের অধিকারগুলিকেও তিনি মানবতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে মূর্ত একটি বহুমাত্রিক নারীচেতনা, যার মধ্যে মিশে আছে সাধারণ জ্ঞান এবং দার্শনিকতা, বাস্তববোধ এবং আদর্শবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং কবিদৃষ্টি। মরাঠী ভাবুক দিনকর বেডেকর তাঁর প্রবন্ধ 'দ্বিতীয় নবজাগরণের পদধ্বনি'তে (বীণা আলাসে-র অনুবাদ, *জিজ্ঞাসা* ৬: ৪) ঠিকই বলেছেন যে মানুষের যৌনতার বিষয়ে আমাদের নতুন ক'রে ভাবতে হবে। এ কাজে ডোরা রাসেলের ভাবনা, যা যুগপৎ বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনস্পন্দিত, আমাদের আলোকশিখা দেখাতে সমর্থ। এবং এ ব্যাপারে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চাইতে ডোরা রাসেলকেই ভবিষ্যতের পক্ষে বেশী প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ক ব'লে মনে হয় আমার। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তত্ত্বের দিক দিয়ে যে-নীতিকে সমর্থন করতেন, কার্যতঃ সে-নীতির প্রতি অখণ্ড আনুগত্য দেখাতে পারেন নি, কিছু দূর এগিয়েও দুরপনেয় পিতৃতান্ত্রিক প্রতিন্যাস দ্বারা ব্যাহত হয়েছেন। তার জন্য জীবনে দাম দিতে হয়েছে ডোরাকে। ডোরা রাসেলের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে সেই মর্মস্পর্শী কাহিনীর পরিলেখ পাওয়া যায়।[১৩] স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ডোরা রাসেলের চিন্তা যেমন সংস্কারমুক্ত ও আলোকপ্রাপ্ত, তেমনই মৌল অর্থে নৈতিক। যৌন সংস্কারমুক্তির সঙ্গে শিশুদের মঙ্গলের জন্য সমানভাবে সংস্কারমুক্ত, সানুকম্প, সুস্থ জননী-ভাবনার আধুনিক সমন্বয় যে কিভাবে সম্ভব তা যাঁরা জানতে চান, তাঁদের পক্ষে এই মহিলার চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় অপরিহার্য। এবং ডোরা জীবনশিল্পী ছিলেন: তিনি যা ভাবতেন তাকে জীবনচর্যাতেও সাধ্যমতো রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। তাই তত্ত্বে তথা তার প্রয়োগে সামগ্রিকভাবেই এই বিবেকী, সাহসী ও প্রেমসমর্থ মহিলা আজকের নারী-আন্দোলনের পক্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

জিজ্ঞাসা-র ৬ : ৩ সংখ্যায় 'মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা প্রসঙ্গে'-নামক প্রবন্ধের উপসংহারে অম্লান দত্ত যে-'নবমানববাদী আন্দোলন'-এর সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়েছেন, আমার প্রস্তাবিত বহুমাত্রিক নারী-আন্দোলনকে তারই অন্তর্গত একটি ধারা বলা চলে, যার লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কেবলমাত্র মেয়েদের মুক্তি নয়, স্ত্রীপুরুষের মাঝখানে শোষণসম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে উভয় পক্ষেরই মুক্তি। শোষণ সর্বদাই একটা অভিশপ্ত সম্পর্ক। ক খ-কে শোষণ করলে খ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, স্থূলভাবে বা সূক্ষ্মভাবে তার বদলা নেবে, তখন ক তার শোষণকে দৃঢ়তর করবে, এইভাবে চলতে থাকবে একটা কুণ্ডলী-পাকানো, পেঁচানো, অনিষ্টকর প্রক্রিয়া। এই গিঁঠটা কেটে ফেলা দরকার।

যাঁরা নিজেদের র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্ট নামে চিহ্নিত করেন— এঁরা মেয়েও হতে পারেন, পুরুষও হতে পারেন,— তাঁরা মনে করেন যে পুরুষ-কর্তৃক নারীশোষণের মধ্যে নিহিত আছে মানুষের হাতে মানুষের শোষণের একটা আদিরূপ। র‍্যাডিকালিজ্‌ম্ প্রাতিষ্ঠানিকতা মানে না। মৌল ভাবনা এমন এক স্রোতস্বিনী যাকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গোসলখানার ভিতরে বেশী দিন আটকে রাখা যায় না। আমার নিজের ধারণা, মৌল বিশ্লেষণের সব থেকে মৌল ধারাটা এ মুহূর্তে ফেমিনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই বইছে। তাই যাঁরা নিজেদের র‍্যাডিকাল হিউমানিস্ট ব'লে চিহ্নিত করেন তাঁদের পক্ষে র‍্যাডিকাল ফেমিনিজ্‌মের সঙ্গে সংলাপ জরুরী।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটি আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ এবং 'আধুনিক' সম্পর্কের মধ্যেও যে শোষণ লুকিয়ে থাকতে পারে, র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্ট চিন্তা সে-সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। এই নিগূঢ়, সূক্ষ্ম শোষণের স্বরূপকে বোঝানো যায় একটি সূত্রের সাহায্যে : নারীর কাছ থেকে পুরুষ যে-অনুপাতে পুষ্টি আদায় ক'রে নেয়, সে-অনুপাতে নারীকে পুষ্টি ফিরিয়ে দিতে চায় না ; তার চেষ্টা সংহত থাকে কম দিয়ে বেশী আদায় ক'রে নেবার দিকে। নারীর প্রেমের প্রবর্তনা দ্বারা পুরুষের সৃষ্টিশীলতা যে উদ্দীপিত হয় তা একটি স্বীকৃত তথ্য। নারীর প্রেম পুরুষের অহং-কে পুষ্ট করে, তাকে নির্ভর জোগায় ; সেই পুষ্ট অহংবোধ থেকে সংস্কৃতির রাজ্যে পুরুষের সৃষ্টিশীলতা বহুধা প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। এর উল্টোটা অনেক বেশী দুর্লভ : পুরুষের প্রেম নারীর অহং-কে পুষ্ট করছে, তাকে নির্ভর জোগাচ্ছে, সেই পুষ্ট অহংবোধ থেকে নারীর সৃষ্টিশীলতা সংস্কৃতির রাজ্যে বহুধা প্রবাহিত হতে পারছে, এটা অনেক কম দেখা যায়। এবং এটা একটা বড় কারণ যে-জন্য মেয়েরা বইয়ের শিক্ষায় বা আর্থিক সঙ্গতিতে অনেকটা এগোলেও তাদের সহজাত প্রতিভা বিকাশের সম্ভাব্য পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না। যে-ধরনের ভালোবাসা থেকে চিত্তের ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি হয়, সৃষ্টির প্রেরণা নিস্যন্দিত হয়, আমি নিজে একাধিক গুণী মেয়েকে সেই মহার্ঘ ভালোবাসার কণিকার জন্য নতজানু হতে ও রক্তাক্ত সংগ্রাম করতে দেখেছি। দুঃখের বিষয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অন্বেষণের বৈধতাকে আজকের দিনেও অনেকে স্বীকার করতে চান না। এই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় মনুষ্যজন্মের মোটা লড়াইগুলো তথা নারীজন্মের নিজস্ব মোটা লড়াইগুলো, তখন সমস্তটার যোগফল দাঁড়াতে পারে এমন একটা জটিল বঞ্চনা, যার

জটাজাল থেকে সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে নিজেদের মুক্ত ক'রে নেওয়া দুঃসাধ্য কাজ, যার ফলে মেয়েদের উদ্যমের শাখায় কুঁড়ি ধরলেও ফুল ফুটতে চায় না, ফুল ফুটলেও ফল ধরতে চায় না, ফল ধরলেও ফল পাকবার আর সময় থাকে না, শীত এসে তাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়। দেশে-বিদেশে আমার এই বিপর্যস্ত ভগিনীদের জন্য আমি অনেক সময়ই রোদন করেছি।

পুরুষদের যে-দৃষ্টিভঙ্গি তথাকথিত প্রেমের নামে নারীর মধ্যে কেবল আত্মপুষ্টি খোঁজে, কিন্তু নারীর পুষ্টি যে-বীক্ষার অন্তর্গত নয়, তার বহু স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাদের লেখা কবিতায়। বাংলা কবিতায় তো এই সেল্ফ্-ইন্ডাল্জেন্স বা স্বপোষণের ছড়াছড়ি। এই ভাববিলাস যতই শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে ব্যঞ্জিত হোক না কেন, এর লক্ষ্য অথবা উপলক্ষ্য হওয়া থেকে মেয়েদের নিজেদের কতটা ব্যক্তিত্ববৃদ্ধি হয় তা বলা শক্ত; মনে হয় তারা পুরুষদের সামগ্রীই থেকে যায়, এবং হয় একতরফাভাবে পুরুষদের পুষ্টি জুগিয়ে যায়, নয়তো প্রতিদান দেয় তুলনীয় মুদ্রায়,— স্বার্থপর, স্বত্ববোধচিহ্নিত, ঈর্ষাশাসিত, সামগ্রী-আদায়কারী 'ভালোবাসা'য়। যেহেতু এই মনোবৃত্তি ও প্রক্রিয়া কাল্চার-নামক সুপারস্ট্রাক্চার বা উপরি-কাঠামোর অন্তর্গত, যে-বায়ুমণ্ডলে আমরা নিঃশ্বাস নিই তার অঙ্গীভূত, তাই বিশ্লেষণধর্মী ফেমিনিস্ট চেতনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত না হয়ে উঠলে এর স্বরূপ বোঝা কঠিন।

সভ্যতার যে-সংকটের বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ক্রমাগত উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে চলেছেন, তার মোচনকল্পে লিঙ্গনির্বিশেষে সকলের সামনেই সম্ভবতঃ একটা বড় কাজ হচ্ছে সেই ধরনের যত্নবৃত্তিসমন্বিত সম্পর্কের কর্ষণ, যা একতরফা নয়, দু'-তরফা, যা পরস্পরের অস্তিত্বের এবং অস্মিতার চারাগাছে জলসিঞ্চন করে, তাকে বেড়ে উঠতে দেয়, সেই বৃদ্ধিকে স্বীকার এবং স্বাগত করে, তার জন্য প্রয়োজনবোধে কষ্টস্বীকার করতেও প্রস্তুত, কিন্তু যা আত্মত্যাগের মর্ষকামী আতিশয্যকে বা অপরের কাছ থেকে আত্মত্যাগ আদায় করবার ধর্ষকামী আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেয় না। অপরের যত্ন নিতে হবে, নিজের অঙ্গহানি বা বিলোপ না ঘটিয়ে; নিজের পুষ্টির দিকে সচেষ্ট হতে হবে, অপরের অঙ্গহানি বা বিলোপ না ঘটিয়ে। যে-কাজ একতরফাভাবে হলে তা হয় শোষণাত্মক, তাকে যদি প্রজ্ঞার সহযোগিতায় পারস্পরিক ক'রে তোলা যায়, তা হলে তা হয়ে উঠতে পারে মানুষের মুক্তির হাতিয়ার। যত্নবৃত্তির অন্যোন্যতা বা মিথস্ক্রিয়ার মধ্যেই মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত। এ ব্যাপারে উভয় লিঙ্গেরই অনেক শিক্ষণীয় আছে এবং এই প্রতিন্যাস অনুশীলনীয় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে, জনকজননী এবং সন্তানদের মধ্যে (দু' পক্ষেরই অনুশীলনীয়), এবং সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে। আমাদের সময়ে মেয়েদের গুরুদায়িত্ব বোধ করি এই যে প্রথমতঃ এই প্রতিন্যাসকে তাদের সযত্নে আয়ত্ত করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ পুরুষরাও যাতে একে আয়ত্ত করে সে-দিকে সজাগ হতে হবে। শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে। পুরুষদের সঙ্গে সমস্ত আদানপ্রদানে তাদেরকে আমাদের বোঝাতে হবে যে তাদের কাছ থেকে আমরা আরও যত্নশীল, আরও মিথস্ক্রিয় সম্পর্ক প্রত্যাশা করি, যা থেকে কেবল তাদের নয়, আমাদেরও বৃদ্ধি ঘটতে পারে। খাঁটি জিনিসটা দিলে তারাও আমাদের কাছ থেকে খাঁটি জিনিসটা ফিরে

পাবে। সমাজের মধ্যে কেবল মেয়েরা কল্যাণী হয়ে বিচরণ করলে কোনো দিনই কোনো আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব ঘটবে না, কল্যাণবৃত্তিকে পুরুষদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত, জাগরিত করতে হবে। এই সেই চেতনার 'ফেমিনাইজেশন', যা মানুষের সভ্যতাকে বাঁচাতে পারে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে যার উৎসমুখ, সমূহের অভিমুখে প্রবহণে যার সাগরসঙ্গম।

এখানে পাশ্চাত্য শিল্পকলাজগতের একটি সাম্প্রতিক প্রবণতা প্রাসঙ্গিক এবং শুভ ব'লে বিবেচিত হতে পারে। হাল আমলে যে-নতুন শৈলীর ফেমিনিস্ট মেয়েরা আর্টের জগতে প্রবেশ করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে আনন্দের থীমে বিশেষ আগ্রহী। অনুশীলিত বিচ্ছিন্নতাবোধের যে-ভারী বোঝাটা বিশ শতকের প্রথমার্ধের উত্তরাধিকারস্বরূপ আমাদের ঘাড়ে অর্সেছে তার সঙ্গে নারী শিল্পীরা প্রায়ই কোনো সংরক্ত সাযুজ্য অনুভব করেন না, এবং অনেকে এখন সাহস ক'রে কথাটা প্রকাশ্যে বলতে আরম্ভ করেছেন। এই মেয়েরা আত্মীয়তাবোধ এবং আনন্দ থেকে প্রবর্তনা আহরণ করতে চান; এঁরা উৎসব করতে উৎসুক। একটি পত্রিকা থেকে জানতে পারছি, কয়েকজন ফেমিনিস্ট মেয়ে একজোট হয়ে একটা গানবাজনার ব্যাণ্ড করেছেন, এবং তাঁদের বক্তব্য হলো: 'যদি জিনিসটার সঙ্গে নাচতে না পারি, তা হলে সেটা আমাদের বিপ্লব নয়।' আমি এঁদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার টান অনুভব করি।

দু'-একটি ব্যক্তিগত অনুপুঙ্খ দিয়ে এই সংযোজন শেষ করছি। ইংরেজী প্রবন্ধটিতে বলেছিলাম: বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান ক'রে আমি আরেকটি গবেষণাগ্রন্থ রচনা করতে পারবো কিনা একমাত্র সময়ই তা বলতে পারবে। তখন আমি আমার প্রথম উপন্যাস রচনা করছিলাম। এর পর কিছু গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করি মিশ্র আঙ্গিকে রচিত *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে* বইটির শরীরে। আমার যে-শুভানুধ্যায়ীরা মনে করেন গবেষণাজগতে আমার কিছু দেবার আছে তাঁরা অতঃপর আমাকে টেনে আনেন আরও গবেষণাকর্মের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার চিঠিপত্র সম্পাদনার সূত্রে ইংরেজীতে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ সম্প্রতি শেষ করেছি, কিন্তু এর জন্য আমাকে তিন বছর ধ'রে সত্যিই অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-নামক ক্লাবের ভিতর থেকে একবার বেরিয়ে আসলে গবেষণার জন্য আর্থিক মদত জোগাড় করা মোটেও সহজ নয়।

নিন্দা এবং সমাদর সম্পর্কে প্রাক্তন মন্তব্যগুলি কিছুটা কৌতুকসঞ্চারী। স্পষ্টতঃ তখন পর্যন্ত বিশেষ নিন্দা জোটে নি। তার পর কিছু কিছু খোঁচা খেতে হয়েছে বৈকি, তবুও স্বীকার্য যে মোটের উপর সমাদরই বেশী। বস্তুতঃ, ফেমিনিস্ট নামে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও আমার মিশ্র আঙ্গিকের বইটি যে-সমাদর লাভ করেছে তা ভারতে নারী-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাসূচকই বটে, এবং এ প্রসঙ্গে আমার ইংরেজী প্রবন্ধটির আশাবাদী মন্তব্যগুলিকে সমর্থনই করে। তাই আবারও বলি, ভারতে উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন।

১ Andrew Harvey and Anne Pennington (translators), *Songs from Macedonia*, Mid-Day Publications, Oxford, 1978, song no. 41.

২ Jenneke Arens and Jos van Beurden, *Jhagrapur: Poor peasants and women in a village in Bangladesh*, published by the authors from P. O. Box 11742, Amsterdam, The Netherlands, distributed in the UK by Third World Publications, 151 Stratford Road, Birmingham B11 1RD.

৩ Minfong Ho, *Sing to the Dawn*, translated by Liu Ge, Lotus Book House, Singapore, no date.

৪ এ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : N. and G. O'Neill, *Open Marriage*, Peter Owen, London, 1973.

৫ Sara Ruddick and Pamela Daniels (ed.), *Working It Out: 23 Women Writers, Artists, Scientists, and Scholars Talk About Their Lives and Work*, foreword by Adrienne Rich, Pantheon Books, New York, 1977.

৬ Shulamith Firestone, *The Dialectic of Sex*, Paladin paperback, London, 1972.

৭ Kate Millet, *Sexual Politics*, Abacus paperback, Sphere Books Ltd., London, 1972.

৮ Anais Nin, *In Favour of the Sensitive Man and Other Essays*, and *A Woman Speaks*, ed. with an introduction by Evelyn J. Hinz, both published by W. H. Allen, London, 1978.

৯ Richard Lannoy, *The Speaking Tree: A Study of Indian Culture and Society*, Oxford University Press, London etc., 1971.

১০ Dora Russell, *The Dora Russell Reader: 57 years of writing and journalism, 1925-1982*, foreword by Dale Spender, Pandora Press, Routledge & Kegan Paul, London etc., 1983; 'In a Man's World: The Eclipse of Woman' (1965).

১১ Dora Russell, *The Religion of the Machine Age*, Routledge & Kegan Paul, London etc., 1983.

১২ Dora Russell, *Hypatia or Women and Knowledge*, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London, and E. P. Dutton & Co., New York, 1925; *The Right to be Happy*, George Routledge & Sons Ltd., London, 1927; *In Defence of Children*, Hamish Hamilton, London, 1932.

১৩ Dora Russell, *The Tamarisk Tree*, Vol. 1 (*My Quest for Liberty and Love*), Virago, London, 1977; also Vol. 2 (1981) and Vol. 3 (1985).

১৯৮৬

জিজ্ঞাসা ৭ : ৩, কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৩ [১৯৮৬-৮৭]

মানুষ কি সব কিছুর মাত্রা ?

[১৯৮৮-তে প্রকাশিত *ভাবনার ভাস্কর্য*-এ সর্বশেষ রচনাটির নাম ছিলো 'মানবেন্দ্র-পরিচিতি'। সেটি ছিলো শিবনারায়ণ রায়-সম্পাদিত *এম. এন. রয়, ফিলজফার-রেভোলিউশনারি* (রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ১৯৮৪) বইটির সমালোচনা। সেটি প্রথম ছাপা হয়েছিলো *জিজ্ঞাসা*-র ৬ : ৩ সংখ্যায়। তার পর সে-বিষয়ে ঐ পত্রিকার ৭ : ২ সংখ্যায় দেবতোষ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন পাঠকের চিঠি বেরোয়, এবং সেই চিঠির সূত্র ধ'রে আমি আবার লিখি। যদিও চিঠির জবাব দেবার তাগিদ থেকেই সেই লিপি জন্ম নিয়েছিলো, তবুও লেখাটি পুরোপুরি চিঠি ছিলো না; পত্রের সূত্র ধ'রে তার গতি ছিলো প্রবন্ধেরই দিকে। সেই লেখাটি থেকে কিয়দংশ যৎসামান্য সম্পাদনা ক'রে এখানে সংকলিত হলো। আমার ধারণা আমার ঐ সময়কার কিছু শিকড়গত ভাবনা এখানে ধরানো আছে। সেই ভাবনাগুলি পূর্ণতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে এর তিন বছর বাদে আমার প্রথম নাটক *রাতের রোদ*-এ। বর্তমান সংকলনের অন্যান্য প্রবন্ধেও তাদের অনুরণন শ্রুতিগোচর হয়। আলোচনাটি অনুসরণ করতে পাঠকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য আমার মূল গ্রন্থসমালোচনার প্রাসঙ্গিক বাক্যগুলি লেখাটির গোড়ায় বাঁকা হরফে উদ্ধার করলাম।—গ্রন্থকার, ২০০৪]

> *মানবেন্দ্রনাথের রচনার যে-কয়েকটি নিদর্শন এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যেও দেখা যাবে যে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো অস্থিরভাবে প্রায়ই খুঁজে বেড়াচ্ছেন সূত্রকে, সূত্রধর্মী বাক্যকে। হয়তো প্রোতাগরাস বলেছেন যে 'মানুষ সব কিছুর মাত্রা' বা মার্ক্স বলেছেন যে 'মানুষই মনুষ্যজাতির শিকড়' : এ-জাতীয় উক্তি তিনি সাগ্রহে পুনরুদ্ধার করতে ভালোবাসেন। এই আগ্রহ আমার মনে একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তির রেশ রেখে যায়। মানুষ তার আপন দুনিয়ার মাত্রা হতে পারে, কিন্তু তাকে সব কিছুর মাত্রা ভাবার মধ্যে বিপদ আছে। বিশ্বজগৎটা তার চেয়ে অনেক বড়, সে তার অংশমাত্র : মানবিক মাত্রা আর মহাজাগতিক মাত্রা যে এক হতে পারে না তা বোঝার জন্য ঈশ্বরবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। ...মানবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে-সংরক্ত তার্কিকতা আছে তা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তাঁর মধ্যে মানবতান্ত্রিক আদর্শবাদ কি কিছুটা ভোঁতা ক'রে দিয়েছিলো কীট্স্-কথিত সেই 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি'কে, যা সাহিত্যিকদের পক্ষে অপরিহার্য, যা মানুষকে সক্ষম করে 'তথ্য আর কারণের জন্যে খিটখিটে ভঙ্গিতে হাঁকুপাঁকু না ক'রে অনিশ্চয়তা, রহস্য আর সংশয়দের মধ্যে অবস্থান করতে' ?*

... আমি এই মনুষ্যকেন্দ্রিকতার মধ্যে প্রকৃতির প্রতি একটা ঔদাসীন্য, একটা ইকলজিগত বিপদ দেখতে পেয়েছিলাম, যে-সম্পর্কে আজকের দুনিয়ার অনেক চিন্তাশীল মানুষই গভীরভাবে ভাবছেন।...

... আমি এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলাম যে প্রাক্তন ভাবুকদের সূত্রধর্মী উক্তিদের উপরে খুব বেশী জোর না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, কেননা তাতে ক'রে অতীতের ফর্ম্যুলাগুলি, যেগুলি এককালে হয়তো কাজ দিয়েছে, তাদের প্রাক্তন বৌদ্ধিক প্রসঙ্গাবস্থান থেকে চ্যুত হয়ে এখনকার মানুষদের মধ্যে মন্ত্রে, ডগমায় বা স্লোগানে শিলীভূত হতে আরম্ভ করে। সূত্রের ধর্মই এই যে তা অতিসংক্ষিপ্ত। অতিসংক্ষেপের মধ্যে নিহিত থাকে দ্ব্যর্থকতা। অবশেষে উক্তিটি হয়ে দাঁড়ায় 'অল্ থিংস্ টু অল্ মেন', 'সকলের কাছে সব কিছু'। মানবতান্ত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রেও এই বিপদ অবশ্যই আছে এবং যাঁরা নিজেদের মানবতন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত করেন তাঁদেরও এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার।

প্রোতাগরাস খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক সফিস্ট ছিলেন।... [তাঁর] বিখ্যাত উক্তিটি বেঁচে আছে উত্তরসূরি প্লাতোনের (অর্থাৎ প্লেটোর) দুটি দিয়ালগস্ বা ডায়ালগের মধ্যে উদ্ধৃত হয়ে। সে-দুটির একটি হচ্ছে 'থেয়াইতেতস্' ('Theaetetus'), যেটি প্রোতাগরাসের বক্তব্যকে ঘিরেই রচিত। আমি গ্রীক পড়তে পারি না; স্বনামধন্য পণ্ডিত বেঞ্জামিন জোয়েটের প্রামাণিক ইংরেজী অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পুনরনুবাদ করছি :

সোক্রাতেস : ... বলছেন যে প্রত্যক্ষভাবে জানাকেই বলে জ্ঞান ?

থেয়াইতেতস্ : হ্যাঁ।

সোক্রা. : তা হলে আপনি জ্ঞান সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেই পেশ করছেন। এটা হচ্ছে প্রোতাগরাসের অভিমত, যদিও তিনি কথাটাকে বলেছেন একটু অন্যভাবে। তিনি বলেন যে মানুষ হচ্ছে সব কিছুর মাত্রা, যা-কিছু আছে তাদের অস্তিত্বের,এবং যা-কিছু নেই তাদের অনস্তিত্বের। আপনি তাঁকে পড়েছেন তো ?

(এখানে একটি পাদটীকায় জোয়েট যোগ করেন যে প্রোতাগরাসের বক্তব্য যে কেবল জিনিসদের অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তা না-ও হতে পারে, জিনিসদের গুণবিচারও তার অন্তর্গত হয়ে থাকতে পারে; সে-ক্ষেত্রে অনুবাদ সামান্য বদলে নেওয়া যায় : '... যা-কিছু আছে, তারা যে আছে তার [মাত্রা], যা-কিছু নেই, তারা যে নেই তারও [মাত্রা]'।)

থেয়া. : হ্যাঁ হ্যাঁ, বারবার।

সোক্রা. : তিনি কি এই কথাই বলতে চান না যে জিনিসরা আপনার কাছে সেইরকম, যেভাবে তারা প্রতিভাত হয় আপনার কাছে, এবং আমার কাছে

সেইরকম, যেভাবে তারা আমার কাছে প্রতিভাত হয়, এবং আপনি-আমি হচ্ছি গিয়ে মানুষ ?

থেয়া. : হ্যাঁ, উনি তাই বলেন।

সোক্রা. : বিজ্ঞ ব্যক্তি বাজে কথা বলবেন এটা হতে পারে না। আসুন আমরা তাঁকে বোঝার চেষ্টা করি। একই বাতাস বইছে, তবু আমাদের মধ্যে একজনের শীত করছে, অন্যজনের করছে না, কিংবা একজনের সামান্য করছে, অন্যজনের খুব বেশী— তাই তো ?

থেয়া. : ঠিক তাই।

সোক্রা. : এখন এ অবস্থায় বাতাসটাকে কী বলা যায়,— ঠাণ্ডা, না ঠাণ্ডা নয়,— আমাদের সঙ্গে তার আপেক্ষিক সম্পর্কের বিচারে নয়, নিরপেক্ষভাবে ? না কি প্রোতাগরাসের সঙ্গে আমাদের বলতে হবে যে বাতাসটা যার কাছে ঠাণ্ডা তার কাছে ঠাণ্ডা, যার কাছে নয় তার কাছে নয় ?

থেয়া. : মনে হয় শেষের কথাটাই বলতে হবে।

সোক্রা. : অপিচ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ?

থেয়া. : হ্যাঁ।

টেক্সট্‌ তথা পণ্ডিতদের টীকাভাষ্য থেকে [illegible]
এই : জ্ঞান ব্যাপারটা যে জানছে তার [illegible]
আপেক্ষিকতা আমাদের কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তা ছিলো একটা মস্ত বড় মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ মেলে প্রোতাগরাসের তত্ত্বটিতে। সত্যের কোনো নিরপেক্ষ মানদণ্ড আছে কিনা সে-বিষয়ে তিনি সম্ভবতঃ কোনো নিশ্চিত রায় দিতে চান নি।' পণ্ডিতরা আমাদের আরও সতর্ক ক'রে দেন এই ব'লে যে প্রোতাগরাসের প্রয়োগে 'মানুষ' একটা অস্পষ্ট অভিধা। সে ব্যষ্টি না সমষ্টি, মূর্ত না বিমূর্ত, যে-কোনো লোক না কেউ কেউ : এসব বিশ্লেষণ ছিলো প্রাক্‌-সোক্রাতিক ভাবুকদের চিন্তার বাইরে। প্রোতাগরাসের 'মানুষ' ঠিক সর্বমানব নয়, তার বিপরীতে ঠিক আজকের দিনের ধারণানুযায়ী ব্যক্তিমানবও নয়, সে হচ্ছে 'আপনি বা আমি, যাকে খুশি বেছে নিন',— অন্ততঃ তাঁর শিষ্যরা তাঁর বক্তব্যকে ওভাবেই বুঝেছিলেন। অপিচ মনে রাখতে হবে যে পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের এখনকার ধারণা যেরকম সুস্পষ্ট, তখন মোটেও তেমন ছিলো না। 'সেন্‌সেশন' এবং 'পার্সেপ্‌শন'-এর মধ্যে আমরা আজকাল যে-তফাৎ করি প্রোতাগরাস তা করতেন না।

এখন প্লাতোনের এই ডায়ালগটির উদ্দেশ্য মোটেও নয় প্রোতাগরাসের থিসিসকে মদত দেওয়া, বরং ঠিক তার উল্টো : সংলাপ যত এগিয়ে চলে, সোক্রাতেস ততই তাঁর দ্বান্দ্বিক তর্ক দ্বারা প্রোতাগরাসের তত্ত্বটিকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকেন। তিনি তোলেন সেই সব অদীক্ষিত লোকেদের কথা, যারা কোনো জিনিসকে হাতের মুঠোয় ধরতে না পারলে

তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে না; অন্য দিকে মনে করিয়ে দেন সেই স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবুক থালেসের কথা, যিনি কিনা নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প'ড়ে গিয়েছিলেন গর্তে। জানতে চান : জ্ঞান যদি হয় সরাসরি প্রত্যক্ষ বেদন, তা হলে সেখানে স্মৃতির স্থান কোথায়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রজ্ঞাই বা কাকে বলে; স্বপ্ন, স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষ, মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্যান্য প্রত্যক্ষবোধ ইত্যাদির সম্পর্কে কী বলা যাবে; প্রোতাগরাস কেন বললেন না যে একটি শূকর বা কুকুরমুখো বেবুন বা তার চাইতেও বিচিত্র বেদনসম্পন্ন কোনো রাক্ষসই সমস্ত কিছুর মাত্রা ? জ্ঞানের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি হয় স্বনির্ভর, তা হলে তো কেউই কারও চাইতে বিজ্ঞতর নয়; কার মত ঠিক আর কারটা বেঠিক তা যাচাই করার কোনো পন্থা নেই; ভেদ নেই জ্ঞানী আর অজ্ঞজনের মধ্যে। সে-ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রোতাগরাসকে অন্যদের চাইতে প্রাজ্ঞতর ভাবারও কোনো ভিত্তি থাকে না, অতএব তাঁর কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে পাঠ নেওয়ারই বা কী অর্থ থাকে ? ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত মজাদার বিচিত্র কথা। সংক্ষেপে, পূর্বসূরি প্রোতাগরাসের থিসিসটিকে সোক্রাতেস ধূলিসাৎ করেন এবং প্রোতাগরাসের শিষ্য বেচারী থেয়াইতেতস্ কাঁচুমাচু হয়ে যান: গুরু সোক্রাতেসের এই জয়টা দেখানোই তাঁর শিষ্য প্লাতোনের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন উঠবে, নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে পরিবেশিত আকারে প্রোতাগরাসের মূল তত্ত্বের কতটা আমরা নির্ভুলভাবে পাচ্ছি, কতটা বা নাট্যকার প্লাতোনের তৈরি করা। পণ্ডিতদের মতে, সূত্রাকারে উদ্ধৃত মূল উক্তিটি প্লাতোন নির্ভুলভাবেই পরিবেশন করেছেন এমন অনুমান করা চলে, কেননা তাঁর অন্য ডায়ালগ 'ক্রাত্যুলস্'-এও ('Cratylus') সেটি ঐভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে।

> সোক্রাতেস : কিন্তু আপনি কি এ কথা বলবেন, হের্মগেনেস, যে নামগুলো যেমন আলাদা, তেমনি জিনিসগুলোও আলাদা ? এবং, যেমন আমাদের বলেন প্রোতাগরাস, তারা ব্যক্তিসাপেক্ষ ? কেননা তিনি বলেন যে মানুষ সব কিছুর মাত্রা, এবং জিনিসরা আমার কাছে তেমন, যেভাবে তারা আমার কাছে প্রতিভাত হয়, এবং আপনার কাছে তেমন, যেভাবে তারা প্রতিভাত হয় আপনার কাছে। আপনি কি তাঁর সঙ্গে একমত, না কি আপনি বলবেন যে জিনিসদের মধ্যে তাদের নিজস্ব কোনো খাঁটি সার থাকে ?
>
> হের্মগেনেস : সোক্রাতেস, আমি কখনও কখনও চিন্তাবিভ্রান্ত হয়ে প্রোতাগরাসের মতকে আশ্রয় করেছি; তা ব'লে আমি তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই।

জ্ঞানের স্বরূপবিচার করতে গিয়ে সোক্রাতেস তাঁর বিখ্যাত 'ডায়ালেক্টিক' দিয়ে প্রোতাগরাসের যুক্তিকে খণ্ডন ক'রে দিয়েছেন ব'লেই যে দ্বিতীয়জন আমাদের কাছে অগ্রাহ্য হয়ে গেলেন তা তো নয়। জোয়েট আমাদের মনে করিয়ে দেন যে প্লাতোনের লেখাগুলি এমন এক যুগের জাতক, যখন ভাষার সাহায্যে বিশ্লেষণের ক্ষমতা জগৎ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের

প্রায়োগিক উপায়গুলিকে অতিক্রম ক'রে গেছে। পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞান তখনও ঠিক ক'রে গ'ড়ে ওঠে নি, কিন্তু চুলচেরা দ্বান্দ্বিক তর্কের সাহায্যে অন্যদের যুক্তিকে খর্ব ক'রে দেওয়ার ক্ষমতা শীর্ষে উঠেছে। গ্রীক মন তখন বিমূর্তনের শক্তি দ্বারা সম্মোহিত, এবং তার দরুন নানাভাবে বিভ্রান্ত। যে-সব ভাবনার মধ্যে সত্যের বীজ নিহিত, যেগুলিকে অনুধাবন করলে হয়তো বা কোথাও পৌঁছনো যেতো, সেগুলিকে ভাবুকরা অনুধাবন করেন না। প্রোতাগরাসকে তাঁর নিজের শর্তে বুঝে নিতে আগ্রহী নন প্লাতোন, প্রাগ্রসরতর লজিকের জালে তাঁকে জড়িয়ে ফেলাই তাঁর অভীষ্ট।

আরেকজন পণ্ডিত, এডওয়ার্ড হ্যাসি, আমাদের মনে করিয়ে দেন যে সোক্রাতিক পদ্ধতিটা তখনকার নব-উদীয়মান চর্চা জ্যামিতি দ্বারা প্রভাবিত। বিরাট বিরাট মানবিক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা সোক্রাতেসের : কাকে বলে ভালো, কাকে বলে মন্দ, কাকে বলে ন্যায়, কাকে বলে অন্যায়, কাকে বলে সুখ ইত্যাদি ; কিন্তু তাঁর অন্বীক্ষার পদ্ধতিটা বিষয়োপযোগী নয়। তিনি চান স্পষ্ট এবং সাধারণ কতগুলি সংজ্ঞা, সেগুলি থেকে এবং অন্যান্য লভ্য অনুমান থেকে যুক্তির অবতারণা। কিন্তু যেখানে জ্যামিতিবিদ ঐ পথ ধ'রে পৌঁছন উপপাদ্য থেকে উপপাদ্যে, অথবা সমস্যা থেকে তার সমাধানে, সোক্রাতেস সেখানে সাধারণতঃ উত্তীর্ণ হন সমস্যা থেকে সমস্যান্তরে। সংলাপের মাধ্যমে অনুসৃত তাঁর অন্বীক্ষা তাঁকে দেয় অন্যদের নিশ্চয়তাগুলিকে প্রকাশ্যে ধ্বংস করবার একটা মস্ত ক্ষমতা,— এমন সমস্ত বিষয়ে, যেগুলির সম্বন্ধে প্রতিটি সাধারণ মানুষই স্বভাবতঃ ভাবে যে তারও কিছু মূল্যবান বক্তব্য রয়েছে। সোক্রাতেসের মধ্যে এই ধ্বংসাত্মক দ্বান্দ্বিক তর্কনৈপুণ্যের সঙ্গে একটা গভীর আন্তরিকতার সহাবস্থানই মুগ্ধ করে তাঁর শিষ্যদেরকে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সমকালীন ভাবনার উপরে যতটা প্রভাব রাখতে পেরেছিলেন তার থেকে ঢের বেশী রাখেন পরবর্তী কালের দর্শনের ইতিহাসের উপরে— তাঁর বিখ্যাত শিষ্য প্লাতোনের বিবর্তনের মাধ্যমেই।

সোক্রাতিক পদ্ধতির বিষয়-অনুপযুক্ততার মজাদার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ল্যুসিস' ('Lysis') নামে প্লাতোনের ডায়ালগটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে সোক্রাতেস ও অপর দুই ব্যক্তি বন্ধুত্বের স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। বহু সূক্ষ্ম তর্কের পরেও বন্ধু কাকে বলে সে-সম্পর্কে বন্ধুত্রয় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। কবিতা দিয়ে হয়তো বোঝানো যেতো, কিন্তু কবিতা সোক্রাতিক ডায়ালেক্টিক নয় এবং কবিরা প্লাতোনের বিশ্বাসের পাত্র নন।

ফিরে আসা যাক প্রোতাগরাসের কাছে। গ্রীক পুরাণের দেবদেবীদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অজ্ঞাবাদী। 'দেবতাদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তাঁরা আছেন কি নেই, কী বা তাঁদের রূপ, সে-সব জানবার কোনো উপায় আমার জানা নেই ; সাক্ষ্যের অভাব তথা মনুষ্যজীবনের হ্রস্বতাসমেত নানা কারণেই এই বিষয়ে জ্ঞান সম্ভব নয়।' তাঁর চিন্তা মানুষের দৃষ্টিকে পারমার্থিকের দিক থেকে সরিয়ে এনে তাকে নিবদ্ধ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাতিভাসিক জগতের দিকে। তাঁর চাইতে বয়সে ছোট সফিস্ট গর্গিয়াস (Gorgias) স্রেফ ব'লে

দিয়েছিলেন যে কোনো-কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না, যদি বা কিছু জানা সম্ভব হয় তা হলেও সে-জ্ঞানকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় না। এই ভয়াবহ শূন্যের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ মানুষ চায় সাধারণ জ্ঞানে প্রত্যাবর্তন, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাস্তবতায় পুনরবতরণ। প্রোতাগরাস তাকে সেই আশ্বাস দিতে সমর্থ। 'আন্‌থ্রোপস্ মেত্রন্'— 'মানুষ মাত্রা'— তাই হয়ে ওঠে একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।

তা হলে সব মিলিয়ে বলা চলে যে প্রোতাগরাসের সার্থকতাগুলি হচ্ছে এইরকম : তিনি জীবনদর্শনকে ঈশ্বরবাদী অবস্থানের বিপরীত দিকে দাঁড় করিয়েছিলেন ; ইন্দ্রিয়সংবেদ্য প্রত্যক্ষ জগতের দিকে তার মুখটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ; আপেক্ষিকতা ও প্রায়োগিকতার দিকে তাকে একটা আভিমুখ্য দিয়েছিলেন ; কিছুটা সংশয়ের সঙ্গে কিছুটা সাধারণ জ্ঞানের একটা সাধারণবোধ্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। শিবনারায়ণ রায় যাকে বলেছেন 'মূঢ়তার জয়যাত্রা' (*জিজ্ঞাসা* ৭ : ২) সেই প্রবণতাকে রুখতে প্রোতাগরাসীয় মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই সহযোগী। সমস্যাটি বঙ্গে অথবা ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিমেও জনমানসে যুক্তিবাদের অনুপ্রবেশ যে আজও কতটা অগভীর, যুক্তিবাদের পাতলা বরফের নীচে অযৌক্তিক বিশ্বাসের শীতল জল যে এখনও কতটা তরল, তা টের পাওয়া যায় সহসা কোনো সংকট উদিত হলে। ভাইরাস-সংক্রামিত এইড্‌স্ ব্যাধি যে ঈশ্বরের রোষের প্রকাশ ও তাঁর অভিশাপ, এমন অভিমত প্রকাশিত হতে শুনেছি।

তৎসত্ত্বেও প্রোতাগরাসের বিখ্যাত সূত্রটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কোনো বিরাট বৈশ্বিক ফর্মুলায় পরিণত করতে আমি নারাজ। তার কারণ আগেই বলেছি : সূত্রদের প্রবণতা বুলিতে পরিণত হওয়ার দিকে। এডওয়ার্ড হাসি প্রোতাগরাসের সূত্রটাকে অভিহিত করেওছেন 'একটি চমৎকার স্লোগান' হিসাবে, যা সত্যের ব্যাপারে আপেক্ষিকতা ও প্রায়োগিকতার দিকে আভিমুখ্যের সঙ্গে মানুষের সমাজ ও ব্যবহারের বিবিধ সমস্যার ক্ষেত্রে মানবতান্ত্রিক আশাবাদের সমন্বয় ঘটায়।

স্লোগানটির অপব্যবহার কেবল একটা সম্ভাবনামাত্র নয়, তা ঘটেছে এমন নিশ্চয়ই বলা চলে। প্রোতাগরাস জ্ঞানের স্বরূপের কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য সম্প্রসারিত হয়ে গেছে এই ধারণায় যে মানুষ প্রকৃতিসংক্রান্ত যাবতীয় ভালোমন্দেরও মাত্রা। এর ফলে প্রশ্রয় পেয়েছে এমন এক প্রজাতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে হাল আমলে বলা হয় প্রজাতিতন্ত্র ('species-ism'), যার বক্তব্য হলো : 'প্রাণীদের রাজ্যে আমাদের প্রজাতিই বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, অতএব তা সবার উর্ধ্বে, আমাদের স্বার্থে অন্য প্রজাতিদের নির্দ্বিধভাবে নির্বংশ করলেও কোনো দোষ নেই, আমাদের সে-অধিকার আছে।' যারা এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, সভ্যতার অগ্রগতির দোহাই দিয়ে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে সর্বপ্রকারে দূষণ-লুণ্ঠন-ধর্ষণ করতে তাদের বাধে না। তখন কার্যতঃ এই দাঁড়ায় যে মানুষের লোভ, হিংসা, স্বার্থান্ধতা, মায় তার মাত্রাজ্ঞানহীনতা পর্যন্ত 'সব কিছুর মাত্রা'। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ মহিলার একটি প্রবন্ধ ও কবিতার অনুবাদ 'ব্রিটেনের বিপন্ন গ্রামাঞ্চল' শিরোনামায় *জিজ্ঞাসা*-র দপ্তরে পাঠিয়েছিলাম ; সেটি যদি ভবিষ্যতে প্রকাশিত হয় বা এই

আলোচনা প্রকাশিত হবার আগেই বেরিয়ে গিয়ে থাকে [এটি *জিজ্ঞাসা* ৮ : ১ সংখ্যায় ছাপা হয়], তা হলে আমি যা বলতে চাইছি তা স্পষ্টতর হবে। এটি আমাদের সময়ের একটি জরুরী পরিপ্রেক্ষিত, যা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীব্যাপী, কেবল পাশ্চাত্য দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যে-সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব যখন প্রোতাগরাসীয় উচ্চারণ থেকে কিছুটা স'রে এসে আমরা বলতে পারি যে না, কতগুলি এলাকা আছে যেখানে মানুষ সব কিছুর মাত্রা হতে পারে না, উন্নত বুদ্ধি দ্বারা অন্বিত হলেও সমগ্র অস্তিত্বের সে অংশমাত্র; যে এই পৃথিবীটাতে কেবল আমাদের অধিকার নেই, একে আমরা অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদদের সঙ্গে ভোগ করি। আমাদের দুনিয়াকে আমরা যেমন আমাদের মাপকাঠি দিয়ে মাপি, অন্যান্য প্রাণসমন্বিত সত্তারাও তেমন তাদের মাপকাঠি দিয়ে তাদের দুনিয়াকে মাপে। বস্তুতঃ মহাজগৎও তার নিজস্ব মাপকাঠিতে সমানে আমাদের মাপছে এবং সেই মানদণ্ডে আমাদের মূল্যনির্ণয় করছে। এ-সব কথা বোঝার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই, বরং বিজ্ঞান এখানে আমাদের পথ দেখায়। আমাদের পাশের বাড়ির বিড়ালটা যখন তার তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়দের দ্বারা তার জগৎটাকে মাপে, যার অন্তর্গত আমি, যখন আমি অসহায়ভাবে, নিরুপায়ভাবে তার ক্ষমাহীন মাপকর্মের মধ্যে প'ড়ে যাই, তখন তার চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারি যে ওর মাপকাঠিটা আর আমারটা এক নয়। কোন্ সাহসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দাবি করবো যে মানুষ বিড়ালের জগতেরও মাত্রা? (এ প্রশ্ন মানবেন্দ্রনাথ বুঝতেন মনে হয়।)

শান্তিনিকেতনের মাটির দোলনচাঁপাকে তিন বছরের উপর এ দেশে আমার বাড়ির ভিতরে পোষ মানাচ্ছি। অপ্রতিহত তার তেজ, কিন্তু ফুল ফোটাতে সে এ পর্যন্ত উৎসুক নয়। তার সমস্ত সংবেদন দিয়ে নতুন পরিবেশটাকে সে মেপে চলেছে, বংশরক্ষা করছে শিকড় থেকে ক্রমাগত নতুন ডাঁট বার ক'রে, ফুল প্রসব করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করছে না। আমি তাকে দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলতে পারি : 'তিন বছরে অন্ততঃ তিনটে ফুল ফোটাতে পারতি।' কিন্তু মানবীর মাত্রা তো ওর নয়। ও যে বিলেতের ঘোর শীতের মধ্যেও গৃহাভ্যন্তরের তাপব্যবস্থার প্রশ্রয়ে সরস সবুজ ডাঁট-পাতার সমারোহে আমার ঘর আলো ক'রে আছে এর জন্যেই আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ, ফুল না-ই বা ফুটলো। প্রতিদিন ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি যে ওর মাত্রাজ্ঞান আমার চাইতে কিছু কম নয়, বরং বেশীই। এই দেশান্তরিত দোলনচাঁপাও তার আপন জগতের মাত্রা।

এবারে স্বীকার করি আমার মূল অস্বস্তিবোধটাকে উস্‌কে দিয়েছিলো ঠিক কোন্ ব্যাপার। সমালোচিত বইটির [শিবনারায়ণ রায়-সম্পাদিত *এম. এন. রয়, ফিলজফার-রেভোলিউশনারি*, ১৯৮৪] ১৬৪ পৃষ্ঠায় প্রাসঙ্গিক অংশটি পাওয়া যাবে। সেটি হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের যৌথ রচনা 'মৌল' গণতন্ত্রের বাইশ-দফা নীতির সর্বশেষ নীতিটি :

> **Radicalism starts from the dictum that "Man is the measure of everything" (Protagoras) or "Man is the root of mankind" (Marx),**

and advocates reconstruction of the world as a commonwealth and fraternity of free men, by the collective endeavour of spiritually emancipated moral men.

এখানে পাচ্ছি দুজন পুরুষ গুরুর নাম স্মরণ ক'রে মন্ত্রোচ্চারণ, আদিতে বড় হরফের 'এম্'-সহ 'ম্যান্', এবং সেই সত্তার বহুবাচনিক রূপ : পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বমণ্ডিত, স্বাধীনচেতা, নৈতিক আলোকপ্রাপ্ত পুরুষমণ্ডলী, যাঁদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে এই পৃথিবীকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব। আমি এই জেঠামশাইদের আসরে একদম স্বস্তিবোধ করি না! আমি এঁদের মধ্যে এই পৃথিবীর দিদি-বৌদিদের দেখতে পাই না, নিজের চেহারাও দেখতে পাই না, খুঁজে পাই না নারী হিসাবে আমার আত্মপরিচয়। এই জেঠুরা যত ভালোই হোন না কেন, দুনিয়া পুনর্গঠনের যে-নকশা এঁরা গ্রহণ করবেন মেয়েদের স্বার্থ যে সেখানে সংরক্ষিত হবে এমন কোনো প্রত্যাভূতি আমি ছবিটা থেকে পাই না।

এঁরা কঠিনদৃষ্টি প্রবীণ পুরুষ, সমাজের মাথা,— সে-সমাজ কমনওয়েল্থ্ হলেও। এঁরা সেনেটের সদস্য, পার্টির দাদা, সমবেত সূত্রধারমণ্ডলী, ডিরেক্টরদা-বৃন্দ। আমি এঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার একটা প্রবল তাগিদ স্বতঃই অনুভব করি! আমি জানি এঁদের জগৎকে মাপবার পদ্ধতি, জগৎ সম্পর্কে এঁদের বর্গীকরণ কখনো আমার পদ্ধতি ও বর্গীকরণের সমধর্মী নয়। আমি জানি না এঁদের সঙ্গে আমার কী সংলাপ বা সহযোগিতা সম্ভব হতে পারে। আমার ধারণা এঁদের ব্যবহার বাইরে যতই মোলায়েম হোক না কেন, কার্যতঃ সব লেনদেনে এঁদের দ্বারা আরোপিত অলিখিত শর্তদেরকেই মেনে নিতে হবে। এঁদের মানদণ্ডে আমার কখনো উতরোনো সম্ভব নয়,— বহু দোষত্রুটি বেরোবে, যে-কোনো মুহূর্তে তিরস্কৃত হতে পারি, ঘটতে পারে অ্যালিস-ইন-ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডীয় কায়দায় প্রথমে শিরশ্ছেদ, তার পর বিচারকের রায়! এঁরা অনায়াসেই হতে পারেন প্রাচীন-গ্রীক-জাতীয়, যাঁদের চোখে আমি একজন দুর্বিনীত হেটাইরা (hetaera), যার অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হয়ে উঠেছে। দুনিয়া পুনর্গঠনের সময়ে আমাকে কেটে বাদ দেওয়া অনায়াসেই এঁদের পরিকল্পনার অন্তর্গত হতে পারে!

কেউ কেউ বলবেন যে আমি 'ওভার-রিঅ্যাক্ট' করছি, আমার জানা উচিত যে মেয়েরাও ঐ 'ম্যান'-নামক সমষ্টির অন্তর্গত। কিন্তু তাঁদের আমি বলতে বাধ্য যে প্রস্তাবিত মৌল গণতন্ত্রের বাইশটি নীতি মিলিয়ে যে-টেক্সট বা ডিসকোর্স তাতে কোথাও স্ত্রীপ্রকৃতির কোনো প্রকৃত স্বীকৃতি নেই। এর শুরু 'Man is the Archetype of Society' এই দৃপ্ত ঘোষণা দিয়ে; সুস্পষ্ট এখানে নির্মাতার এই আত্মবিশ্বাস যে 'man is the maker of his world'; এখানে 'exploitation of man by man' দূর করার কথা শুনতে পাই, কিন্তু পুরুষ-কর্তৃক নারীশোষণ দূর করার কথা শুনতে পাই না; যুক্তি এবং স্বাধীনতাস্পৃহার উপরে সঙ্গত কারণেই ঝোঁক দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আনন্দ বা প্রেমের কথা কোথাও বলা হয় নি। জানি না কেন, *দ্য আইডিয়াল অফ ইণ্ডিয়ান উমানহুড*-এর মতো র‍্যাডিকাল টেক্সটের রচয়িতা মৌল গণতন্ত্র গঠনের মহাযজ্ঞে মেয়েদের ঠিক ক'রে নেমন্তন্ন করেন নি। মেয়েরা

এই সভায় টিকের আড়ালেই রয়ে গেছে: অদৃশ্য, অনুমেয়মাত্র। এবং তাই মন্ত্রোচ্চারণে আমার অস্বস্তিবোধ: আমি তো জানি তত্ত্বে যেমনই হোক, 'মানুষ সব কিছুর মাত্রা' স্লোগানের যে-ব্যবহারিক রূপ কার্যতঃ সমাজে দৃষ্ট হয় তা হচ্ছে 'পুরুষরা (বা গ্রীকরা, বা শ্বেতজাতিরা, বা খৃষ্টানরা, বা ব্রাহ্মণরা, বা বিত্তবানরা, বা রাজনৈতিক নেতারা, বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি, বা ...) সব কিছুর মাত্রা'। ক্ষমতার সঙ্গে যাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে তারাই সব কিছুর মাত্রা হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখা যেতে পারে যে থ্রাস্যমাকস্ (Thrasymachus) নামে প্রোতাগরাসের পরবর্তী একজন সফিস্ট স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে শক্তিমানের পক্ষে যা উপকারী তা-ই ন্যায্য। তিনি তা হলে কোন্ দুনিয়ার মাত্রা? এ ব্যাপারে আমার 'অত্যধিক প্রতিক্রিয়া'ও (যদিও মূল গ্রন্থসমালোচনায় একে আমি লাগাম দিয়েই রেখেছিলাম) কি নয় মৌল অর্থে প্রোতাগরাসীয়, একজন মেয়েমানুষের নিজস্ব মাত্রা, নিদেনপক্ষে ধ্রুপদী সূত্রটির 'সাবভার্সিভ' নবপ্রয়োগ?

মেয়েদের আন্দোলন যদিও মানবতন্ত্রের একটা উঠোনের মধ্যে লতিয়ে উঠেছে, তবুও দুয়ের মধ্যে যে একটা টেন্‌শন বর্তমান সে-সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। মানবতন্ত্র এখনও পর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক ভাবলোকের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করে; তার মুখ্য প্রতীক ও মূল্যগুলি পৌরুষ-আশ্রয়ী, পিতৃতান্ত্রিক প্রাধিকার, প্রতিষ্ঠা ও গৌরব দ্বারা মণ্ডিত। নারী-আশ্রয়ী প্রতীক ও মূল্যগ্রাম সেখানে গৌণ, তাদের কিছুটা স্বীকৃতি বরং ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যেই মেলে। মানবতন্ত্রে এখনও পর্যন্ত প্রাধান্য পাচ্ছে পুরুষদের নিজস্ব মাপজোক করার পদ্ধতি। মেয়েদের মাপকাঠিটা এখনও তাতে যুক্ত হয় নি। মেয়েরা যেভাবে পৃথিবীকে দ্যাখে-বোঝে-মাপে সেই পরিপ্রেক্ষিতটা তার সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা পূর্ণ অর্থে মানবতন্ত্র নয়। 'মৌল' মানবতন্ত্রে মেয়েদের স্থান ঠিক কোথায়, সেখানে তাদের ভূমিকা ঠিক কী, এ-সব খুঁটিনাটি অন্ততঃ সমালোচিত বইটির টেক্সটে স্পষ্ট নয়।

[পত্রলেখক] দেবতোষবাবুর সর্বশেষ আপত্তি ছিলো কীট্‌সের 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি' তত্ত্বকে আমি আমার সমালোচনার মধ্যে যেভাবে টেনে এনেছিলাম তা নিয়ে। কীট্‌স্ একে চিহ্নিত করেছিলেন লেখকদের পক্ষে অপরিহার্যরূপে। অনিশ্চয়তা ও সংশয় যতদূর সম্ভব কমিয়ে জ্ঞানের পরিধি যতদূর সম্ভব বাড়ানো যে অবশ্যই কাম্য, এ কথা [দেবতোষবাবুর মতো] আমিও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতায় প্রতি ধাপেই কিছু-না-কিছু অনিশ্চয়তা থেকে যায়, এবং যত বাড়ে জ্ঞান তত সেই বৃত্তের কেন্দ্রে ঘনীভূত হয় রহস্য। এমন সব প্রশ্ন থেকে যায়, যাদের উত্তর মেলে না। আমাদের জীবনে এমন সব প্রতিকারহীন কান্না রয়ে যায় যাদের অপনোদনে কোনো সান্ত্বনা অনুসন্ধান ক'রেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন অবস্থার মধ্যে টিকে থেকে সৃষ্টিশীল কাজ করতে গেলে যে-মনোবৃত্তির প্রয়োজন হয় সেটাই, আমি যতদূর বুঝেছি, নন্দনতত্ত্বের 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি'। বস্তুতঃ, যাঁরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করতে অপারগ, তাঁদের তো আরও বেশী ক'রেই লাগবে এই গুণটি। যে-কোনো তন্ত্রের মুখোমুখি শিল্পী হিসাবে আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য: তা আমার শিল্পী-সত্তাকে কী দিতে পারে, তাকে

কিভাবে পুষ্ট করতে পারে ? আধুনিক ভারতের র‍্যাডিকাল ভাবনা যে নান্দনিক চেতনায় খুব বেশী সমৃদ্ধ নয় এই অভিযোগ তো শিবনারায়ণ রায় নিজেই করেছেন *দ্য ওয়ার্ল্ড হার ভিলেজ* বইটিতে।

প্রোতাগরাসের মর্মোদ্ধারে যে-বইগুলির পাতা উল্টেছি সেগুলির নাম নীচে দিলাম। গ্রীক নাম ও শব্দগুলির উচ্চারণ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়েছিলাম, অর্থাৎ বাংলা হরফের মাধ্যমে মূল ধ্বনিগুলির যথাসম্ভব কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

Encyclopaedia Britannica, Micropaedia VIII, Macropaedia 14, 15, 16, 17.

Benjamin Jowett, *The Dialogues of Plato*, translated into English with analyses and introductions, various volumes, especially *Vol. III.*

Lewis Campbell, ed., *The Theaetetus of Plato*.

W. K. C Guthrie, *A History of Greek Philosophy, Vol. 1.*

Edward Hussey, *The presocratics*.

জানুয়ারি ১৯৮৭

জিজ্ঞাসা ৭ : ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৩ [১৯৮৭]

রোম্যান্টিক নস্টালজিয়া ও মোহভঙ্গ

পশ্চিম বাংলার সাহিত্যসংস্কৃতি যাঁদের মনের কাছাকাছি তাঁরা আলোচ্য প্রবন্ধসংকলনটিতে* চিন্তার নানা খোরাক পাবেন। কৈশোর-যৌবনের প্রিয় দুনিয়া সম্পর্কে নস্টালজিয়া এই বইটির একটি প্রধান সুর। এই পিছুটান কম-বেশী প্রায় সবারই থাকে। বলা চলে তা আমাদের মানস জীবনের তথা সংস্কৃতিচেতনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ, আমাদের আত্মপরিচয়ের পোষক। তবে অশোক মিত্রর ক্ষেত্রে এই ফিরে তাকানো বিশেষভাবে রোম্যান্টিক, এবং হয়তো সে-দৃষ্টি অধুনা সম্পর্কে তাঁর হতাশাকে তীব্রতা দিয়েছে। তাঁর যে-আকৃতি, তা কি একটা বাস্তব পরিপার্শ্বের জন্যে, না কি একটা অখণ্ড স্বপ্ন বা অসম্ভব অপাপবিদ্ধতার জন্যে, যা বর্তমানে অনস্তিত্বশীল তো বটেই, অতীতেও কখনো ছিলো না, ভবিষ্যতেও কখনোই ফিরে আসতে পারে না ?

শ্রীযুক্ত মিত্র দাবি করেছেন যে তাঁর প্রজন্মের মানুষরা বরাবরই অনুভব ক'রে এসেছেন যে জীবনানন্দে একমাত্র তাঁদেরই 'অখণ্ড অধিকার', কেননা জীবনানন্দকে তাঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন,— তাঁদের কৈশোরে। আবিষ্কারের দাবিটা না-হয় মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তা থেকে কি সত্যিই কোনো প্রজন্মগত একচেটিয়া অধিকার আসে ? অধিকার তো আসে জানি অনুরাগ আর অনুশীলন থেকে,— সেখানে নেই দেশকালের ভেদ। একজন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন কালের মানুষও সেই অধিকার অর্জন করতে পারেন। শ্রীযুক্ত মিত্র আরও লিখেছেন : 'অনুভবের গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যে' জীবনানন্দের কবিতার 'কোনো তুলনাই নেই।' জীবনানন্দর কবিতা যদিও ভালোবাসি, তবুও এই দাবি আমার কাছে অতিশয়োক্তির মতো ঠেকে। তুলনা নিশ্চয় আছে। বেশী দূর যাবার দরকার নেই : অনুভবের গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ বা চণ্ডীদাস মোটেও ফ্যালনা নন। বাংলা কবিতার কোনো বিশেষভাবে 'মননশীল' বা 'মননধর্মী' পর্যায়ের ফলেই জীবনানন্দ তাঁর কবিজীবনের গোড়ার দিকে যথেষ্ট সমাদর পান নি,— শ্রীযুক্ত মিত্রর এই বিশ্লেষণও বোধ হয় একটু অতিরিক্তভাবে সহজ-ঘেঁষা। সে-অনাগ্রহের জন্যে মননের আধিক্য হয়তো ততটা দায়ী নয় যতটা দায়ী একটা বিশেষ ধরনের মন, যা শহর-ঘেঁষা, নাগরিক বৈদগ্ধ্য দ্বারা সমাচ্ছন্ন, গ্রামবাংলার চিত্রকল্পে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক।

ধূর্জটিপ্রসাদের কথা বলতে গিয়ে শ্রীযুক্ত মিত্র এক দিকে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যায়ন সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, অন্য দিকে প্রবন্ধ লেখার

---

* অশোক মিত্র, *অচেনাকে চিনে-চিনে ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, ষোলো টাকা।

সাম্প্রতিক ধারায় 'ভাষাতে একধরনের প্রকট পাণ্ডিত্য' সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন : 'এই কঠিন-কঠিন কথাগুলো যে ব্যবহার করলাম, এই কঠিন-কঠিন তত্ত্বগুলোর যে উল্লেখ করলাম, তাতে লোকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।' বাণিজ্যায়নের বিপদ সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগের বেলায় তিনি কাদের কথা ভাবছিলেন জানতে ইচ্ছে করে। এই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন যে 'সাহিত্যের জন্য সংগঠন প্রয়োজন ... কোনো বিশেষ সাহিত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে গেলে কিছু-কিছু পারস্পরিক অনুকম্পায়ী মানুষকে একত্র করতে হয়।' এ কথা যদি মেনে নিই, তা হলে হয়তো এর মধ্যেও জীবনানন্দ প্রথম দিকে যে-অনাদর পেয়েছিলেন তার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনানন্দ কোনো দলের অন্তর্গত ছিলেন না, তাঁর জন্য প্রচার করবার লোক ছিলো না, সম্ভবতঃ সেটাও একটা কারণ যেজন্যে তাঁকে ঘিরে কিছু কাল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় নি।' এবং সে-দিক থেকে দেখতে গেলে, বিষ্ণু দে-কে উপলক্ষ্য ক'রে অন্য এক প্রবন্ধে অশোক মিত্রর যে-বিষণ্ণতা, তা কি অন্ততঃ কিছুটা ভরসা পায় না বিষ্ণু দে-র গুণগ্রাহী পাঠক অধ্যাপক অরুণ সেনের অধ্যবসায়ী লেখাগুলি থেকে ?

বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে মূল্যগ্রামের দ্বন্দ্বে একেকসময়ে আমার খটকা লেগেছে। এক দিকে অরুণকুমার সরকারের আত্মলোপকারী নিঃস্পৃহতা,— 'কী হবে লিখে'— অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসুর অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা ও ভাষাপ্রেম : এ দুয়ের মধ্যে আমাদের নির্বাচন ক'রে নিতে হবে তো ? এবং এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি : অরুণ সরকারের 'ঝিকিমিকি গদ্যের নিদর্শনঠাসা অজস্র' চিঠিপত্রে বোঝাই দু'-দুটো বিরাট ঝোলাকে শ্রীযুক্ত মিত্র কী মনে ক'রে হারিয়ে যেতে দিলেন ? অরুণ সরকারের নিজের নিরাসক্তি যদি বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি ক'রে থাকে, তা হলে তাঁর চিঠিগুলির সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁর সুহৃদের এই সমান্তরাল নিরাসক্তিও কি সমান ক্ষতি করলো না ?

সুরঞ্জন সরকার আর আতোয়ার রহমানের বিষয়ে আমি প্রায় কিছুই জানতাম না, তাই এঁদের উপরে লেখাদুটি আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। দুটি কৌতূহল-জাগানো প্রতিকৃতি। অবশ্য চল্লিশ বছর আগে সুরঞ্জন সরকার এক বিশেষ রীতিতে কবিতা পড়া শুরু করেছিলেন ব'লেই 'এখন যে-কেউই কবিতা পড়েন', শ্রীযুক্ত মিত্রর এই প্রত্যয় যেহেতু, তাঁরই ভাষায়, 'ধর্মবিশ্বাস', সেহেতু তার সঙ্গে কোনো তর্কও করা চলে না ! একটি ছোট প্রশ্ন : ১৯৪৬ সালের কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে পরিত্যক্ত গৃহস্থবাড়ির তেতলার কুঠুরি থেকে সুরঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে যে-সব কবিতার বই এবং সাহিত্যপত্রিকা লুঠ ক'রে আনা হয়েছিলো, গৃহস্থ গৃহে ফিরে এলে সে-সব চোরাই মাল তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়েছিলো তো ? নয়তো কাজটা বড় অসামাজিক হয়ে যায় !

প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পারছি যে *পুতুলনাচের ইতিকথা* সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মিত্রর প্রবন্ধটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে-সব আলোচনা অনুসরণ করবার সুযোগ আমার হয় নি। *পুতুলনাচের ইতিকথা* নিঃসন্দেহে বড় মাপের সাহিত্যকর্ম, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে সমগ্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র

এই বইটিকেই শ্রীযুক্ত মিত্র মহত্ত্বস্পর্শী ও ধ্রুপদচিহ্নিত বলছেন কেন। এই উক্তির মধ্যে তুলনা প্রচ্ছন্ন আছে, অথচ কোনো খুঁটিনাটিসমেত তুলনামূলক মূল্যায়নের ভেতরে তিনি যান নি। আমার জিজ্ঞাস্য : আর কোনো বাংলা বইয়ের মধ্যেই কি মহত্ত্বের লক্ষণ নেই? বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ঠিক এতটা কুণ্ঠার কারণ কিন্তু আমি দেখতে পাই না। আমার তো মনে হয় না যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ উপন্যাসটি কোনো শুকনো মরুভূমিতে একলা ক্যাক্টাস।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মিরোস্লাভ হোলুবের কবিতার অনুবাদের উপরে শ্রীযুক্ত মিত্র যে-প্রবন্ধটি লিখেছেন সেটি প'ড়ে আমার মনে একটি জরুরী প্রশ্ন জেগেছে। তিনি লিখেছেন : 'মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূল চেক থেকে অনুবাদ করেছেন কি না আমার জানা নেই, অনুবাদে কতটা ভাবস্বাধীনতা নেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন তা-ও আমার জানা নেই ...'; কিন্তু অনূদিত কবিতার পাঠক হিসাবে এগুলি কি আমাদের জানা দরকার নয়? এই প্রবন্ধ থেকেই জানতে পারছি যে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্প্যানিশ থেকে, জর্মন থেকে, হাঙ্গেরিয়ান তথা বিভিন্ন স্লাভ সাহিত্য থেকে' অনুবাদ করেছেন। বাঙালীর ক্রমবর্ধমান কূপমণ্ডুকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কৃতির জন্যে শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁকে 'অকুণ্ঠ অভিনন্দন' জানিয়েছেন। এ-সমস্ত অনুবাদই কি মূল থেকে? যে-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত মিত্র নিজেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যায়ে বাঙালীর ঔপনিবেশিক-ভূত-গ্রস্ত মন ইংরেজীনির্ভরতার দরুন ইংরেজীতে যা অনূদিত হয় নি তাকে জানবার সুযোগ পায় নি, সে-ক্ষেত্রে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন অনুবাদগুলি মূল ভাষা থেকে করা না ইংরেজী অথবা অন্য কোনো ভাষার মধ্যস্থতাতে করা তা জানতে চাওয়া নিশ্চয় অবান্তর নয়। সে-খবর না জানলে মানবেন্দ্রর কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করা কিভাবে সম্ভব? মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এতগুলি ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করার ক্ষমতা রাখেন, তা হলে বাংলা সাহিত্যে তিনি অবশ্যই মূল্যবান ব্যক্তি এবং গর্ব করবার মতো বিষয়, এবং সে-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত মিত্র আতোয়ার রহমান-সংক্রান্ত প্রবন্ধটিতে কেন বিলাপ করেছেন যে 'বাংলা সাহিত্যে ... পৃথিবীচেতনা বর্তমানে প্রায় নির্বাপিত'?

অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে অশোক মিত্র আরও লিখেছেন : 'বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে বিদেশী বাক্‌সরস্বতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বরাবরই সবচেয়ে উৎসাহী ভূমিকা পালন করেছেন বামপন্থীরা। ... আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বুদ্ধদেব বসুদের কথা ভুলে যাচ্ছি না, তাঁদের বৈদেশিক কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে উন্মুখতার প্রতীপ প্রেরণা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, কিন্তু প্রেরণা থেকেই তো প্রতীপ প্রেরণারও উৎস।' এখানে তর্কের অবকাশ তো আছেই, শেষের দিকে বক্তব্যের ঝোঁকও আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট নয়।

শ্রীযুক্ত মিত্রর চিন্তাগুলির স্রোত-প্রতিস্রোতের মধ্যে যে-অস্থিরতা, অস্বস্তিবোধ, বা অতৃপ্তিবোধ স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান, তাদের উৎসের সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন নামপ্রবন্ধটিতে। পশ্চিম বাংলার বাঙালী সমাজ 'গত কুড়ি বছর ধ'রে ভয়ংকর সংকটাপন্ন' (১৯৮৫-তে লেখা) এবং এর কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন বামপন্থী আন্দোলনের জড়তা ও

পরীক্ষাবিমুখতার মধ্যে। তাঁর বিবেচনায়, 'রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু, কমিউনিস্ট পার্টি, গত একশো বছরের বাঙালি সামাজিক ইতিহাস শেষ পর্যন্ত এই তিনটি সৌরমণ্ডলের উপর নির্ভর ক'রে' ; অপিচ : 'বাঙালি সৃষ্টিপ্রতিভার, চল্লিশের দশক থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত, প্রধান অবলম্বন সাম্যবাদী আন্দোলন : যা-কিছু সৃষ্টিশীল পশ্চিম বাংলার মাটিতে এই এতগুলি বছর ধ'রে ঘটেছে তা বামপন্থী আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সঞ্জাত প্রেরণাসূচিত, ক্বচিৎ-কখনো হয় তো বক্তব্য প্রকাশের সারাৎসার প্রতীপধর্মী হ'লেও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা পার্টির কোনো কর্মসূচী।' অতএব, তাঁর মতে, বামপন্থী আন্দোলনের আপজাত্যই পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের সাম্প্রতিক সংকটের মৌল কারণ।

এই বিশ্লেষণের ন্যায্যতা নিয়ে অনেক পাতা জুড়ে আলোচনা করা যায়, এখানে যার পরিসর নেই। পশ্চিম বাংলার বাঙালী সমাজের সংকটাবস্থা কেউই হয়তো অস্বীকার করবেন না, বামপন্থী আন্দোলনের আপজাত্যও হয়তো অনেকে মেনে নেবেন, কিন্তু প্রথমটার একমাত্র কারণই কি দ্বিতীয়টা ? আমার তো মনে হয় সংকট অনেক-কিছু উপাদান মিলিয়ে, অনেক স্তরে। এ অবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণ অসম্ভব নয়, কিন্তু তা স্থানকালশ্রমসাপেক্ষ। সংকট আছে, আবার আশাব্যঞ্জক কিছু-কিছু লক্ষণও আছে, এবং সেই লক্ষণগুলিও কেবলই কোনো একটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মনে হয় অশোক মিত্র একটা জায়গাতে বেশী আশাভরসা ন্যস্ত করেছিলেন, সেদিক থেকে আশাভঙ্গ হওয়ায় দোষারোপটা সমগ্রতঃ সেদিকেই প্রেরণ করছেন। এর মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক মোহভঙ্গের ব্যাপার আছে, রোম্যান্টিক নস্টালজিয়ার যা উল্টো পিঠ। এর ফলে তিনি হয়তো গত কুড়ি-বাইশ বছরের বাঙালী উদ্যমের প্রতি সুবিচার করছেন না। এ কথা আমি উল্লেখ করতে বাধ্য এই কারণে যে ঠিক ঐ বছরগুলিতেই যে-প্রজন্ম সাবালকত্ব অর্জন করেছে আমি তার অন্যতম। আমাদের প্রজন্মের কোনো উদ্যোগকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিতে শ্রীযুক্ত মিত্র কি নারাজ ? তিনি কি এক মিনিট ভেবে দেখবেন তাঁর বইটির সমালোচনা লিখতে তাঁর প্রকাশক আমাকে কেন অনুরোধ করলেন ? তার মানে কি এই যে গ্রন্থসমালোচক হিসাবে আমি ইতঃপূর্বে কিছু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছি ? এটা কি হতে পারে না যে ঐ সংকটাপন্ন বছরগুলিতে আমরা কেউ কেউ সংগ্রাম ক'রেও পশ্চিম বাংলার এবং বাংলাভাষার জন্য কাজ ক'রে গেছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, কূপমণ্ডুকতার প্রতীপ কোণে বাংলা সাহিত্যের শরীরে পৃথিবীচেতনাকে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছি ? আমাদের সেই সব চেষ্টা সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থান পাবে না কেন, বাঙালী যে প্রতিকূল অবস্থাতেও সৃষ্টিশীল হতে পারে তার লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হবে না কেন ? হয়তো এই বিগত বছরগুলিতে, যে-সময়ে শ্রীযুক্ত মিত্রর মনে হয়েছে যে কিছুই হচ্ছে না, অন্তঃশীল এমন কিছু কিছু বৃদ্ধি ঘটেছে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ, বাঙালীদের বৌদ্ধিক জীবনে যেগুলির প্রয়োজন ছিলো। চাষবাসে একই ক্ষেতে বছরের পর বছর একই বীজ না বুনে ক্ষেতকে বীজের বৈচিত্র্য দিতে হয়, মধ্যে মধ্যে তাকে একেবারে বিশ্রামও দিতে হয়। সেই ফাঁক প্রকৃত অর্থে ফাঁকা নয়, সেই অবকাশে মাটি ফিরে পায় তার আপন শক্তি। কৃষ্টিও এক ধরনের কর্ষণ বা চাষ, এবং

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলারও হয়তো সেইরকম একটা অবকাশের প্রয়োজন ছিলো, যার ফসল ভবিষ্যতে আপন নিয়মেই আত্মপ্রকাশ করবে। আমি অন্ততঃ ভাগ্যের কাছে এজন্যে কৃতজ্ঞ যে আমি অশোকবাবুদের প্রজন্মের মানুষ নই। তার কারণ আমি মেয়ে। তাঁর প্রিয় কৈশোর-যৌবনের বছরগুলিতে বাঙালী মেয়ের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশের জন্যে ঠিক ক'রে জায়গা করা হয় নি। সৃষ্টিশীল পুরুষরা নিজেদের মৌতাতে নিজেরা বুঁদ হয়ে থাকতেন, মেয়েদের অস্তিত্ব ছিলো মুখ্যতঃ ব্যাকরণের কর্মকারকের ভূমিকায়। সেই ব্যাকরণের যদি কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্তনও ঘ'টে থাকে, এখনকার বাঙালী মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ যদি কিছু পরিমাণেও বিবক্ষু এবং চিকীর্ষু কর্তৃকারকের ভূমিকা নেবার স্পর্ধা অর্জন ক'রে থাকেন,— যার জন্যে তাঁদের নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে স্ফীত মূল্য দিতে হয়েছে,— তা হলে সমাজের অন্যান্য অনেক সমস্যা সত্ত্বেও সেই বিবর্তন সমাজের পক্ষেই একটা তর্কাতীত লাভ। হয়তো এরই সূত্র ধ'রে কোনো কোনো সমস্যার গ্রন্থিমোচন ভবিষ্যতে সম্ভব হবে।

এবং আলোচ্য প্রবন্ধাবলী যদি একজন সতর্ক পাঠিকার মনে এত সব প্রশ্নের তরঙ্গ তুলতে পারে, তা হলে তেমন বইয়ের প্রাপ্তিও নিশ্চয়ই একটা লাভ।

বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছনোর অব্যবহিতপূর্বে রবীন্দ্রনাথ

৬ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখের রাত্রে বুয়েনোস আইরেসের বন্দরে নোঙর ফ্যালে আন্দেস্ জাহাজ। পরের দিন সে-শহরের কাগজে কাগজে র'টে যায় আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রনাথের পদার্পণের খবর। পুরানো সেই সব প্রতিবেদনের মধ্যে একটি আমাদের কাছে বিশেষভাবেই ঔৎসুক্যকর ও আদরণীয়; সেটি হচ্ছে ৭ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখের *লা নাসিয়ন* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনা। কবি যে খুব শ্রান্ত, জ্বরতপ্ত অবস্থায় আর্জেন্টিনার রাজধানীতে পৌঁছেছেন, পৌঁছেই অধ্যাপক রিকার্দো রোখাস্-কর্তৃক প্লাসা হোটেলে ন্যস্ত হয়েছেন, এবং শীঘ্রই ডাক্তারদের দ্বারা পরীক্ষিত হবেন, এই মর্মে একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি-সহ ঐ দিনের *লা নাসিয়ন*-এ প্রকাশিত হয় পত্রিকার জনৈক সাংবাদিকের নেওয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি পূর্ণাবয়ব সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় আন্দেস্ জাহাজেই, মন্তেভিদেও আর বুয়েনোস আইরেসের মাঝখানে। দক্ষিণ আমেরিকার অভিমুখে তাঁর যাত্রার সর্বশেষ পর্যায়টিতে, ফ্লু-ক্লিষ্ট অবস্থায় বুয়েনোস আইরেসের দিকে জলপথে এগোতে এগোতে,— সে-শহরটিতে তাঁর জন্য কী ভাগ্য অপেক্ষা ক'রে আছে সে-সম্পর্কে, বলাই বাহুল্য, সম্পূর্ণ অজ্ঞতায়,— রবীন্দ্রনাথ কী ভাবছিলেন, কী ছিলো তাঁর মানসিক প্রতিন্যাসগুলি, আর্জেন্টিনার কাছ থেকে এবং নিকট ভবিষ্যতের কাছ থেকে কী ছিলো তাঁর প্রত্যাশাগুলি: সে-সমস্তরই একটা ভারী সুন্দর আর মূল্যবান ছবি এই লেখাটির মধ্যে পাওয়া যায়, মেলে তাঁর তৎকালীন তথা তাৎক্ষণিক ভাবনানিচয়ের একটি আশ্চর্য চুম্বক।

সাংবাদিক প্রতিবেদন হিসাবে রিপোর্টটি সুলিখিত এবং *লা নাসিয়ন* পত্রিকার সাংবাদিকতার উচ্চমানের পরিচয়বহ। সাক্ষাৎকারটি যিনি নিয়েছিলেন এবং পরিমার্জিত লেখাটি যিনি তৈরি করেছিলেন, এ দুজন একই ব্যক্তি না-ও হতে পারেন: হতে পারে যে ছাপা লেখাটি দ্বৈত রচনা। কোথাও কোনো নাম দেওয়া নেই, কেবল জানা যাচ্ছে যে সাক্ষাৎকারটি যিনি নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদকমণ্ডলীর একজন, হয়তো একজন সহ-সম্পাদক বা অবর-সম্পাদক। একমাত্র এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখকরূপে চিহ্নিত করা ছাড়া আর কোনো উল্লেখ্য ভুল তিনি করেন নি। তিনি নির্ঘাত ভেবেছিলেন যে অত বড় একজন কবির যিনি সচিব, তিনি নিশ্চয়ই নিজে একজন লেখক হবেন। গ্রামোন্নয়ন, কৃষির উন্নতিবিধান ইত্যাদিও যে ছিলো কবির ধ্যান এবং প্যাশন, সেটা হয়তো তিনি সেই মুহূর্তে মনে রাখেন নি, বা সঠিক জানতেন না— যদিও যে-কাজ মানুষের পার্থিব কল্যাণের জন্য তার সঙ্গে কবি যে নিজেকে যুক্ত রাখেন, এ খবর তিনি রাখতেন দেখা যাচ্ছে।

যতিচিহ্ন ব্যবহারে ও অণুচ্ছেদবিভাজনে সামান্য শৃঙ্খলা এনে প্রথমে প্রতিবেদনটির অনুবাদ পরিবেশন করছি, তার পর যোগ করছি আলোচনার কয়েকটি সূত্র। রচনাটিতে যেসব প্রসঙ্গ বা ব্যক্তি উল্লিখিত, সেগুলি বা তাঁরা রবীন্দ্র-অধ্যয়নকারীদের কাছে সুপরিচিত ; যে-ব্যাপারগুলি বিশেষভাবে আর্জেন্টিনার সঙ্গে জড়িত সেগুলি শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষের এবং আমার এ-যাবৎ প্রকাশিত কাজের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পরিচিত হবারই সম্ভাবনা। অতএব তর্জমাটিকে অনর্থকভাবে পাদটীকা-কণ্টকিত করলাম না।

গত রাত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুয়েনোস আইরেসে/ বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন/ 'আপনারা একটি নূতন জাতি এবং এটা অসম্ভব নয় যে আপনাদের মধ্যে অর্সেছে সভ্যতার উত্তরাধিকার'/ পেরু-যাত্রা

লা নাসিয়ন পত্রিকার জনৈক সম্পাদক গত রাতের আগের রাতে স্টীমার-পথে চ'লে যান মন্তেভিদেও, তার পর গতকাল সকালে জাহাজবদল ক'রে ওঠেন আন্দেস-এ, যে-জাহাজ আমাদের দেশে বহন ক'রে এনেছে সমকালীন প্রাচ্য দুনিয়ার মহত্তম কবিকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে পৌঁছেছেন খানিকটা অসুস্থ অবস্থায়, কেমনা রিও দে জানেইরোর পর থেকেই তাঁর শরীরটা ভালো নেই। জাহাজটা মন্তেভিদেওতে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে উরুগুয়ের সাংবাদিকরা সেটাকে ছেঁকে ধরেন, কিন্তু তিনি, তাঁর কামরায় বন্দী, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা হয়তো তাঁর সচিবের অজুহাতমাত্র, তাই তাঁরা অন্যান্য যাত্রীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যাত্রীদের একজন বললেন, 'হ্যাঁ, খবরটা ঠিক ; তিন দিন যাবৎ তিনি করিডরে দেখা দেন না, সাদা-আলখাল্লা-পরা মূর্তিমান আত্মার মতো তাঁকে সন্ধ্যাগমে ডেকে আর পায়চারি করতে দেখা যায় না। প্রায় সর্বদা একাকী, আত্মমগ্ন তাঁকে এভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পেতাম না, যদিও তাঁকে দেখে মনে হয় যে তিনি বড় সহজ মানুষ, বড় ভালো। তিনি যখন কথা বলেন, তখন মনে হয় যেন কানে আসছে কোনো সংগীত।'

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনির মতন এই সব কথাবার্তা এসে পৌঁছলো আমাদের সম্পাদকের কানে ; অসুস্থ ও অদৃশ্য সেই গৌরবান্বিত কবির সম্পর্কে এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন আমাদের সম্পাদকের নিকটবর্তী একজন যাত্রীই। এর পর জাহাজটা যখন আমাদের রাজধানীর দিকে এগোতে লাগলো, তখন আমাদের সম্পাদক কবির সচিব বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে কথা ব'লে জানতে চাইলেন যে কবির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার পাওয়া সম্ভব হবে কিনা। জবাব এলো: 'অসম্ভব ; তিনি ভয়ংকর ক্লান্ত ; তিন দিন ঘুমোন নি ; তাপমাত্রার পরিবর্তন তাঁর খুব ক্ষতি করেছে। যদি একটু ভালো বোধ করেন তবে হয়তো বা বিকেলের দিকে সম্ভব হতে পারে ...।'

বিকেলবেলা শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্স্ট স্মিতমুখে আমাদের বললেন : 'রবীন্দ্রনাথ সুস্থতর বোধ করছেন এবং তাঁকে মন্তেভিদেওতে নমস্কার জানাবার জন্য *লা নাসিয়ন* তাঁদের একজন সম্পাদককে পাঠিয়েছেন এ কথা শুনে স্পৃষ্ট বোধ করেছেন। তাঁর একটিই অনুরোধ আছে: যদি ক্লান্তিবশতঃ সাক্ষাৎকার মাঝপথে বন্ধ ক'রে দিতে হয়, তা হলে তাঁকে যেন মাপ করেন।'

॥রবীন্দ্রনাথের মূর্তি॥

আমরা প্রবেশ করলাম। তিনি শয্যায় শয়ান, একটা ভারী ওভারকোটে ঢাকা তাঁর শরীর, পায়ের উপরে একটা কম্বল। তাঁর সেই আশ্চর্য মাথাটা— যে-মাথা আপনিই এত সুন্দর যে প্রতিকৃতি-আঁকিয়েরা তাকে আদর্শায়িত করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি— বিশ্রাম করছে ক্যাবিনের একটা কোণের সামনে একটা বড় বালিশের উপরে। সাদা দাড়ি এবং কোঁকড়া সাদা চুলের রাশি ঘিরে আছে তাঁর অভিজাত বাদামী মুখমণ্ডল; ঘন কালো চোখদুটিতে এমন একটি স্নিগ্ধ প্রকাশভঙ্গি, যাকে কখনো ভুলে যাওয়া অসম্ভব। এই স্নিগ্ধ চোখদুটির দৃষ্টি বড় গভীর ও সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত। গভীরভাবে প্রশান্ত বটে তাঁর মুখমণ্ডলও, যেখানে একটিও বলিরেখা দৃষ্টিগোচর নয়। উন্নত, অভিজাত ললাটে নেই ভ্রূকুঞ্চনের লেশমাত্র; কুঞ্চিত শ্বেত কেশগুচ্ছের নীচে কপালটা যেন উপরে উঠছে তো উঠছেই। সমগ্র আননে এক গরীয়সী বিভা।

কোনো কবির সম্পর্কে যদি এ কথা বলা যায় যে তাঁর মুখমণ্ডলের মধ্যেই মূর্ত তাঁর কবিতা, তা হলে তা নিঃসন্দেহে আর কারও ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয় যতটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে। রজনীর, শান্তির, নীরবতার যেসব স্বপ্নোপম চিত্র, গীতিকবিতার যেসব ঐন্দ্রজালিক পুষ্প তিনি আশৈশব অবিরাম সৃষ্টি ক'রে আসছেন, সে-সমস্তই যেন ঘিরে আছে ক্যাবিনের কোণে বালিশের উপরে ন্যস্তমস্তক এই মূর্তিকে।

এবং এই মূর্তি যখন কথা বলে,— সেই সংগীতের সঙ্গে, যা সেই অজ্ঞাতনামা যাত্রীটিকে মুগ্ধ করেছিলো, যা তাঁর প্রত্যেকটি বাক্যাংশকে পরিণত করে গীত শ্লোকে,— তখন এক তীব্র আবেগের শিহরণ অনুভব না ক'রে পারা যায় না। সে এমন এক সংগীতের সুর, যা কিনা আসলে দূরস্থিত কোনো-কিছুর দ্বারা গুষ্ঠিত। সহস্রবর্ষবয়স্ক, ভাস্বর, সমগ্র প্রাচীই যেন তার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমুদ্রদের পার হয়ে এসেছে।

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্স্ট আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন।

নিপুণভাবে নির্বাচিত এমন দু'-তিনটি প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করতে হবে, যাদের জবাবে মিলবে ভাবনাদের সব চাইতে মূল্যবান কোনো সমন্বয়; সেই তাড়নাতেই রবীন্দ্রনাথের সামনে তুলে ধরলাম এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাটি : 'পাশ্চাত্য সভ্যতা কি এখন অবক্ষয়ের পথে?' তাঁর একাধিকবার ইয়োরোপপর্যটন, পুবের আর পশ্চিমের স্বার্থদের মেলাবার জন্য তাঁর বহু-আলোচিত প্রচার, তাঁর শান্তির স্বপ্ন, তাঁর সেই বৌদ্ধভাবাপন্ন

অতীন্দ্রিয়বাদ যা তাঁকে তৎসত্ত্বেও মানুষের পার্থিব কল্যাণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে দেয়, সে-কাজে বাধা দেয় না : এই সব কারণে আমরা প্রত্যাশা করলাম এমন একটা জবাব, যা ঐ বিষয়ে আজকালকার বহু-উচ্চারিত সাহিত্যিক ভাবনাদের থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন হবে।

সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বললেন তা তারিফ করবার মতো। কথা বললেন তাঁর প্রশান্ত চিন্তাকে থেকে থেকে এমন কোনো বাক্‌প্রতিমার উপরে ন্যস্ত ক'রে, যে-প্রতিমা তাঁর অমর কবিতাদের মধ্যে দেদীপ্যমান বাক্‌প্রতিমাদেরই সহোদরা বটে। ধীরে ধীরে, না থেমে, উক্ত বিষয়ে তিনি আমাদের যা-কিছু বলতে আরম্ভ করলেন সে-সমস্তই তুলে ধরতে চেষ্টা করছি, যদিও এ প্রতিবেদন তাঁর বলার মতো উজ্জ্বল হবে না। তিনি যেই কথা বলা শুরু করলেন, অমনি তাঁর মুখমণ্ডলে হলো দ্রুত প্রাণসঞ্চার, তাঁর রোগক্লিষ্ট সত্তার ভূলুণ্ঠিত শক্তি ফিরে পেলো নবজীবন, এবং তাঁর সবল আধ্যাত্মিকতা জয়লাভ করলো নিশ্চল শরীরের ক্লান্তির উপরে।

॥ইয়োরোপের দুটি ডানা আছে : একটি সবল, অন্যটি নিপতিত॥

'কতগুলি চিহ্ন থেকে বোঝা যাচ্ছে,' বললেন তিনি, 'যে ইয়োরোপের সভ্যতার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

'কোনো জীবদেহ যখন তার বিকাশের পূর্ণতায় পৌঁছয়, তখন তার মধ্যে জমতে থাকে কোনো-একটা বিষাক্ত পদার্থ। কেননা সে-দেহ পৌঁছে গেছে বার্ধক্যে। তখন সেই শরীর নিজেই নিজের ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু ক'রে দেয়। এটা তো প্রত্যেক মানুষই তার নিজের মধ্যে যাচাই ক'রে নিতে পারে। পরাক্রান্ত ইয়োরোপীয় মহাদেশও জীবদেহদের মতন বিষাক্রান্ত, পরিশ্রান্ত, সন্দেহবাদী হতে আরম্ভ করেছে। এখনই সে হারিয়েছে তার প্রত্যয়। প্রত্যয়ের অভাব : এটা হচ্ছে দুর্বলতার একটা অভ্রান্ত লক্ষণ, মৃত্যুর ঘোষণা।

'এই ঘটনাকে আপনি আপনার নিজের মধ্যেই যাচাই ক'রে নিতে পারেন। যতদিন আপনার প্রত্যয় থাকবে, ততদিন আপনি যা শ্রেয়ঃ তার জন্য, মানবনিয়তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো মহৎ লক্ষ্যের জন্য লড়তে থাকবেন। কিন্তু যখন নিজেকে একজন প্রত্যয়ভ্রষ্ট শুভনাস্তিকে পরিণত করবেন, তখন তিক্ত হয়ে যাবেন ; যখন সব-কিছুকে উপহাস করতে আরম্ভ করবেন এবং ভালো আর মন্দের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখতে অসমর্থ হবেন, তখন নিজেকে বোঝাবেন যে যা-কিছু শিখেছেন সে-সমস্তই মূল্যহীন, যে ঐ-ঐ অবস্থায় বরাবরই ঘটেছে অবক্ষয়জনিত বিবিধ সর্বনাশ, দেখা গেছে ঐ একই সব লক্ষণ।

'অবক্ষয় যখন অতটা এগিয়ে যায়, তখন আর কোনো ক্রমোন্নতির মাধ্যমে নববিবর্তনে বা নবযুগে পৌঁছনো যায় না। তখন অন্য রাস্তা লাগে।

'যেমন, হয়তো উন্মেষ হয় কোনো নূতন প্রতিভার, ঘ'টে যায় একটা আকস্মিক বিপ্লব, বদলে যায় মানুষদের মূল্যনির্ণায়কগুলি, এবং বর্তমান সময়ে ঠিক যে-ব্যাপারটির সম্ভাব্যতা আগে কখনো ভাবা যায় নি সহসা ঘ'টে যায় ঠিক তাই।

'আমার মনে হয় যে একটা বিরাট ভাবনাপরিবর্তনের সময় এসেছে। কেননা মানুষের বুদ্ধি যখন ধাক্কা খেয়ে কোনো চরম পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছয়,— যেমন ঘটেছে বর্তমান ইয়োরোপে,— তখন তা ডাক পাঠায় নিহিত শক্তিদের উদ্দেশে, নিজের ভিতর থেকে টেনে বার করে তার শ্রেষ্ঠ রসদগুলিকে, পরিহার করে সেই অবহেলাসর্বস্ব এবং আলস্যশাসিত অস্তিত্বকে, যার জন্য তার পতন ঘটেছিলো।

'ইয়োরোপ— এবং এখানে ইয়োরোপ বলতে বোঝাচ্ছি সমগ্র পশ্চিমকেই— পৌঁছেছিলো ঐহিক সমৃদ্ধির একটা আধিক্যে, একটা বিত্তপ্রাচুর্যে; এবং এই সমৃদ্ধি, এই প্রাচুর্য তাকে নিমজ্জিত করেছিলো আলস্যে, মানুষের মহৎ লক্ষ্যের প্রতি ঔদাসীন্যে।

'অর্থাৎ সে ক্রমাগত তার আস্থা স্থাপন ক'রে গেছে জড়সম্পদে, চিত্তের ঐশ্বর্যে আর শক্তিনিচয়ে নয়।

'ইয়োরোপ বড় বেশী মূল্য দিয়েছে যা-কিছু বাহ্য আর প্রাতিভাসিক সে-সমস্তকে, জড়সামগ্রীকে।

'আমার ধারণা এটাই ঘটেছে, এবং পশ্চিম যতদিন এটা না বুঝবে যে এ-জাতীয় ঐহিক সমৃদ্ধি তাকে প্রকৃত অর্থে সামনের দিকে চালিত করে না, ততদিন তার যথার্থ প্রগতি হবে না, ততদিন তার জীবনটা হবে একটা বৃত্তকে ঘিরে ঘুরপাক খাওয়ার মতন, সর্বদা সেই একই বৃত্তের নিষ্ফল প্রদক্ষিণ। তার কেবল থাকবে অগ্রগতির একটা অধ্যাস। সে দেখবে যে বস্তুতঃ তা থেকে তার সাংস্কৃতিক উচ্চতার এক তিল বৃদ্ধি হচ্ছে না। সে কেবল জিনিসের উপরে জিনিস চাপিয়ে যাবে। আজকের দিনে এই ব্যাপারটাই গভীরভাবে বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন করছে ইয়োরোপের মনীষীদের, রোম্যাঁ রলাঁর মতো সেই সব মানুষদের, যাঁরা মনুষ্যজাতির নবজন্মের জন্য ব্রতী হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। এমন হতে পারে যে ইয়োরোপ যে-ভারসাম্য হারিয়েছে তা ফিরে পাবে। ইয়োরোপ তা হারিয়েছে, কেননা আমাদের সকলের মতোই ইয়োরোপেরও দুটি ডানা আছে। তার দ্রব্যসামগ্রীগত ক্ষমতা হচ্ছে একটি ডানা, আর তার চিত্তের ক্ষমতা হচ্ছে তার অপর ডানা।

'কেবল একটি ডানার উপরে নির্ভর করার জন্য সে তার ভারসাম্য হারিয়েছে। ভারসাম্য ফিরে পাবার মুহূর্তটির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

'মধ্যযুগে সর্বদাই সে তার ভারসাম্যকে অন্বেষণ করেছে, থেকে থেকে কখনও এই ডানাটির দিকে কখনও অন্য ডানাটির দিকে ঝুঁকেছে, কখনও একদিকে কখনও অন্যদিকে হেলেছে। সেটা ছিলো জড়ের বিরুদ্ধে চিত্তের এবং আত্মার বিরুদ্ধে শরীরের সংগ্রাম। তখন তার ধর্মীয় প্রত্যয় ছিলো এবং ধর্মকে হারানোর মুহূর্ত পর্যন্ত সে ছিলো জীবন্ত, প্রাণবন্ত। তার পর সে বিজ্ঞানকে অনুমতি দিলো প্রত্যয়ের জায়গাটা দখল ক'রে নিতে, প্রত্যয়ের দখলে যে-জায়গাটা ছিলো তার গোটাটাই অধিকার ক'রে নিতে। এর ফলে

সে আবশ্যিকভাবেই হারিয়ে ফেললো তার ভারসাম্য। এখন আগত সেই লগ্ন যখন ব্যাপারটা তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। চিত্তের স্বার্থগুলি যাতে ফিরে আসে এবং পুনরায় তাদের স্বাধিকার স্থাপন করে সেইটে দেখতে হবে।'

॥রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করছেন যে তিনি প্রকৃত সভ্যতার জন্য লাতিন আমেরিকায় লড়বেন॥

এ পর্যন্ত ব'লে রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে তাঁর সংগীতময় কণ্ঠস্বর এই উচিত ও গভীর বিষয়গুলিকে নিয়ে অবিরাম গান গেয়ে চলেছে।

তার পর সেই একই সহজ ভঙ্গিতে তিনি যা বললেন তাকে বলা চলে এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী।

'কিন্তু ওখানে, ইয়োরোপে, সভ্যতার যদি পড়তি এসে গিয়ে থাকে, তা হলে এখানে তো ঘটতে পারে তার নবজন্ম। আপনারা একটি নূতন জাতি, এবং এটা অসম্ভব নয় যে আপনাদের মধ্যে অর্সেছে ইয়োরোপীয় সভ্যতার উত্তরাধিকার, যা আপনাদের কাছে এনে দিচ্ছে তার নিজস্ব, অন্তরতম সব রসদ, যেগুলি এখনও পূর্ণবিকশিত হয় নি, এবং এভাবে, ঐ সত্তার তথা আপনাদের নিজেদের সম্পদের মাধ্যমে, সম্ভবপর ক'রে তুলছে একটি নিখুঁত সমন্বয়কে।

'আমি এই নূতন দেশগুলিতে আসছি এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দেবার আগ্রহ নিয়ে, তাদের অনুরোধ করতে যে তারা যেন প্রকৃত সভ্যতার পক্ষ অবলম্বন করে, যেন ওখানকার একঝোঁকা প্রবণতাকে বর্জন ক'রে দুটো ডানাকে সমানভাবে মেলে দিয়ে ওড়ে।

'ইয়োরোপ দুর্বল হয়ে পড়েছে। খরচ ক'রে ফেলেছে তার চিত্তের সব রসদ এবং খুইয়েছে তার প্রাচীন সংবেদনশীলতাকে।'

রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনাটিকে আরেকটু বিশদ করেন এবং আর্জেন্টিনার বর্তমান সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন করেন; তিনি জানতে চান এই দেশের বিদেশী জিনিস বুঝবার ক্ষমতা কতটা,— হুবহু নকল না ক'রে, অনুকরণ না ক'রে এ দেশ বিদেশের শিক্ষার সদ্ব্যবহার করতে পারে কিনা।

যখন তাঁকে জানালাম যে শিল্পকলার নব-নব স্বপ্রকাশ সম্পর্কে আর্জেন্টিনায় তীব্র কৌতূহল বিদ্যমান, তখন তিনি আনন্দে সস্মিত হলেন।

॥রবীন্দ্রনাথ বুয়েনোস আইরেসে বঙ্গীয় চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন॥

'তা হলে,' শুধালেন তিনি, 'বাংলার চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যাবে এখানে? ভাস্কর্যের ও চিত্রকলার বহু মূল্যবান নিদর্শন কলকাতায় জড়ো করেছি আমি। সে-সবই বাঙালী শিল্পীদের হাতের কাজ,— যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই বড় জাতের শিল্পী। সবসুদ্ধ সে এক অসাধারণ সংগ্রহ, যা দর্শকদের অবাক করবে,

বিস্মিত করবে। ভাবছিলাম সে-সব কাজ প্যারিসে পাঠাবো, সেখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবো। কিন্তু হয়তো সেগুলিকে কলকাতা থেকে বুয়েনোস আইরেসেই পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেবো। হ্যাঁ, ঠিক, বাংলার চিত্রভাস্কর্যের যে-আত্মিক ও শৈল্পিক অজানা ঐশ্বর্য আছে তাকে এখানে তুলে ধরাই বেশী সমীচীন, বেশী কার্যকর হবে।'

॥দাসভাবাপন্ন অনুকরণ লাতিন আমেরিকার সভ্যতার উপরে কলঙ্কের মতো পড়তে পারে॥

এশিয়া-ইয়োরোপের শিল্পকলা আমরা কতটা বুঝতে পারি সে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বললেন যে কোনো-কিছুকে অনুকরণ করার চেষ্টা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

'আপনারা তরুণ,' তিনি বললেন আমাদের, 'যা এখনই বিদ্যমান, যা এখনই তৈরি করা হয়ে গেছে, তাকে কেন নকল করতে যাবেন? কেননা ও পথে তো আপনারা কেবল পৌঁছবেন প্রতিমূর্তি নির্মাণে। তা ছাড়া নকলনবিসির মাধ্যমে মূলের সমকক্ষতায় পৌঁছনো এক দুরূহ ব্যাপার। দেখবেন যেন একটা নূতন দেশের বর্ধিষ্ণু সভ্যতাব উপরিভাগে কলঙ্কের দাগ না প'ড়ে যায়।

'বরং দেখতে হবে যাতে সভ্যতার এই শক্তি নিজেকে জীবন্ত, প্রাণস্পন্দিত রাখতে পারে। তাই অন্যান্য সভ্যতার কাছ থেকে প্রেরণাদাত্রী চালিকা শক্তিদের আহরণ করতে হবে, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে, তারা যে-সব জিনিস সৃষ্টি করেছে তাদের আত্মস্থ করতে হবে, কিন্তু সর্বদাই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে নিতে হবে নিজস্ব আত্মাকে, আপন জাতির চরিত্রকে। এক দিক থেকে দেখলে সভ্যতা হচ্ছে এমন একটা উত্তরাধিকার যার যোগ্য হয়ে ওঠা দরকার, যার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক অবহিত হওয়া দরকার।'

॥রবীন্দ্রনাথ কলকারখানার আর্জেন্টিনাকে জানতে আগ্রহী নন, জানতে চান আর্জেন্টিনার আত্মাকে॥

এর পর রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনাকে গভীরভাবে জানবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

'কিন্তু,' বললেন তিনি, 'আমি এখানে যা দেখতে আগ্রহী তা এ দেশের যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি নয়, আর্জেন্টিনার আধুনিকীকৃত রূপ নয়, যা বাহ্য, যা বাইরে থেকে নেওয়া, তা নয়। তার অর্থনৈতিক উন্নতি কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা দেখতেও আমি আগ্রহী নই। ব্যাকুলভাবে জানতে চাই তাকে যা এ দেশের একেবারে নিজস্ব, খাঁটি জিনিস। জানতে চাই দেশজ রীতিনীতিকে, সেই সব জিনিসকে যাদের মধ্যে জাতির চিত্ত স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে। আমি এই দেশের জলমাটির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। জানতে চাই এখানকার ক্ষেতখামারকে, পশুচারণভূমিকে; দেখতে চাই এ দেশের নিজস্ব নৃত্যকলা, শুনতে চাই জনপ্রিয় গান, করুণ প্রেমগীতিকা, সেই সংগীত যা জন্ম নিয়েছে এখানকার প্রান্তর-পল্লী-

পর্বত থেকে। জানতে চাই দেশটাকেই, অন্য দেশের সঙ্গে এ দেশের যে-ব্যাপারগুলি মিলে যায় সেগুলিকে নয়; দেশের সত্তাকে, তার পরিস্থিতিকে নয়।'

॥রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনাসংক্রান্ত বইপত্র পড়েছেন॥

ভারতের বিস্ময়কর দূত ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে আমাদের দেশের ক্ষেতখামার, পশুচারণভূমি আর প্রেমের গানের কথা শোনা; সুদূর প্রাচ্য দেশে ব'সে ব'সেই আমাদের আর্জেন্টিনার রীতিনীতি বিষয়ে তাঁর কল্পনা কিভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাঁর গভীর চোখদুটিতে তার লিপি পাঠ করা; আমাদের মাটির কাছাকাছি আসবার জন্য, আমাদের মৃত্তিকার আত্মাকে স্পর্শ করবার জন্য তাঁর যে-তীব্র ব্যাকুলতা তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া: এ-সমস্তই নিশ্চিতভাবে আমাদের পক্ষে এক প্রগাঢ়, অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

তাঁকে না শুধিয়ে পারলাম না, আর্জেন্টিনার জীবন সম্পর্কে এত খবর তিনি কিভাবে সংগ্রহ করেছেন, কিভাবে ঘটেছে তাঁর এই কৌতূহলের উন্মেষ।

'ইংরেজীতে লেখা ডব্লিউ. এইচ. হাডসনের বইপত্র প'ড়ে। তাদের একটির নাম হচ্ছে *প্যাটাগনিয়াতে অলস দিনগুলি*। আরেকটি বইয়ে বর্ণিত হয়েছে পাম্পা-প্রান্তরের নিসর্গদৃশ্যাবলী এবং রীতিনীতি। তিনি একজন বিখ্যাত পক্ষিবিদ্যাবিশারদ। লণ্ডনের কেন্‌সিংটন উদ্যানে তাঁর উদ্দেশে একটি সুন্দর স্মারকসৌধ রয়েছে, কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের একজন। শুনেছি তিনি আর্জেন্টিনাতে জন্মেছিলেন, অন্ততঃ তাঁর জীবনের বৃহদংশ কাটিয়েছিলেন এই দেশে, যার মর্ম তিনি বুঝেছিলেন তার প্রাকৃতিক রূপ আর তার কাব্যের মধ্যে দিয়ে। অপিচ তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজ, পাখীদের বিষয়ে তাঁর যাবতীয় অন্বীক্ষা: সবই হচ্ছে যুগপৎ জ্ঞানীর এবং কবির কর্ম। হ্যাঁ, ঠিক, হাডসনই আমার কাছে অনাবৃত করেছেন আর্জেন্টিনার মাটিকে।'

একটি নীরবতা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হাসির আভাস; হাডসনের বই পড়া তাঁর বিশাল চিত্তে যে-সব স্বপ্নোপম দর্শন রেখে গেছে, নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করছেন তাদেরই।

॥পেরু থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনায় কিছু সময় কাটাবেন॥

'হ্যাঁ,' ব'লে চলেন তিনি, 'এই দেশটাকে জানতে হবে আমার। এখন তো আমি পেরুর পথে। আর্জেন্টিনায় বেশী দিন থাকতে পারবো না। কিন্তু পেরু থেকে ফিরে এলে পর আর্জেন্টিনায় কিছু সময় থাকতে পারবো এটা খুবই সম্ভব।'

॥গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন দুই ভিন্নমুখী ধারা॥

এর পর আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম সেই বিখ্যাত মরমী বিপ্লবী সম্পর্কে, যিনি ভারতকে আন্দোলিত করছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বললেন যে গান্ধীর সঙ্গে বেদনাদায়ক এক আলোচনার পর থেকে গত তিন বছর ধ'রে ওঁরা দুজনে চিরকালের জন্য আলাদা হয়ে গেছেন এবং যে-যার ক্রিয়াকলাপকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করছেন।

'গান্ধী হচ্ছেন গিয়ে হিংসা, এবং আমি মনে করি যে মানুষের পক্ষে কেবল মিলন ও প্রেমই সঙ্গত।

'আভিমুখ্য এবং চিত্তের দিক দিয়ে গান্ধীর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে। ইয়োরোপব্যাপী এক বিস্তৃত পর্যটনের সময়ে আমি সর্বত্র গান্ধীকে চিহ্নিত করেছিলাম ভারতীয় চিত্তের একটি উজ্জ্বল প্রতিনিধিরূপে। সেই বিজয়াঙ্কিত পর্যটনের পর যখন স্বদেশে ফিরে এলাম, তখন মুখোমুখি হলাম আমার জীবনের সব থেকে বড় এবং সব থেকে বেদনাদায়ক আশাভঙ্গের সঙ্গে। দেখলাম যে গান্ধীর বাণী দ্বারা আন্দোলিত জনগণ ইয়োরোপের যাবতীয় প্রতীককে পোড়াচ্ছে,— যা-কিছুরই ইয়োরোপীয় সভ্যতা বা রীতিনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রয়েছে, তাকেই। দেখলাম যে তাদের প্রাণিত করছে হিংসাই।

'আমরা দুজনে মিলিত হয়ে কথাবার্তা বললাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার যে-দৌত্য তা কি চিত্তের, না পশুশক্তির ? গান্ধী আমাকে বললেন যে তিনি নিশ্চিত যে ইয়োরোপীয় সব-কিছুকে নষ্ট করা দরকারী,— বিজ্ঞান তথা রীতিনীতি, পশ্চিমের সঙ্গে যা-কিছু সম্পৃক্ত সে-সমস্তই। দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক হয়েছিলো সেই আলোচনা। অবশেষে আমি তাঁকে বললাম, আপনার কর্মসূচী রাজনৈতিক; আমি হচ্ছি কবি এবং শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ নই। এবং আমি তৎক্ষণাৎ সংকল্প করলাম যে পশ্চিমের সঙ্গে প্রেমের এবং মিলনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করবো। ঐ ক্লেশকর আলোচনার পরের দিন জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত একটি ভাষণে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করলাম, আমি যে গান্ধীর নীতির বিরোধী তা বোঝালাম।'

॥রবীন্দ্রনাথ, পরিত্যক্ত ও একাকী॥

'আমার বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলো এক বিরাট জনতা। তারা তখনও জানে না আমি কী বলবো। আমার প্রেমবিষয়ক ভাবনাগুলিকে বিশদ ক'রে বোঝালাম, হিংসার মধ্যে নিহিত যে-স্ববিরোধ তাকে চেনালাম, করলাম দিকবদলের প্রস্তাব।

'আমার কথাদের স্বাগত করলো এক মৃত্যুতুল্য নীরবতা। সেই বিশাল জনসমাবেশের মধ্যে থেকে আমার সপক্ষে উত্থিত হলো না একটিও করতালি। অনুভব

করলাম যে আমি আমার নিজের দেশে একেবারে একা এবং পরিত্যক্ত। এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার এ নিয়ে তৃতীয়বার হলো।

'ফিরে এলাম সেই বিদ্যালয়ে, যার জন্যে বিলিয়ে দিয়েছি আমার যা-কিছু টাকাকড়ি এবং আমার পত্নীর গহনাপত্র। সেখানে প্রতিদিন শিক্ষকতা ক'রে যেতে লাগলাম এবং একই সঙ্গে উদ্যোগী হলাম বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠায়,— সেই সংস্থা, যা প্রথমে প্রাচীর বিভিন্ন ভাববাদী ও ধর্মীয় ধারাগুলির মধ্যে সমন্বয় অন্বেষণ করে, তার পর দ্যাখে কিভাবে মেলানো যায় প্রাচী আর প্রতীচীকে।'

এবং এখানেই শেষ হলো আমাদের সাক্ষাৎকারের, এই উদার এবং সুন্দর আশা দিয়ে, যে-আশা গান গাইছিলো রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এবং ঝলমল করছিলো তাঁর মুখমণ্ডলে।

আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রনাথের সমাগমকে উপলক্ষ্য ক'রে সেখানে যে-প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, এখানে তার একটি চিত্তস্পর্শী সাক্ষ্য পাই আমরা। লাতিন আমেরিকায় কবির খ্যাতি তখন তুঙ্গে। এই আগন্তুক যে একজন মহাকবি, প্রাচীর একজন বিশেষ দূত, এ বিষয়ে এই সাংবাদিকের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

এবং ইনি রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে সর্বাগ্রে যে-বিষয়ে কিছু কথা শুনতে চান, সেটি হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট। সময়টা মনে রাখতে হবে: তার ছ' বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকৃত সংকটবিশ্লেষণটি মৌল, এবং এরই মাধ্যমে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে তাঁর শিক্ষকের ভূমিকাকে। যে-সংকটের কথা তিনি এখানে বলেছেন, তা মোটেও দূর হয়ে যায় নি, বরং পশ্চিম ছাপিয়ে তা সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছে, তীব্রতর হয়েছে পারমাণবিক প্রলয়ের সর্বগ্রাসী সম্ভাবনায়। সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই সংকটের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চেতনা বেড়েছে, তবে এই চেতনার লালনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে যে-পরিশ্রম করেছিলেন, তা আজও যথেষ্ট স্বীকৃতি পায় নি। এই অনাদরের জন্য অনেকাংশে দায়ী আমাদেরই চিত্তদৈন্য। কোনো মৌল বিশ্লেষণ পেশ করতে গেলে যে-সৎসাহস বা দুঃসাহস লাগে, তা প্রায়ই আমাদের থাকে না; যার মধ্যে সে-গুণ দেখতে পাই, তাকে আমরা ঈর্ষা করতে আরম্ভ করি। উপরন্তু সে-বিশ্লেষণ যদি পরিবেশিত হয় একজন কবির সূক্ষ্ম সংবেদন, আপসবর্জিত সত্যভাষণ এবং রূপময় বাক্‌শক্তির সহায়তায়, তখন সে-উচ্চারণে যে-তীব্রতার ছোঁয়া লাগে, তাকে আমাদের গতানুগতিক, অর্ধসত্য ও মিথ্যায় অভ্যস্ত কান সহ্য করতে পারে না। আমাদের চিন্তার আর অনুভবের দৈন্যকে যা হাট ক'রে দেয়, তার দ্বারা আমরা অপমানিত ও বিপন্ন বোধ করি, এবং তাকে খর্ব করার চেষ্টায় তাকে করি পাল্টা আক্রমণ। পশ্চিমে দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মূল্যহ্রাসের উৎস বোধ হয় এইখানেই, এই মনস্তত্ত্বের মধ্যে।

১৯২৪-এর নভেম্বরের মধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশই রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়ে গেছে,— ইয়োরোপে, উত্তর আমেরিকায় এবং এশিয়ায়,— কিন্তু রাশিয়া তখনও দেখা হয় নি। বিত্তপ্রাচুর্যের বিপদের উপরে তিনি যে-জোর দিয়েছেন, তার মধ্যে কেবল ঐতিহ্যিক বৈরাগ্যধর্মের ছায়াকে দেখলে তাঁর প্রজ্ঞাকে খাটো করা হবে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হোক, সবাই ভালোভাবে বাঁচুক, সুশিক্ষা পাক, এটা তাঁর খুবই কাম্য ছিলো। নয়তো গ্রামোন্নয়ন আর শিক্ষা নিয়ে তিনি অত মাথা ঘামাতেন না, নিজের ছেলেকে কৃষিবিদ্যা পড়তে আমেরিকায় পাঠাতেন না, এল্‌ম্‌হার্স্টকে সুরুলে টেনে আনতেন না, বা এর বছরকয়েক বাদে রাশিয়ায় গিয়ে মানুষের দুর্গতি দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা দেখে উত্তেজিত হতেন না। রবীন্দ্রনাথ জোর দিচ্ছেন বিহঙ্গের দুটি ডানার মধ্যে সমতা আনার প্রয়োজনের উপরে। একটিকে অবহেলা ক'রে কেবল অন্যটির উপরে ভর করলে যে-বিপদ আসে সে-দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন তিনি। দ্রব্যশক্তিকে অবহেলা ক'রে কেবল চিত্তশক্তির জোরে উড্ডীন হবার চেষ্টাও সমানভাবে বিপজ্জনক।

রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ এখনও যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমের গণমাধ্যমগুলিতে অনবরত যে-প্রতিন্যাস প্রচারিত হতে দেখি (বা শুনি) তাতে অধিকাংশ সময়েই সভ্যতাবিহঙ্গের একটি ডানার অবস্থাকে নিয়েই ব্যস্ততা থাকে। তৈজসপত্রের প্রাচুর্য স্বতঃই খুব ভালো জিনিস, তার তিলমাত্র অভাব স্বতঃই খুব খারাপ ব্যাপার : ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাটাই বারবার বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রত্যয়ের অভাবজনিত বিপদের কথা বলেছেন, সেখানে প্রত্যয়কে সংকীর্ণ অর্থে ঐতিহ্যিক ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে সমীকৃত ক'রে না দেখে বৃহত্তর অর্থে নেওয়াই সঙ্গত। ঈশ্বরের ধারণা মানুষের উচ্চতম বাসনাদেরই অভিক্ষেপ, এইরকম কোনো সংজ্ঞার্থ মেনে নিলে নিরীশ্বরবাদী মানবতন্ত্রীদের পক্ষেও রবীন্দ্রনাথের কথায় সায় দেওয়া সম্ভব। শাস্ত্রকথিত দেবতায় বিশ্বাস করি আর না-ই করি, মানুষে আমাদের আস্থা রাখতেই হবে, যে-পৃথিবীতে বাস করি তার প্রতি মমতা বজায় রাখতে হবে, আমাদের উত্তরসূরিরা যাতে একটি বাসযোগ্য পৃথিবীকে পায় সে-লক্ষ্যে তন্ময় হতে হবে। একে বলা চলে ঐতিহ্যিক ধর্মের বদলে মূলগত অর্থে এক নূতন ধরনের ধর্ম ('যা ধারণ করে'), অধুনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক এবং জরুরী জীবনদর্শন। রবীন্দ্রনাথ যদি বিজ্ঞানবিরোধী হতেন, তা হলে হাডসনের অত ভক্ত হতেন না, তবে হাডসনকে তাঁর বিশেষভাবে ভালো লেগেছে এই কারণেই যে তিনি যুগপৎ বিজ্ঞানী এবং কবি। রবীন্দ্রনাথ ঐক্যবদ্ধ বেদিতার সন্ধানী ছিলেন। তিনি জানতেন যে পুরাতন প্রত্যয় যদি অকেজো হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তার জায়গায় কেবল সংকীর্ণ সংজ্ঞার্থের বিজ্ঞানকে বসালে যথেষ্ট হবে না। বিজ্ঞান, কবিদৃষ্টি, নীতিবোধ, মনুষ্যোচিত প্রেম ও প্রত্যয়: নানা উপাদানে গঠিত একটি সুস্থ, সবল, সুন্দর ও কালোপযোগী বিশ্ববীক্ষারই স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

আর্জেন্টিনার জাতীয় সত্তার সারকে জানবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা আয়রনিতে মণ্ডিত। কেবল যে অসুস্থতার জন্য এ ব্যাপারে তাঁর বাসনা পূর্ণ হয় নি তাই নয়।

আর্জেন্টিনা সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে তিনি গঠন করেছিলেন হাডসনের বই প'ড়ে। কিন্তু সে-দেশে যখন তিনি পৌঁছলেন, হাডসনবর্ণিত আর্জেন্টিনা তখন আর নেই, বদলে গেছে অনেকটাই। প্রান্তরপর্বত নিশ্চয় বদলায় নি, কিন্তু অনেকাংশে রূপান্তরিত হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক জীবন, ফলতঃ নাগরিকদের মানসিক জগৎও। তাঁকে থাকতে হলো রাজধানীর বিত্তবান-অধ্যুষিত নগর-উপকণ্ঠেই। হাডসনের (১৮৪১-১৯২২) ছেলেবেলাকার বুয়েনোস আইরেস তখন কোথায়? ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর জন্মের সময়েও (১৮৯০) সে-শহরের মধ্যে একটা বৃহৎ পল্লীর আদল ছিলো, কিন্তু উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরু থেকে আরম্ভ হয় তার অভূতপূর্ব বিবর্ধন। রবীন্দ্রনাথ যখন এসে পৌঁছলেন তখন বুয়েনোস আইরেস একটি বর্ধিষ্ণু, জনবহুল, আধুনিক বন্দর-শহর, যাকে নানাভাবে মদত দিচ্ছে একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌ভূমি। দোকানে-রেস্তোরাঁয়, সৌধে-উদ্যানে, পণ্যদ্রব্যে-বাণিজ্যে, যানবাহনে, বন্দরের জাহাজদের ভিড়ে একেবারে গমগম করছে সেই শহর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে আর্জেন্টিনার এই দিকটাকে জানতে তিনি আগ্রহী নন। আয়রনি এই যে সেই চলিষ্ণু অর্থনৈতিক জীবনই পুষ্ট করেছে শহরের সাংস্কৃতিক জীবনকে, যার 'ফীডব্যাক' তিনি পাবেন এবং এখনই পাচ্ছেন। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন ওকাম্পোর মতন অনুরাগী এবং বিদগ্ধ পাঠিকা। *লা নাসিয়ন*-এর করিতকর্মা সাংবাদিক জাহাজে উঠে এসে তাঁকে ইন্টারভিউ করছেন; বুয়েনোস আইরেসে বাংলা ছবির প্রদর্শনী হতে পারে এমন কথাও আলোচিত হচ্ছে। এ-সমস্ত কি সম্ভব হতো হাডসনের শৈশবের আর্জেন্টিনায়, তার প্রান্তরে, ক্ষেতখামারে, পশুচারণভূমিতে? আসলে বুয়েনোস আইরেস তখন লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক রাজধানী: তার কোলন থিয়েটারে ৩৫০০ লোক একসঙ্গে ব'সে অপেরা-ব্যালে-কনসার্ট উপভোগ করতে পারে। সেই সাংস্কৃতিক জীবনের জোরেই তো সে অভ্যর্থনা-কমিটি তৈরি ক'রে প্রাচ্য কবির পদার্পণের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে।

যে-দ্রব্যপ্রীতির কঠোর সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, বুয়েনোস আইরেসের বনেদী বিলাসী নাগরিকদের মধ্যে— ওকাম্পোর নিজস্ব সমাজে— তা একটু বেশী মাত্রাতেই ছিলো। পুরানো রীতির যে-সব ক্ষেতখামার এবং পশুচারণভূমি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, সেই ধরনের 'এস্তান্সিয়া' ভিক্তোরিয়ার ঠাকুর্দার ছিলো; সেখানে ভিক্তোরিয়া ছেলেবেলায় অনেক ছুটি কাটিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ধরনের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় নি, দেখেছেন মিরালরিওর বারান্দা থেকে প্লাতা নদীর সৌন্দর্য, শুনেছেন গিটারের সঙ্গে কিছু দিশি গানও। এস্তান্সিয়ার বদলে তাঁকে বেড়াতে যেতে হয়েছে চাপাদমালালের ইংরেজী কায়দার বাগানবাড়িতে, যে-বাড়ির আসবাববাহুল্য তাঁর একটুও ভালো লাগে নি, এবং সেই পালিশ-করা আসবাবে ভর্তি বাড়িতে ব'সে পড়তে হয়েছে বোদলেয়রের 'আসবাবের কবিতা'। বুয়েনোস আইরেসের সংস্কৃতিগর্বিত নাগরিকদের অত্যধিক ইয়োরোপনির্ভরতা, লাতিন-মার্কিন হিসাবে তাদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মপরিচয়বোধের অভাব: এগুলি তাঁকে হতাশ করে এবং সে-হতাশা তিনি রোম্যাঁ রলাঁর কাছে প্রকাশ করেন। ৭ই পৌষ তথা খৃষ্টীয় বড়দিন তাঁকে কাটাতে হয় মিরালরিওতে; সে-

সময়ে দ্রব্যসামগ্রীপ্রিয় সভ্যতার সান্নিধ্য এবং শান্তিনিকেতনের পরিপার্শ্বের অভাব তাঁর পক্ষে যে কতটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় এল্‌ম্‌হার্স্টের লিখে-রাখা বিশদ প্রতিবেদনে। নানা স্থত্র থেকেই জানা যায় যে বুয়েনোস আইরেসে ভক্ত পাঠকমণ্ডলী পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন খুশী হয়েছিলেন (অজানা শহরে অনুরাগী পাঠকগোষ্ঠী পেলে কোন্‌ লেখক খুশী না হবেন?) তেমনি নিরাশ হয়েছিলেন বিশ্বভারতীর আদর্শগুলির মর্ম উপলব্ধি করতে পারে এমন কোনো বিদগ্ধমণ্ডলীর সন্ধান না পেয়ে। হয়তো তাই, তাঁর সাধারণ ভক্তদের কানে সেই উচ্চ আদর্শগুলিকে পৌঁছে দেবার আশায় তিনি ডাক্তারী নির্দেশ অমান্য ক'রে, ওকাম্পো-এল্‌ম্‌হার্স্টের অনুনয়কে অগ্রাহ্য ক'রে অগণিত দর্শনপ্রার্থীদের জন্য দরজা খোলা রাখতেন।

বস্তুতঃ, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ইয়োরোপীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী অথচ নূতন ব'লেই যে সেখানে ভারসাম্যযুক্ত সভ্যতার উদয় হবে, এমন আশার যথোপযুক্ত ভিত্তি ছিলো না। কি উত্তরে কি দক্ষিণে 'নয়া দুনিয়া'র পত্তনই হয়— অন্ততঃ প্রধানতঃ— ইয়োরোপ থেকে আগত সেই সব মানুষদের দ্বারা, যারা ছিলো পুরাতন মহাদেশের অসচ্ছল, অনিশ্চিত, সমস্যাকীর্ণ জীবনের বদলে ঋদ্ধতর কোনো জীবনের সন্ধানে। সে-তাগিদে তারা আবিষ্কৃত নবভুবনের আদিবাসীদের উৎসাদন ক'রে অথবা কোণঠাসা ক'রে ফেলে দুটি বিশাল মহাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে অবারিতভাবে লুণ্ঠন করতে দ্বিধা করে নি। উত্তরে দাসব্যবসায়ীদের তথা দক্ষিণে স্বর্ণলোভাতুর স্পেনীয় বিজেতাদের নির্মমতা ইতিহাসের বিদিত তথ্যাবলী। নিকট অতীতের এই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে-সভ্যতা, তা তখনও (এবং এখনও) প্রবলভাবেই দ্রব্যশক্তিসন্ধানী, ক্ষমতাসন্ধানী, তৈজসপত্রবিলাসী। ইয়োরোপ থেকে আনীত ঐতিহ্যিক ধর্মবিশ্বাস এই সভ্যতার উগ্রতাকে লক্ষণীয়ভাবে নরম করতে পারে নি। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা নেহাৎ কম হয় নি, কিন্তু তাকে প্রধানতঃ কাজে লাগানো হয়েছে ভোগসামগ্রীদের তথা সামরিক শক্তির বিবর্ধনে, অর্থাৎ একটি ডানারই পোষণে, দ্বিতীয় ডানাটির স্বার্থকে হেলাফেলা ক'রে। রবীন্দ্রনাথ যে-ভারসাম্যের কল্পনা করেছেন তা বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীন জাতিদের পক্ষেই যথেষ্ট কঠিন, নূতন জাতিদের পক্ষে কঠিনতর। দুটো ডানার মধ্যে সমতা আনতে পারে যে-প্রকৃতিস্থ বিহঙ্গচেতনা, তার উন্মেষের জন্য প্রয়োজন জাতিদের মানসিক পরিণতি এবং দীর্ঘ সাধনা। সত্যি বলতে কি, সে-সাধনা এখনও মানবপ্রজাতির সম্মুখস্থ পায়ে চলার পথ, যে-পথ ধ'রে আরও অনেক দূর হেঁটে যেতে হবে।

নূতন দেশ আর্জেন্টিনায় সার্মিয়েন্তো-প্রমুখ উনিশ শতকী সুধীরা অপক্ব, উগ্র সভ্যতাকে পরিণত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ইয়োরোপীয় ধ্যানধারণার আত্মীকরণের মাধ্যমে জাতির মানসিক উন্নতির দিকে ঝুঁকেছিলেন। সেই উদ্যোগ তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে নিঃসন্দেহে আসে একটা আপেক্ষিক মানসিক উন্মুক্ততা, সংস্কৃতির দিকে একটা আভিমুখ্য, স্বয়ং ওকাম্পো যে-জলবায়ুর সন্তান। মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে যে-প্রেমের বার্তাকে সঞ্চারিত করেছিলেন তাকে স্বাগত করতে সমর্থ

ছিলেন অনেক সাধারণ পাঠকই। পত্রপত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে তাঁর শিক্ষকের ভূমিকাটাও অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনিবার্যতঃ ছিলো একটা বালসারল্য, গুরুর কাছ থেকে কোনো একটা সহজ, সংক্ষিপ্ত মন্ত্র পেয়ে যাবার বাসনার মতো। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে যে-সূক্ষ্মতা ছিলো, রণিত-অনুরণিত ছিলো আঞ্চলিক শিকড়বাকড়ের প্রতি প্রগাঢ় মমতার সঙ্গে বিশালাক্ষ বৈশ্বিকতার যে-সুস্বনতা, তার যথার্থ সমাদর করতে পারেন এমন বিদগ্ধ মানুষ খুব বেশী ছিলেন ব'লে মনে হয় না। সেভাবে তৈরি হয়ে উঠতে পারেন এমন একজন ছিলেন,— সেই নারী, যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হবার আগেই প্রুস্তের পথ আর রবীন্দ্রনাথের পথের পার্থক্য কোথায় তা ব্যাখ্যা ক'রে লিখে ফেলেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ পড়ার আনন্দ' নামে নিবন্ধটি (*লা নাসিয়ন*, ৯ নভেম্বর ১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ হাডসনবর্ণিত আর্জেন্টিনাকে পান নি, বা তাঁকে তা খুঁজতে দেওয়া হয় নি, পেয়েছিলেন এমন একজন নারীর সান্নিধ্য, যিনি ক্রমশঃ তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ালেন আর্জেন্টিনার প্রতীক, তার সত্তার সার। আর সেই নারীই তাঁর পরিণত জীবনে নিজেকে উৎসর্গ করলেন স্বদেশের চিত্তশক্তির উদ্বোধনের ব্রতে। পরবর্তী কালে সেই মহিলাকে এমন সব দিনের মধ্যে দিয়ে বাঁচতে হয়েছে যখন তাঁর দেশের সভ্যতার চিত্তশক্তির ডানাটি রীতিমতো আহত, রক্তাক্ত। সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলে রবীন্দ্রনাথ কী বলতেন? তবে ভাগ্যের একটি স্নিগ্ধ কৌতুক এই যে বুয়েনোস আইরেসে বাংলা ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করার সুযোগ তাঁর না মিললেও খোদ প্যারিসেই তাঁর নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী সম্ভবপর হয়েছে বুয়েনোস আইরেসের ঐ দুহিতারই সহায়তায়।

গান্ধীর আর তাঁর নিজের চিন্তার ও পথের পার্থক্য কোথায় তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাগুলি বলেছেন সেগুলিও বর্তমান সময়ে যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক। 'গান্ধী হচ্ছেন গিয়ে হিংসা': এই ঘোষণাটি প'ড়ে প্রথমে খানিকটা চমকেই উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, ছাপার ভুল হয় নি তো? কেননা গান্ধীকে হিংসার নয়, অহিংসার প্রতীক হিসাবে ভাবতেই তো অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু সাংবাদিক-উদ্ধৃত গোটা বাক্যটা পড়লে নিশ্চিত হওয়া যায় যে একটা ধাক্কা দিয়ে শ্রোতাদের চিন্তাকে জাগরিত করাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য : সমগ্র বাক্যে দুটো পথের একটা বৈপরীত্যের দিকেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হয়তো সাংবাদিকমহোদয়ের দ্রুত শ্রুতিলিখনের ফলে উদ্ধৃত বাক্যের প্রথমাংশে এসে গেছে একটা সূত্রোপম সংক্ষিপ্ততা, ভাবনার একটা শর্টহ্যাণ্ড। রবীন্দ্রনাথ আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন যে গান্ধী অহিংসার বাণী প্রচার করলেও কার্যতঃ তা জনতাকে প্ররোচিত করেছে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে; তা ছাড়া ইয়োরোপীয় সভ্যতার যাবতীয় প্রতীক পোড়ানোর মধ্যে নিহিত ছিলো এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা, এক ধরনের ডাইনী-পোড়ানো, যাকে মোহমুক্ত মন নিয়ে বিশ্লেষণ করলে পৌঁছতে হবে একটি বিরাট মানবগোষ্ঠীর প্রতি ঐ আচরণকারীদের বিদ্বেষে, অপ্রেমে, যে-মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে মেলানো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পার্থক্য নিয়ে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায়-প্রমুখ সুধীরা আলোচনা করেছেন। দুই মনীষীর চিন্তার সমন্বয় কিভাবে সম্ভব, কোনো বাঞ্ছিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন বা পুনর্গঠনের কাজে বহুসংখ্যক লোক যখন কাজ করতে আরম্ভ করে তখন তারা হিংসার অলিগলি দ্বারা পথভ্রান্ত না হয়ে প্রেমের পথ ধ'রে কিভাবে চলতে পারে: এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ও হবে, অতএব এ প্রসঙ্গে এখানে আর কথা বাড়াতে চাই না।

শেষে বলি যে আলোচ্য সাংবাদিক প্রতিবেদনটি যেমন আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রনাথের আগমনের অব্যবহিতপূর্বে তাঁর মনোজগতের একটি চমৎকার ছবি তুলে ধরে,— একটি সুনির্মিত তথ্যচিত্রের মতো,— তেমনি এর আরেকটা মূল্য আছে। আমার ধারণা ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো এই অজ্ঞাতনামা সাংবাদিকের (বা সাংবাদিকদ্বয়ের) লেখাটি দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার পর তিনি প্রথম যে-রবীন্দ্রবিষয়ক নিবন্ধটি লেখেন ('রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু কথা', 'আমিগোস্ দেল্ আর্তে'-নামক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, ১৫ নভেম্বর ১৯২৫ তারিখের *লা নাসিয়ন*-এ প্রকাশিত), সেখানে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে কবির আর্জেন্টিনাবাসকালে তিনি, ওকাম্পো, কোনো নোট নেন নি। কবির মৃত্যুর পর ১৯৪১ সালে তিনি যে-স্মারক প্রবন্ধটি লেখেন, সেটিও মূলতঃ ব্যক্তিগত প্রতিবেদন, স্মৃতি-চিঠিপত্র-রবীন্দ্রনাথপাঠ ইত্যাদির ভিত্তিতে লিখিত। কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি যে সংবাদপত্রগুলির লেখ্যাগারে পড়াশোনা করেন এবং ১৯২৪ সালের সাংবাদিক প্রতিবেদনগুলি নাড়াচাড়া করেন, তা স্পষ্ট, এবং সে-কথা তিনি নিজে স্বীকারও করেছেন (*সান ইসিদ্রোর বার্‌রাংকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বুয়েনোস আইরেস, ১৯৮৩, পৃঃ ৬৫)। এই পড়াশোনা তাঁর সাক্ষ্যদানে ছাপ রাখে। যেমন, তাঁর ১৯২৫ সালের প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের চেহারা সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই আছে যে তাঁর 'শারীরিক সৌন্দর্য পৃথিবীবিদিত'। ১৯৪১ সালের প্রবন্ধটিতে আছে একটি স্মরণীয় বাক্য, সুন্দর বর্ণনা হলেও একটি বাক্যেই সমাপ্ত। (পাঠকরা সেটির তর্জমা আমার *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*-তে পেয়ে যাবেন।) প্রতিতুলনায় তাঁর পঞ্চাশের দশকের প্রথমভাগে লেখা স্মৃতিকথায় (তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *আত্মজীবনী*-র চতুর্থ খণ্ডে) এবং ১৯৫৮ সালে লেখা রবীন্দ্রবিষয়ক বইটিতে এ বিষয়ে পাওয়া যায় প্রায় এক পাতা জুড়ে মনোহারী বর্ণনা। শেষোক্ত প্রতিবেদনটির একটি বাংলা রূপ পাঠকরা শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষের *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ*-এ পাবেন। সেই বর্ণনার পাশাপাশি উপরে অনূদিত 'রবীন্দ্রনাথের মূর্তি' নামধেয় অংশটি পড়লে মনে হয় যে *লা নাসিয়ন*-এর বর্ণনাটি ভিক্তোরিয়ার মনের মধ্যে একটা মডেলের মতন কাজ করেছে। নিঃসন্দেহে কতগুলি খুঁটিনাটি ভিক্তোরিয়ারই স্মৃতিরোমন্থনকারী লেখককল্পনার অবদান,— হাজার হোক, খবরের কাগজের লোকটি কবিকে প্রথম দেখলেন শোয়া অবস্থায়, আর ভিক্তোরিয়া তাঁকে দেখলেন হেঁটে ঘরে ঢুকতে, যে-পার্থক্য থেকে দুজনের প্রথম ইম্প্রেশন কিছুটা আলাদা তো হতেই পারে,— তবু মনে হয় যে কতগুলি খুঁটিনাটিতে, যেমন

রবীন্দ্রনাথের সাদা চুল যে কোঁকড়া ছিলো বা তাঁর কপালে যে একটিও বলিরেখা ছিলো না এই জাতের ডিটেলে, সাংবাদিক প্রতিবেদনটি তাঁর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলেছে। তা ছাড়া সমস্ত বর্ণনাটাকে কিভাবে সাজাতে হবে সে-সম্পর্কেও তিনি ঐ প্রতিবেদনটি থেকে একটা আইডিয়া পেয়ে থাকবেন।

গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য নিয়ে যে-অংশটি, সেটিও ভিক্তোরিয়ার ভাবনাকে উস্‌কে দিয়ে থাকতে পারে। ১৯২৪ সালে ভিক্তোরিয়া রোম্যাঁ রলাঁর লেখা একটি ছোট বইয়ের মাধ্যমে গান্ধীকে সবেমাত্র আবিষ্কার করেছেন। পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন রবীন্দ্রপ্রতিবেদনে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য নিয়ে তিনি যে বেশ কিছুটা মাথা ঘামিয়েছিলেন তা আমরা জানি।

নাসিয়ন পত্রিকাটির তৎকালীন ইতিহাস ভালো ক'রে ঘাঁটলে আলোচ্য প্রবন্ধটি কে বা কারা তৈরি করেছিলেন সে-খবরও হয়তো মিলতে পারে, কিন্তু সে আরেক গবেষণা![১]

রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া

[*জিজ্ঞাসা* পত্রিকার ৯ : ১ সংখ্যায় শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় আমার *ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন* (১৯৮৮) বইটির একটি সমালোচনা লেখেন। প্রধানতঃ তারই সূত্র ধ'রে, তার সঙ্গে আরও দু'-একজন সমালোচকের তোলা অন্যত্র প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নকে মনে রেখে আমি কিছু বক্তব্য পেশ করি, যা ঐ পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে ছাপা হয়। তার কিয়দংশ ঈষৎ সম্পাদিত আকারে এখানে দেওয়া হচ্ছে, বিশেষতঃ এই কারণে যে এই লেখাটি থেকে *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় প্রকাশিত গৌরী আইয়ুবকে উদ্দিষ্ট আমার জবাবের কয়েকটি দিক আরেকটু আলোকিত হয়।]

... আমার বইটি সম্বন্ধে সুপ্রিয়া যে-সব সাধুবাদ উচ্চারণ করেছেন প্রথমেই সেগুলির জন্যে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। অনেক বছরের পরিশ্রমের পর তাঁর মতো একজন বিদগ্ধ পাঠিকার গুণগ্রাহিতা নিশ্চয়ই এ জাতীয় কাজের প্রকৃত পারিশ্রমিক। আলোচনাকে যে উস্‌কে দিতে পেরেছি, এতে আমি খুশী। এখন চাইছি আলোচনাটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে,— পাঠচক্রের মেজাজে। আমার ধারণা বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আলোচনাকে গভীরতা ও বিস্তৃতি দেওয়া খুবই দরকারী। সেই চেষ্টার জন্য যে-অবকাশ *জিজ্ঞাসা*-য় প্রাপ্তব্য তা অন্যত্র সহজে মেলে না।

... সুপ্রিয়া বিশ্বাস করতে চান ওকাম্পোর আত্মজীবনীর সেই উক্তিটি, যেখানে তিনি বলেন যে কবির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো এমন একটা প্রীতিস্নিগ্ধতা, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব ছাড়া আর কিছু ঢোকে নি। এবং সুপ্রিয়া আশ্বস্ত হন এই দেখে যে ওকাম্পোর জীবনীকার ডরিস মায়ারও ঐ ধরনের মত পোষণ করেন। কিন্তু আমার বইয়ে আমি বলছি যে এ ক্ষেত্রে ওকাম্পোর প্রৌঢ় বয়সে রচিত আত্মজীবনীর উক্তিকে আমরা তার আপাত-মূল্যে নিতে পারি না, কেননা অন্যান্য সাক্ষ্য তার বিরোধিতা করে। রবীন্দ্রনাথের শারীরিক উপস্থিতি, দেহসৌন্দর্য, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি যে তাঁকে আবিষ্ট করেছিলো সেটাও তো ধর্তব্য। তা ছাড়া আছে ১৯২৪-২৫-এর চিঠিগুলির আপাত-মূল্য। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ঐ সময়ের এবং পরবর্তী কালের চিঠিগুলিতেও এমন সব কথা আছে, যেগুলিকে সর্বদেশে সর্বকালেই লোকেরা প্রেমিকার উক্তি ব'লে সনাক্ত করবে। অর্থাৎ তাঁর আন্দোলিত অনুভূতির প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক স্বাক্ষর আর পরবর্তী কালে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসে স্মৃতিরোমন্থনকারী মেজাজে লিখিত পিছনে-তাকানো বিশ্লেষণ— এ দুয়ের মধ্যে একটা বিরোধিতা আছে।

আমার বিবেচনায় ডরিস মায়ার এখানে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য 'অথরিটি' নন। তাঁর বইটি ওকাম্পোর জীবৎকালে ওকাম্পোরই সক্রিয় সহযোগিতায় প্রস্তুত, এবং সেটির মূল লক্ষ্য হলো ওকাম্পোর পারিবারিক পটভূমিকা, বংশমর্যাদা, কর্মজীবন প্রভৃতির একটা প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া। সেখানে বইটি অবশ্যই সফল। কিন্তু ওকাম্পোর ব্যক্তিগত জীবনের ঝড়গুলির সম্পূর্ণ পরিচয় তো ওখানে নেই। বুয়েনোস আইরেসে রবীন্দ্রনাথসংক্রান্ত যে-সব কাগজপত্র আমি দেখেছি সে-সব যে তিনি দেখেন নি, বা তাঁকে দেখতে দেওয়া হয় নি, তা তো পরিষ্কার। শান্তিনিকেতন বা ডার্টিংটনের কাগজপত্রও তিনি দেখেন নি। রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার সম্পর্কস্থাপনে এল্‌ম্‌হার্স্টের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তা তিনি আদৌ জানতেন ব'লে মনে হয় না। ওকাম্পো তাঁকে যেমন বুঝিয়েছেন, তিনি তেমনই লিখেছেন। তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু তিনি করতে পারতেন না, কারণ ওকাম্পো তখনও জীবিত। এ কারণে লাতিন-মার্কিন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কারও কারও মতে মায়ারের বইটি কার্যতঃ সন্তচরিত ('হ্যাগিওগ্রাফি'), যদিও আমি নিজে এঁদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারি না।

তাঁর আত্মজীবনীতে ওকাম্পো যখন মুখ্যতঃ কোনো ঘটনার বিবরণ দেন, তখন সেই বিবরণ আমরা মোটের উপর মেনে নিতে পারি, যদিও মনে রাখতে হবে যে খুঁটিনাটিতে ছোটখাট স্মৃতির স্খলন যে-কোনো লোকেরই ঘটতে পারে। বিশেষতঃ তারিখঘটিত ভুল যে ওকাম্পোর লেখায় অনেক জায়গাতেই আছে, তা তো আমি দেখিয়েছি। কিন্তু ঘটনার অনেক পরে তার তাৎপর্যের বিশ্লেষণ, তার জন্যে যুক্তি দেখানো,— ওখানে ইয়ুং-কথিত আত্মছলনার সুযোগ পর্যাপ্ত। তাই ১৯২৪-২৫ সালে ভিক্তোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে কী ধাঁচে ভালোবেসেছিলেন তার বিচারে তাঁর উত্তরজীবনের সাহিত্যকর্মের সাক্ষ্যের চাইতে ঐ ১৯২৪-২৫-এর চিঠিপত্রই অনেক বেশী প্রামাণিক। প্রৌঢ় বয়সের স্মৃতিচারণায় শৈশব-যৌবনের কথা লেখা কোনো নিরপেক্ষ ইতিহাসরচনা নয়, বরং শিল্পকর্ম, সত্যের আর কল্পনার মিশ্রণে তৈরি, আত্মজৈবনিক উপন্যাসের কারুকলার কাছাকাছি। অপরপক্ষে তাঁর চিঠিপত্র থেকে যে-সব প্রেমিকার উক্তি আমার বইয়ের ২৫৯-২৬১ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে, সেগুলি তাঁর তৎকালীন অনুভবের অকাট্য দলিল। মায়ার এগুলি কোনো কালেই দেখেন নি, কেননা এ-সব কাগজপত্র বরাবরই ভারতে, এবং যতদূর জানি উনি ভারতে গবেষণা করতে যান নি। ভিক্তোরিয়ার চিঠিপত্রের প্রেমের উচ্চারণগুলিকে আমরা যদি 'স্পিরিচুয়াল' অর্থে নিই, তা হলেও তাদের পাশাপাশি কি আমাদের রাখতে হবে না তাঁর দ্বিতীয় প্রেমিক দ্রিয় লা রশেলের সেই মর্মভেদী মন্তব্যটি, ইংরেজীতে যার তর্জমা দাঁড়ায় 'For you the spirit is ever sperm' ? ওকাম্পোর স্বভাবের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতীপ কোণে যে-'দৈহিক প্রতিভা'কে দ্রিয় সনাক্ত করেছিলেন, ওকাম্পো যেটাকে অস্বীকার করার কোনো চেষ্টাই করেন নি, সেটার একটা হিসাবও তো আমাদের খাতায় রাখতে হবে ?

প্যারিসে একটি সাক্ষাৎকারে খ্যাতনামা লাতিন-মার্কিন সাহিত্যিক মিগুয়েল আস্তুরিয়াস্-এর বিধবা পত্নী প্রবীণা ব্লাংকা আস্তুরিয়াস্ আমাকে বলেন: '১৯২৪-এ ভিক্তোরিয়া অবশ্যই তাগোরের প্রেমে পড়েছিলেন। *ফ্রান্‌চেস্কা থেকে বেয়াত্রিচে* বইটা পড়লে তাঁর সে-সময়কার মনকে বুঝবেন।' সে-বই আমার তখন পড়া হয়ে গেছে, কাজেই এঁর বক্তব্য বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি। ভিক্তোরিয়ার তৎকালীন বাসনা: প্রেমের ভূমিকায় ফ্রান্‌চেস্কা থেকে বেয়াত্রিচেতে উত্তীর্ণ হবেন। প্রেমার্থী অর্তেগার সঙ্গে তাঁর তখন 'আড়ি', পত্রবিনিময় বন্ধ। তারই মধ্যে অর্তেগা মাদ্রিদ থেকে ১৯২৪ সালে ছেপে দিলেন ভিক্তোরিয়ার প্রথম বই,— নিজের একটি 'উত্তরকথা' জুড়ে দিয়ে। কিন্তু বেয়াত্রিচে হতে চাওয়া এক, আর হয়ে ওঠা আরেক ব্যাপার। ১৯২৯ সালে ভিক্তোরিয়া যখন দ্রিয় লা রশেলের প্রণয়িনী হলেন তখন দ্রিয় নিজে বিবাহিত পুরুষ; কিছু বাদে দ্রিয় ভিক্তোরিয়ার ভগ্নী আন্‌হেলিকারও প্রেমিক হয়েছিলেন। এই সব কথা এজন্যে তুলছি যে এই 'অ্যাফেয়ার'গুলি বিধিবদ্ধ সামাজিক নীতির কোনো ধার ধারে না, এবং ভিক্তোরিয়াকে ঠিক ক'রে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের এই দিকটাও আমাদের হিসাবের মধ্যে নিতে হবে। ১৯২৯ সালের চিঠিপত্রে দ্রিয় ভিক্তোরিয়াকে লিখেছেন: 'ঘাসের মধ্যে সুন্দরী মাদী জানোয়ারের মতন তোমার আকর্ষণক্ষমতা', 'হোমার বলতেন তুমি পাম্পা-প্রান্তরের সব চাইতে সুন্দরী গাভী' ইত্যাদি। ওকাম্পো-আত্মজীবনীর পঞ্চম খণ্ডে এ-সব কোনো রাখ্-ঢাক্ না ক'রে ছাপা হয়েছে।

অথচ এলমহার্স্ট আর রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা, যে-দুটিতে দৈহিকতার ছাপ আছে, সে-দুটি মুদ্রিত আত্মজীবনী থেকে বর্জিত হয়েছে। তার কারণ আত্মজীবনীটি প্রকাশের দায়িত্ব ওকাম্পো যাঁদের হাতে দিয়ে গেছিলেন তাঁরা তাঁদের গুরুস্থানীয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় গুরুদেবের সৌহার্দ্যের ইতিহাসটাকে একটা গৌরবান্বিত আদর্শায়িত নিষ্কলঙ্ক ভারতপ্রেমের স্তরে রেখে দিতে চান। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, কেননা আর্জেন্টিনায় তাঁদের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। এই সম্পাদকীয় নীতির ফলে আত্মজীবনীটির মধ্যে একটা অসমানতা এসে গেছে। ভারতের সঙ্গে ওকাম্পোর 'বিশেষ সম্পর্ক'-এর যিনি প্রধানা মুখপাত্রী তাঁর বিশেষ কোনো সাহিত্যবোধ না থাকায় এই অসমানতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন নন।

হ্যাঁ, ঠিক, ভিক্তোরিয়া অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মেয়ে ছিলেন ব'লে তাঁকে ভুল বোঝা সহজ। কিন্তু কেউ আবেগপ্রবণ হবার মানে কি এই যে তিনি যা বলছেন তা সত্য নয়, মিথ্যা? ১৫ জানুয়ারি ১৯২৫ তারিখে, রবীন্দ্রনাথ যখন চ'লে গেছেন, যা ঘটবার তা যখন ঘ'টে গিয়েছে, তখন ভিক্তোরিয়া লিখছেন:

> **And though it will make you still more conceited than you already are, let me tell you, Gurudev, that I love you.**

এর মধ্যে যদি 'কোকেট্রি' না থাকে তা হলে আমি ইংরেজী জানি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পছন্দ করেন সে-কথা ভালোভাবে জেনেই ভিক্তোরিয়া এই বাক্যটি লিখছেন। কোনো চৌত্রিশ বছরের মহিলা যদি কোনো পুরুষকে এভাবে লেখেন তা হলে সেই উচ্চারণের জন্য দায়িত্ব তাঁকে নিতেই হবে। রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্রয় দেওয়া যদি তাঁর উদ্দেশ্য না হয়, তবে এই সুর কেন? কেন কোনো চিঠিতেই ভিক্তোরিয়া লিখলেন না— 'গুরুদেব, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, আপনি যেভাবে ভাবছেন আমি আপনাকে সেভাবে ভালোবাসি না, বাসি কেবল আধ্যাত্মিকভাবে'? কেন সমানে কেবল ব'লে গেলেন— 'ভালোবাসি ভালোবাসি'? একটি আবেগপ্রবণ রোম্যান্টিক প্রকৃতির মেয়ে, যাঁর মধ্যে আবার 'দৈহিক প্রতিভা'ও আছে, যখন এভাবে কথা বলেন, তখন তাঁর ভালোবাসাকে খণ্ডিত অর্থে না নিয়ে পূর্ণ অর্থে নেওয়াই আমাদের পক্ষে সঙ্গততর।

পাশ্চাত্য জগতে কেউ কেউ আছেন, ওকাম্পোর চরিত্রের আধ্যাত্মিকতার কথা উঠলে যাঁরা মৃদুহাস্য করেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোনো প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রবণতা ছিলো এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে সেটা তাঁর ভণ্ডামি, অভিনেত্রী-হতে-চাওয়া মেয়ের অভিনয়। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কারও কারও মতে তাঁর মধ্যে যৌনতা-বিষয়ে রীতিমতো একটা অবসেশন ছিলো। পুরুষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর নিন্দুকের অভাব নেই এবং প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে তাঁর স্বীকারোক্তিগুলির পূর্ণ অকপটতা সকলে স্বীকার করেন না। *লা নাসিয়ন* যাঁদের ঘরের কাগজ, সেই মিত্রে পরিবারের গৃহিণী ব্লাংকা মিত্রে-র বাড়িতে লাঞ্চের আসরে— যেখানে অক্তাভিও পাস্, ওদিল্ বারন্ সুপারভিয়েই ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন— আমি ওকাম্পো-প্রসঙ্গে 'সেক্সোপ্যাথি' শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছি। আমার মতে এটাও তাঁর প্রতি অবিচার। আমার মনে হয়, যেমন আমার বইয়ে বলেছি, যে তাঁর মধ্যে দৈহিকতা আর আধ্যাত্মিকতার একটা মিশ্রণ ছিলো, ছিলো দৈহিকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার জন্য একটা নিবিড় তৃষ্ণা। এই সহাবস্থান তাঁর ব্যক্তিত্বকে একটা আকর্ষক ক্ষমতাই দিয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের সুশিক্ষিত সংবেদনশীল চোখ ঐরকমই কোনো স্বভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকবে। তাই পরিচয়ের প্রায় সূত্রপাতেই তিনি লিখতে পেরেছেন:

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।

কাইজ়ারলিঙের সঙ্গে যা ঘটেছিলো তার পুনরাবৃত্তি ওকাম্পো অবশ্যই চাইবেন না। কিন্তু সে তো ১৯২৯ সালের ঘটনা। তার আগে ওকাম্পোর অনুভূতি কেমন ছিলো? রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পছন্দ করেন জেনেও তিনি কেন ইতালীয় ভিলার পরিকল্পনা করছিলেন? আত্মজীবনীতে তিনি কেন লিখেছেন যে হুলিয়ান তাঁর জীবনে না থাকলে তিনি শান্তিনিকেতনে চ'লে যেতেন? হুলিয়ান যদি না থাকতেন, রবীন্দ্রনাথের বয়স যদি আরেকটু কম হতো, তা হলে এই কাহিনীর কী পরিণতি হতো? অর্থাৎ অবস্থাগত কারণে ভালোবাসাটা কার্যতঃ অসম্পূর্ণ থেকে গেছিলো ব'লেই তা থেকে এমন অনুমান করা যায় কি যে অনুভবেও প্যাশনের কোনো তীব্রতা আসে নি? বরং মানবিক মনস্তত্ত্ব যতটুকু বুঝি তা থেকে মনে হয় যে অনুভবে একটা সংরক্ত তীব্রতা এসেছিলো ব'লেই এত বেদনাও সঞ্চারিত হয়েছিলো। এটা ঠিকই যে শেষ পর্যন্ত ওকাম্পো হয়তো ইচ্ছে ক'রেই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে আসা এড়িয়ে গেছেন,— পাছে কোনোভাবে জড়িয়ে পড়েন, পাছে রবীন্দ্রনাথের মনে আঘাত দিতে হয়। এ ধরনের কথা আমার মনে হয়েছে, বইয়ে তা লিখেওছি। কিন্তু তাঁর সেই না-আসাতেই রবীন্দ্রনাথ আরও বেশী কষ্ট পেয়ে থাকবেন। কাইজ়ারলিঙের সঙ্গে যেমনটা ঘটেছিলো ঠিক তেমনটা ঘটবে তা ওকাম্পোও নিশ্চয় ভাবেন নি। কাইজ়ারলিঙের স্থূলতার জন্য তাঁর আহ্বানে তিনি সাড়া দিতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তো তাঁর কখনো সেরকম মনে হয় নি। বলেছেন যে ঐ দুই পুরুষের ব্যক্তিত্বের ছন্দ একেবারে আলাদা।

ভিক্তোরিয়ার আধ্যাত্মিক তাড়নাকে আমি যেমন হেসে উড়িয়ে দিই না, তেমনি তাঁর চরিত্রের দেদীপ্যমান দৈহিকতাকেও অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি যে একের পর এক প্রেমিক গ্রহণ করেছেন এই তথ্যটার মধ্যেও তো তাঁর চরিত্রের ঐ দিকটার প্রমাণ আছে। দ্রিয়-র পরে এদুয়ার্দো মাজ়েয়া তাঁর প্রেমিক হন। শুনেছি এর পর ফ্রুগোনি নামে একজন ইতালীয় এবং রোজ়ারিনো নামে একজন ইহুদী তাঁর প্রেমিক হয়েছিলেন। ফ্রুগোনি নাকি পোপের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। ফরাসী লেখক রজ়ে কাইওয়ার দ্বিতীয়া স্ত্রী আমাকে নিজমুখে বলেছেন: 'আমার স্বামীর সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিলো কিনা সে-বিষয়ে আমার স্বামীকে আমি সরাসরি কোনো প্রশ্ন করি নি, তবে আমার দৃঢ় ধারণা যে হয়েছিলো। হয়ে থাকাই স্বাভাবিক।' অন্যরাও এ কথা সমর্থন করেছেন। মাদাম কাইওয়া আরও বলেন: 'ভিক্তোরিয়া নিজেকে রজ়ে আর তার প্রথম বৌয়ের মাঝখানে সেঁধিয়েছিলেন।' ভিক্তোরিয়াকে নিয়ে তাঁর অনেক বন্ধুপত্নীরই এ ধরনের অসন্তোষ ছিলো। ডার্টিংটনে শুনেছি যে তাঁকে নিয়ে ডরোথি এল্‌ম্‌হার্স্টের একটা চিরস্থায়ী অস্বস্তিবোধ ছিলো। মনে রাখতে হবে যে রজ়ে কাইওয়া ভিক্তোরিয়ার চাইতে একুশ বছরের ছোট ছিলেন। ভিক্তোরিয়া যদি তাঁর চাইতে একুশ বছরের ছোট যুবকের প্রেমিকা হয়ে থাকতে পারেন, তা হলে তাঁর চাইতে ঊনত্রিশ বছরের বড় কবির প্রেমেও প'ড়ে থাকতে পারেন,— সেটা অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে উত্তরজীবনে ভিক্তোরিয়া অর্তেগারও প্রেমিকা হয়েছিলেন, মাদ্রিদে সংরক্ষিত চিঠিপত্রে না'কি তার প্রমাণ

আছে। আমি অবশ্য সে-সব চিঠি নিজের চোখে দেখি নি, তবে কথাটা বিশ্বাস করতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয় না।

ভিক্তোরিয়ার চরিত্রের কতগুলি দিকের উপর আলোকপাত ক'রে জনৈক আর্জেন্টাইন লেখক আমাকে বলেন: 'তাঁর সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হলো তখন তাঁর বয়স তেষট্টি। সেটা ১৯৫৩ সাল। তিনি বেশ মেক-আপ ব্যবহার করতেন, গালে রুজ চড়াতেন। একটা রোদে-পোড়া, ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো, বা পাকা পীচফলের মতো আভা আনতেন ত্বকে। ঢিলে ট্রাউজারের উপরে শৌখিন ফরাসী ব্লাউজ, মুক্তোর হার আর মুক্তোগুচ্ছের দুল পরতেন। ছোট বোন সিল্‌ভিনা, ভগ্নীপতি বিঅয় কাসারেস্, আর বর্হেস্— এই তিনজনার উপরে খুব দিদিগিরি করতেন। আর ঐ তিনজন আড়ালে ভিক্তোরিয়ার স্নবারি আর আধিপত্যপ্রয়াস নিয়ে হাসাহাসি করতেন। ভিক্তোরিয়া ছিলেন অবসেসিভ প্রকৃতির মানুষ। যখন কোনো-কিছু নিয়ে মাততেন তখন একেবারে মেতে উঠতেন। তখন আপনি তাঁর সঙ্গে মাতলে ভালো, নয়তো বড় বিপদ। সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ছিলো প্রখর। বেশী বয়সেও সুপুরুষ যুবকদের সঙ্গ তিনি বেশ পছন্দ করতেন। যাদের তিনি অনায়াসেই "তুমি" ব'লে ডাকতে পারতেন, সেই সব অল্পবয়স্ক ছোকরাদেরও তিনি "উস্তেদ" [অর্থাৎ "আপনি"] ব'লে সম্বোধন করতেন। এ নিয়ে কত যে হাসাহাসি হতো। উনি ছিলেন হাবভাবশালিনী মহিলা [বক্তা মূলে ব্যবহার করেন একটি ফরাসী শব্দ, allumeuse]— পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতেন। ওঁর মধ্যে একই সঙ্গে ছিলো কোকেট্রি আর পিউরিটানিজ্‌ম্, পুরুষকে উত্তেজিত করা, তার পর নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। কিন্তু শেষ জীবনে এন্‌রিকে পেৎসোনিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন মায়েরই মতো।'

রক্ষণশীল ভারতবর্ষে তাঁর চরিত্রের এই দিকগুলির যে বিরূপ সমালোচনা হতে পারে তা ভিক্তোরিয়া নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছিলেন, এবং হয়তো সেটাও অন্যতম কারণ যেজন্যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও তিনি ভারতের মাটি মাড়ান নি। একটু আগেই বলেছি, এ-সব নিয়ে তাঁর স্বদেশেও তাঁর নিন্দুকের অভাব নেই, এবং আমি চ'লে আসার প্রাক্কালেও আর্কাইভ্‌সের একজন মহিলা সশঙ্কচিত্তে আমাকে বলেছেন: 'দেখবেন, কেবলই আপনাদের কবিকে উপরে তুলবেন আর আমাদের ভিক্তোরিয়াকে নীচে নামাবেন, তা যেন করবেন না।' এই শঙ্কা অকারণ নয়। ওখানে ব'সেই আমি *তাগোর এন্ লাস্ বার্‌রাংকাস্ দে সান ইসিদ্রো* বইটিকে নিয়েও ছাপার অক্ষরে ঠাট্টাবিদ্রূপ পড়েছি। ১৯৮৩ সালে শান্তিনিকেতনে একটি বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে 'কল্যাণী লক্ষ্মী' বলতে আমরা যা বুঝি ভিক্তোরিয়া তা কোনো কালেই ছিলেন না। মনে পড়ছে, কথাটা মেনে নিতে কারও কারও কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু কষ্ট হলেও সত্যের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে, কেননা তাঁর চরিত্রের একটা সামগ্রিক ছবিকে স্বীকার ক'রে নিতে না পারলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মনোভাবকেও আমরা তার জটিলতায় বুঝতে পারবো না। একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য, দুঃখ-অপমান-অত্যাচার-দারিদ্র্য-বঞ্চনা সব কিছুকে মুখ বুঁজে সহ্য ক'রে স্বামিসেবা, অবারিত ত্যাগব্রতী মাতৃস্নেহ, নিজেকে আড়ালে রেখে নিরন্তর অন্যদের সেবা: মোটের উপর

এগুলোই ভারতীয় নারীত্বের ঐতিহ্যিক আদর্শ, এবং অধুনা শিক্ষিত সমাজে এ ক্ষেত্রে কিছু গৌণ পরিবর্তন হয়ে থাকলেও মূল কাঠামোটা তেমন-কিছু বদলায় নি। মেয়েদের মধ্যে রাগ, সংরাগ, মেজাজ, জেদ, অধিকারবোধ, অপমানবোধ, জিজ্ঞাসা, যৌনতা— এগুলি শিক্ষিত সমাজেও প্রশংসা পাবে না, নিন্দাই পাবে। যাঁরা নিজেদের আধুনিক বিবেচনা করেন তাঁরাও স্ত্রীলোকের মধ্যে এগুলির লক্ষণ দেখলে প্রায়শঃ কুঁচকে যাবেন, দূরে স'রে যাবেন। অথচ ভিক্তোরিয়ার ভিতরে এগুলি প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলো। এমনও শুনেছি যে তিনি নাকি একবার রাগের মাথায় তাঁর স্বামীর দিকে একটা ভারী জিনিস ছুঁড়েছিলেন— ইস্ত্রি বা ঐরকম কিছু। তাঁর পারিবারিক চক্রেরই প্রতিবেদন এটা। ভারতীয় সমাজে হলে এই মহিলাটিকে তাঁর স্বভাবচরিত্রের জন্য তাঁর শ্বশুরকুল খুনই ক'রে ফেলতেন, খুন ক'রে তাঁর সব সম্পত্তি কেড়ে নিতেন। কোনো কোনো গোঁড়া মুসলিম সমাজে স্বামীর জীবদ্দশায় প্রেমিক গ্রহণের জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড হতো। কর্মে প্রেমে বন্ধুত্বে সৃষ্টিশীলতায় সংগঠনপ্রতিভায় তিনি একজন বড় মাপের মানুষ, কিন্তু নারীর ঐতিহ্যিক ভূমিকাকে তিনি যে সবলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা অনস্বীকার্য। না পেরেছেন কুলবধূর ভূমিকা নিতে, না পেরেছেন রক্ষণশীল সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করতে। দ্বন্দ্বে ছিন্ন হয়ে আর্তনাদ করেছেন : 'Estoy harta del papel de mujer adultera' ('ব্যভিচারিণীর ভূমিকায় আমি ক্লান্ত')। ভিক্তোরিয়ার স্বভাবের মধ্যে প্যাশনের প্রাবল্য এত স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুভূতিতে তার কোনো ছোঁয়া লাগে নি এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন। চিঠিপত্রেও তার সাক্ষ্য মেলে।

এবারে আসি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে ভিক্তোরিয়ার প্রভাবের কথায়। তাঁর জীবনের ঐ পর্যায়ের 'সমস্ত কিছুর মধ্যেই এই অসম্পূর্ণ প্রেমের ছায়া পাশে পাশে ঘুরে মরেছে' এমন দাবি কিন্তু আমি করি নি। সমস্ত কিছুর মধ্যে নয়,— বলাই বাহুল্য, তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায়, ছেলে-ভুলানো ছড়ায়, বা *সভ্যতার সংকট*-এর মতো বক্তৃতায় নয়,— কিন্তু সম্ভবতঃ থেকেছে তাঁর নিঃসঙ্গতার পাশে পাশে, এবং নিঃসৃত হয়েছে কোনো-কোনো শিল্পকর্মে, গানে কবিতায় ছবিতে। আমি কোনো-কিছুকে নেহাৎ আক্ষরিকভাবে নিতে বলছি না, শিল্পকর্মকে যেভাবে আলোছায়ার মধ্যে নিতে হয় সেভাবেই নিতে বলছি। তারই মধ্যে কোথাও দুলছে ঐ নারীর ছায়া, অনুরণিত হচ্ছে তাঁর স্মৃতি, ধ্বনিত হয়ে উঠছে তাঁর বিরুদ্ধে কবির অভিমান। এবং কেবল তিনি নন, আছেন আরও অনেকেই : যাঁরা 'পর্বে পর্বে' কবিকে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের কাউকেই আমি অস্বীকার করি না এবং করি নি। বলেছি যে অনেকের সমভিব্যাহারেই সৃষ্ট রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনীর মূর্তিটি। তাঁদের মধ্যে ওকাম্পোও আছেন, যোগ দিয়েছেন। তাঁর পরেও কেউ কেউ গুরুত্ব পেয়েছেন, যেমন রানী মহলানবিশের কথা আমি উল্লেখ করেছি। কিন্তু যা নিয়ে আমি গভীরভাবে গবেষণা করি নি তা নিয়ে খুব বেশী 'স্পেকুলেট' করি নি। কতগুলি কবিতায় ওকাম্পোর ছায়া আমার কাছে বেশ স্পষ্ট। তবে কবিতার উৎসমুখ একটা জটিল জায়গা। কবিতারা যে সব সময় একটা ছোট উৎসমুখ থেকে উঠবে এমন তো নয়। কখনও কখনও তারা ওঠে একটা সমুদ্রের নীচ

থেকে। তাই আমি কাউকে কোনো 'সরল সিদ্ধান্তে', কোনো বাহাই ধর্মের সহজতায় আসতে বলছি না, জটিলতাকেই স্বীকার ক'রে নিতে বলছি। একটা জটিল বুনটের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভিক্তোরিয়া-স্মৃতিও যে একটা সুতো হতে পারে, এটুকু মেনে নিতে অসুবিধা হবে কেন?

যোগাযোগ-এর ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযোজ্য। কেবলমাত্র ভিক্তোরিয়ার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার উপরে 'ভিত্তি ক'রে' তিনি উপন্যাসটি লিখেছিলেন এমন দাবি আমি করি নি, বলেছি কুমুর যন্ত্রণার পিছনে ভিক্তোরিয়ার বৈবাহিক দুর্ভাগ্যের ছায়া থেকে থাকতে পারে। তার মানে এ নয় যে এর পিছনে আর কিছু নেই বা থাকতে পারে না। আমি এ কথাও বলেছি যে মধুসূদনের চরিত্র বাংলার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নিপুণভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে। নগেন গাঙ্গুলী আর মীরা দেবীর প্রাসঙ্গিকতার কথা আমারও মনে হয়েছে, তবে তা নিয়ে কোনো গবেষণা করি নি ব'লে কোনো মন্তব্য করি নি। হয়তো বা সাহস ক'রে এক লাইন যোগ করা উচিত ছিলো।...

ওকাম্পোর সঙ্গে কবির সম্পর্ক আন্দ্রে কার্পেলেস্ আর এলিজাবেথ ব্রুনারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের থেকে কী অর্থে ভিন্ন ছিলো তা বোঝাতে গিয়ে এ দুজনের চিঠিপত্র থেকে আমি যে-উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছি, সেগুলি সুপ্রিয়ার চোখে অপ্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রাচুর্যের মতো ঠেকেছে কেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তেমন বেশী তো দিই নি। ব্রুনার থেকে সর্বসমেত সাত লাইনের বেশী উদ্ধৃতি নেই (পৃঃ ২৭৮); কার্পেলেস্ থেকে আছে গোটা-পাঁচেক ছোট-ছোট উদ্ধৃতি, সবসুদ্ধ তিরিশ লাইনের মতো (পৃঃ ২৮০-২৮২)। এটুকু না দিলে আমার বক্তব্যকে কিভাবে স্পষ্ট করতাম? সুপ্রিয়া আরও লিখেছেন যে কার্পেলেসের চিঠি 'বইটির অন্যত্রও প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে, যার অনেকাংশের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট নয়', কিন্তু আর যেখানে এই উৎসের ব্যবহার আছে সে তো রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর একটা ছবি তৈরি করতে। এই ব্যবহার ২৩৪-২৩৯ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এই প্রদর্শনীর ব্যাপারে ওকাম্পোর ভূমিকা সম্পর্কে কার্পেলেসের কিছু কিছু কৌতুকময় ঠেস-দেওয়া উক্তিও এখানে আছে, যেগুলি নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীসংক্রান্ত ঘটনাবলীর যে-বিবরণ আমি দিয়েছি সুপ্রিয়া তো তার প্রশংসাই করেছেন, তাই এই দ্বিতীয় অভিযোগটির প্রাসঙ্গিকতাও আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট হলো না।

আমি নিজে বরাবর খুঁটিনাটির ভক্ত, সামান্যীকরণের ম্লানতার চাইতে বিশেষের রঙদার বাহারের দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। আমার অন্যান্য লেখাতেও নিশ্চয় এই প্রবণতা ফুটে ওঠে। অন্যদের লেখাতেও জমজমাট ডিটেল না পেলে আমি পড়তে পারি না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অক্সফোর্ডীয় শিক্ষার একটি মগজ-ধোলাই: বন্যার মতো কারণ দেখাতে না পারলে কোনো কথা বলবে না, যা-কিছু দাবি করবে তার জন্যে ভিত্তি দেখাবে, দেবে তথ্য-উদ্ধৃতি-উদাহরণ, কম দেবে না, বরং প্রয়োজনের বেশীই দেবে, 'অধিকন্তু ন দোষায়', নয়তো অন্যরা তোমার কথা মানবে কেন? তা ছাড়া আমার নিজের বিশ্বাস, এবং বইয়েও বলেছি, যে এ জাতীয় গবেষণাকার্যে কিছুটা তথ্যপ্রাচুর্য তেমন-কিছু ক্ষতিকর নয়,

কেননা এই সব ছড়ানো তথ্য থেকে হয়তো অন্য কেউ এমন কোনো সংযোগ আবিষ্কার করতে পারবেন যা এই মুহূর্তে আমাদের চোখে ততটা পরিষ্কার হচ্ছে না। নিজের যাবতীয় তথ্যপুঞ্জের অন্তর্নিহিত পরস্পরসম্পর্কগুলি কোনো গবেষকের পক্ষে একা ঠাহর করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য না-হয় রইলোই কিছু বাড়তি খবরাখবর,— কোনো-না-কোনো সময়ে কারও-না-কারও কাজে লেগে যাবে, কারও জিজ্ঞাসাকে উস্‌কে দেবে। বিজ্ঞানের গবেষণাও তো অনেক সময়ে ওভাবে এগোয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়, মাত্রাজ্ঞানও লাগবে : ওটি না থাকলে প্রকাশকই পাণ্ডুলিপি নেবেন না! আমার তো ধারণা মাত্রা আমি লঙ্ঘন করি নি! কার্পেলেস্ আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আরেকটি ভিন্ন কাজ অবশ্যই হতে পারে ; আশা করি সেটি কেউ করবেন, হতে পারে আমার উদ্ধার-করা কোনো জিনিস তাঁর কাজেও লেগে যাবে।

তথ্যপ্রাচুর্য যে কতটা জরুরী তা বোঝা যায় শ্রীযুক্ত নিত্যপ্রিয় ঘোষের একটি অভিযোগ থেকে (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ মে ১৯৮৮)। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভিক্তোরিয়াকে স্পর্শ করা কবেকার ঘটনা তা আমি খুঁজি নি, ফরাসী খসড়ায় আদৌ কোনো সন-তারিখ আছে কিনা তা-ও জানাই নি! সমস্ত বইয়ে আমার রীতি যেরকম, তা থেকে এটা স্পষ্ট হতে পারতো যে দেবার মতো কোনো খবর থাকলে আমি তা দিতাম, লুকোতাম না! কিন্তু ওঁর চোখে তা স্পষ্ট হয় নি। সত্যিই কোনোখানে আর কোনো খুঁটিনাটি নেই, আর কিছু খুঁজে পাই নি, মূল দলিলে কোনো তারিখের বালাই যে নেই তা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ সে-মুহূর্তে কোন্ কবিতাটি অনুবাদ করছিলেন সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। ওটি যে 'অতিথি', 'আশঙ্কা', বা 'কঙ্কাল'-এর অনুবাদ তা আমার মনে হয় না ; এগুলির অনুবাদকাহিনী ভালোভাবে 'ডকুমেন্টেড'। মোটে এই তিনটি অনুবাদের প্রতিলিপিই তিনি নিজে ওকাম্পোকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আরও কয়েকটি অনুবাদ করেছিলেন, যেগুলির কপি তিনি ওকাম্পোকে দেন নি। সেইদিনকার লেখাটি এই শেষোক্ত দলের অন্তর্গত হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলি— কেননা মনে হয় এই ছোট্ট ঘটনাটি নিয়ে কারও কারও মনে নানারকমের প্রশ্ন জেগেছে— গবেষক হিসাবে এটির প্রতিবেদন বইয়ে না দিয়ে আমার উপায় ছিলো না। এটা কি ঠিক যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা ঘটনার বিকৃত রূপ কেবল তাঁদেরই মুখে মুখে ঘুরবে, যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, ওকাম্পোকেও শ্রদ্ধা করেন না? ঘটনাটার একটা ভাঙাচোরা চেহারা আমি পাই আর্জেন্টিনা যাবার আগেই, অক্সফোর্ডে ব'সেই, একজন আর্জেন্টাইনের মুখে। যতদূর মনে পড়ছে, আরও রঙ-চড়ানো একটা চিত্র পেয়েছিলাম, যেন ওটা ঘটেছিলো বাগানে, আপেলের বনে। পরে বুঝেছি কেন ওভাবে বিকৃত হয়ে যায়। সংবাদদাতাকে বলেছিলাম : 'তা আপনি জানলেন কী ক'রে?' তিনি যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন না, বাগানে বা যেখানেই হোক, তা তো পরিষ্কার। তিনি বলেছিলেন : 'গল্পটা পেয়েছি এন্‌রিকে পেৎসোনির কাছ থেকে। তিনি কখনো বাজে কথা বলবেন না। আপনি আর্জেন্টিনায় গিয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ ক'রে দেখবেন। ভিক্তোরিয়া তাঁকে

কখনো মিথ্যে খবর দেবেন না। তাঁকে খুব বিশ্বাস করতেন, স্নেহ করতেন। মৃত্যুর আগেও তিনি ডাক দিয়েছিলেন— এন্‌রিকে, এন্‌রিকে। তবে সে-ব্যক্তি পেৎসোনি না অন্য কেউ, কে জানে ?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পর তো ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ দেখলাম, 'এন্‌রিকে, এন্‌রিকে'র সঙ্গেও (যদি এই এন্‌রিকে সেই এন্‌রিকেই হয়ে থাকেন) দেখা হলো। এন্‌রিকে পেৎসোনি এককালে ভিক্তোরিয়ার সহকর্মী ছিলেন, বর্তমানেও *সুর*-এর সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতমানুষ। দেখলাম যে এঁর মনে ঘটনাটার সত্যতা সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নেই। তখন বুঝলাম যে অন্ততঃ ভিক্তোরিয়ার লিখিত সাক্ষ্যটুকু নির্ভুলভাবে পরিবেশন করা গবেষক হিসাবে আমার দায়িত্বই বটে, নয়তো এর বিকৃততর রূপ আরও সাতমুখ ঘুরে শান্তিনিকেতনে পৌঁছবে, এবং তখন অন্যরা আমাকে উল্টে ধোলাই দেবেন : কেতকী কেন জেনেশুনেও এর ঠিক রূপ আমাদের জানান নি ? আমার প্রথম সংবাদদাতা ভিক্তোরিয়া সম্পর্কে একেবারেই শ্রদ্ধাশীল নন। চলতি বছরে ওকাম্পো সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য *লণ্ডন রিভিউ অফ বুক্‌স্* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সে-কাগজ কলকাতায় পৌঁছয় কিনা জানি না। কৌতূহলীরা খোঁজ নিতে পারেন।

নিত্যপ্রিয়র সমালোচনায় আরেকটি অনুপুঙ্খ আলোচনাযোগ্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিটিতে ব্যবহৃত 'আ উমান্‌স্ লাভ্' কথাটিকে 'মাতৃত্বের, কল্যাণময়ীর, আশ্রয়দাত্রীর অর্থে' নিতে চান ; সেটাই নাকি স্পষ্ট অর্থ ; এবং তিনি অভিযোগ করেছেন যে আমি কথাটিকে 'নারীপুরুষের আসঙ্গলিপ্সা' অর্থে নিতে চেয়েছি, যা ওঁদের দুজনের পরিচয়ের ঐ প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভবই নয়। কিন্তু আমি কথাটিকে কেবলমাত্র 'আসঙ্গলিপ্সা' অর্থে কখনোই নিতে চাই নি, নিয়েছি নারীর সামগ্রিক প্রেমের অর্থে। সেইটেই ইংরেজীতে কথাটির প্রচলিত অর্থ, এবং রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয় তা জানতেন, জেনেই লিখেছেন। ছ'-সাত দিনের মধ্যে একটি সংরক্ত আবেগতাড়িত প্রকৃতির মেয়ে অনায়াসেই প্রেমে পড়তে পারে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মতো একজন দুর্ধর্ষ পুরুষের প্রেমে, এবং রবীন্দ্রনাথও তা জানতেন। কেবলমাত্র মাতৃস্নেহের অর্থে ইংরেজীতে প্রচলিত 'আ মাদার্স লাভ্', 'মাদারলি লাভ্' ইত্যাদি ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে-কথা বলছেন না। তিনি বলছেন, নারীর প্রেমের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত মূল্যকে পাবার 'বেদনার্ত বাসনা' তাঁকে তাড়না করে, এবং সেই মূল্যবান দান তিনি পেয়েছেন ভিক্তোরিয়ার কাছ থেকে। এ তো সেই প্রেম, যার কথা তিনি কত কবিতায়, কত গানে বলেছেন— 'কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে' ইত্যাদি। অপিচ ঐ চিঠিতে আছে মরুভূমিতে হাঁটা এবং পিপাসার জল পেলে কৃতজ্ঞ হওয়ার চিত্রকল্প। এ জিনিস ৬৩-বৎসরবয়স্ক কবির মাতৃরূপিণী বা মাতৃবিকল্প কাউকে অন্বেষণের চিত্রকল্প নয়, প্রৌঢ় কবির সঙ্গিনীবর্জিত জীবনেরই চিত্রকল্প। তাঁর চারপাশে কন্যারূপিণী অনেকেই তো ছিলেন, যাঁদের কাছ থেকে মাতৃস্নেহরসের বিকল্প তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু মরুভূমির পিপাসা একটু অন্য ধরনের ছবি। এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় কবিতায় ঐ একই ছবির ব্যবহার : *বীথিকা*-র 'বিদ্রোহী', 'ক্ষণিক', 'অন্তরতম', *পত্রপুট*-এর এগারো-নম্বর

কবিতা। প্রত্যেকটি কবিতাতেই ঐ ছবির মধ্য দিয়ে যে-অর্থ ফুটে উঠছে তা সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ বা সেবাময়ীর করুণা নয়, তা নারী-পুরুষের প্রেম, এবং শুধুমাত্র আসঙ্গলিপ্সা কখনোই নয়, দেহে মনে মিলিয়ে একটি সর্বাঙ্গীণ অনুভূতি। ঐ প্রেমের মধ্যেও স্নেহ-সেবা-করুণার উপাদান যে নেই তা নয়, অবশ্যই আছে, আবার কিছু অন্য রঙের মিশালও আছে। বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসাদের মধ্যে ওভারল্যাপও থাকবে, পার্থক্যও থাকবে। নারী-পুরুষের প্রেম একটা বর্ণালী, যার মধ্যে কোনো ছেদ নেই,— একটা রঙ পরেরটার সঙ্গে মিশে যায়। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন দেহে মনে মিশিয়ে একটা বিচিত্র বর্ণালী তাকে উদ্ভাসিত করে। সেই বর্ণালীর কোনো অংশ যদি সামাজিক নিষেধের কারণে চেপে রাখতে হয়, তার দ্বারা তো অনুভবের সত্যতা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। সমস্ত সাক্ষ্য খুঁটিয়ে দেখার পর আমার ধারণা এই যে কিছু সময়ের জন্য হলেও আমাদের কবি আর আর্জেন্টিনার সেই মেয়েটির মধ্যে ঐ বর্ণালী, ঐ সর্বাঙ্গীণ অনুভবের গরিমা জেগেছিলো। তা কেবল পিতা-কন্যার, মাতা-পুত্রের, বা গুরু-শিষ্যের ব্যাপার নয়, আবার কেবল সেই আসঙ্গলিপ্সাও নয়, যার তাগিদে পুরুষরা গণিকালয়ে যায়। এই ভালোবাসাকে যে ব্যবহারিক জীবনে কোনো রূপ দেওয়া গেলো না, তার জন্য শেষ পর্যন্ত কষ্ট পেলেন নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথই বেশী। ভিক্তোরিয়া একটা সময়ের পরে আর ততটা দুঃখ পেলেন না, কেননা তখনও তাঁর বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প ; তাঁর জীবনে এলো কর্মের উত্তেজনা, এলেন একের পর এক প্রেমিক। কাঁচা দুঃখটা মুছে যাবার পর আগেকার অনুভূতিটাকে সাবলিমেশনের চূড়ান্ত শীর্ষে তুলে নিতে এবং সেভাবে দেখাতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি ; সেখানে তাঁকে সাহায্য করেছে ক্যাথলিক লালন, দান্তে-পড়া ফ্রান্‌চেস্কা-থেকে-বেয়াত্রিচে-হতে-চাওয়া মন। কিন্তু দুজনেই যে-যার নিজের মতন ক'রে অভিজ্ঞতাটা থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিলেন। এই তো ওঁদের কাহিনী।

... যে-কোনো ব্যাপারেই আমাদের মতামত এবং বিশ্বাসসমূহ আমাদের সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষার উপরে নির্ভরশীল। দুজন মানুষের বিশ্ববীক্ষায় যদি কোনো মৌল পার্থক্য থাকে, তা হলে একই সাক্ষ্য থেকে তারা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়ার সম্পর্কের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পশ্চিমবঙ্গে যাঁদের অসুবিধা হচ্ছে (এঁদের মধ্যে আরও আছেন শ্রীআনন্দ লাল, যিনি সমালোচনা লিখেছেন কলকাতার *টেলিগ্রাফ* কাগজে, ৬ অগাস্ট ১৯৮৮ তারিখে) তাঁদের সঙ্গে আমার সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষায় নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। অপরপক্ষে আর্জেন্টিনা থেকে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে, যিনি আমার বইটি নিজে যত্ন ক'রে পড়েছেন, অন্যদেরও পড়িয়েছেন, এবং আমার সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিতে এঁদের কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না, কেননা অন্য দেশের মানুষ হলেও বিশ্ববীক্ষায় এঁরা সম্ভবতঃ আমার কাছাকাছি। এঁরা বিস্মিত— আর্জেন্টিনার মেয়ে না হয়েও তাঁদের ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোকে আমি এত ভালোভাবে এবং গভীরভাবে বুঝলাম কী ক'রে,— নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসার জোরে। এবং এঁরা মনে করেন যে আমার বিশ্লেষণ ভিক্তোরিয়ার আবেগগত বিবর্তনকে

বুঝতে তাঁদের সাহায্য করছে। পত্রলেখক জানান যে আত্মজীবনীর মুদ্রিত রূপে ওকাম্পোর উত্তরজীবনের জনৈক অনুগত শিষ্যার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আছে (আমি যেমন আঁচ করেছিলাম), এবং তিনি এমন আশাও পোষণ করেন যে ভবিষ্যতে আমিই ভিক্টোরিয়ার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করবো! অবশ্য সেই দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার কাজ কোন্ উৎস থেকে অর্থসাহায্য পেতে পারে তা তিনি জানান নি।

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্টোরিয়ার ব্যাপারে আমার বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত এমন কয়েকজন বাঙালীর চিঠিও আমার কাছে পৌঁছেছে। এ ছাড়া আর যাঁরা বইটি প'ড়ে সাগ্রহে চিঠি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অবাঙালী ভারতীয় এবং ইংরেজ। নিশ্চয়ই এঁদের সঙ্গে বিশ্ববীক্ষায় আমার যথেষ্ট মিল রয়েছে, তাই একই সাক্ষ্য থেকে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্টোবর ১৯৮৮

জিজ্ঞাসা ৯ : ৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৫ [১৯৮৮-৮৯]

শয়তানী পদাবলী প্রসঙ্গে কিছু চিন্তা

চলতি বছরে (১৯৮৯) যখন কয়েক মাসের জন্য ভারতে ছিলাম তখন সাল্‌মান রুশ্‌দির বিতর্কিত বই *দ্য স্যাটানিক ভার্সেস্‌* (ভাইকিং, লণ্ডন, ১৯৮৮) সম্পর্কে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। তখনও বইটি পড়ি নি। সম্প্রতি বইটি পড়লাম। যে-দু'-চার কথা মনের মধ্যে দানা বাঁধছে সেগুলিকে গোছানোর চেষ্টায় এই লেখা। বইটি আপনাদের কাছে অপ্রাপ্য, তাই খুব বেশী খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়া অর্থহীন হবে। এমন একটা আলোচনার সূত্রপাত করতে চেষ্টা করছি, যা অত্যধিকভাবে আনুপুঙ্খিক না হয়েও আপনাদের ভাবনাকে উস্‌কে দিতে পারে।

প্রথমেই বলতে হয় যে বইটিকে নিয়ে গোঁড়া মুসলমান সমাজে যে এত প্রবল আপত্তির ঢেউ উঠেছে, তা নেহাৎ অকারণে নয়। বলাই বাহুল্য, আমি ধর্মান্ধদের হিংস্র দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক নই, কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই বইয়ের মধ্যে এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যেগুলি গোঁড়া মুসলমানদের কাছে আপত্তিকর ঠেকতেই পারে, এমন কি যাঁরা গোঁড়া নন তাঁদের কাছেও তাঁদের ঐতিহ্যের পক্ষে অসম্মানজনক ব'লে মনে হতে পারে। তাঁদের কাছে সম্ভবতঃ সব থেকে বেশী অপ্রীতিকর 'রিটার্ন টু জাহিলিয়া'-নামক বিভাগের একটি অংশ, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে জাহিলিয়ার গণিকালয়ে গণিকারা মাহুণ্ড অর্থাৎ পয়গম্বর মহম্মদের বারোজন স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে খদ্দেরদের যৌন ফ্যান্টাসিকে তৃপ্ত করতেন। অংশটি সুলিখিত, কিন্তু রুশ্‌দি অথবা তাঁর প্রকাশক যে কী ক'রে ভাবলেন ঐ পাতাগুলি বার ক'রে তাঁরা পার পাবেন তা আমি জানি না। বর্তমান সময়ে ইসলামী গোঁড়ামির একটা অসহিষ্ণু আগ্নেয় রূপ সর্বত্র বর্ধমান ; আলোচ্য পাতাগুলি যে ঐ আগুনে ঘৃতাহুতি দেবে তা কি তাঁরা বুঝতে পারেন নি, অথবা বুঝেও বুঝতে চান নি ?

দ্বিতীয়তঃ, বইটির নামকরণের মধ্যেই এমন একটা ব্যঞ্জনা আছে যা ধার্মিক মুসলমানদের কাছে অপ্রীতিকর। বইটি পড়লে জানা যাবে যে তার ভিতরের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ নামের একটা সীমাবদ্ধ মানে আছে। কিন্তু যে-কোনো বইয়ের নামকরণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, পাঠক বই প'ড়ে উঠবার আগেই তা সমগ্র গ্রন্থের পরিচয় বহন করে। নাম বইকে চিনিয়ে দেয়। তাই মনে হয় যে একটা দ্ব্যর্থকতা এখানে ইচ্ছে ক'রেই রেখে দেওয়া হয়েছে, একটা ইঙ্গিত,— যেন সমগ্র কোরানই 'শয়তানী পদাবলী'।

তৃতীয়তঃ, মহম্মদের মডেলে রুশ্‌দি যে-চরিত্রটি তৈরি করেছেন তার জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন 'মাহুণ্ড' নামটি। এটি 'মহম্মদ' নামেরই একটি মধ্যযুগীয় ইংরেজী রূপ। মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে এই নামটি সদর্থক অর্থ বহন করে না। এর মধ্যে আছে মিথ্যা পয়গম্বর, ঝুটা দেবতা, শয়তানের একটি নাম ইত্যাদি

অনুষঙ্গ। অভিধানেও এই সব অনুষঙ্গ স্বীকৃত। ইসলামের প্রতি মধ্যযুগের ইয়োরোপে বিদ্বেষের এবং অবজ্ঞার যে-মনোভাব ছিলো, তা এই নামের মধ্যে ঘনীভূত। সে-ক্ষেত্রে এই নামের নির্বাচন লেখকের একটা বিশেষ পক্ষপাতেরই স্থচক।

কিছু দিন আগে একটি খবরে পড়লাম যে সৌদি আরব দেশে প্রবেশরত কেরলের একজন এঞ্জিনীয়রের মালপত্রের মধ্যে কথাকলি-নাচ-বিষয়ক একটি বই এবং অন্য একটি প্রখ্যাত মলয়ালী সাহিত্যগ্রন্থ পাওয়া যায় এবং হিঁদুয়ানি প্রচারের উপকরণ হিসাবে তাদের পোড়ানো হয়। এ কথা প'ড়ে আমাদের মুখে হাসি ফুটতে পারে বটে। কিন্তু রুশ্‌দির *শয়তানী পদাবলী* বইটিকে কেন্দ্র ক'রে গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে যে-বিক্ষোভ জেগেছে তা ঠিক হেসে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়। গা ঢাকা দেবার আগে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রুশ্‌দি বলেন যে তিনি চান মহম্মদকে মানুষ হিসাবে দেখা হোক। কিন্তু মহম্মদ তো মানুষই, যদিও বিশ্বাসীর বিশ্বাস অনুসারে তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত, অতএব বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বটেন। ভারাক্রান্ত 'মাহুণ্ড' নামটি স্পষ্টতঃ রুশ্‌দির ঘোষিত উদ্দেশ্যের বিরোধিতাই করে। লেখক সম্ভবতঃ চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজে সেক্যুলার চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে,— অন্ততঃ তর্কের খাতিরে এটুকু আমরা মেনে নিতে পারি। কিন্তু এই চিন্তাবিপ্লব প্রয়োজনীয় এবং কাম্য হলেও তাকে আনবার জন্য এ ধরনের বই-ই প্রকৃষ্ট কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি যে তাঁর বই গোঁড়ামিকে আরও মূলবদ্ধ করেছে। বৃটেনে প্রতিক্রিয়া দুই শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত। এক দিকে 'উদারনৈতিক' বুদ্ধিজীবীরা লেখকদের বাক্‌স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। টোনি হ্যারিসন নামে একজন কবি রুশ্‌দির সপক্ষে একটা পুরো টেলিভিশন অনুষ্ঠান ক'রে ফেললেন। ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ চান নি যে সেটি প্রচারিত হয়, তবু তা হয়েছে। অন্য দিকে গোঁড়া মুসলমানরা চান যে এই বইয়ের প্রচার বৃটিশ সরকার-কর্তৃক নিষিদ্ধ হোক। খৃষ্টধর্মসংক্রান্ত প্রকাশের ব্যাপারে বৃটেনে ব্ল্যাস্‌ফেমি-বিরোধী আইন আছে। গোঁড়া মুসলমানরা বলছেন যে সেই আইনের পরিধি বর্ধিত হওয়া উচিত, ইসলামসংক্রান্ত প্রকাশও যেন তার আওতায় আসে। এই আন্দোলনের যাঁরা ঠাণ্ডা মাথার নেতা তাঁদের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে কর্তৃপক্ষের উপরে চাপ সৃষ্টি ক'রে এই পরিবর্তন আনা। কিন্তু চরমপন্থীরা খোমেইনির উস্‌কানি পেয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদীরা এখনও বইয়ের দোকানের সামনে বোমা ফাটানোর চেষ্টা করছেন। অনুমান করি রুশ্‌দির মাথা এখনও তাঁদের ঈপ্সিত। অতএব তাঁর অজ্ঞাতবাস যে শীঘ্রই শেষ হবে তা তো মনে হয় না।

মনে হয় ইতোমধ্যে বেশ খানিকটা মুনাফা লুটে নিচ্ছেন বইটির প্রকাশক। অবশ্য তাঁদের বইয়ের দোকানগুলির এবং তাঁদের রক্ষান্যস্ত লেখকের নিরাপত্তার ব্যবস্থায় তাঁদের কিছুটা টাকা ঢালতে হচ্ছে, তবে দিয়ে-থুয়েও নিশ্চয় তাঁদের হাতে মন্দ টাকা থাকছে না। শুনছি বৃটেনেই বইটির দু' লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, পেপারব্যাকের প্রকাশও নাকি আসন্ন। রয়াল্‌টির সূত্রে লেখকও নিঃসন্দেহে সেই মুনাফার অংশভাক্‌, যদিও অজ্ঞাতবাসে ব'সে সেই উপার্জন তিনি কিভাবে ভোগ করবেন তা জানি না। সম্প্রতি টেলিভিশন-আয়োজিত

একটি আলোচনাচক্রে পুস্তকবিক্রেতাদের একজন প্রতিনিধি এই মত প্রকাশ করলেন যে পেপারব্যাক প্রকাশ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে। তিনি মনে করেন যে এই সিদ্ধান্তের দ্বারা চরমপন্থীদের আন্দোলন দৃঢ়ীকৃত হবে। নিরপরাধ কতগুলি মানুষ, যাঁরা বইয়ের দোকানে বই কিনতে আসেন, অথবা সেখানে কাজ করেন, অকারণে প্রাণ হারাতে পারেন।

এই হৈচৈ-এর মধ্যে যে-কথাটা হারিয়ে যাচ্ছে সেটা হলো এই : সাহিত্যের বিচারে বইটি সত্যি কিরকম ? যে-দু' লক্ষ কপি এ দেশে বিক্রি হয়েছে তা কি হয়েছে সাহিত্যরসের গুণে ? *শয়তানী পদাবলী*-র নির্মাণরীতি বা শৈলী আদৌ সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বইয়ের বহু ব্যঙ্গ-ইঙ্গিত-রসিকতা কথিত হিন্দী-উর্দুর কিছুটা জ্ঞান ব্যতীত বোধগম্যই নয়। আমি না-হয় এগুলো ধরতে পারছি, কিন্তু নেটিভ ইংরেজরা ? যাঁরা হিন্দী বা উর্দু একেবারেই জানেন না ? তাঁরা হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে বইটা পড়ছেন কিসের লোভে ? মনে হয় এই তাগিদের একটা বড় অংশ হচ্ছে 'দেখি দেখি রুশ্‌দি ইসলামকে কিরকম বাঁশ দিয়েছেন'। লণ্ডনস্থ আমার এক বিচক্ষণ বান্ধবীকে রুশ্‌দির জনপ্রিয়তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দিলেন, 'যেহেতু সবাই জানে তিনি একটা দুষ্টুমি করেছেন। লণ্ডনের সাহিত্যিক মহল দুষ্টুমি বড় ভালোবাসেন।'

রুশ্‌দির কলম নিঃসন্দেহে এক ধরনের ক্ষমতা ও চাতুর্যের অধিকারী। আমি কিন্তু তাঁর লেখায় সেই সংবেদনশীলতা ও অনুকম্পা, সেই রূপ-রস-প্রজ্ঞা পাই না যা আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্য জগৎ শক্তিমত্তা ও চাতুরীর বিশেষ সমঝদার, তাই *মিডনাইট্‌স্ চিল্‌ড্রেন*-এর প্রকাশকাল থেকেই তিনি বাহবা পেয়ে আসছেন ; কিন্তু সাম্প্রতিক ডামাডোলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করবার সময় এসেছে: রুশ্‌দির উপন্যাসগুলিতে মহৎ সাহিত্যের অভিজ্ঞান কতদূর উপস্থিত ?

তাঁর প্রথম উপন্যাস *গ্রাইমাস্* আমি পড়ি নি। যে-বর্ণনা পড়েছি, তা থেকে মনে হয় না যে উপন্যাসটি আমাকে আকর্ষণ করবে। যাই হোক, যে-বই পড়ি নি সে-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা ধৃষ্টতা হবে। *মিডনাইট্‌স্ চিল্‌ড্রেন* নতুন ধরনের লেখা, মনে কিছুটা দাগ কাটবেই। আমার ভালো লেগেছিলো প্রথমার্ধ, যেখানে লেখকের পারিবারিক পটভূমিকা এবং বোম্বাইয়ে বাল্যকালের স্মৃতি একটা ছাপ রেখেছে। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি চ'লে যান বিশুদ্ধ ফ্যান্টাসিতে ; এ অংশ আমার তেমন বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে নি, আমাকে তেমন স্পর্শ করে নি। *শেইম*-এর চাতুর্য ও ঝাঁজ অনস্বীকার্য। এখানে রুশ্‌দি পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার এমন একটা ছবি আঁকতে চেয়েছেন যা হবে অবক্ষয়ের একটা বিরাট দেয়ালচিত্র। উপন্যাসটি আগাপাছতলা স্যাটায়ারের উপাদানে গঠিত। কোথাও কোনো বিশ্রাম, করুণা, স্নিগ্ধতা, বা মমতার মুহূর্ত নেই। কারও কারও এ ধরনের লেখা ভালো লাগতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এরকম ক্ষেত্রে উপন্যাসের উপন্যাসত্বে একটা ফাঁক থেকে যায়। তা ছাড়া থেকে যায় সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশ্ন। যে-অন্ধকার তিনি এঁকেছেন তা কি সত্যিই অতটা নিরেট ছিলো ? তার মধ্যে কি কোনো আশার শুকতারা, কোনো

সম্ভাবনার বীজ ছিলো না? ঐ গ্লানির আবহের ভিতরেও কিছু কিছু লোকের মধ্যে কিছু শুভবুদ্ধি যদি না থেকে থাকবে, তা হলে পাকিস্তানে সাম্প্রতিক কালে গণতন্ত্রের অভ্যুদয় কিভাবে সম্ভব হলো? এই সম্ভাবনার পূর্বাভাস কি রুশ্‌দির চালচিত্রে ধরা পড়া উচিত ছিলো না? *শেইম্‌* প্রবলভাবে রাজনৈতিক ব'লেই, তার মধ্যে জিয়া-ভুট্টো স্পষ্টতঃ উপস্থিত ব'লেই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক।

দ্য স্যাটানিক ভার্সেস্‌-এ থেকে থেকে সৃষ্টিশীল প্রতিভার একটা ঝলকানি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বইটিকে মহৎ সাহিত্যকীর্তি ব'লে আমার মনে হয় না। *মিডনাইট্‌স্‌ চিল্‌ড্রেন*-এর মতো এখানেও যেখানে যেখানে সম্ভবতঃ কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে, সেখানে জীবনের সত্য মুহূর্তের জন্য জ্ব'লে উঠেছে। যেমন বালক সালাহ্‌-উদ্দীন চামচাওয়ালার প্রথম বিলেতী অভিজ্ঞতাগুলির বিবরণে, যেখানে সম্ভবতঃ লেখকের নিজস্ব কিছু স্মৃতির পুঁজি বিনিয়োজিত। ছেলেটি স্কুলের প্রাতরাশে নব্বই মিনিট ধ'রে অন্যান্য নীরব বালকদের দৃষ্টির সামনে কাঁটাসুদ্ধ 'কিপার' (kipper) অর্থাৎ স্মোক্‌ড্‌ হেরিং-মাছ (নুন এবং কাষ্ঠধূম দ্বারা সংরক্ষিত শুঁটকি হেরিং) খায়, এবং তার মনে হয় যে 'ইংল্যাণ্ড একটা অদ্ভুত স্বাদের ধোঁয়ায় শুকানো মাছ, অজস্র কাঁটায় ভর্তি, আর সেটা কিভাবে খেতে হবে তা কেউ তাকে ব'লে দেবে না'। বর্ণনাটি মর্মস্পর্শী ও লক্ষ্যভেদী, কিন্তু এই ধরনের মুহূর্ত বইটিতে দুর্লভ। বইটির নির্মাণকৌশল জটিল, কিন্তু তার দ্বারা যে কোনো বড় মাপের শিল্পগত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তা বলতে পারি না। টুকরো টুকরো গল্পগুলি নিজেদের পথ ধ'রে চলে, পরস্পরকে এমনভাবে সাহায্য করে না যে সমস্ত জিনিসটা একটা মানবিক আয়তনের উপন্যাস হয়ে উঠবে। এই বইয়েও কোনো কোনো চরিত্র এক অর্থে জীবন থেকে নেওয়া। জিব্রীল ফারিশ্‌তা সীমাবদ্ধ অর্থে অমিতাভ বচ্চনের ছায়ায় গঠিত। সাদৃশ্যটা উপরে উপরে,— বেশী দূর যায় না। তা ছাড়া বচ্চন একজন সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব হিসাবে আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছেন, অর্থাৎ লেখক জানিয়ে দিয়েছেন যে বচ্চন আর ফারিশ্‌তার সমীকরণ যুক্তিযুক্ত হবে না। খোমেইনির চ'টে যাবার যথেষ্ট কারণ ছিলো, কেননা তাঁর ছায়ায় গঠিত একটি চরিত্রও আছে। উপরে উল্লিখিত চামচাওয়ালা বা সংক্ষেপে চামচা-র মধ্যে লেখকের বেশ কিছুটা আত্ম-অভিক্ষেপ আছে, এবং মনে হয় এই চরিত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁর ভারতীয় শিকড়বাকড় তথা বৃটিশ জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভারতীয় শিকড়বাকড়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রয়াস অর্ধমনস্ক ও অমনোযোগী ; যতটা ভঙ্গি আছে, ততটা বেগ নেই। ভারতীয় এবং বৃটিশ উভয় জীবনের রূপদানেই তিনি এত বেশী উদ্ভটরস ব্যবহার করেছেন যে তাঁর বক্তব্যগুলি ঠিক ক'রে প্রতিষ্ঠা পায় না, একটা গোলকধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যায়। যেখানে সব কিছুই মোটের উপর আজগুবি, আজগুবি হওয়াই প্রথম পাতা থেকে যে-বইয়ের ঘোষিত ধর্ম, সেখানে কাহিনীর বা চরিত্রচিত্রণের পরিচিত মাপকাঠিগুলি খাটে না। *শয়তানী পদাবলী*-র ঘটনাবলী বা চরিত্রদের কাছ থেকে জীবনের প্রতি কোনো বিশেষ বিশ্বস্ততা প্রত্যাশা করা বৃথা। এর প্রায় কোনো চরিত্র প্রীতিকর নয়, এমন নয় যাকে আপনার জানতে ইচ্ছা করবে, বোধ হয়

একমাত্র মির্জা সঙ্গঁদের চরিত্রটি ছাড়া। এই একটি চরিত্র আভাস দেয় যে হয়তো চেষ্টা করলে রুশ্‌দি অন্য জাতের উপন্যাসও লিখতে পারতেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি শয়ান আছেন আজব কল্পনার এক ক্ষীরসাগরে।

কেউ কেউ বলবেন, ক্ষতি কী, ফ্যান্টাসি গোত্রের কথাসাহিত্যে ঐরকমই হয়, তার মধ্যে খুব বেশী মানবিক আয়তন খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। হয়তো তাই; হয়তো রুশ্‌দিকে নিয়ে আমার অসুবিধার মূলই এই যে ফ়্যান্টাসি-নামধেয় আধুনিক জ্যঁরটির প্রতি আমার ব্যক্তিগত আকর্ষণ কম। অনেকেই বলেন যে রুশ্‌দি গুন্টার গ্রাস দ্বারা প্রভাবিত। গ্রাসের বিখ্যাত *টিনের ঢোলক* আমি অর্ধেকটা প'ড়ে বাকিটা আর শেষ করতে পারি নি। কাউকে কাউকে জানি যাঁদের *মিডনাইট্‌স্ চিল্‌ড্রেন* এবং *শেইম* পড়ার অভিজ্ঞতাও অবিকল তাই। রুশ্‌দির একজন বিশেষ প্রিয় লেখক মিলান কুন্দেরা। কৌতূহলপ্রণোদিত হয়ে এঁর একটি বই পড়েছিলাম, কিন্তু মুগ্ধ হই নি।

লাতিন-মার্কিনরা নাকি ফ্যান্টাসি রীতির প্রতিভূ। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর *নির্জনতার এক শতাব্দী* প'ড়ে মনে হয়েছিলো বটে যে হ্যাঁ, একটা আশ্চর্য বই পড়লাম, যদিও আমার ধারণা এখানেও শেষের দিকে ফ্যান্টাসির আতিশয্য শিল্পের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। ইসাবেল আলিয়েন্দে-র *প্রেতাত্মাদের বাসভবন* ফ্যান্টাসি হয়েও মানবিক আয়তনে লক্ষণীয়ভাবে সমৃদ্ধ। আমার বিশেষ ভালো লেগেছে শ্রীমতী আলিয়েন্দে-র আরেকটি উপন্যাস, *প্রেম এবং ছায়াদের বিষয়ে*, যেখানে মানুষিক কাহিনীই প্রবল, উজ্জ্বল, এবং মর্মস্পর্শী। এই তিনটি বইয়ের জাদু কিন্তু রুশ্‌দির বইগুলিতে নেই।

শয়তানী পদাবলী-র শিল্পগত কাজগুলি মোটা দাগের, বোম্বাইয়ের 'ব্লকবাস্টার' সিনেমার মতো। সূক্ষ্মতা বা সৌকুমার্য তাদের প্রধান গুণ নয়। একটা বড় অন্তরায় লেখকের ভাষা। সেখানে রূপের চাইতে মুদ্রাদোষ এবং স্থূল রসিকতা বেশী। ইংরেজী তথা ভারতীয় উৎসের খিস্তির ফেনা পেরিয়ে রসের চুমুকে পৌঁছতে আমার অন্ততঃ বেশ অসুবিধা হয়। এই মাত্রাতিরিক্ত খিস্তিপ্রয়োগের কোনো শৈল্পিক সার্থকতা আমি দেখতে পাই না। এটাকে আমার বিরক্তিকর নাবালকত্ব ব'লেই মনে হয়। ক্রমাগত এই সব ভুড়ভুড়ি ফাটার আওয়াজে সারের অভাব ঢাকা পড়ে না। হিন্দী-উর্দু শব্দ, বাক্যাংশ বা বাগ্‌রীতিকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেন তা যে তাঁর শৈলীকে কোনো বিশেষ জাদু দেয় এমন বলতে পারি না। এই অংশগুলি ঝোলের উপরে প্রয়োজনাতিরিক্ত তেলের মতন ভেসে থাকে। হয়তো এদের সাহায্যে ইংরেজ পাঠকদের কাছে একটা মজাদার ভারতীয় আবহ তৈরি হয়, কিন্তু এর মধ্যে একটা চালাকি বা প্রতারণা আছে। রুশ্‌দির কাছে এগুলি বুকনি-মাত্র, কথার ফোড়ন, উপরের অলংকার। এগুলি বড় জোর একটা ভিন্ন আবহের মেজাজ সৃষ্টি করে, বড় জোর ব্যঙ্গচিত্রের আভাস আনে, কিন্তু এদের সাহায্যে আমরা কখনো কোনো ভারতীয় মননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি না। রুশ্‌দি এগুলো মশলার মতো ছিটিয়ে দেন বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি মূলতঃ একভাষী লেখক। উর্দুতে তিনি লেখেন না, লিখতে পারেন না। এই অক্ষমতার কি একটা বৌদ্ধিক পরিণাম নেই, থাকবে না?

আমার তো মনে হয় পরিণাম আছে, থাকতে বাধ্য। রুশ্‌দি যদি সত্যিই উর্দুতেও বই লিখতে পারতেন, উর্দুভাষী আধুনিক পাঠকসমাজের সঙ্গে, তাঁদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর যদি একটা প্রত্যক্ষ, হার্দ্য যোগ থাকতো, তা হলে এই বইয়ে তিনি যে-বেহিসাবী কাজ করেছেন সেটা হয়তো করতেন না। হয়তো তা হলে তাঁর ভারতবিষয়ক কথাশিল্পের টিউনিংটা সূক্ষ্মতর হতো, কথাসাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামী গোঁড়ামির সমালোচনা কিভাবে করতে হবে সে-বিষয়ে তিনি ঢের বেশী বিচক্ষণ হতেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপের ক্রুসেডারদের মতন ঝাঁপিয়ে পড়তেন না,— যেমন এখন করেছেন। অবশ্য তা হলে তিনি লণ্ডনের হাততালি পেতেন কিনা তা বলতে পারি না। এখানে সীমাবদ্ধ ভারতীয়ত্বরই (এবং 'দুষ্টুমি'র) কদর বেশী।

শয়তানী পদাবলী-তে অলৌকিক ঘটনাবলী খুব বেশী। এখানে শূন্যে বোমা-বিধ্বস্ত বিমান থেকে প'ড়ে গিয়েও লোক বাঁচে, মানুষের মাথায় রীতিমতো শিং গজায়, আত্মঘাতিনীর প্রেত যখন-তখন ভেসে আসে, প্রজাপতির ঝাঁক নগ্নদেহকে ঢেকে দেয় ইত্যাদি। তা ছাড়া পয়গম্বর মহম্মদের জীবন, সময়, সমসাময়িক সমাজকে নিয়ে কাহিনী রচনার চেষ্টা করেছেন লেখক। এই অংশে অনস্বীকার্য বৈদগ্ধ্য আছে; মনে হয় তিনি বেশ খানিকটা পড়াশোনা ক'রে নিয়েছেন। তবু জিজ্ঞাস্য : রুশ্‌দি যদি মহম্মদকে মানুষ হিসাবে দেখতে চেয়ে থাকেন, গোঁড়া ধার্মিকদের পৌরাণিকতাকে ভাঙতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তবে অলৌকিকতার উপর নির্ভরশীল, মিথরচনায় আগ্রহী তাঁর এই আঙ্গিক কতটা উপযুক্ত? আধুনিক মিথের সৃষ্টির দ্বারা কি সেক্যুলার মূল্যবোধের এবং যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, হওয়া সম্ভব? না কি তার জন্যে ঢের বেশী কাজের হতো যুক্তিধর্মী প্রবন্ধ? রুশ্‌দি প্রবন্ধের মাধ্যমে গোঁড়া মুসলমানদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামেন না কেন? *শয়তানী পদাবলী*-তে তাঁর উদ্দেশ্য ও আঙ্গিকের মধ্যে কি একটা বিরোধ নেই?

এই প্রবন্ধ যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জানেন যে আমার নিজের একটি বইয়ে আমি উপন্যাস আর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধকে একসঙ্গে ব্যবহার করেছিলাম। আমার ধারণা, ঐ মিশ্র আঙ্গিকের সাহায্যে আমি এমন কতগুলো বক্তব্যকে রূপ দিতে পেরেছিলাম, যেগুলো বিশুদ্ধ উপন্যাস বা বিশুদ্ধ প্রবন্ধের মাধ্যমে ধরা পড়তো না। আমি চেষ্টা করেছিলাম যাতে দুটো জিনিস পরস্পরকে আলোকিত করে, অথচ তাদের মধ্যে একটা সীমারেখা বজায় থাকে। *শয়তানী পদাবলী*-র কৌশল এর ঠিক উল্টো। রুশ্‌দি সব কিছু গুলে, ঘেঁটে, হাতা দিয়ে নেড়ে, সজোরে মন্ত্র প'ড়ে— খিস্তির মন্ত্র— একাকার ক'রে দিতে ভালোবাসেন। তাঁর আঙ্গিক ফ্যান্টাসি তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু কোনো বৌদ্ধিক বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দেয় না। আমার নিজের সন্দেহ, রূপকথা রচনাই তাঁর আসল লক্ষ্য, ভাবনাজগতে কোনো পরিবর্তন আনা তাঁর কাছে গৌণ ব্যাপারমাত্র। বইটির মধ্যে তৃতীয় বিভাগে তিনি খামকা একটি আর্জেন্টাইন কাহিনী ঢুকিয়েছেন, গল্প বলা ছাড়া যেটির আর কোনো ভূমিকা দেখি না। তিনি গল্প বলুন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কথা

হচ্ছে বড়দের জন্য আজগুবি গল্প বলাই যদি তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য হয়, তা হলে মহম্মদকে নিয়ে টানাটানি করার কী প্রয়োজন ছিলো ?

সাংবাদিকরা ফরাসী কায়দায় যার নাম দিয়েছেন 'লাফেয়ার রুশ্‌দি', সেই রুশ্‌দি অ্যাফেয়ারের হট্টগোলের মধ্যে অনেক প্রাসঙ্গিক কথাই চাপা প'ড়ে যাচ্ছে, আলোচিত হচ্ছে না। আগেই বলেছি যে রুশ্‌দির লেখায় আমি যথেষ্ট সংবেদনশীলতা ও অনুকম্পার স্পর্শ পাই না। তিনি মুসলমানদের কিভাবে আঘাত দিয়েছেন সেই ব্যাপারটা আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু *শয়তানী পদাবলী*-তে বৃটেনের কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাফ্রো-ক্যারিবীয় সম্প্রদায়ের চিত্রণ মোটেও প্রীতিকর নয়, এবং সাধারণভাবে,— তাঁর প্রধান তিনটি উপন্যাসেই এ কথা সত্য,— মেয়েদের তিনি সহানুভূতির সঙ্গে আঁকেন না। তিনি যখন মেয়েদের বর্ণনা করেন তখন তাঁর বর্ণনায় প্রায়ই একটা ঘৃণার এবং অবজ্ঞার ভাব থাকে। তাঁর লেখায় নারীপ্রকৃতির, শিশুপ্রকৃতির, নিছক প্রকৃতির, অথবা সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখের বিশেষ স্বীকৃতি বা সমাদর নেই। এই অভাব একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতাই বটে। রুশ্‌দি মূলতঃ গ্রোটেস্ক্ বা বীভৎসরসের রসিক। তাঁর মধ্যে আমি সেই কবির মন পাই না, যাকে আমি উপন্যাসেও খুঁজি, যাকে বাদ দিয়ে, আমার মতে, মহৎ সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ তাঁর মধ্যে কখনও কখনও বর্ণবিদ্বেষ বা নারীবিদ্বেষের একটা বিপজ্জনক আভাসই দেখতে পাওয়া যায়।

উদ্ভট গল্পে বাস্তবানুগতার প্রশ্ন ওঠে না, তবু লেখক যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছবি আঁকেন, তাদের মধ্যে কিছু-কিছু পার্থক্যও থাকে, তখন তাঁর শিল্পসার্থকতা বিচারের আর কী মানদণ্ড থাকতে পারে জানি না। একটি বৃটেনপ্রবাসী বাংলাদেশী রেস্তোরাঁ-পরিবারের যে-ছবি তিনি এঁকেছেন, তা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে না। পরিবারের কর্তা মহম্মদ সুফিয়ান বেঁটে এবং মোটা, এককালে ঢাকায় স্কুলশিক্ষক ছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রাচীন সাহিত্যে তিনি পারদর্শী। তিনি যে কেবল ঋগ্বেদ আর কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন তা নয়, লাতিন সাহিত্যও তাঁর নখদর্পণে। তাঁর গৃহিণী হিন্দ্, বয়স্ক মহিলাদের বর্ণনায় রুশ্‌দির সাধারণ নিয়ম মেনে, ভয়ংকর মোটা তো বটেই,— রুশ্‌দির জগতে মোটা হওয়াটা একটা নৈতিক ও নান্দনিক অপরাধ,— উপরন্তু চেঁচিয়ে কথা বলেন, এবং তাঁর ঢাকাবাসকালে তিনি তাঁর পণ্ডিত স্বামীর যোগ্য হয়ে উঠবার সাধনায় 'বিভূতিভূষণ ব্যানার্জির উপন্যাস আর টাগোরের মেটাফিজিক্সের সঙ্গে ধস্তাধস্তি' করেছিলেন। তাঁর স্বামীর ছিলো মুক্ত অনেকান্তবাদী সেক্যুলার মন ; ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলিকে তিনি আপন ক'রে নিয়েছিলেন। বেচারী হিন্দ্ পতির মতো বৌদ্ধিক জগতে বিচরণ করতে না পেরে আপন ক'রে নিয়েছিলেন কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রন্ধনপ্রণালীগুলিকে। তিনি ভালোবাসতেন রাঁধতে আর খেতে। এবং অত খাওয়ার ফলেই তাঁর শরীরে একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে, 'কেননা অত সব খাবারকে তো কোথাও না কোথাও আশ্রয় পেতে হবে, এবং ক্রমশঃ তাঁর সাদৃশ্য ফুটে উঠতে লাগলো সেই বিশাল গড়িয়ে-যাওয়া স্থূলভাগের সঙ্গেই, সীমানাবর্জিত উপমহাদেশের সঙ্গে, কারণ আপনি

যে-সীমানার কথাই তুলুন না কেন, খাবার তাকে পেরিয়ে যায়'। এটি কোনো ঔপন্যাসিক মনুষ্যচরিত্র নয়, বৃহদাকার ব্যঙ্গচিত্র। সুফিয়ান আর হিন্দ্ দুজনে বাঙালী চরিত্রের ক্যারিকেচর, একজন বাঙালী পুরুষের বিদ্যানুরাগের, অন্যজন বাঙালী নারীর রন্ধনভোজনবিলাসিতার।[১] লক্ষণীয়, লেখক কিভাবে দুম্ ক'রে দুজন বিখ্যাত বাঙালীর নাম এই বর্ণনার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, নাম ছিটানোর কায়দায়। কিন্তু বিভূতিভূষণ আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঢাকার মেয়েকে অত 'ধস্তাধস্তি' করতে হবে কেন? এঁরা তো যে-কোনো বাংলাভাষীর স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। আর সাধারণ বাঙালী মেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মেটাফিজিক্স' নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে খুব সম্ভব রবীন্দ্রসংগীতের রসেই ডুবে থাকবেন। আমার আন্দাজ যে আসলে 'ধস্তাধস্তি' করতে হয়েছে রুশ্‌দিকেই। সম্ভবতঃ তিনি ইংরেজী টেক্সটে এই লেখকদ্বয়কে নিয়ে 'ধস্তাধস্তি' করেছেন, ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো রসের স্বাদ হয়তো পান নি। অন্ততঃ বাক্যটি প'ড়ে তাই মনে হয়। বিভূতিভূষণ বা রবীন্দ্রনাথের নাম তাই রুশ্‌দির কথাসাহিত্যে উর্দু বুকনির মতোই কেবল ফোড়নের মশলা। এই উল্লেখের মধ্যে আমি তো কোনো বুঝদার মনের ছাপ পাই না, বরং একটা সস্তা চালিয়াতিই দেখতে পাই। পাশ্চাত্য সমালোচকরা রুশ্‌দির মধ্যে একজন 'আন্তর্জাতিক' লেখকের সন্ধান পেয়েছেন। সেই 'আন্তর্জাতিকতা' যে প্রকৃতপক্ষে কতটা সীমাবদ্ধ তা এই ধরনের ফাল্‌তু মন্তব্যের মধ্যে ধরা প'ড়ে যায়।

ভাগ্যের পরিহাস এই যে রুশ্‌দি আজ জগৎসভায় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এক্সটার্নাল স্টাডিজ্' বিভাগের একটি চল্‌তি কোর্স বিষয়ে একটি কাগজ আমার হাতে এসেছে। পাঠ্যক্রমটির নাম 'বৃটিশ রাজের আগে এবং পরে: ভারতের পরিবর্তনশীল সাহিত্যগুলি'। কিন্তু নাম শুনে আপনাদের যা মনে হবে, কোর্সটি তা নয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে:

> ইংরেজীতে প্রাপ্তব্য ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশাল পরিসরের ভূমিকাস্বরূপ এই পাঠ্যক্রম। অধ্যয়নের জন্য যে-গ্রন্থগুলি নির্বাচিত হয়েছে সেগুলি অনেক শতাব্দীর মধ্যে সেতুবন্ধন করে, খৃষ্টোত্তর চতুর্থ শতাব্দী থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত। এগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত: প্রাচীন সংস্কৃত ঐতিহ্য, বৃটিশ রাজত্বের সময়ে অথবা তার বিষয়ে লেখা উপন্যাস, এবং সমকালীন ভারতের বহু কণ্ঠস্বরের মধ্যে কয়েকটি।

তার পর পাঠ্যসূচী। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদের মাধ্যমে কিছু নমুনা: কবিতা, কাহিনী, এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল। তার পরেই, বহু শতাব্দী বাদ দিয়ে,— না, সেতু-টেতু বেঁধে নয়, একেবারে ঝাঁপ দিয়ে,— মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলিকে একেবারে না ছুঁয়ে, আমরা সোজা চ'লে আসি বিংশ শতাব্দীতে, এবং কিমাশ্চর্যমতঃপরং আদৌ ভারতীয় সাহিত্যে নয়,

একেবারে ইংরেজী সাহিত্যে : রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙের *কিম্*, ই. এম. ফর্স্টারের *আ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া*, এবং পল স্কটের *স্টেইং অন্*। সব শেষে সমকালীন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে এ. কে. রামানুজনের অনুবাদে অনন্তমূর্তির উপন্যাস *সংস্কার*, ঐ রামানুজনেরই *সিলেক্টেড পোয়েম্‌স্*, এবং রুশ্‌দির *মিডনাইট্‌স্ চিল্‌ড্রেন*।

কোর্সটি যিনি তৈরি করেছেন এবং পড়াচ্ছেন তাঁর ডক্টরেটসমেত ছুটি স্নাতকোত্তর উপাধি আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ব'লে তাঁর কিছু আছে ব'লে তো মনে হয় না। নয়তো তিনি কী মনে ক'রে ঐ শিরোনামের নীচে এ হেন একটি পাঠ্যসূচী তৈরি করতে পারলেন। 'এক্সটার্নাল স্টাডিজ্' বিভাগের কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়। এ থেকে কোনো ডিগ্রীলাভ হয় না। সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষেরা সপ্তাহে একদিন এ ধরনের ক্লাস করতে আসেন। তাই ব'লে এই বিভাগের কাজে এতটা হেলাফেলা থাকবে? বরং কিছুটা বাড়তি যত্ন নিয়েই তো এই বিভাগের কর্মসূচী প্রস্তুত করা উচিত, যাতে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৌদ্ধিক বিভ্রান্তি না ছড়ায়। বিদ্যার জগতে, একটা স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার নীচে, এমন হেলাফেলা শোভা পায় না। বৃটিশ রাজের আগে মানেই একেবারে সংস্কৃত সাহিত্য? সংস্কৃত সাহিত্য আর বৃটিশ রাজের মাঝখানে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে আর কিছু নেই? আর কিপলিং-ফর্স্টার-স্কট ভারতীয় সাহিত্য? উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ট্যাক্সনমি বা উদ্ভিদদের জাতকুলবিচার একটা বড় শাখা। বলতেই হয়, বটানির মতন সাহিত্যালোচনাতেও ট্যাক্সনমির একটা স্থান আছে। কোনো কোনো লেখক অবশ্যই একসঙ্গে একাধিক গোষ্ঠীর সভ্য হতে পারেন, কিন্তু ঐ তিনজন সে-জাতের লেখক নন। ভারত-বিষয়ে লেখা আর ভারতীয় লেখক হওয়া এক জিনিস নয়। বস্তুতঃ, যদিও শিরোনামে বলা হয়েছে 'ভারতের পরিবর্তনশীল সাহিত্যগুলি', কার্যতঃ কিন্তু পাঠ্যবস্তুর এই বিচিত্র সমাহারে একমাত্র কানাড়া ছাড়া (*সংস্কার*) আর কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা স্থান পায় নি। 'গৌরবে বহুবচন' হয়তো একেই বলে। রামানুজনের নিজের ইংরেজী কবিতা নেবার আগে তাঁর করা প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় কবিতার অনুবাদ নেওয়া সঙ্গততর হতো। আর উত্তর ভারতের কোনো ভাষারই প্রতিনিধি এখানে নেই। ইংরেজী *গীতাঞ্জলি* বা র‍্যাডিচির অনুবাদগুচ্ছ থাকতে পারতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই, আছেন রুশ্‌দি।

এই 'নাকের বদলে নরুন পেলাম'-জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জাতক। ১৮৩৫ সালে মেকলে বলেছিলেন যে ভারতের বৃটিশ শাসকদের এমন একটি ইংরেজীশিক্ষিত শ্রেণী তৈরি করতে হবে, যার সভ্যরা হবে 'রক্তে ও রঙে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতামতে, নীতিবোধে ও ধীশক্তিতে ইংরেজ'। ইংরেজীভাষী জগৎ এখনও এই শ্রেণীর লোকেদেরই ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি ব'লে গণ্য করে। তাই ভারতীয় ভাষার লেখকদের ডিঙিয়ে যে-ভারতীয়রা ইংরেজীতে লেখেন তাঁরাই ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তাঁরা ভারতের যে-ছবি আঁকেন তা-ই ভারতের যথার্থ চিত্র হিসাবে গৃহীত হয়। ভারতের কিছু কিছু 'স্মার্ট' সমালোচকও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মদত দিয়ে থাকেন।

তাঁদের কাছে লণ্ডন-নিউ ইয়র্কের হাততালিই সাহিত্যবিচারের নিকষ। এটা এক ধরনের নব্য উপনিবেশবাদ, নব্য মেকলে-বাদ। রুশ্‌দি নিজে চান বা না চান, এই নব্য উপনিবেশবাদ বা নব্য মেকলেবাদ স্বপ্রয়োজনে তাঁকে ব্যবহার করে।

রুশ্‌দি সেটা বোঝেন কিনা আমি জানি না। বৃটেনের বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবং থ্যাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে *শয়তানী পদাবলী*-তে সোচ্চার প্রতিবাদ আছে। তাঁর মধ্যে একটা দ্বিত্ব আছে: তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন, আবার নিজে তার দিকে বিপজ্জনকভাবে ঘেঁষেও গেছেন। মিসেস থ্যাচার এই বইয়ে উল্লিখিত হয়েছেন 'মিসেস টর্চার' নামে। অবশ্য সেজন্যে মিসেস থ্যাচার লেখকের মাথা দাবি করেন নি। এবং নিয়তির পরিহাস এই যে যদিও এই বইয়ে রুশ্‌দি বৃটিশ পুলিশের খুব খারাপ ছবি এঁকেছেন, তবুও বর্তমানে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঐ ঘৃণিত বৃটিশ পুলিশের সহায়তা ব্যতীত সম্ভবই নয়।

রুশ্‌দির বর্তমান জীবন তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পক্ষে নিঃসন্দেহে কষ্টকর অভিজ্ঞতা। শুনছি তাঁর মার্কিন স্ত্রীও নাকি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অজ্ঞাতবাসকে দুঃসহ মনে ক'রে তাঁকে ছেড়ে স্বদেশে চ'লে গেছেন। একে তিনি আধুনিক মার্কিন মেয়ে, তায় তিনি নিজে লেখিকা। আর কত দিন তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে লুকিয়ে থাকবেন? তাঁর কাছ থেকে সীতার স্টাইলের পাতিব্রত্য আশা করা যায় না। মনে হয় রুশ্‌দি এখন একেবারেই একা। কোনো লেখকের পক্ষে, কোনো মানুষের পক্ষে এ অবস্থা সুখকর হতে পারে না। এ যেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তিনি কি কোনো দিন নিরাপদে বাইরে বেরোতে পারবেন, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন? অনেকেই বলছেন, তাঁকে আত্মপরিচয় বদলাতে হবে, প্ল্যাস্টিক সার্জারির সাহায্যে মুখের চেহারা বদলাতে হবে, নয়তো তাঁর পক্ষে বাইরে বেরোনো নিরাপদ হবে না। কিন্তু চেহারা যদি বা বদলানো যায়, একজন লেখকের পক্ষে তাঁর স্বকীয় লেখার স্টাইল বদলানো কি সম্ভব? না কি তাঁকে বাঁচতে হবে দুই স্তরে— বাইরে বেরোবেন নতুন নামে, নতুন মুখে, ছদ্মপরিচয়ে, কিন্তু বই লিখে যাবেন আগের মতোই আগেকার নামে? কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া পুরো পরিচয়ে কেউ তাঁকে জানবে না?

লণ্ডনের সাহিত্যিক হোমরাচোমরাদের পৃষ্ঠপোষকতা রুশ্‌দি পেয়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি এঁরা তাঁকে বর্তমান দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম। প্রশ্ন তোলা যায়, তিনি যে-বিশ্রী বেকায়দায় পড়েছেন তার সমস্তটাই কি আপতিক, না কি এর পিছনে কোনো জটিলতর পটভূমি, কোনো প্রতিষ্ঠানের কায়েমী স্বার্থ আছে? তিনি কি কোনো গোষ্ঠীর হাতে 'ব্যবহৃত', দাবা খেলার বড়ে? যাঁরা তাঁকে সাহিত্যিক মহলে 'দুষ্টুমি করতে' প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, লুক্কায়িত লেখকের বই বিক্রি ক'রে যাঁদের মুনাফাবৃদ্ধি হচ্ছে, তাঁদের স্বার্থ কি এর সঙ্গে জড়িত?[২] 'আন্তর্জাতিক' লেখক হওয়ার একটা পরিণাম কি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কাছে আত্মবিক্রয়, এবং সে-ক্ষেত্রে আলোচ্য লেখকের নিঃসঙ্গ জীবনের রয়াল্‌টির টাকা কি এক ধরনের সান্ত্বনা-পুরস্কার?

মার্কিন কবি সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথের কথা মনে পড়ছে। এঁকেও লণ্ডনের সমালোচকরা খুব উপরে তুলেছিলেন, বীভৎসরসের লেখিকা হতে জোরসে মদত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর

মানসিক ভাঙনের সময়ে তাঁরা কিছু করতে পারেন নি, আত্মহত্যার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারেন নি।

ভারতে বইটির প্রচার নিষিদ্ধ ক'রে দিল্লী সরকার অনিবার্যতঃ বাক্‌স্বাধীনতা-প্রেমিকদের সমালোচনাভাজন হয়েছেন। লেখকদের বাক্‌স্বাধীনতায় আমরা কে না বিশ্বাস করি। এই পত্রিকা যাঁরা পড়েন, এখানে যাঁরা লেখেন, তাঁরা সকলেই এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। লেখা আমার বৃত্তি ; সুতরাং বাক্‌স্বাধীনতার সঙ্গে আমার নিজের স্বার্থও জড়িত। কিন্তু সব স্বাধীনতাকেই বুঝতে হবে একটা প্রসঙ্গে, একটা বাস্তবতার অভ্যন্তরে। জীবন তো কেবল তত্ত্বের ব্যাপার নয়, তার একটা ব্যবহারিক দিক আছে। আপনার স্বাধীনতা যদি হয় আমার পরাধীনতা, তা হলে সে-স্বাধীনতা অচল। হিংসার, পরপীড়নের, চৌর্যের, পর্নোগ্রাফির— এবংবিধ আরও অনেক কাজের— স্বাধীনতার কোনো ভিত্তি নেই। সব স্বাধীনতাই সীমাবদ্ধ।

এ ক্ষেত্রে দিল্লী সরকারের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিলো ব'লে মনে হয় না। আজ না হোক কাল এই বই গোঁড়া মুসলমানদের বিক্ষোভের কারণ হতোই, তাকে ঠেকানো যেতো না। অশান্তি এড়াবার জন্যই যে এই সরকারী সিদ্ধান্ত, বইটি পড়ার পরে এটুকু বুঝতে পারছি। সান্ত্বনা এই যে এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ভারতীয় পাঠকরা কোনো অনুপম সাহিত্যকীর্তির রস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না, এবং রাষ্ট্রের শান্তি হয়তো কিছুটা রক্ষিত হয়েছে।

স্বাধীনতা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও নিতে হবে। ট্র্যাফিকের স্রোতে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে যেমন, তেমন বই লেখা ও বার করার ক্ষেত্রেও কিছু-কিছু নিয়ম থাকাই স্বাভাবিক, যদিও সেগুলি অলিখিত হতে পারে। যখন আমরা চাইবো যে আমাদের আত্মপ্রকাশের উপরে কোনো সরকারী নিষেধাজ্ঞা যেন আরোপিত না হয়, তখন সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদেরই দায়িত্বশীল ও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠতে হবে। প্রয়োজনবোধে আত্মসংযম, লেখনীসংযম সেই কর্তব্যের অন্তর্গত। মনে হয় রুশ্‌দির সেখানেই একটা ত্রুটি হয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

[নীচের দুটি টীকা বর্তমান বইয়ের সম্পাদনাকালে (২০০৪) যোগ করেছি; প্রথম প্রকাশকালে কোনো টীকা ছিলো না।]

১ বলা দরকার, ঢাকার একজন প্রাক্তন স্কুলশিক্ষক, যিনি সংস্কৃত, আরবী এবং লাতিন থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন, যাঁর স্ত্রীও মোটামুটি লেখাপড়া জানেন কিন্তু রান্নাবান্না আর খাওয়াদাওয়ায় যাঁর আগ্রহ আরও বেশী, রেস্তোরাঁ খুলে বৃটেনে সংসার চালাচ্ছেন— এটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী ছবি। উপন্যাসের চরিত্রকে জাতিরূপ হতে হবে, সে ব্যতিক্রম হতে পারবে না, এমন মোটেই বলছি না— তা হলে তো আমাদের অনেককেই বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম অবলম্বনের দ্বারা স্রষ্টাকে কোনো-একটা উল্লেখযোগ্য বক্তব্য তো

তুলে ধরতে হবে। এখানে ক্যারিকেচর ছাড়া আর কোনো মতলব নেই। বাস্তবতা এই যে বৃটেনের বাংলাদেশী রেস্তোরাঁগুলির সিংহভাগ সিলেটীদের দ্বারা পরিচালিত, ঢাকাইয়াদের দ্বারা নয়। দোকানের রান্নাবান্নায় পুরুষরাই নিযুক্ত থাকেন, বাড়ির মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন না। এবং ঐ মেয়েরা, অর্থাৎ সিলেটী রেস্তোরাঁ-পরিবারের প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী মেয়েরা, কদাচিৎ রবীন্দ্রনাথ অথবা বিভূতিভূষণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেন।

২ 'দুষ্টুমি করা'র বাণিজ্যিক মূল্য প্রসঙ্গে অঞ্জন দত্তের একটি গান মনে আসছে, যেখানে শিল্পকলার ব্যাপারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিনেমা-পরিচালককে প্রযোজক বারবার অনুরোধ ক'রে যাচ্ছেন, 'একটা দুষ্টু গান ঢোকান না দাদা, দুষ্টু গান ঢোকান'। একটা সিরিয়াস ছবির ভিতরে যেভাবে হোক কসরত ক'রে একটা 'দুষ্টু-মিষ্টি' গান ঢুকিয়ে দিলে সেটার জোরেই টিকিট বিক্রি হবে, আর তার পর প্রমাণিত হয়ে যাবে যে ভালো ছবিও 'চলে'!

জিজ্ঞাসা ১০ : ৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৬ [১৯৮৯-৯০]

[প্রবন্ধটি পরে *'জিজ্ঞাসা' সংকলন*-এর অন্তর্ভুক্ত হয় (সম্পাদনা: শিবনারায়ণ রায়, প্যাপিরাস, ১৯৯২)। রুশ্‌দির বিষয়ে ১৯৯০ সালে লেখা আমার একটি ইংরেজী প্রবন্ধ ('Reflections on the Rushdie Affair') কিন্তু সেই সময়ে প্রকাশিত হতে পারে নি, বাধা পেয়েছে, বলা উচিত সেন্সর্ড হয়েছে। সেটি বহুদিন বাদে অকর্তিত রূপেই ছাপা হয় ক্যানাডা থেকে প্রকাশিত একটি দ্বৈভাষিক পত্রিকায়— *বাংলা জর্নাল* ৩ : ২, ভাদ্র ১৪০৮ (অগাস্ট ২০০১)।]

একালের বাঙালী মেয়ে : কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত

গতকাল গভীর রাত্রে— হ্যাঁ, সত্যিই গভীর রাত্রে, রাত বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট থেকে আড়াইটে পর্যন্ত জেগে থেকে এবং একমুহূর্তের জন্যও তন্দ্রালু বোধ না ক'রে,— বৃটেনের চতুর্থ টেলি-চ্যানেলে প্রচারিত শ্রীমতী অপর্ণা সেনের *সতী* ছবিটি দেখার পর, আজ সকালে উঠে 'পরিশোধিত' চিত্তে একালের বাঙালী মেয়েদের বিষয়ে ধ্যান করতে বসেছি। প্রথমেই একটি কথা উল্লেখ ক'রে নিতে হচ্ছে, যা আমাদের বিষয়ের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। এখানকার তৃতীয় ও চতুর্থ টেলি-চ্যানেলের কার্যক্রম যে-পত্রিকাটিতে পূর্ণাঙ্গভাবে ছাপা হয়, সেখানে অপর্ণা সেনের ফিল্মটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে : 'ভারত, ১৯২৮। সতীদাহপ্রথা তখনও চলছে। ... ইংরেজী সাবটাইট্‌ল্-সহ একটি হিন্দী ছবি।' এক অর্থে দুটোই তুচ্ছ ভ্রান্তি। প্রথমটা হয়তো স্রেফ মুদ্রণপ্রমাদ। দুটোরই উৎস একধরনের অজ্ঞতা ও অমনোযোগ। কিন্তু দুটোই আমাদের পক্ষে ক্ষোভের বিষয়। প্রথমতঃ, ১৯২৮ আর ১৮২৮-এর মধ্যে এক শতাব্দীর ব্যবধান। ১৯২৮ আমাদের থেকে ততটা দূরে নয়। আমার নিজের জন্মের মাত্র বারো বছর আগে, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ যখন রীতিমতো জীবিত, বৃটিশ রাজত্বের ছাতার নীচে ভারতে সতীদাহ একটি প্রচলিত প্রথা? ঐ তারিখটা যে ঠিক হতে পারে না, ওখানে যে একটা ভুল আছে, তা ঐ টেলি-পত্রিকার সাধারণ পাঠকদের বোঝার সাধ্যের বাইরে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে শুরু ক'রে বঙ্গীয় নবজাগরণের যাঁরা যাঁরা স্ত্রীজাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য লড়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই এখানে একবাক্যে থাপ্পড় মারা হলো। পত্রিকাটির অন্যত্র ফিল্মটির উপরে একটি সংক্ষিপ্ত নোট আছে; সেখানে উনিশ শতকের কথা ঠিকই বলা হয়েছে, কিন্তু সবাই কি পাতা উল্টে সে-জায়গাটা দেখবেন? দেখলেও, দু' জায়গায় দু'-রকমের তারিখ দেখে কি বিভ্রান্ত হবেন না? দ্বিতীয়তঃ, *সতী* যে একটি বাংলা ছবি এ কথাটা কোথাও স্বীকৃতি পায় নি, এবং না ব'লে দিলে এ দেশের দর্শক ছবি দেখেও বুঝবেন না। উনিশ শতকের বাঙালী মেয়েদের অবস্থা নিয়ে ছবিটি যিনি তৈরি করেছেন তিনি নিজে একালের একজন বাঙালী মেয়ে, এই কথাটা জানিয়ে দেওয়া যেতো, কিন্তু তা করা হয় নি। সাধারণভাবে বলা যায় যে গণমাধ্যমগুলি নারীদেহকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে যতটা প্রস্তুত, মেয়েদের উচ্চ পর্যায়ের কৃতিত্বের উপরে সেভাবে ফোকস্ করতে মোটেই তেমন আগ্রহী নয়। মনে রাখবেন যে ব'লে না দিলে বিদেশীদের পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয় যে ওটি একজন মেয়ের নাম।

একালের বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ভেবে নিতে হবে বাঙালী মেয়ে বলতে আমরা কাদের বোঝাচ্ছি। বাঙালী সমাজ শ্রেণীবিভক্ত এবং এর মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতা অসমভাবে বণ্টিত। উঁচুতলার মেয়েদের

জীবন আর নীচুতলার মেয়েদের জীবন একরকম হতে পারে না। মধ্যবিত্ত জীবনের অভ্যন্তরে চল্লিশের আর পঞ্চাশের দশকে আমি যখন বড় হয়ে উঠছিলাম, তখন আমাকে কখনোই মনে করতে দেওয়া হয় নি যে স্ত্রীজন্ম-হেতু আমি একটি নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ। বঙ্গের নবজাগরণের পর থেকেই বাঙালীদের মধ্যে একটি শিক্ষিত সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে, মধ্যবিত্তরা যার আওতায় মানুষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে এর কেন্দ্র কলকাতায়, কিন্তু এর শাখাপ্রশাখা মফস্বল শহর এবং গ্রামাঞ্চলের সচ্ছল পরিবারগুলির মধ্যেও বিস্তৃত। একে বলা চলে পশ্চিমবঙ্গের 'মেট্রপলিটান কাল্‌চার'— 'মেট্রপলিস' শব্দটির শিকড়গত অর্থ মাতৃ-নগরী— এবং মানতেই হয় যে এই সংস্কৃতির কতগুলি সদর্থক এবং প্রশংসনীয় দিক আছে। এই সংস্কৃতি পৃথিবীসচেতন, বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত, সম্মুখদ্রষ্টা, সৃষ্টিশীল এবং নানামতসহিষ্ণু। এর অভ্যন্তরে স্ত্রীশিক্ষা কয়েক দশক ধ'রেই আবশ্যিক। মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী মেয়ে একেবারেই কোনো লেখাপড়া শেখে নি— এটা কেবল আমাদের বাল্যকালে কেন, আমাদের মায়েদের বাল্যকালেও সম্ভব ছিলো না। *পুনশ্চ*-র একটি কবিতায় বাঁকিপুরের মাসী যেমন বলেন: 'মুর্খু মেয়ের বোঝা বইবে কে/ আজকালকার দিনে।' শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী উত্তরাধিকারে এই শ্রেণীর আধুনিক মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমানাধিকার দাবি করছেন, তাঁদের সৃষ্টিশীলতাকে নানা পথে প্রবাহিত করছেন, নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করছেন, বা ইচ্ছে হলে বিয়ে করছেন না।

এই মেয়েদের প্রধান সমস্যা হলো ঘরে-বাইরে দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন ক'রে সংসার সামলানো এবং তাঁদের স্বশ্রেণীভুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে সমান সুযোগসুবিধা আদায় করা। সার্বিক সেবায় অভ্যস্ত পুরুষদের পক্ষে এটা আধুনিকতার একটা বিরক্তিজনক উপসর্গ হলেও, আজকালকার শিক্ষিত স্ত্রীরা যেহেতু উপার্জনক্ষম এবং *সতী* ছবির বকনা-বাছুরের মতন মূল্যান্বিত, তাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বাঙালী মধ্যবিত্ত পুরুষরা ক্রমশঃ আরও সহযোগী হয়ে উঠতে বাধ্য হবেন। এঁরা এখনও পর্যন্ত গৃহকর্মে এবং সন্তানপালনে তেমন সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন না। তার প্রধান কারণ এখনও পর্যন্ত নিম্নমানের মজুরিতে গরিব মেয়েদের বা বিনামূল্যে পূর্ববর্তী প্রজন্মের আত্মীয়া মহিলাদের মদত পাওয়া যায়। কিন্তু এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই সাংসারিক দায়িত্বগুলি লিঙ্গনির্বিশেষে সমানভাবে ভাগ ক'রে নিতে প্রস্তুত এমন একটি নূতন প্রজন্মকে গ'ড়ে তোলা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কালোপযোগী গুরুদায়িত্ব।

স্ত্রীস্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো বিবাহনামক প্রতিষ্ঠানটির পুনর্বিচার। যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দী এই প্রতিষ্ঠানটি নারীদমনে সাহায্য করেছে, তাই একে অবশ্যই খুঁটিয়ে দেখা হবে, ব্যাপারটা ঐতিহ্যপন্থীদের কাছে যত অপ্রিয়ই হোক না কেন। দম্পতির সম্পর্কের মধ্যে একটা স্বত্বের সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন থাকে। 'স্বামী', 'পতি', 'নাথ'— এই শব্দগুলির মধ্যে এই স্বত্বসম্পর্ক পরিষ্কারভাবেই স্বীকৃত। এককালে একজন পুরুষ অনেক ক'টি স্ত্রীর মালিক হতে পারতো। আধুনিক একগামী বিবাহে মালিকানা সীমাবদ্ধ তথা পারস্পরিক, অর্থাৎ স্বামীর উপরে স্ত্রীরও একটা স্বত্ব আছে, অন্ততঃ থিওরিতে। তবে তাকে যে-ছদ্মবেশই পরানো যাক

না কেন, মালিকানা মালিকানাই। মনুষ্যব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে একটা সময় আসে যখন আলোকপ্রাপ্ত সুসংস্কৃত মন এই নিহিত স্বত্বসম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, পূর্ণবিকশিত মানুষের পক্ষে স্বত্বের সম্পর্ক সম্ভব কেবল সামগ্রীর সঙ্গে, অন্য একজন মানুষের সঙ্গে নয়। পিতৃতন্ত্রের পরবর্তী পর্যায়ে পরিবারের চেহারা কেমন দাঁড়াবে তা এখনই বলা যায় না, তবে সন্দেহ নেই স্ত্রীপুরুষদের সাহচর্যের নকশায় কিছু কিছু পরিবর্তন আসবে এবং সন্তানপালনের দায়িত্ব থেকে জনকরা মুক্তি পাবে না।

মানুষের যৌনতা এখনও একটা সমস্যাজড়িত এলাকা এবং এ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন চিন্তা এখনও বিরল। পশ্চিমবঙ্গে পুরুষদের যৌনতার স্বীকৃতি কবিতা থেকে গণিকালয় পর্যন্ত প্রাপ্তব্য। পুরুষাঙ্গের দাবির কাছে পুরুষ কবিদের চেতনা যে কতটা অসহায়, তা সমসাময়িক কবিতা একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই বোঝা যায়। এর বিপরীত প্রান্তে কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলার কবিশ্রেষ্ঠ এ-সমস্ত বালাই থেকে মুক্ত ছিলেন। এদিকে নারী, যে কিনা পুরুষের প্রয়োজন মেটায়, তার নিজেরও যে যৌন প্রয়োজন থাকতে পারে, তা স্বীকার করতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে লেখিকা হিসাবে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমার মিশ্র আঙ্গিকে লেখা বই *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*-তে আঁকা অনামিকা চরিত্রটি অনেকের কাছ থেকেই যেমন সমাদর লাভ করেছে, আবার তেমনি কাউকে কাউকে বিব্রতও করেছে। চরিত্রটি আমি সাবধানেই এঁকেছিলাম। সে বৃটেনপ্রবাসিনী, পাশ্চাত্য সমাজের ভিতরে বাস করে। (তা হোক, মেয়েটি বাঙালী তো! একই প্লটে এই চরিত্রটি মেমসাহেব হলেই আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকতো না! বিদেশী উপন্যাসে কী না মেনে নেওয়া যায়! কিন্তু বাঙালী মেয়ের 'অ্যাফেয়ার' ?) অনামিকা বিধবা, নিজেই নিজের মালিক। তা ছাড়া তার মৃত স্বামীর সঙ্গেও তার সম্পর্ক মালিকানাভিত্তিক ছিলো না। সে খানিকটা একলা, আরেকটি সম্পর্ক অন্বেষণ করার অধিকার তার আছে,—পশ্চিমবঙ্গের নিরিখেও। খুঁটিনাটির সাহায্যে দেখিয়েছি যে সে সুগৃহিণী এবং সন্তানবৎসলা, নূতন সম্পর্কের প্রয়োজনে সন্তানদের কল্যাণকে বিপর্যস্ত করতে চায় না। এটাও দেখাতে চেষ্টা করেছি যে তার তাগিদ কেবলমাত্র 'জৈব' নয়, দেহে মনে মিলিয়ে একটা সুন্দর সুষম সম্পর্কই তার অন্বিষ্ট। অপিচ, কোনো পর্যায়েই সে অশনিকে তার দূরে স'রে যাওয়া স্ত্রীর কাছ থেকে সরিয়ে আনতে আগ্রহী নয়। তার প্রাথমিক ধারণা, অশনির সঙ্গে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তার পক্ষে হয়তো গ'ড়ে তোলা সম্ভব। ক্রমশঃ তার সে-ধারণা ভেঙে যায়। সে বুঝতে পারে যে তা সম্ভব নয়। কথা হচ্ছে, এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে হলে তাকে তো একটা পথ অতিক্রম করতে হবে, সম্পর্কটাকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই ক'রে নিতে হবে। সম্পর্ক গ'ড়ে তোলা একটা প্রক্রিয়া, কোনো রেডি-মেইড জিনিস নয়। অংশগ্রহণ ব্যতীত তা সম্ভব নয়।

কারও কারও ক্ষোভ, অনামিকার মতো মেয়ে অশনির মতো পুরুষকে পছন্দ করবে কেন? কী মুশকিল, অশনি যে ঠিক কিরকম সেটা তো এক লহমায় বোঝা যায় নি!

তার একটা চিত্তাকর্ষক স্টাইল আছে। অনেক মানুষের মধ্যেই ওভাবে একটা মনোজ্ঞ স্টাইল আর একধরনের সীমাবদ্ধতা মেশানো থাকে, কাছে থেকে না জানলে বোঝা যায় না। ঠেকে শিখতে হয়। আমার নায়িকা বুদ্ধিমতী, আবার তার মধ্যে একটা 'ইনোসেন্স'ও আছে। অশনির প্রাক্তন সম্পর্কগুলির কথা সে যখন জানতে পারে, তখন সে বিছানায়। তার খটকা লাগে, কিন্তু অশনিকে সে প্রত্যাখ্যান করে না। 'তুমি একটি খারাপ লোক, আমার যোগ্য নও,' এ কথা ব'লে পুণ্যাত্মার মতো বিছানা ছেড়ে ছিটকে উঠে দাঁড়ানো স্ত্রীপুরুষের প্যাশনের ধর্ম নয়। তা ছাড়া পারস্পরিক আকর্ষণ পরস্পরের সীমাবদ্ধতাকে কিছু দূর পর্যন্ত সহ্য তো করেই। রাজারা যে বহুবল্লভ হন শকুন্তলা আর তাঁর সখীদের তা অজানা ছিলো না, কিন্তু শকুন্তলা কি সে-কারণে দুষ্যন্তকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ? রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় চিত্রাঙ্গদা-নাম্নী যে-নারী ব্রহ্মচর্যব্রতধারী, দ্রৌপদীর পতি অর্জুনকে মদনের সহায়তায় রীতিমতো 'সিডিউস্' করেন, আমার অনামিকা কি তাঁর চাইতেও 'খারাপ' মেয়ে ?

না, আমি তো তা মনে করি না। আসলে, ঝুঁকি না নিয়ে কোনো সন্ধান হয় না, তাই একটা লগ্নে ঝুঁকি সে নিয়েছে। বেদনায় দামও দিয়েছে। কিন্তু ঝুঁকি নেবার যোগ্যতা যে তার ছিলো তা আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি তার চরিত্রের সামগ্রিক চিত্রে। সে সন্তানদের ভালোবাসে, স্বামীর স্মৃতিকে রক্ষা করে, চিন্তা করতে পারে, গবেষণা করতে পারে। সে উত্তীর্ণ হয়। প্রকৃত প্রগতি তো তারাই ঘটায়, যাদের ভুল করার সাহস থাকে। বৈজ্ঞানিক তো তারাই হতে পারে, যারা অসফল এক্সপেরিমেন্টের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। বাঙালী মেয়েরা যদি পূর্ণ সাবালিকাত্ব চান, তা হলে তাঁদের 'পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে' মানুষ হয়ে উঠতে হবে। আধুনিক হবার শর্তই তাই। এর বিকল্প নেই। মেয়েদের বিষয়ে বঙ্গমাতাকে আমার অনুরোধ : তাদের ভুল করবার এবং ঝুঁকি নেবার অধিকার দিন—

পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না 'ভালো মেয়ে' ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।

এবারে বলতে চাই যে কেবল মধ্যবিত্ত মেয়েরাই কিন্তু একালের বাঙালী মেয়ে নন। মধ্যবিত্তদের বাইরেও একটা বিরাট সমাজ আছে, এবং সেই দলের মেয়েরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে নারীর স্থান যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এতগুলি বছর পরেও সন্তোষজনক নয়, এ কথা এখন সরকারী মহলেও স্বীকৃত। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হিসাবে বিহার বা রাজস্থানের মতন পশ্চাৎপদ না হলেও, ধনীদরিদ্রের যে-বৈষম্য স্ত্রীপুরুষের বৈষম্যকে তীব্রতর ক'রে তোলে তা তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোপ পেয়ে যায় নি। আশা করা যায় আজকাল বঙ্গসমাজের কোনো কোণকানাচেই মেয়েদের ধ'রে বেঁধে গাছের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, তবু এ কথা মানতেই হবে যে গ্রামাঞ্চলে তথা শহরের বস্তিতে,

যেখানেই মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদ সীমাবদ্ধ, সেখানেই শিশুকন্যার কল্যাণ অবহেলিত এবং নারীর ভাগ্য কঠিন। সমাজের এই অংশে শিশুকন্যারা তাদের ভাইয়েদের চাইতে কম পুষ্টি, কম চিকিৎসা ও কম শিক্ষা পায়। মেয়েদের অসুখ করলে তাদের হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় খুব দেরিতে, অন্তিম পর্যায়ে। তাদের যদি বা স্কুলে ভর্তি করানো হয়, সেখানে তাদের বেশী দিন পড়তে দেওয়া হয় না। কেননা, ঘরে ক্ষেতে কর্মশালায়, রান্নাবান্না বাসন মাজা বা ছোট ভাইবোনেদের দেখে রাখা থেকে কাঠ কুড়োনো, জল আনা এবং উৎপাদনের নানা পর্যায় পর্যন্ত বিবিধ কাজে তাদের শ্রমকে বাদ দিয়ে নিম্নবিত্তদের সংসার চলে না। শিক্ষাব্যবস্থা মধ্যবিত্তদের প্রয়োজনের সঙ্গে গিঁঠ-বাঁধা। তা হয়তো মধ্যবিত্ত মেয়েটিকে ভবিষ্যৎ রোজগারের পথ দেখায়, কিন্তু তা গরিব মেহনতী মেয়েটির এই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। ভবিষ্যতেই বা ঐ শিক্ষা দিয়ে সে কী করবে, তার অভিভাবকদের কাছে তা স্পষ্ট নয়। সমাজের এই অংশে বিপুলসংখ্যক মেয়ে অসম্ভব কষ্টস্বীকার করেন, অসম্ভব পরিশ্রম করেন,— অনেক সময়ে তাঁরা পরিবারের প্রধান প্রতিপালিকা,— কিন্তু তাঁদের শ্রমের মর্যাদা নেই, পুরস্কার নেই। কৃষি থেকে বিড়ি বানানো পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই যেখানে মেয়েরা ন্যূনতম বা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছেন না। কৃষিতে লাঙ্গল চালানো ছাড়া আর সব কাজেই মেয়েরা হাত লাগান। গৃহভিত্তিক তাঁতশিল্পে আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ মেয়েরাই করেন, কোনো কোনো মেয়ে নিজের জোরে তাঁতশিল্পীও বটেন। রেডি-মেইড পোশাক সেলাইয়ে ফিনিশিঙের কাজগুলো মেয়েরাই করেন— খুব নীচু মজুরিতে। দেশের অর্থনীতি এই সব মেয়েদের সম্মিলিত শ্রমশক্তির উপরে ভয়ংকরভাবে নির্ভরশীল : এই শ্রম অপসৃত হলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। মধ্যবিত্তদের দৈনন্দিন জীবনের সুখসুবিধাগুলিও অনেকাংশে এই শ্রমশক্তির উপরেই নির্ভর করে, তবু এই শ্রেণীর মেয়েদের কল্যাণের প্রতি তাঁরা সাধারণতঃ উদাসীন। সমাজের অসহায়দের প্রতি মধ্যবিত্তদের দৃষ্টিভঙ্গি কখনও কখনও ১৮২৮ সালের দৃষ্টিভঙ্গির মতোই নির্মম হতে পারে। অথচ এ কথা তো সত্য যে যাদের পশ্চাতে রাখা হয় তারা সমগ্র সমাজকে পশ্চাতে টানে। একটিমাত্র ছোট সহজবোধ্য উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যায়। সমাজের কোনো অংশে মেয়েদের প্রতিকারহীন নিঃস্বতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অনিবার্য পরিণাম গণিকাবৃত্তির বৃদ্ধি। তা এমনিতেই নানাভাবে অবাঞ্ছিত। বর্তমান সময়ে সংক্রামক, আপাততঃ অচিকিৎস্য এইড্‌স্ ব্যাধির কারণে এই বিপদ সম্বন্ধে আরও বেশী অবহিত হওয়া দরকার। অতএব শহুরে সংস্কৃতির আওতায় শিক্ষিত মেয়েদের জীবনে ও চিন্তাধারায় যে-পরিবর্তনগুলি হচ্ছে সেগুলি যেমন ঔৎসুক্যকর, গ্রামাঞ্চলে বস্তিতে গণিকালয়ে মেয়েদের অবস্থা এখন ঠিক কিরকম সেটাও তেমনি অনুধাবনযোগ্য একটি বড় মাপের বিষয়।

আরেকটি কথায় আসি। আমি অবিভক্ত বাংলায় জন্মেছিলাম এবং আমার চোখে পূর্ববঙ্গের মেয়েরাও একালের বাঙালী মেয়ে। বস্তুতঃ, বাইরের পৃথিবীতে বাঙালী বলতে আজকাল প্রথমতঃ বাংলাদেশের বাঙালীকেই বোঝায়। যতটুকু বুঝি, যতদূর খবর পাই, সেখানে যদিও একটি নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছে, যার অভ্যন্তরে মেয়েদের

অবস্থার একটা আপেক্ষিক উন্নতিও ঘটেছে, তবুও সামগ্রিকভাবে সেখানে মেয়েদের অবস্থা আরও অনেক বেশী খারাপ। সন্দেহ নেই, সেখানকার সমাজ পশ্চিমবঙ্গের সমাজের চাইতে নানাভাবেই ঢের বেশী বিপন্ন। সেই বিপদ্‌গ্রস্ততা সমাজের সর্বস্তরে মেয়েদের কাছ থেকে একটা বড়রকমের মূল্য আদায় ক'রে নিচ্ছে। ঢাকার *এদেশ একাল* পত্রিকার সম্পাদিকা নূরজাহান মুরশিদের মতে বাংলাদেশের মেয়েরা ঘরে-বাইরে বিপন্ন, তাঁদের মানসম্মান ও জীবন সর্বত্র 'হুমকির মুখে'। পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (১৯৮৯) প্রকাশিত 'বাংলাদেশের নারীনির্যাতন ও বৈষম্যের চিত্র ১৯৮৮' শীর্ষক একটি অংশে অত্যাচার-অনাচার ও দুরবস্থার তথ্যভিত্তিক একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে কয়েকটি আইটেম তুলে দিচ্ছি: নির্যাতনে মৃত্যু, অপহরণের মামলা, ধর্ষণ, নারী কেনাবেচা, নারী পাচার, তালাক পেয়েছে, অ্যাসিডে দগ্ধ, যৌতুকের কারণে নিহত, যৌতুকের মামলার নিষ্পত্তি হয় নি, প্রতি বছর সন্তানসম্ভবা মেয়ে মারা যায়, গর্ভপাত ঘটাতে মারা যায়, ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়, রক্তহীনতায় ভোগে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবংবিধ সমস্যাবলীর কোনো-কোনোটি নিশ্চয়ই আপনাদেরও চেনা-চেনা লাগবে।

বাংলাদেশের মেয়েদের সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করা বা চিন্তার বাইরে রাখা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্যাগুলি এত তীব্র এবং ব্যাপক যে রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে তাদের আটকে রাখা যায় না, তারা ক্রমাগত উপচে পড়ে। এই দুঃস্থ মেয়েদের মধ্যে অনেকেই যে সীমানা পার হয়ে পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় নেন, তা কে না জানেন?

পশ্চিমবঙ্গ কেন, বাংলাদেশের মেয়েদের সমস্যাদের উপেক্ষা করা বহু মাইল দূরে অবস্থিত বৃটেনের পক্ষেও সম্ভব নয়। বাংলাদেশ থেকে আগত বহুসংখ্যক পরিবার এখানে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে সব থেকে বড় দলটা সিলেট থেকে আগত। এঁরা আর্থিক দিক দিয়ে দুঃস্থ নন, কিন্তু শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং পিতৃতন্ত্রের দাপট এই গোষ্ঠীর মেয়েদের পীড়ন করে। এই সিলেটী মহিলারা প্রায়ই কোনো ইংরেজী জানেন না; বাড়ির ভিতরে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ তাঁদের জীবন। গৃহাভ্যন্তরে নারীনির্যাতন একটি সমস্যা। তাঁদের নিপীড়িত অস্তিত্বের কল্যাণে বৃটেনের গণমাধ্যমগুলিতে 'একালের বাঙালী মেয়ে'র 'প্রোফাইল' বা পার্শ্বচিত্রটি মোটেও দ্যুতিময় নয়।

পরিশেষে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মেয়েদের প্রতি আমার অনুরোধ : স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে যে-অনাচারগুলি সর্বভারতীয় বিচারে দৃঢ়মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন যৌতুকঘটিত হত্যা, গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ণয় ক'রে নিয়ে স্ত্রীভ্রূণের গর্ভপাত ঘটানো (এই সমস্যাটি বৃটেনের ভারতীয়দের মধ্যে পর্যন্ত দেখা দিয়েছে), সেগুলির বিরুদ্ধে সামাজিক বিবেক এবং ক্রিয়াকে সংহত করতে এগিয়ে আসুন। শিক্ষিতদের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা অনাচারীদের অবাধ প্রশ্রয় দেয়।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ বৈশাখ ১৩৯৭ (২২ এপ্রিল ১৯৯০)

[পত্রিকার সম্পাদকদের দেওয়া " 'ভালো মেয়ে' হয়ে থাকা আর নয়" শিরোনামে প্রকাশিত, পরে একই শিরোনামে ঐ পত্রিকার প্রবন্ধসংকলন *আনন্দসঙ্গী*-র (২০০১) অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমার নিজের দেওয়া মূল শিরোনামটিই ফিরিয়ে আনলাম। এই প্রবন্ধটি যখন লিখি তখন আমি *রাতের রোদ* নাটকটি লিখছিলাম। নারীবিষয়ক ভাবনার কয়েকটি খুঁটিনাটি উভয়ের মধ্যে সাধারণ।]

নারীত্বের আদর্শের সূত্রে (এক)

[এই প্রবন্ধটির ভূমিকায় দু'-একটি কথা বলা দরকার। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিখ্যাত দীর্ঘ নিবন্ধ *দ্য আইডিয়াল অফ ইণ্ডিয়ান উমানহুড* তাঁর কারাগার-পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ। এটি ১৯৩৬ সালে তাঁর কারাগার-বাসকালে রচিত হয়ে ঘষামাজার পর দেরাদুনের দ্য ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস অ্যাসোসিয়েশন-কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। শিবনারায়ণ রায়ের অনুরোধে এটির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ আমি করেছিলাম। *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় তার কিছু কিছু অংশ বার হয়। পরে সমগ্র অনুবাদটি *ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ* শিরোনামায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ১৯৮৮)। নিবন্ধটি অনুবাদ করার সময়ে সেখানে উত্থাপিত নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আমি বেশ খানিকটা ভাবনাচিন্তা করেছিলাম, এবং সেই ভাবনাগুলিকে প্রবন্ধাকারে বিন্যস্ত ক'রে 'রয় অ্যাণ্ড হিজ় আইডিয়াল অফ ইণ্ডিয়ান উমানহুড' শিরোনামায় শিবনারায়ণ-সম্পাদিত মানবেন্দ্র-স্মারক প্রবন্ধগ্রন্থ *ফর আ রেভোলিউশন ফ্রম বিলো*-তে (মিনার্ভা, ১৯৮৯) দিয়েছিলাম। *জিজ্ঞাসা*-র ১০ : ১ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অরুণ ঘোষ সেই বইটির সমালোচনা লেখেন, এবং সমালোচনাপ্রসঙ্গে আমার উদ্দেশে একটি সরস অথচ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন নিক্ষেপ করেন। প্রশ্নটি এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি মন্তব্য প'ড়ে বেশ বুঝতে পারি যে অরুণবাবু একটি জমজমাট আলোচনার সূত্রপাত করতে চান এবং আমার কাছ থেকে সুচিন্তিত উত্তর প্রত্যাশা করছেন। সেই উত্তর সরবরাহ করবার তাগিদ থেকে বর্তমান প্রবন্ধটি জন্ম নেয়। অর্থাৎ এই রচনার উৎস সবসুদ্ধ তিনটি : ভারতীয় নারীত্বের আদর্শবিষয়ক মানবেন্দ্রনাথের আদি রচনা, মানবেন্দ্র-স্মারক গ্রন্থে দেওয়া আমার ইংরেজী প্রবন্ধ, এবং সেই বইটির অরুণ ঘোষ-কৃত সমালোচনা। ইংরেজী স্মারক-গ্রন্থটি কতজন সংগ্রহ ক'রে পড়েছিলেন সে-বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিলো না। অথচ সেখানে আমি যা বলেছিলাম তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে নতুন আলোচনায় আমি যা-যা বলতে চাই সে-সমস্তর সূত্র অনুসরণ করা কঠিন। সেই বিবেচনায় আমার ইংরেজী প্রবন্ধটিতে আমি যা বলেছিলাম, বাংলা প্রবন্ধে প্রথমে সেই বক্তব্যকেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরি, পরে অরুণবাবুর উত্থাপিত বিষয়ে আসি। এখানে দেওয়া হচ্ছে সেই নতুন প্রবন্ধটির কিঞ্চিৎ সম্পাদিত রূপ।]

॥১॥

আমার বক্তব্য ছিলো এই যে ১৯৪১-এ প্রকাশিত মানবেন্দ্রনাথের দীর্ঘ প্রবন্ধটি এমন একটি বৌদ্ধিক নিশানা যাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ একে দেখা যেতে

পারে একটা পরিণতি হিসাবে : উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণ সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে ভাবনার যে-আলোড়নকে উস্কে দেয় তারই পরিণতি হিসাবে। এই অর্থে দেখলে প্রবন্ধরচয়িতা চিন্তক এবং কর্মীদের একটা লম্বা লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐসব চিন্তক এবং কর্মী ভারতে মেয়েদের অবস্থার উন্নয়নসাধনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মনে রাখতে হবে যে এঁদের মধ্যে আছেন কিছু বৃটিশ শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক এবং প্রশাসকও। এঁরাও ঐ সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়েছিলেন।

প্রবন্ধটিতে মানবেন্দ্রনাথের প্রধান কৌশল হচ্ছে বিশ্লেষণের সাহায্যে হিন্দুদের নারীবিষয়ক ভাবনার অন্তর্বিরোধগুলিকে উদ্ঘাটন করা এবং একটি গৌরবান্বিত ও পবিত্রীকৃত আদর্শের অন্তরালে স্বত্ব-সম্পর্কের বাস্তবতাকে উন্মোচন করা। এ বিষয়ে গান্ধীর চিন্তাও অন্তর্বিরোধে ভর্তি। মানবেন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন এবং গান্ধীর খামখেয়ালী যোগী-পনাকে মহোৎসাহে এবং ঝাঁজের সঙ্গে ঠুকেছেন। মানবেন্দ্রনাথ তর্কযুদ্ধ ভালোবাসতেন এবং সন্দেহ নেই এ কাজ তিনি সানন্দেই করেছেন।

প্রবন্ধটির পাদটীকাগুলিতে যে-সব তারিখ দেওয়া আছে সেগুলি থেকে বোঝা যায় যে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তায় লেখাটি মোটামুটিভাবে রূপ নেয় ১৯৩৬ সালে। এর প্রায় দশ বছর আগে কাইজারলিঙের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রবন্ধটি রচনা করেন তার সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির তুলনা করা যেতে পারে। 'দ্য ইণ্ডিয়ান আইডিয়াল অফ ম্যারেজ' শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। তার পরের বছর সেটি কাইজারলিং-সম্পাদিত *দ্য বুক অফ ম্যারেজ*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধসংকলনটিতে সে-কালের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ভাবুক এবং লেখক বিবাহ-বিষয়ে তাঁদের চিন্তাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সে-সময়ে অনেকেই ভাবছিলেন যে পৃথিবীর নানা জায়গাতেই বিবাহনামক প্রতিষ্ঠানটি সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির একটি বাংলা রূপও আছে। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'র স্বর এবং ঝোঁকপ্রদান স্থানে স্থানে ঈষৎ ভিন্ন, এবং সেটি পড়লেও কিছু কিছু নূতন প্রাপ্তি হয়।

বোঝা যায় যে ঐতিহ্যিক ভারতীয় সমাজে মেয়েদের যে-অবস্থা তাতে রবীন্দ্রনাথ আর মানবেন্দ্রনাথ উভয়েই গভীর ক্ষোভ অনুভব করেছেন। এটা লক্ষণীয় যে দুজনেই তাঁদের সব থেকে বেশী পরিচিত জমির মধ্যে, অর্থাৎ হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে, নিজেদের চিন্তাকে বিচরণ করতে দিয়েছেন। মুসলিম ঐতিহ্যকে তাঁরা রেখেছেন তাঁদের সমালোচনার বাইরে। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধটি লিখেছেন ক্রুদ্ধ হয়ে, আর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির মধ্যে বেদনাবোধ বেশী। রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছে এমন একটা বিধি যা মেয়েদের পক্ষে কঠোরভাবে দমনাত্মক ; তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন কেন এমন হলো, এর হেতুগত ভিত্তি কী। প্রাচীন সাহিত্যে থেকে কিছু কিছু মূল্যবান অংশ পুনরুদ্ধার ক'রে তিনি ভবিষ্যতের এমন একটা ছবি অভিক্ষেপ করতে চেয়েছেন, যেখানে মেয়েদের এবং পুরুষদের পৃথক্ শক্তিগুলি— তিনি সেগুলিকে যেমন বুঝেছেন— পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে একটি সুষমতর সমাজব্যবস্থা গঠন করতে পারে।

মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আরও আপসহীন, তাঁর যুক্তি আরও ক্ষমাহীন ও নির্মম। মেয়েদের শৃঙ্খলের 'ঝকমকে গিল্‌টি'কে তিনি যখন উদ্‌ঘাটন করেন, যখন দেখান যে মেয়েদের পদমর্যাদা বস্তুতঃ 'তৈজসপত্রের' সমগোত্রীয়, এবং সেই নিম্নমর্যাদাকে ঘোমটা দিয়ে আড়াল ক'রে রাখে কেবলমাত্র কতগুলি 'মরমী আদর্শ', তখন তাঁর ক্রোধ সশব্দে ফেটে পড়তে থাকে। ব্যক্তির অধিকারসমূহকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন ; জোর দিয়ে বলেন যে যে-সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান বয়সদোষে অচল হয়ে গেছে তাদের বিদায় দিতেই হবে।

এই ঝোঁকপ্রদানের কারণে মানবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিকে আমরা পাঠ করতে পারি নূতনের একটি সূচনা হিসাবে। এই রচনার গোড়ায় উল্লিখিত দুটি দৃষ্টিকোণের মধ্যে এটি তা হলে দাঁড়ায় দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ, যেখান থেকে মানবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিকে দেখা যায়, বিবেচনা করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রাক্কালে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এমন একটি টেক্সট্‌কে যা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের সময়কার নারীমুক্তি-আন্দোলন, যা আন্দোলন হিসাবে আরও মৌল, আরও র‍্যাডিকাল, এই টেক্সট্‌ থেকে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক যে আমরা এখানে ভাবনার এমন কয়েকটি অবস্থানবিন্দু পেয়ে যাই যেখান থেকে আজকের দিনে আমরা একটু স'রে আসতে চাই, পাখা মেলে নতুন দিগন্তের দিকে উড়ে যেতে চাই। সেটাই স্বাভাবিক।

মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে আমাদের সময়ের কতটা কাছাকাছি তা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না যখন দেখি যে তিনি তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন জনসংখ্যার সমস্যা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দিয়ে। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথও 'কৃত্রিম' পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে ছিলেন এবং এ ব্যাপারে মার্গারেট স্যাংগার-এর কার্যক্রমকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় বিবাহের উপরে তাঁর প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। সেখানে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তাঁর আলোচনার পরিধির বাইরে রেখেছেন। উপরন্তু তিনি সেখানে চেষ্টা করেছেন বিবাহ-বিষয়ে কালিদাসের দৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে, যে-দৃষ্টিতে বিবাহ হচ্ছে 'একটি নিয়মানুবর্তী অবস্থা', যেখানে বীরপুত্রের জন্মদানই মুখ্য উদ্দেশ্য, দম্পতির যৌন আনন্দ যেখানে গৌণ।

এর বিপরীতে, স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্পর্ক যে প্রজননের উদ্দেশ্যে এই ধারণাটাকেই মানবেন্দ্রনাথ একেবারে তুলো-ধোনা ক'রে ছেড়েছেন। তিনি জানতেন যে ভারতের জনগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তখনও তৈরি নয়, কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে ভবিষ্যতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া পথ নেই। পঞ্চাশ বছর পরে আমরা তাঁর দিগ্‌বোধের তারিফ না ক'রে পারি না। সন্দেহ নেই, মানবপ্রজাতির টিঁকে থাকার জন্য উচ্চ জন্মহারই এককালে অত্যাবশ্যক ছিলো, এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় দাম মেয়েরা অবশ্যই দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর উল্টোটাই সত্য ; এখন সমগ্র প্রজাতির স্বার্থ এবং প্রজাতির অর্ধভাগ স্ত্রীজাতির স্বার্থ এক জায়গায় এসে মিশেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সেই চাবিকাঠি যা মেয়েদের স্বাধীনতাকে সম্ভব করে। মেয়েরা যেই একবার তাদের উর্বরতাকে আপন নিয়ন্ত্রণের অধীন করতে পারে,

অমনি তারা আর কোনোমতেই বিচ্ছিরি পচা পুরোনো দিনগুলোর দাসত্বে ফিরে যেতে চায় না। অতএব, মানবিক উর্বরতার নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে সেই স্থিরদণ্ড যার উপর নির্ভর ক'রে নারীমুক্তি দোলায়িত হয়। সৌভাগ্যবশতঃ, বর্তমান ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবেই স্বীকৃত ; কিন্তু তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ার নানা অঞ্চলেই ,— যেমন ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেশগুলিতে, অথবা যে-সব দেশে নব্য-ফ্যাশিস্ট ধর্মীয় গোঁড়ামি উত্তেজক বাণীর সাহায্যে রণক্ষেত্রের জন্য পুত্র উৎপাদন করতে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে, যেমন ইরানে,— এখনও অনেক আত্মিক লড়াই লড়া এবং জেতা বাকি রয়েছে।

তাঁর কোনো কোনো বিশ্লেষণে কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ নিজেকে জটিল জালে জড়িয়ে ফেলেছেন। যখন তিনি দাবি করেন যে 'প্রজনন সেই মহৎ আবেগের [অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রেমের] জৈব উপজাত', তখন তিনি মোটামুটিভাবে যা বলতে চাইছেন তা আমরা ধরতে পারি, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কি এখানে গাড়িটাকে ঘোড়ার আগে জুতে দেন নি ? কেননা, জীববিদ্যার বিচারে, আমাদের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রেমনামক মহৎ আবেগটাই কি নয় যৌনতার উপজাত, যে-শক্তিশালী প্রবৃত্তি প্রাণিরাজ্যে স্পষ্টতঃই প্রজননের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ? তিনি যখন বলেন যে সঙ্গম এবং প্রজননের সম্পর্কটা আপতিক, তখন তাঁর বক্তব্য কেবলমাত্র উপরে-উপরে সত্য। অমন শক্তিশালী একটা প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রজননপ্রক্রিয়াকে যে জুতে দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সেই অচেতন নক্শার অন্তর্গত, প্রকৃতির সেই কৌশলজালেরই অঙ্গ, যার সাহায্যে প্রজাতি হিসাবে আমাদের টিঁকে থাকা সুনিশ্চিত হয়। অপিচ, যদিও সঙ্গমের আনন্দ এবং প্রজনন দুটো আলাদা ব্যাপার বটে, এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করা মানেই ও দুটোকে আলাদা করা, তবু এটাও স্বীকার্য যে তারা একটি বাঞ্ছিত সন্তানকে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে এ জ্ঞান প্রেমিকদম্পতির আনন্দবর্ধন করে।

মানবেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যে সচ্ছল জীবনযাত্রা এবং স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সমকামনা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাবে। আধুনিক পশ্চিমে কিন্তু তা ঘটে নি।[১] যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমকামনা স্পষ্টতঃ পরিপার্শ্বসঞ্জাত, তবুও এমন কতগুলি নিদর্শন অবশিষ্ট থেকেই যায়, যেখানে ঐ অবস্থার একটা শরীরগত ভিত্তি আছে। অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাই কেউ কেউ যেন ঐরকম প্রবণতা নিয়েই জন্মায়। ব্যাপারটাকে ডাক্তারী অর্থে আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝি না, এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থেকে আমরা এখনও দূরে।

মানবেন্দ্রনাথ বেশ জোর দিয়েছেন একটা ব্যাপারের উপরে : অভাব-অনটনের সময়ে মেয়েরা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ ক'রে অর্থনৈতিক অসাধ্যসাধন করতে পারে। কিন্তু মেয়েরা ব্যাপক বেকারত্বের সময়ে বাইরে বেরিয়ে এলেও যে-ধরনের কাজ থেকে ভালো পারিশ্রমিক পাওয়া যায় সে-ধরনের কাজ জোগাড় ক'রে উঠতে পারে কিনা সেটাই তো বড় প্রশ্ন। তিনি তাঁর সময়কার একটি পাশ্চাত্য পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন : পুরুষরা বেকার হয়ে ব'সে থাকতো, মেয়েরা বাইরে গিয়ে রুটি রোজগার করতো। এটা সে-সময়ে সম্ভব হয়ে থাকতে পারে কর্মসংস্থানের একটা বিশেষ ধাঁচের জন্যে : একদিকে পুরুষরা বরাবর

ক'রে এসেছে এমন কতগুলি কাজ লোপ পেয়ে যাচ্ছিলো, অপরদিকে অন্য কতগুলি এলাকায় নতুন কাজের সম্ভাবনা খুলে যাচ্ছিলো, অথচ পুরুষরা সে-ধরনের কাজ ছুঁতে নারাজ ছিলো। কিন্তু প্রতিবারেই যে এরকমটা ঘটবে তা তো নয়। পশ্চিমের বর্তমান মন্দায় ছবিটা অন্যরকম। যে-সব কাজে পারিশ্রমিক সব থেকে কম নারী-শ্রমিকরা আগে থেকেই সেখানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। মন্দার ধাক্কা তাদের ঠেলে দেয় সবার পিছে সবার নীচে। একদিকে দেখতে পাই যে কোন্ কাজটা পুরুষরা করবে, কোন্‌টা মেয়েরা করবে, এ বিষয়ে ঐতিহ্যিক ধারণাগুলি অনেকাংশে শিথিল হয়ে এসেছে, ফলে যা-কিছু কাজ পাওয়া যাচ্ছে তার জন্যে মেয়ে-পুরুষ উভয়ে সমানভাবে কাড়াকাড়ি করছে। আবার অন্যদিকে দেখতে পাই যে সমাজের ক্ষমতার কাঠামো, যেখানে বরাবর পুরুষদের প্রতিই পক্ষপাত, এখনও মূলতঃ বদলায় নি। সমাজ এখনও মোটের উপর পুরুষদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এর ফলে মেয়েদের আর পুরুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র আর নগ্ন হয়ে উঠেছে। কাজের বাজারে মেয়েরা যে লভ্য তার মানে হামেশাই দাঁড়াচ্ছে কেবলমাত্র এইটুকু যে তাদের যোগ্যতা যেমনই হোক না কেন, তারা সব থেকে বাজে কাজগুলো নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছে।

এর পর আমি পৌঁছেছিলাম একটি প্রশ্নে, যেটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ: যে-পরিস্থিতিতে মেয়েরা আর পুরুষদের সম্পত্তি নয়, তাদের উপরে নির্ভরশীল পরগাছা নয়, বরং তাদের সমকক্ষ, সেই পরিস্থিতির যাবতীয় তাৎপর্য কি মানবেন্দ্রনাথ ভেবে দেখেছিলেন? নারী আর পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্যের অর্থ হলো এই যে মানবিক জীবনের সব এলাকাতেই, তা হোক না কেন অস্তিত্বে, কর্মে, দর্শনে বা উপলব্ধিতে, মেয়েদের যেটা নিজস্ব পন্থা বা পদ্ধতি সেটা পুরুষদের পন্থা বা পদ্ধতির সমান মূল্য পাবে; আত্মোন্নয়নে, আত্মপ্রকাশে, পূর্ণতা অর্জনে নারী আর পুরুষ সমান অধিকার এবং সুযোগ ভোগ করবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী নারী আর পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতার সম্পর্ককে মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি; কিন্তু সাম্যের অর্থ হবে ঐ সম্পর্কের অবসান। নারী আর পুরুষের সম্পর্ককে তার শোষণাত্মক স্বভাব ছাড়তে হবে। পুরুষরা প্রত্যাশা করে যে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে মেয়েরা মনোযোগী হবে; মেয়েদের প্রয়োজন মেটাতে পুরুষদেরও কিন্তু ততটাই মনোযোগ দিতে হবে। মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষরা চিরটা কাল *নিয়েছে*; কিন্তু এবারে তাদের *দিতে* শিখতে হবে। না, এটা খোরপোশ দেবার ব্যাপার হবে না, কেননা সাম্যের যুগে মেয়েরা তো আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষদের উপরে নির্ভরশীল থাকবে না। এটা হবে আরও ঢের বেশী মৌল দান: অপরের যে-প্রেমময় সহায়তায় ব্যক্তির বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কীর্তি সম্ভব হয় সেই সাহায্যই পুরুষকে নারীর দিকে এগিয়ে দিতে হবে। এগুলি কিন্তু *বিপ্লবাত্মক* পরিপ্রেক্ষিত। নারীমুক্তি আন্দোলনের যুক্তি এবং গতিবেগকে ঐতিহ্যপন্থীরা যে ডরান সেটা তো নেহাৎ অকারণে নয়।

পশ্চিমে অনেকে মনে করেন যে নারী আর পুরুষের মধ্যে সংলাপের যে-সংকট তা বিবর্তনগত সংকটের সমগোত্রীয়; আমরা যদি প্রজাতি হিসাবে বাঁচতে চাই তা হলে এ

সংকট আমাদের অতিক্রম করতে হবে। একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটা স্পষ্ট যে নারীমুক্তি ব্যতীত প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব নয়; অন্যদিকে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অনেকে মনে করেন যে পৃথিবীকে সম্ভবপর সামূহিক বিনাশ থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে নারী-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেওয়া উচিত। পুরুষশাসিত সভ্যতা আত্মবিনাশের দিকে সবেগে ধাবমান; সর্বনাশ হওয়ার আগে মেয়েরা এই গতি রোধ করতে পারবে কিনা এই প্রশ্নটা প্রায়শঃ তোলা হয়। পশ্চিমের সভ্যতা যে-পরিমাণে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী মানবতন্ত্রের জাতক, সে-পরিমাণেই জিজ্ঞাস্য: ঐ ভাবনাতন্ত্র আদৌ কতটা নির্ভরযোগ্য ছিলো? তার মুখের চেহারা কি যথেষ্ট পরিমাণে মানবিক ছিলো? অথবা কি তা ছিলো কেবল পুরুষেরই যোগ্য, মানবজাতির অপরার্ধের মুখের আদল আর ব্যঞ্জনাকে একেবারে বাদ দিয়ে গঠিত? মানবতন্ত্রকে এমন একটা চেহারা দেওয়া উচিত নয় কি, যার মধ্যে থাকবে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই আদল? ভারতের র‍্যাডিকাল এবং মানবতন্ত্রী ভাবুকরা এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ভেবে দেখলে পারেন। ভারতের মানবতান্ত্রিক আন্দোলন কি এ যাবৎ অত্যধিক পুরুষকেন্দ্রিকতার মধ্যে আটকে থেকেছে?

মানুষের যৌনতা যখন হবে সমকক্ষদের প্রেমের প্রকাশ, ক্ষমতার প্রসঙ্গ থেকে তাকে যখন ছাড়িয়ে আনা হবে, তখন তার চেহারা কেমন দাঁড়াবে? বহুকাল ধ'রেই মানবিক অভিজ্ঞতায় যৌনতা একটা অন্ধকার এলাকা, যেখানে কারও কারও ভাগ্যে তীব্রতম বেদনা জোটে, যেখানে কেউ কেউ অপরকে ক্রূরতম অপমানের অধীন করে, কোনো কোনো নীচতম ক্ষমতার খেলা যেখানে খেলা হয়। ঐ আদিম জলাভূমি থেকে তাকে কি অবশেষে তুলে আনা হবে? যে-নৈতিক পাতালে তাকে আর্তনাদকারী কুকুরের মতো শিকলে বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে সেখান থেকে তাকে কি মুক্তি দেওয়া হবে? বেশ হয় যদি আমরা ঐ নরক থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারি আলোকের রাজ্যে, যদি মানুষের যৌনতার প্রতি আমাদের প্রতিন্যাস হয়ে ওঠে আরও সহজ, খোলামেলা, যন্ত্রণামুক্ত।

আমাদের হাতের কাছে সমকক্ষদের প্রীতির যেটি শ্রেষ্ঠ মডেল সেটি হচ্ছে বন্ধুত্বের মডেল। আমাদের যাত্রা কি হবে সেই দিকেই? তার মানে কি এ-ও নয় যে যে-সব সম্পর্ক অন্যদের বর্জন ক'রে দ্বৈতের মধ্যে একান্তভাবে রুদ্ধ, সীমাবদ্ধ, সেগুলি ক্রমশঃ ক্ষ'য়ে আসবে? 'ব্যভিচার', 'অবৈধ জন্ম' ইত্যাদি ধারণা, যেগুলির উৎপত্তি প্রাচীন স্বত্ব-সম্পর্ক থেকে, সেগুলিও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে না কি?

মনে হয় মানবেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক ঘটবে অনুক্রমিক একগামিতার পথে, যে-কোনো সময়ে একজনের সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্ক-রূপে। বন্ধুত্বের রীতি কিন্তু ওরকম নয়। এমন নয় যে বন্ধুত্ব ঘটে এলোমেলোভাবে, বাছবিচার না ক'রেই। বন্ধুত্ব অবশ্যই নির্বাচনভিত্তিক। কিন্তু আমরা তো একই সময়ে একাধিক বন্ধুকে ভালোবাসতে সক্ষম। যৌন প্রেম এর থেকে মূলতঃ অন্যপ্রকারের নয়। এটা একটা ঘটনা যে আমরা একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ অনুভব করতে পারি, নূতন কারও প্রেমে পড়ার আবশ্যিক অর্থ এ নয় যে কোনো পুরাতন প্রেম থেকে পিছলে স'রে

এসেছি। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটা সাধারণতঃ খোলাখুলি স্বীকৃত হয় না, কারণ সে-স্বীকৃতির পথরোধ ক'রে আছে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের দখলদার রূপটা। সম্পত্তি-সম্পর্কে যুগল পরস্পরকে স্বীয় সম্পত্তি ব'লে বিবেচনা করে ; এই সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈর্ষা। ঈর্ষার উদয় হয় তখনই যখন আমরা নিজেদেরকে, আমাদের প্রেমকে, এবং আমাদের রতিক্রিয়াকে পরিণত করি *দ্রব্যসামগ্রীতে*, যেগুলি স্বত্ব-সংক্রান্ত আইনের অধীন। পুরুষরা তো বটেই, কখনও কখনও মেয়েরাও এই দখলদার বৃত্তির অপরাধে অপরাধী। কিন্তু প্রেমকে যদি হতে হয় সম্মতিপ্রদানকারী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত সাহচর্য, তা হলে একাধিক সম্মতিপ্রদানকারী সঙ্গীর সঙ্গে স্বেচ্ছাকৃত সাহচর্য নৈতিক বিচারে গর্হিত হতে পারে না। মিত্রসংসর্গের যেটা সাধারণ নিয়ম স্ত্রীপুরুষের প্রেম তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাকে যে একটা গোপন, অন্ধকার, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হতে হবে, যা থেকে অন্যেরা একেবারে বহিষ্কৃত, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

বলাই বাহুল্য, এই সদাচারভ্রষ্ট পৃথিবীতে সাধারণ বন্ধুত্বও, যেখানে স্ত্রীপুরুষের বিশেষিত প্রেমের প্রশ্ন ওঠে না, প্রায়ই ঈর্ষা আর দখলদার বৃত্তির কালিমায় মলিন। রোমান বক্তা সিসেরো-র বন্ধুত্ব সম্বন্ধে একটি রচনা আছে, যেটি এ বিষয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের একটি ধ্রুপদী পর্যালোচনা। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন বন্ধুত্বের পথগুলি কী-আন্দাজ কণ্টকাকীর্ণ।

আমরা আজকাল আগেকার চাইতে ঢের বেশী বছর বেঁচে থাকছি এবং এই বর্ধিত আয়ুষ্কালের মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের বিকাশের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারবন্ধনও বেড়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির উপর এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আমাদের একদিকে লাগে আশ্বাস, হৃদয়াবেগদের নোঙর ফেলবার জায়গা, আবার অন্যদিকে লাগে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি। দ্বিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে একটা মিটমাট লাগে। এটা সম্ভব হতে পারে আমরা যদি পুরোনো বন্ধুদের প্রত্যাখ্যান না ক'রে মৈত্রীর বৃত্তের মধ্যে নতুন বন্ধুদের স্বাগত করি ; নতুন বন্ধুত্ব যেন হয় নতুন মানুষকে ভিতরে ডেকে আনার ব্যাপার, পুরোনো বন্ধুকে বাইরে বার ক'রে দেওয়ার ব্যাপার নয়। এটা তো ঠিক যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বন্ধুরা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। আমাদের চরিত্রের নানা দিক, নানা নিহিত সম্ভাবনা বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সহচর এবং সহকর্মীদের মধ্যে একটা বৈচিত্র্য না থাকলে একজন মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রস্ফুটন হয় না।

অতএব, নারীমুক্তি পারিবারিক জীবনে এবং স্ত্রীপুরুষের সাহচর্যের চালচলনে কিছু মৌল পরিবর্তনকে উস্‌কে দিতে বাধ্য। একদিকে স্ত্রীপুরুষেরা এমন সব সম্পর্কের প্রয়োজন অনুভব করবে যেগুলি ততটা রুদ্ধ নয়, বরং আরেকটু খোলামেলা এবং বহুবাচনিক। অন্যদিকে ঘরকন্না এবং সন্তানপালনে পুরুষদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাবে। গার্হস্থ্য দায়িত্বগুলিকে স্ত্রীপুরুষদের আরও ন্যায্যভাবে ভাগ ক'রে নিতে হবে। আমরা চাই যে পুরুষরা নতুন মানুষ হয়ে উঠুক, এমন মানুষ যারা অপরের কথা ভাবে, সেবা করতে জানে,

কোনো-কিছু একলা দখল করার বদলে ভাগ ক'রে নিতে রাজি। আমরা চাই এমন একটা নতুন প্রজন্মকে গ'ড়ে তুলতে যাদের মধ্যে এই মূল্যগ্রাম ক্রিয়াশীল। গৃহকর্ম ও সন্তানপালনে পুরুষদের সক্রিয়তর অংশগ্রহণ ব্যতীত এই শুভংকর পরিবর্তন সম্ভব নয়। যদিও অনেকে এর উল্টোটাই ভাবেন, বস্তুতঃ কিন্তু যাদের মধ্যে আগ্রাসী মর্দানির আস্ফালন প্রবল তেমন পুরুষদের চাইতে সংবেদনশীল এবং পরিশীলিত পুরুষদেরই মেয়েরা সাধারণতঃ বেশী পছন্দ ক'রে থাকে। তারা চায় যে পুরুষদের মধ্যে স্বার্থপরতা এবং একাধিপত্য করবার প্রবণতা যেন কমে, নম্রতা এবং লালননৈপুণ্য যেন বাড়ে, তারা যেন হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করতে শেখে, কোমলতার প্রকাশে অনাড়ষ্ট হয়। পুরুষজাতি যদি আগ্রাসিতার অনেকটাই ঝেড়ে ফেলতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির ভিত্তিস্থাপন সম্ভব নয়। ঐ আগ্রাসিতা হয়তো এককালে তাকে টিঁকে থাকতে মূল্যবান সাহায্য করেছে, কিন্তু বর্তমানে, বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, তা অনাবশ্যক ভার। অর্থাৎ, *পৌরুষেরও* একটি নতুন আদর্শ আমাদের নির্মাণ করতে হবে। আজকের যে নতুন মেয়ে সে এখনই নতুন ধরনের সঙ্গী খুঁজছে, এমন পুরুষ যে তার নিজের বৃদ্ধির প্রতি যতটা অঙ্গীকারবদ্ধ তার সঙ্গিনীর বৃদ্ধির প্রতিও ততটাই অঙ্গীকারবদ্ধ। ছেলেরা যদি এই নতুন আদর্শের পূর্ণতায় পৌঁছতে চায়, তা হলে তাদের একটা নতুন ধরনের পরিবেশে মানুষ হতে হবে। তারা যদি তাদের বাবাদের লালনপালনকারী ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত হয়, তবেই তারা নিজেদের ঐ মডেলে গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এর পর আমি বলেছিলাম যে মানবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ভাবনাদের যে-ছক আমরা দেখতে পাই তার একটি তৃতীয় ঔৎসুক্যজনক দিক আছে। সেটি হলো ঐ ছক যেভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে বেরিয়েছে এবং তার নকশাদের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এরকমটাই ঘটে। জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে বিবাহের অভ্যন্তরে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের দ্বারা, গান্ধীর এই পরামর্শের মধ্যে তাঁর নিজের বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালনের যোগী-তুল্য সংকল্প প্রতিবিম্বিত। মেয়েরা যেভাবে পুরুষদের সৃষ্টিশীলতাকে জাগরিত করে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবেছেন : সেই ভাবনা পুরুষ শিল্পী হিসাবে তাঁর নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সন্দেহ নেই, নারী শিল্পীরাও পুরুষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার তাগিদ অনুভব করে, যা তাদের কাছে সমান জরুরী ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে বিশেষ কিছু বলেন নি।[২] তেমনি, মানবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যে প্রজননকে বাদ দিয়ে যৌন সম্পর্ক, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অনুক্রমিক একগামিতার প্রতি যে-অঙ্গীকারবন্ধন আমরা দেখতে পাই তাতে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নকশাগুলি প্রতিফলিত।

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শকে মানবেন্দ্রনাথ যেভাবে মেঘমন্দ্র স্বরে ধিক্কার দিয়েছেন তাকে ঘিরে আছে আয়রনির একাধিক বৃত্ত। প্রথমতঃ, মেয়েদের সঙ্গে তাঁর যে-তিনটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা আমাদের জানা আছে সে-তিনটিই বিদেশিনীদের সঙ্গে : ভারতীয় নারীত্বের বাস্তবতার সঙ্গে তাঁকে কখনো রফা করতে হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত বিবরণ থেকে আমরা জানি যে এলেনের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন কেবল একজন প্রেমময়ী

সঙ্গিনীকে নয়, উপরন্তু একজন অত্যন্ত কর্মপটু সচিবকে, একজন অক্লান্ত সহকর্মিণীকে, একজন নিবেদিত সেবিকাকে, এবং জীবনের প্রীতিসম্মিলনগুলিতে অতিথি-আপ্যায়নে নিপুণা একজন আদর্শ গৃহকর্ত্রীকে। এলেন তাঁকে যে কেবল নিঃশর্ত ব্যক্তিগত আনুগত্য দিয়েছিলেন তাই নয়, মানবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে যা-কিছু নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন সে-সমস্তর সঙ্গেও এলেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম ক'রে নিয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি এবং তাঁর সংগ্রামের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন উভয়ই এলেন প্রসন্নচিত্তে এবং নিঃস্বার্থভাবে মিটিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি 'আদর্শতম হিন্দু স্ত্রীকেও' ছাড়িয়ে গেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ সন্তান চান নি এবং এলেন তা মেনে নিয়েছিলেন। স্বামীর বন্ধুবর্গ এবং সহকর্মীরাই কার্যতঃ হয়ে দাঁড়ান তাঁর নিজের বৃহৎ পরিবার, এবং ঠিক একজন হিন্দু গৃহিণীর মতোই তিনি এঁদের তাঁর দাক্ষিণ্যপূর্ণ মনোযোগ দিতেন। তাঁর জীবৎকালে তাঁর ভারতীয় বন্ধুরা তাঁকে সীতার অবতার ব'লে মনে করতেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে সতী এবং সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়। এই সব খুঁটিনাটি শিবনারায়ণ-সম্পাদিত *দ্য ওয়ার্ল্ড হার ভিলেজ*-নামক এলেন-স্মারক বইটিতে পাওয়া যাবে। এখন জিজ্ঞাস্য : একজন ঐতিহ্যপন্থী স্বামীও তাঁর উদ্দামতম স্বপ্নে এর চাইতে বেশী আর কী চাইতে পারতেন? ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ কি এখানে তার নীরব প্রতিশোধ নিয়েছে বলতে হবে? র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী মানবেন্দ্রনাথ যেন তাঁর মনের গভীরে, অচেতনভাবে একটা চরম নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই খুঁজেছিলেন,— একজন প্রাচীনপন্থী স্বামীর মতো, অথবা যেমন নাকি ঈশ্বর দাবি করেন মানুষদের কাছ থেকে,— এবং অবশেষে তা পেয়েছিলেন এলেনের মধ্যে। মানিয়ে নেওয়া এবং দিঙ্‌নির্বাচনের প্রায় সমস্তটাই যেন এলেনের দিক থেকে মানবেন্দ্রনাথের দিকে। মানবেন্দ্রনাথের মধ্যেও তুলনীয় প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় কি? তিনি কি এলেনের মধ্যে তেমন কোনো বিকাশকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যা এলেনের পক্ষে একান্তভাবে প্রাতিস্বিক? *এলেনের* বৃদ্ধির প্রতি *মানবেন্দ্রনাথ* কি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন? এলেন একজন নানাগুণসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা ছিলেন এবং আপন অধিকারে অনেক কিছু করবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো। কিন্তু ভারতে আসার পর কার্যতঃ তিনি বাধ্য হন তাঁর জীবনকে মানবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সংগ্রামের প্রয়োজনাধীন করতে, এবং ঠিক এখানেই আমার প্রজন্মের একজন মেয়ে অস্বস্তিবোধ করে। আমরা চাই যে আমাদের সত্তার কয়েকটা শক্ত দানা অধৃষ্যভাবে আমাদেরই থাক : কেউ যেন তাদের ছিনিয়ে নিতে না পারে। সেগুলো দিয়ে আমরা নিজেরা যা করতে চাই তা করবো। এ কথা মানবেন্দ্রনাথ অথবা এলেনের সমালোচনা হিসাবে বলছি না, বলছি একটা ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। সেটি এই যে আমাদের নারীত্বের তথা পৌরুষের আদর্শগুলি স্থাবর নয়, তারা জঙ্গম, এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তারা যে রূপান্তর গ্রহণ করবে সেটাই স্বাভাবিক।

॥২॥

... অরুণবাবুর মূল জিজ্ঞাসা হচ্ছে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে আমি যে-প্রশ্ন তুলেছি তাকে নিয়ে। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে 'দুঃসাহসিকা' আখ্যা দিয়েছেন এবং লিখেছেন :

> কেতকী দেবীর প্রশ্ন : পুরুষ-নারীর সম্পর্ক একগামী হবে কেন? আমাদের ত' অনেক বন্ধু থাকে। নতুন বন্ধু হওয়া মানে নয় যে পুরানো বন্ধুত্ব বিলোপ পাবে। বন্ধুত্ব ও কামজীবন আসলে আলাদা নয়। তবে কেন পুরুষের ও নারীর মধ্যে একই সময়ে অপর লিঙ্গের একাধিক লোকের সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধ হবে না? ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তা প্রয়োজনীয় হতে পারে। আমার বক্তব্য, কেরলে নায়ারদের মারু-মাক্কায়াম বিধিতে এই চাহিদা মিটতে পারে। (এ বিধি এখন প্রায় লুপ্ত)। নারীরা থাকেন তাঁদের নিজের গৃহে। নানা পুরুষ এসে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গম করেন। তাঁদের পছন্দ না হলে পুরুষদের তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। পুরুষেরাও নানা নারীর কাছে যান। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা আছে। সব সম্পত্তি তাঁদেরই ও সন্তানেরা তাঁদের কাছেই থাকে, অর্থাৎ মামার বাড়ীতে। কেতকী দেবী কি এই বিধির সার্বিক পুনরুত্থানের চেষ্টা করবেন?

এই প্রতিবেদন আমার মূল বক্তব্যের ঝোঁকপ্রদান ও ফোকস্ থেকে স'রে এসেছে। ... 'কামজীবন' শব্দটিতে আমার স্বভাবসিদ্ধ চিন্তার প্রতিফলন নেই। ওটি আমি নিজে কখনো আমার কোনো লেখায় ব্যবহার করেছি ব'লে মনে পড়ে না। মনে পড়ছে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে 'কাম'-এর ধারণাটাকে আমার সৃষ্ট একটি চরিত্রের মাধ্যমে ঠুকেছিলাম।

> মেয়েদের ছিলো 'পতিভক্তি' আর ছেলেদের 'কাম'। দুটোই আমরা আজকের দিনে যাকে ভালোবাসা বলি তার থেকে কিছুটা আলাদা। ডু ইউ এগ্রি, ডিরেক্টর-দা?
>
> (*নোটন নোটন পায়রাগুলি*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৩, পৃঃ ২৪৯)

আলোচ্য ইংরেজী প্রবন্ধে আমার বক্তব্য ছিলো এইরকম : ১) বন্ধুত্বের রীতি অনুক্রমিক একনিষ্ঠতার নয়; ২) বন্ধুত্ব এলোমেলোভাবে বা বাছবিচার না ক'রে ঘটে না ('ফ্রেণ্ডশিপ ইজ্ নট প্রমিস্‌কিউআস্'), ঘটে নির্বাচনের ভিত্তিতেই ('ইট ইজ্, ইফ এনিথিং, সিলেক্টিভ'); ৩) তৎসত্ত্বেও আমরা একই সময়ে *একাধিক* বন্ধুকে ভালোবাসতে সক্ষম (দ্রষ্টব্য যে 'একাধিক' আর 'অনেক' এই শব্দদুটো ঠিক এক জিনিস নয়, দুটোর ব্যঞ্জনা যথেষ্ট আলাদা); ৪) এ ব্যাপারে যৌন প্রেম ('এরটিক্ লাভ্') মূলতঃ অন্যপ্রকারের নয়, কেননা ৫) এটা একটা ঘটনা যে আমরা একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির প্রতি ('ফর্ মোর্ দ্যান্ ওয়ান্

পার্সন্') প্রেম ও আকর্ষণ অনুভব করতে পারি, যদিও ৬) এ সত্য সচরাচর প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হয় না, কেননা ৭) দম্পতিদের পারস্পরিক স্বত্ব-সম্পর্ক ঐ বাস্তবতাকে আড়াল ক'রে রাখে।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে জোর গলায় বলেছেন যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে স্বত্ব-সম্পর্কের স্বভাব থেকে স'রে আসতে হবে। একই সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্পর্ক যে মুখ্যতঃ সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্যে তা তিনি স্বীকার করেন নি। এই জায়গাটায় তিনি যে পুরোপুরি 'সিরিয়াস' ছিলেন তা আমরা জানি, কেননা তাঁর নিজের জীবনেও তিনি নারী-সহবাস করেছেন কিন্তু পিতৃত্ব চান নি। এমন কি তিনি আশা করেছিলেন যে 'হয়তো সে-দিন বেশী দূরে নয় যখন প্রজনন-রূপ জৈব ঘটনাটা যৌন জীবনের সুন্দর আবেগময় উপরি-কাঠামো থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যাবে' (*ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ*, আমার অনুবাদ, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, পৃঃ ২৭)। মানবেন্দ্রনাথের এই অবস্থান প্রবলভাবে ঐতিহ্যবিরোধী। আমি তাঁর এই অবস্থান থেকে লাইন টেনে তাকে তার ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছি মাত্র। কোনো র‍্যাডিকাল অভিমতকে তার যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেওয়া যদি দুঃসাহসের পরিচয় হয়, তবে আমি দুঃসাহসের কাজ করেছি, কিন্তু মৌলভাবে— শিকড়ে গিয়ে— চিন্তা করার মানেই তো প্রায়শঃ গৃহীত মতের বিপক্ষে যাওয়া, অতএব সেই সাহস রাখতে বাধ্য হওয়া যা অনেকের দৃষ্টিতে দুঃসাহস কিন্তু মতান্তরে যাকে সৎসাহসও বলা যেতে পারে।

সাল্‌মান রুশ্‌দির উপরে আমার সম্প্রতি লিখিত প্রবন্ধটিতে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার মতো সাহিত্যালোচনাতেও 'ট্যাক্সনমি'র একটা স্থান আছে। বস্তুতঃ, যে-কোনো বৌদ্ধিক আলোচনাতেই বর্গীকরণ অপরিহার্য : তাকে বাদ দিয়ে এক পা এগোনো সম্ভব নয়।

মেনে নেওয়া যাক যে বংশবৃদ্ধির তাগিদ আমাদের মধ্যে প্রকৃতি-কর্তৃক অনুস্যূত ব'লে অধিকাংশ মানুষই অন্ততঃ দু'-একটি সন্তান চায় ও চাইবে। কিন্তু 'ছোট সুখী পরিবার' সৃষ্টি ক'রে ফেলার পর অধিকাংশ মানুষ তো আর গান্ধীর পরামর্শ মেনে বাদ-বাকি জীবন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে কাটাবে না। মানতেই হবে যে আধুনিক কালে অধিকাংশ রতিক্রিয়া সন্তানোৎপাদনের জন্য হবে না। সে-ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য : স্ত্রীপুরুষের যে-যৌন সম্পর্ক প্রজননার্থে নয়, যা স্বত্বের সম্পর্ক নয়, যা কেবল সমকক্ষদের অনুরাগের প্রকাশ,— যা স্পষ্টতঃ মানবেন্দ্রনাথের আদর্শ,— তা বস্তুতঃ কী জাতের সম্পর্ক ?

তা স্পষ্টতঃ গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, রাজা-প্রজার সম্পর্ক নয়, জমিদার আর রায়তের সম্পর্ক নয়, বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের সম্পর্ক নয়, গণিকার সঙ্গে তার খদ্দেরের অর্থমূল্যে কেনা সম্পর্ক নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তা অমিত্রসম্পর্ক নয়, কোনো হৃদয়হীন যান্ত্রিক সম্পর্ক নয়, কেননা মানবেন্দ্রনাথের বিধান অনুসারেই তা মহৎ হৃদয়াবেগের প্রকাশ। তাঁর স্পষ্টোক্তি : 'পারস্পরিক সম্মতি ও প্রেম ব্যতীত যৌন নীতির ভিত্তি আর কী-ই বা হ'তে পারে ?' (*ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ*, পূর্ববৎ, পৃঃ ২৬)।

তবে কি তা একজাতের মিত্রসম্পর্ক নয়, এক ধরনের বন্ধুত্ব নয়? হ'তে পারে তা বিশেষ ধরনের বন্ধুত্ব, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, তবু তা সখ্য তো। বলা বাহুল্য, এই সত্য উচ্চস্তরের প্রেমের কবিতার ভাষায় বহু কাল ধ'রেই স্বীকৃত। আমার বাদ-বাকি বক্তব্য ঐ বিচারের যৌক্তিক জাতক, সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত। যে-সম্পর্ক বন্ধুত্বগোত্রীয়, *আবশ্যিক* একগামিতার আদর্শ সেখানে অবান্তর। নানা *ব্যবহারিক* কারণে লোকে একগামিতাকে *নির্বাচন* করতে পারে বটে, কিন্তু বিধান হিসাবে, বাধ্যতামূলক নিয়ম হিসাবে, থিওরি বা তত্ত্ব হিসাবে তার আর কোনো ন্যায্য ভিত্তি থাকে না।

এবং এই বক্তব্যের সঙ্গে কোনো প্রাচীন সামাজিক প্রথার পুনরুত্থানের সম্পর্ক বলতে গেলে প্রায় অনস্তিত্বশীল। অরুণবাবু কেরলের প্রথাটির যে-বিবরণ দিয়েছেন তা সরলীকৃত। বস্তুতঃ, ওটি ছিলো একটি জটিল ব্যবস্থা, একটি সামন্ততান্ত্রিক তথা বর্ণশাসিত সমাজের অঙ্গ। যদিও এর অভ্যন্তরে নায়ার মেয়েদের একটা আপেক্ষিক যৌন স্বাধীনতা ছিলো, তবুও সেটাই এ ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না। এর গভীরতর সম্পর্ক ছিলো ভূ-স্বত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সন্তানপালন, এবং কেরলের দুটি বর্ণের পরস্পরনির্ভরতা এবং অন্যোন্যজীবিত্বের সঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী বীণা আগরওয়ালের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে দুটি অণুচ্ছেদ উদ্ধার করতে চাই। বাংলাতে তর্জমা ক'রেই পরিবেশন করতাম, কিন্তু দু'-তিনটি মলয়ালী শব্দের সঠিক উচ্চারণ জানি না, হাতের কাছে কোনো চেনা-জানা মলয়ালীভাষীও নেই, এবং উচ্চারণ না জেনে প্রতিবর্ণীকরণের 'দুঃসাহস' আমার নেই। অতএব, উদ্ধৃতিটি ইংরেজীতেই রাখতে বাধ্য হচ্ছি।

> Historical accounts indicate that traditionally the Nayars of central and southern Kerala were typically non-cultivating tenants, with long-term hereditary tenancy rights to land, and living in matrilineal joint families termed *taravads*, which were also joint property holding units. A *taravad* was comprised of the matrilineal descendants of a common ancestress, and usually contained a set of sisters and brothers, their mother (if alive), and the sisters' children and sisters' daughters' children. Ancestral property was inherited through the female line, in accordance with what was termed the *Marumakkatayam* system of matrilineal inheritance. All *taravad* members had equal claims to maintenance from the joint property, but no individual member could ask for a share by partition, which could only be effected by the consent of all members. Management was in the hands of the seniormost male—the *karnavan*—usually the ancestress's brother, while most of the younger men were away serving in the king's army. The self-acquired property of the *karnavan* lapsed to the *taravad* on his death, and that of the female members passed to their children and descendants solely in the female line.

A pre-puberty rite—the *tali*-tying ceremony—ritualistically married the Nayar girl to a suitable man of a higher caste, usually a Nambudiri Brahmin, the man having no further role in her life. Subsequently, she could enter into sexual unions or *sambandhams* with one or more men belonging to her own or higher subcaste or caste. These unions did not imply co-residence— the man continued to live in his natal home and the children belonged to their mother's *taravad*. Parallel to this, among the patrilineal Nambudiri Brahmins, the eldest brother alone could marry and only within his caste, the younger brothers establishing *sambandham* unions with women of matrilineal castes, especially the Nayars, thus limiting Nambudiri numbers and keeping the joint estate intact. Nambudiris were also typically landlords, whose principal tenants were Nayar lineages holding hereditary rights on a long-term tenure and cultivating the land either through Pulaya serfs or Tiyyar subtenants.

(Bina Agarwal, 'Who Sows? Who Reaps? Women and Land Rights in India', *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 15, No. 4, July 1988, pp. 549-50.)

এখানে দ্রষ্টব্য একটি জটিল এবং অতীব ঔৎসুক্যকর শ্রেণীসম্পর্ক তথা বর্ণসম্পর্ক: একদিকে ব্রাহ্মণ জমিদারশ্রেণী, অন্যদিকে তাদের প্রজা যোদ্ধৃশ্রেণী, যারা এক নম্বর দায়িত্বে রাজ্যের জন্য সৈনিক জোগাতো, দুই নম্বর দায়িত্বে নিম্নতর শ্রেণী তথা বর্ণকে দিয়ে জমি চাষ করাতো, এবং তিন নম্বর দায়িত্বে জমিদারবাড়ির বিবাহাধিকারবঞ্চিত বেচারী ছোট ভাইদের যৌন প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্ত্রীলোক জোগাতো। এটি কোনো প্রেমস্বাধীনতার ফর্ম্যুলা নয়, একটি ছদ্মবেশহীন অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার পরিলেখ। নায়ারদের ক্ষেত্রে ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতৃরৈখিক, নাম্বুদিরিদের ক্ষেত্রে তা পিতৃরৈখিক। যৌথ সম্পত্তিকে অবিভক্ত রেখেও উভয় বর্ণ যাতে বংশবৃদ্ধি করতে পারে তার জন্য মাতৃরৈখিক আর পিতৃরৈখিক উত্তরাধিকারব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটা বিধান দেওয়া হয়েছে এবং উভয় বর্ণের মধ্যে অনুমোদিত যৌন সংসর্গের জন্য নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নায়ার মেয়ে নায়ার অথবা নাম্বুদিরি প্রেমিক নিতে পারে, কিন্তু নাম্বুদিরি মেয়ে নায়ার প্রেমিক নিতে পারে এমন দেখতে পাচ্ছি না। জমিদারশ্রেণীর জনসংখ্যাও এই ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে, কেননা নায়ার-নাম্বুদিরি 'সম্বন্ধ'-এর সন্তানপুঞ্জের ভরণপোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই নায়ার যৌথ পরিবারের উপরে ন্যস্ত। এবং লক্ষণীয়, সমাজের স্থিতির জন্য স্ত্রীলোকের একাধিক পুরুষসংসর্গ যদি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, তা হলে তা কত অনায়াসে প্রকাশ্য ছাড়পত্র পেয়ে যায়! কিন্তু ঐ অধিকার বা দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে একদল স্ত্রীলোকের ভিতরে, যারা শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত নয়। তুলনীয় প্রাচীন ভারতে বারাঙ্গনাবৃত্তির অনুমোদন। কেরলের এই অধুনালুপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একদিনে রূপ নেয় নি, যুগ যুগ ধ'রে কতগুলি বিরোধী স্বার্থদের সংঘর্ষের ফলে বিবর্তিত হয়েছে এমন

একটি কূটনৈতিক চুক্তি হিসাবে, যা কৌটিল্যের উপমহাদেশের অযোগ্য নয়। আমরা যে-স্তরের সখ্যের কথা আলোচনা করছিলাম তার সঙ্গে এই সব 'সম্বন্ধ'-এর সম্পর্ক কতটা? অপিচ দ্রষ্টব্য যে নায়ার যৌথ পরিবারে সন্তানদের পিতারা পিতা হিসাবে অনুপস্থিত, শিশুদের লালনপালনে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। এটা তো আধুনিক মেয়েরা যা চায় তার একেবারে বিপরীত।

অতএব অরুণবাবুর প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য: না, কেরলের ঐ ব্যবস্থার সার্বিক পুনরুত্থানের জন্য আমি মোটেই আন্দোলন করছি না! আমি তো কোনো পুরাতন প্রথার পুনরুজ্জীবনের কথা বলি নি, একটা অনাগত ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিলাম,—যেখানে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক একটা উচ্চতর কোঠায় উন্নীত, যেখানে তা পাপবোধমুক্ত, স্বত্ববোধমুক্ত, ঈর্ষাবর্জিত, বন্ধুত্বের বর্গভুক্ত। আমার বিচারে, যে-সম্পর্ক এর থেকে কম তা আমাদের মনুষ্যত্বকেই খাটো করে, আমাদের মনুষ্যত্বের অহংকারই এ পুনর্জন্ম দাবি করে। সে-পুনর্জন্ম তো কোনো লুপ্ত প্রথার পুনরুজ্জীবনের দ্বারা সাধনীয় নয়, তার জন্য লাগবে নূতনের প্রেরণা, সৃষ্টিশীল নব উদ্যম। অচিন্তনীয়কে চিন্তা করা, অকল্পনীয়কে কল্পনা করা, অসম্ভবকে সম্ভবের সীমানার মধ্যে আনা: এগুলি কি আমাদের কাজের অন্তর্গত নয়?

আর ভুললে চলবে না যে ভারতের গ্রামে গ্রামে বস্তিতে বস্তিতে অগণিত মেহনতী মেয়ের জীবনের রূঢ় বাস্তবতা প্রতিকার দাবি করে আজই, এখনই।

১ শুধু যে ঘটে নি তা নয়, সমকামীরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির জন্য রীতিমতো সোচ্চার হয়েছেন। অধুনা তাঁদের দাবি এই যে 'পার্টনার'দের সঙ্গে তাঁদের সহবাস বিবাহের মর্যাদা পাক। কোথাও কোথাও এই দাবি মেনেও নেওয়া হচ্ছে। [২০০৪-এ সংযোজিত টীকা]

২ বিষয়টা নিয়ে আমি যে এই প্রবন্ধ লেখার অনেক আগে থেকেই ভাবছিলাম তা বোঝা যায় *জিজ্ঞাসা*-য় প্রকাশিত আমার একটি চিঠি থেকে। ঐ পত্রিকার ৪ : ২ সংখ্যায় গৌরকিশোর ঘোষ 'জীবন, সত্য, সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যার সূত্রে আমি প্রশ্ন করি, '... তিনি লিখেছেন, সৃষ্টিশীল শিল্পীদের জগতে নারী ঈশ্বরীর তুল্য, যে-আগুনে পুড়ে ভাজা-ভাজা না হলে মানুষের গভীর রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না সেই আগুনই নারী। তিনি কি বলতে চাইছেন যে কথাটা শিল্পীর লিঙ্গনির্বিশেষে সাধারণভাবেই সত্য, অর্থাৎ নারী শিল্পীদের পক্ষেও কি সেই আগুন নারীই? অথবা কি তিনি কথাটা বলেছেন একজন পুরুষ শিল্পী হিসাবে, অর্থাৎ শিল্পীদের পক্ষে সেই আগুন বিপরীত লিঙ্গ, ফলতঃ নারী শিল্পীদের পক্ষে সেই আগুন পুরুষ?' ৩১ অক্টোবর ১৯৮৩ তারিখে লেখা চিঠিটি পত্রিকার ৪ :৪ সংখ্যায় ছাপা হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে, গৌরকিশোর আনুষ্ঠানিকভাবে এর কোনো উত্তর দেন নি। পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ-আলোচনা থেকে জেনেছিলাম যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে 'নারীত্বের আদর্শের সূত্রে' প্রবন্ধে আমি যে-সব মতামত ব্যক্ত করি সেগুলির অধিকাংশের সঙ্গেই তিনি একমত ছিলেন।

জিজ্ঞাসা ১০ : ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৬ [১৯৯০]

নারীত্বের আদর্শের সূত্রে (দুই)

[দুটি আলোচনামূলক চিঠির সমাহারে গঠিত নীচের লেখাটি *জিজ্ঞাসা*-র প্রবন্ধ বিভাগেই ছাপা হয়েছিলো। যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হয়েছে।]

'নারীত্বের আদর্শের সূত্রে' প্রবন্ধ সম্পর্কে কোনো চিঠি বার হলে তার সূত্রে আরও খানিকটা আলোচনা করতে পারি, *জিজ্ঞাসা*-র সম্পাদক এরকম আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই আশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন ক'রে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

শ্রীযুক্ত অরুণ ঘোষ এবং শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্তর মতো দুজন পাঠককে যে ভাবাতে পেরেছি এতে সম্মানিত বোধ করছি। তাঁদের চিঠিদুটি (*জিজ্ঞাসা* ১১ : ১) প'ড়ে মনে হয় তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো মৌল মতবিরোধ নেই। কেবল আলোচনাটাকে আরও কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কোনো কোনো বক্তব্যকে আরেকটু স্পষ্টতা দেওয়াই এই লিপির আসল উদ্দেশ্য।

অরুণবাবু ঠিকই বলেছেন যে কেরলের সমাজে যে-আপেক্ষিক নারীস্বাধীনতা দেখতে পাওয়া যায় তার পিছনে প্রাচীন মাতৃরৈখিক প্রথাটির একটা ভূমিকা আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রাও এ কথা মানেন। আনুষ্ঠানিকভাবে অবিকল ঐ রূপে প্রথাটির পুনরুজ্জীবন যে অসম্ভব তথা অর্থহীন, তা-ও অরুণবাবু স্বীকার করেন জেনে আশ্বস্ত বোধ করছি। ভবিষ্যৎ কখনোই ঠিক অতীতের মতো হবে না, তবে হ্যাঁ, আমাদের ভবিষ্যৎ-চিন্তা অতীতের কাছ থেকে কিছুটা প্রাসঙ্গিক শিক্ষা লাভ করতে পারে বৈকি। ...

মানসী দেবীর বক্তব্যগুলিতে আসা যাক। প্রথমেই বলি, আমার ইংরেজী এবং বাংলা প্রবন্ধদুটি লিখতে গিয়ে আমার মনের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন জেগেছিলো তাদের মধ্যে অনেকগুলির উত্তরই আমি পেয়ে গেছি *জিজ্ঞাসা* ১০ : ৪ সংখ্যার সম্পাদকীয়র মধ্যে। সেখানে শিবনারায়ণ রায় যে-সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি আমি খানিকটা আঁচ করেছিলাম, কিন্তু সবটা সঠিক জানতাম না ব'লে আমার প্রশ্নগুলি তুলতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। খবরগুলি আগে সুনিশ্চিতভাবে জানলে কতগুলি প্রশ্ন যেভাবে তুলেছিলাম সেভাবে তুলতাম না। যেহেতু, শিবনারায়ণের ভাষায়, 'মানবেন্দ্রভক্তরা' কতগুলি প্রসঙ্গ 'একেবারেই এড়িয়ে চলেন', যেহেতু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মানবেন্দ্রকে 'ঋষি' বানিয়ে এবং এলেনকে 'স্রেফ পতিব্রতা সতীতে' পর্যবসিত ক'রে ভারতীয় সমাজে গ্রাহ্যতর করার চেষ্টা করেছেন, তাই আমাদের বিভ্রান্ত হতে হয়। আশা করি শিবনারায়ণের মানবেন্দ্রজীবনী এই বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করবে। তবে তিনি যে-খবরগুলি দিয়েছেন তাদের পরিপ্রেক্ষিতে *দ্য আইডিয়াল অফ ইণ্ডিয়ান উমানহুড*-এর টেক্সটটি যেন আরও কূটাভাসগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

কেননা ওখানে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের যে-আদর্শকে মানবেন্দ্র তুলে ধরেছেন সেটা কিন্তু অনুক্রমিক একগামিতারই। বিবাহে, সতীত্বে, অথবা অনুক্রমিক একগামিতায় তাঁর যদি তেমন কোনো আস্থা না থেকে থাকে, তা হলে এ কাজ তিনি কেন করলেন? সে কি ভারতের অত্যুগ্র ঐতিহ্যপন্থীদের মুখোমুখি তাঁর নিজের প্রবল ঐতিহ্যবিরোধিতাকে একটা ন্যূনতম গ্রাহ্য বেশ দেবার প্রয়াসেই?

বার্লিনে লুইজ় গাইস্‌লারের সঙ্গে থাকার সময়েই এলেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, এ কথা আগেই জানা ছিলো। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি যে উভয় নারীকেই প্রণয়পত্র লিখেছেন এটি অবশ্যই আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মানসী মন্তব্য করেছেন, 'চিঠি কি শারীরিক-সংযোগতুল্য হতে পারে? চিঠির প্রণয় সূক্ষ্ম, স্পর্শহীন। তবু গোল বাধে না তা নয়।' চিঠি অবশ্যই শারীরিক সংযোগ নয়, কিন্তু মনের সংযোগ তো বটে। প্রেমের লীলায় মনের ভূমিকা কি গৌণ? যে-বন্ধুদের মধ্যে স্থানগত দূরত্ব বর্তমান তারা বাধ্য হয়েই চিঠির মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা ক'রে থাকে। তারা আর কী করবে? এখানে তারা নিরুপায়। অবশ্যই আজকালকার দিনে সম্ভব হলে তারা টেলিফোনও ব্যবহার করে। চিঠির অনুভব 'সূক্ষ্ম, স্পর্শহীন' হলেও তার সত্য হতে বাধা নেই। তা অন্ততঃ কবিতার অনুভবের সমগোত্রীয় হতে পারে। মানসী কি বরিস পাস্তেরনাক আর মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার পরস্পরকে লেখা 'ঝড়ে উতরোল' চিঠিপত্রের কোনো অংশ দেখেছেন? ৎস্‌ভেতায়েভার প্রবাসজীবনে এই পত্রমাধ্যমিক প্রণয় ছিলো একটি বড় অবলম্বন। প্রেমের রাজ্যে ভাষার দাপটকে কি মানসী অস্বীকার করবেন? সাধারণ 'অ-বুদ্ধিজীবী' মানুষও তো প্রেমের কবিতার আর গানের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সে যাই হোক, আলোচ্য ক্ষেত্রে সংযোগটা কেবলই চিঠির ব্যাপার নয়। মানবেন্দ্র লুইজের সঙ্গী তো ছিলেনই, অন্ততঃ ১৯৩০-এর নভেম্বরে ইয়োরোপ ছেড়ে চ'লে আসার সময়ে তিনি যে আল্পস্‌ অঞ্চলের মেরানোতে এলেনের সঙ্গে 'কয়েকটি আশ্চর্য দিন' কাটিয়েছিলেন, তাও আমরা জানি। সম্ভবতঃ আরও কিছু খবর গবেষক শিবনারায়ণের আস্তিনের নীচে লুকানো আছে। মানবেন্দ্র যদি মেরানোর পরেও উভয় নারীকেই প্রণয়পত্র দিয়ে থাকেন, এবং ঐ দুই নারী পরস্পরের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে থাকেন, তা হলে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম— যে মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ অনুভব করা সম্ভব, এবং নূতন কারও প্রেমে পড়ার মানেই পুরাতন প্রেমকে ভুলে যাওয়া নয়— তার সমর্থনই মেলে।

শিবনারায়ণপ্রদত্ত আরেকটি তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন যে মানবেন্দ্রর বিয়েতে অভিরুচি ছিলো না, কিন্তু বিয়ে না করলে এলেন ভারতে পৌঁছনোমাত্র ভারত সরকার তাঁকে তাড়িয়ে দিতো, যেমন তারা তাড়িয়ে দিয়েছিলো লুইজ় গাইস্‌লারকে। অর্থাৎ এলেন যাতে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারেন তার পথ সুগম করার জন্যই মানবেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর বিবাহবন্ধনের প্রয়োজন ছিলো। যাদের ব্যক্তিগত জীবনের টানাপড়েনে রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রমণের একটা ব্যাপার থাকে তারা ভালোভাবেই জানে জীবনের নানা সিদ্ধান্তে

এ-জাতীয় বিবেচনাকে কী-আন্দাজ হিসাবের মধ্যে নিতে হয়। পরিষ্কার মনে পড়ে যে ১৯৬৪ সালে কলকাতার বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনের দপ্তর থেকে আমার বাবাকে বলা হয় একটি মজাদার কথা— যে তাঁর কন্যা যদি জনৈক ইংরেজ যুবকের সঙ্গিনীমাত্র হয়ে বৃটেনে ফিরে যেতে চায়, তা হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎই তার পাসপোর্টে প্রবেশাধিকারের ছাপ মেরে দেবেন, কিন্তু মেয়েটি যদি উক্ত ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে বৃটেনে প্রবেশ করতে চায়, তা হলে তাঁদের সমস্ত প্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটি সাবধানে খুঁটিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ; কেননা কে কার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছুক এ ব্যাপারে তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন ইংরেজ যুবকরা এই ব্যাপারটিতে সর্বদাই নিজেদের মর্যাদাহানি করছে (**'are always disgracing themselves'**), যে-বিদেশিনী একজন ইংরেজের সঙ্গিনীমাত্র তাকে বৃটিশ সরকার ইচ্ছে করলে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অজুহাতে তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু যে একজন বৃটিশ নাগরিকের আইনসম্মত পত্নী তাকে অত সহজে 'ডিপোর্ট' করা যাবে না। এর পর আমার করণীয় বিষয়ে আমার পিতৃদেব আমাকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন তা পাঠকরা সহজেই অনুমান ক'রে নেবেন।

বলতে চাইছি যে এই সব পাসপোর্ট-ভিসা-সংক্রান্ত মোটা ব্যাপারগুলো হস্তক্ষেপ না করলে মানবেন্দ্র-লুইজ-এলেন এই ত্রয়ের ব্যক্তিগত জীবন ঠিক কী রূপ ধারণ করতো তা কে বলতে পারে ? অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও তাঁদের প্রেমজীবনে প্রাত্যহিক রূপে না হলেও নিদেনপক্ষে আসা-যাওয়ার মাধ্যমে ফরাসীরা যাকে বলেন 'মেনাজ্ আ ত্রোয়া' (**ménage à trois**) সেই 'তিনের সংসার'-এর আদল আসা একেবারে অসম্ভব হতো না।

এই ভূমিকার পর মানসীর তোলা অন্য প্রসঙ্গগুলিতে আসি। তিনি তুলেছেন ব্যক্তিগত সম্পর্কে সহৃদয়তার প্রসঙ্গটি। সহৃদয়তাকে আমি অবশ্যই বিরাট মূল্য দিয়ে থাকি। কারও জীবনে যদি এমন ঘটে যে নূতন প্রেম দেখা দিয়েছে কিন্তু পুরাতন প্রেম খারিজ হয়ে যায় নি, তা হলে তাকে তো অবশ্যই তার সমস্ত আচরণে সেই পুরাতন ব্যক্তিটিকে জানতে দিতে হবে যে সে পুরাতন হলেও প্রত্যাখ্যাত হয় নি। 'প্রত্যাখ্যাত হই নি' এই প্রত্যয় থাকলে তবেই না পুরাতন সঙ্গীটির পক্ষে 'নিরুপায় যন্ত্রণা'র অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। বলাই বাহুল্য আমার বিচারে প্রেমে পড়ার মধ্যে লজ্জাকর কিছুই নেই ; যারা এটাকে নিন্দনীয় মনে করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমি একদম বুঝি না। আমার ধারণা নিন্দাকারীরা নিজেরা কখনো কাউকে ঠিক ক'রে ভালোবাসে নি, তাই নিন্দা করে। নিন্দা দ্বারা নিজেদের অপূর্ণতাকে ঢাকার চেষ্টা করে। মানুষ অবশ্যই যে-কোনো বয়সে প্রেমে পড়তে পারে, প'ড়ে থাকে। এটা আবশ্যিকভাবে কোনো অভ্যন্তরস্থ অভাববোধ থেকে ঘটে না, অপর ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্বের উদ্ভাস থেকেও ঘটতে পারে। একটা সুখী সম্পর্কের ভিতরে থেকেও মানুষ নতুন প্রেমের আন্দোলনে আন্দোলিত হতে পারে। আসলে আমাদের মধ্যে ভালোবাসার যে-স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে তাকে আমরা যদি একেবারে নিরুদ্ধ না ক'রে ফেলি, তা হলে সাধারণতঃ দেখতে পাবো যে ভালোবাসার স্বভাবই হলো বারে বারে ফিরে আসার।

প্রেমে পড়লে মানুষ হয়তো কিছু পরিমাণে 'শৈশবে ফিরে যায়', যেমন মানসী বলছেন; কিন্তু প্রেমের প্রসঙ্গে শিশুর সারল্য, মুগ্ধতা এবং বিশ্বাসপ্রবণতা যে-পরিমাণে সদর্থক, তার আঁকড়ে থাকার চেষ্টাটা তো সেই পরিমাণেই নঞর্থক। ছেলেবেলার সেই দখলদার পর্যায়টা তো আর বয়স্ক সম্পর্কের মডেল হতে পারে না। সাবালক সম্পর্ককে সুন্দর ক'রে তুলতে হলে সেই শৈশবকে ছেড়ে আসতেই হবে। বড় হওয়া মানেই তাকে অতিক্রম করা। মানসী মানবেন যে এখানে একটা মনস্তত্ত্বগত 'ক্যাচ্-টোয়েন্টি-টু'র ব্যাপার আছে। আঁকড়ে থাকার পর্যায়কে অতিক্রম করতে পারলে তবেই আমাদের চোখের সামনে মালিকানা-বর্জিত বয়স্ক সম্পর্কের সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়, এবং কেবল তখনই আমাদের কাছে স্বত্ববোধজাত ঈর্ষার ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। সেই বিন্দুতে পৌঁছনোর ক্ষমতা নির্ভর করে কতকাংশে মানুষের নিহিত চরিত্রের উপরে, কতকাংশে শৈশবের লালনের উপরে, কতকাংশে জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা, সাহচর্য, বৌদ্ধিক চর্চা ইত্যাদির উপরে। নিজের সম্পর্কে এইটুকু অনায়াসেই বলতে পারি যে ঈর্ষা কোনো কালেই আমার উপরে বড় একটা আধিপত্য খাটাতে পারে নি। ভাইবোনেদের মধ্যে সবার বড় হওয়া সত্ত্বেও এবং একের পর এক তিনটি ভাইবোনকে মায়ের কোলে আসতে দেখেও আমার মধ্যে তথাকথিত 'সিবলিং জেলাসি' বা সহোদর-ঈর্ষার সঞ্চার হয় নি। হয়তো এর কারণ আমার মা-বাবার ব্যবহার: তাঁরা আমাকে কখনোই মনে করতে দেন নি যে অন্য ভাইবোনেরা জন্মেছে ব'লে তাঁদের চোখে আমার মূল্যের কোনো লাঘব ঘটেছে। সেই প্রাজ্ঞ লালনের জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী; তা নিশ্চয়ই আমার আত্মবিশ্বাসের বনিয়াদকে গড়তে সাহায্য করেছে।

হয়তো ঈর্ষার দাপট আমার নিজের স্বভাবের মধ্যে কম ব'লেই, এবং এর ফলে আমার অস্তিত্ব লাভবান হয়েছে মনে করি ব'লেই, প্রেমকে ঈর্ষার গ্লানি থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমি একটা বিশেষ দায়বদ্ধতা অনুভব করি। মানসী জানতে চেয়েছেন 'মনের কষ্টটা'কে আমি 'খুব নিন্দনীয়' বলবো কিনা। তা হলে আগে জেনে নিতে হবে মনের কোন্ কষ্টটার কথা ভাবা হচ্ছে। তার ভালোবাসা প্রতিদান পেয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত মানুষমাত্রই কষ্ট ভোগ করে। মানুষ যাকে চায় তাকে না পেলে তার অমানুষিক কষ্ট তো হবেই। তা ছাড়া আছে বিরহের কষ্ট। বস্তুতঃ অনেক সময়ে কোনো বিরহবোধের অপ্রত্যাশিত তীব্রতার মাধ্যমেই মানুষ নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে সে প্রেমে পড়েছে। এ সমস্তই স্বাভাবিক কষ্ট।

তবে আমার ধারণা প্রেমের কষ্টের মধ্যে যে-অংশটা স্বত্ববোধজাত, ঈর্ষাজাত, সেই অংশটাকে চেষ্টা করলে উৎখাত করা যায়, মাছের কাঁটার মতো বেছে ফেলে দেওয়া যায়। তা করতে পারলে প্রেমে 'আর্তি'র অংশ কমে, আনন্দের অংশ বাড়ে। প্রেম তখন নব ঐশ্বর্য লাভ করে। তার দেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায়, জীবন থেকে পাবার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। তার সৃষ্টিশীলতা শতধা প্রবাহিত হয়। তেমন প্রেম মানুষের জীবনে এক মহৎ আশীর্বাদ। এর মধ্যে উত্তাপ, তীব্রতা, উন্মাদনা— সবই থাকতে পারে, আবার একই সঙ্গে

এর মধ্যে সাবালকত্ব, ঋজুতা, দায়িত্ববোধও থাকবে। দুটো দিকই মূল্যবান, এবং প্রকৃতপক্ষে দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

সঙ্গমকে নেহাৎ 'সুসঙ্গত নৈশ ব্যায়াম' হিসাবে গ্রহণ ক'রে যাঁরা সহজেই নিশার পর নিশা কাটিয়ে দিতে পারেন, অনুমান করি আমার তত্ত্ব তাঁদের অভ্যাসের পথে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। যাঁরা ঠিক ঐ স্তরে জীবনযাপন করতে পারেন না, আমি বোধ হয় তাঁদের নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি। মানসী আমাকে লক্ষ্য করতে বলেছেন যে 'আচরণে এককালীন একগামিতার বাধ্যতা এসেই যায়', কেননা 'মানবমিথুন গোপনীয়তা খোঁজে', 'অপরের সম্মুখে মৈথুনে লিপ্ত হতে অধিকাংশ নরনারী অসম্মত'। অবশ্যই। পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে বারান্দায় ব'সে গল্প করা চলে, কিন্তু কোনো একজনের সঙ্গে প্রেম করতে হলে মানুষ সাধারণতঃ আড়ালে যাওয়াই পছন্দ করে। অপর্ণা সেনের ছায়াছবি ৩৬ *চৌরঙ্গী লেন*-এর প্লটটাই প্রেমিকদের আড়াল খোঁজার প্রয়োজনকে আশ্রয় ক'রে গঠিত, তাই না? কিন্তু এই আড়ালপ্রীতির জন্য মানুষের বহুগামিতা যে বড় একটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা তো মনে হয় না। পৃথিবীর সব মহাদেশেই বহুগামী পুরুষ তার একাধিক নারীর জন্য সাধ্যমতো একাধিক কুটির বা তাঁবু বা প্রাসাদের মহল তৈরি ক'রে সমস্যা মিটিয়েছে। পঞ্চপতির সঙ্গে দ্রৌপদী কিভাবে সহবাস করবেন তার বিধানও মহাভারতে দেওয়া আছে। 'তখন পাণ্ডবগণ এই নিয়ম করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবেন' ইত্যাদি (রাজশেখর বসুর সারানুবাদ)। লক্ষণীয় যে এখানেও একটা ক্রমের ব্যাপার এসে গেছে,— স্পষ্টতঃ সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ণয়ের প্রয়োজনেই। পাণ্ডবরা আজকের ছেলে হলে সম্ভবতঃ একেকজনের 'টার্ন'-এর জন্য চার-চার বছর অপেক্ষা করতে রাজি হতেন না, হয়তো ডাক্তারী সহায়তায় দ্রৌপদীর সন্তানদের আর নিজেদের 'জেনেটিক টিপছাপ' মিলিয়ে দেখে নিয়ে বুঝে নিতেন কে কার বাবা। বস্তুতঃ, কে কার পিতা সেই তথ্যকে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা দেবার তাগিদই পিতৃতন্ত্রে নারীর আবশ্যিক একগামিতার আসল ভিত্তি। প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে: যারা ফুটপাথে শোয় তারা আড়ালের ব্যাপারে কী করে?[১]

অনুক্রমিক একগামিতার আধুনিক আদর্শটা অনেকাংশেই খৃষ্টীয় সভ্যতার অবদান। কাঠামোটা পশ্চিমেও আর ভালোভাবে কাজ করছে না, তবু মানুষ প্রায়শঃ তাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। এর ফলে পাশ্চাত্য সমাজগুলিকে বেশ চড়া দামই দিতে হচ্ছে। গত দেড় বছরের মধ্যে আমাদের পরিচিত তিনটি মধ্যবয়সী দম্পতি আলাদা হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে দুটি দম্পতি মধ্যবিত্ত এবং আমাদের বন্ধুস্থানীয়, অন্য দম্পতি নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং আমাদের প্রতিবেশী। তিন-চার বছর পিছনে তাকালে আমাদের চেনা-জানা আরও কত দম্পতির অনুরূপ অবস্থা দেখতে পাই। তালিকা করতে বসলে তা নেহাৎ ছোট হবে না। যাঁরা এখনও আলাদা হন নি তাঁদের আসন্ন ভাঙনের আভাসও পাই। এই সব ভাঙনের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে অনুক্রমিক একগামিতার আদর্শকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা, একটা জোড় ভেঙে ফেলে আরেকটা জোড় গ'ড়ে তোলার প্রয়াস। বলাই বাহুল্য এই পুরানো জোড় ভাঙা আর নতুন জোড় গড়া থেকে সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানেরা। সেই

সব বিপর্যয় তো সর্বদাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাই ব'লে কি আর বিশ শতকের শেষে এসে ডিভোর্স তুলে দেওয়া যায়? না, ঘড়ির কাঁটাকে ওভাবে পিছনে ফেরানো যায় না। বিচ্ছেদের অধিকার দম্পতিদের দিতেই হবে। অথচ এই সব দম্পতি যদি তাঁদের রুদ্ধ দ্বৈত-বৃত্তের মধ্যে অন্য প্রেমিকদের অনুপ্রবেশকে কখনও কখনও মেনে নিতে পারতেন, তা হলে তাঁদের পারিবারিক ইউনিটগুলি এভাবে ভেঙে যেতো না, তাঁদের 'ডিভোর্স-এবং-পুনর্বিবাহ' প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হবার এত প্রয়োজন হতো না। কূটাভাস আশ্রয় ক'রে বলা চলে যে পারিবারিক ইউনিটগুলির কল্যাণার্থেই যৌন সাহচর্যের একটা ভিন্ন নকশাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া আজকের দিনে প্রাজ্ঞ হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি কারণে স্ত্রীপুরুষদের ব্যক্তিত্বের যত বিকাশ হচ্ছে, তাদের জীবনে প্রেমের প্রয়োজন ও গুরুত্ব ততই বাড়ছে, কমছে না। তার কারণ ব্যক্তিমানুষের প্রেমজীবনের সঙ্গে তার সৃষ্টিশীলতার একটা নিগূঢ় যোগ থাকে। তাকে অস্বীকার করলে মানুষকে তাসের দেশে ফিরে যেতে বলা হয়।

এই অবস্থায় আপনি আপনার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনেই বা স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের কোন্ মডেলটা তুলে ধরবেন? অনুক্রমিক একগামিতা যে কী-আন্দাজ অকেজো হয়ে গেছে তা তো তারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছে। সে-ক্ষেত্রে বাপ-মায়েদের জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র বা চোখে-রুমাল-বাঁধা গান্ধারী সেজে ব'সে থেকে কী লাভ? তার বদলে স্বীকার করা ভালো যে সমাজের অন্যান্য রূপান্তরগুলির সঙ্গে তাল রাখতে হলে এ ব্যাপারেও দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিবর্তন লাগবে।

বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক দিন ধ'রে ভাবছি, এবং আমার প্রতীতি এই যে ব্যক্তিত্বে ক্রমাগত বৃদ্ধিশীল আজকালকার প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে প্রেমকে যত শীঘ্র সম্ভব মালিকানার 'কন্‌টেক্স্‌ট্‌' থেকে ছাড়িয়ে এনে বন্ধুত্বের 'ফ্রেমওয়ার্ক'-এর মধ্যে স্থাপন করাই সব থেকে কল্যাণকর। ঐ কাঠামোটার ভিতরে তার মধ্যে যুগোপযোগী নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে, এবং সেটাই হয়তো যুগের দাবি। ভালোবাসার পাত্র যদি সম্পত্তি না হয়ে সুহৃদ হয়, তা হলে পারস্পরিক আচরণে নৈতিকতা আনা সহজতর হয়। সম্পর্কে সংকট দেখা দিলে সংকটমোচনের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্বাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার যে-প্রয়োজন, তাকে মেটানো যায়; সন্তানপালনের দায়িত্বকে তার সঙ্গে মেলানো যায়। পুরাতন এবং নূতন সঙ্গীদের প্রতি সহৃদয়তা এবং মমতা রক্ষা করা যায়। অপিচ এই মডেলটা পরবর্তী প্রজন্মের সামনে সহজে তুলে ধরা যায়, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এ বিষয়ে অকুণ্ঠভাবে আলোচনা করা যায়। সত্যি বলতে কি, আমি মানুষের প্রেমজীবনে প্রকৃত নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা দেখতে আগ্রহী ব'লেই তাকে বন্ধুত্বের অঙ্গীভূত করতে উৎসুক। প্রেমকে যদি বন্ধুত্বের বর্গের অন্তর্গত একটি উপবর্গ হিসাবে দেখা যায়, তা হলে সেই যে সুপ্রাচীন নীতি— কিছুই অন্যায় নয় প্রেমে যুদ্ধে পলিটিক্সে— সেই নীতিহীনতার কবল থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়।

মালিকানার ধারণাটা স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত যে নিত্যব্যবহৃত শব্দদের দ্যোতনা পর্যন্ত আমরা মনে রাখি না। অথচ 'স্বামী', 'পতি', 'নাথ'— প্রতিটি শব্দের মধ্যেই অর্থটা জ্বলজ্বল করছে। ইংরেজী 'হাজ্‌ব্যাণ্ড' শব্দটার মধ্যেও লুকিয়ে আছে সেই সম্পন্ন কৃষকের ইতিহাস, যে কিনা তার ঘরদোর আর জমিজমার সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীটিরও মালিক। আর যেভাবেই দেখুন না কেন, 'স্ত্রী', wife, femme, mujer, Frau— সব ক'টা শব্দের ঐতিহাসিক তাৎপর্যই দাঁড়াচ্ছে সেই এক: বিশেষ কোনো পুরুষের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্ত্রীলোক। আমি বিশেষ কোনো ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্ত্রীলোক এবং তদনুসারে অন্যদের কাছে 'পরস্ত্রী', এবং তারা আমার কাছে 'পরপুরুষ', এই আদিম চিন্তাধারা আমাকে একেবারেই আকর্ষণ করে না। বরং এর প্রতি একটা বিকর্ষণই অনুভব করি। এভাবে ভাবতেও তো আমার আত্মসম্মানে বাধে। অথচ দেশে দেশে যৌন নীতি এই আদিমতার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে, এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও তাকে মান্য ক'রে চলেন। আমি নারীপুরুষের সম্পর্কে এই আদিমতার বদলে পরিশীলনের প্রতিষ্ঠা দেখতে আগ্রহী।

এটা হয়তো ঠিক যে এই আগ্রহ বুদ্ধিজীবীদের বা চিন্তাশীল শিল্পীদের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়, তবে আমার ধারণা 'সাধারণ', প্রোলেতারীয় মানুষরাও এর মর্ম অনেকটাই বোঝেন। মানসী আমাকে এ ব্যাপারে ঔপন্যাসিক হিসাবে দৃষ্টিক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছেন। যে-সমাজে বাস করি তার একেবারে ভিতর থেকে চার পাশের নানা শ্রেণীর নানা ধরনের মানুষকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে একটি দীর্ঘ উপন্যাস আমি কিন্তু লিখেছিলাম। সেখানে আধুনিক নারীপুরুষদের পরিবর্তনশীল সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে নানা আলোচনার সূত্রপাত করার চেষ্টা করেছিলাম, তাদের উপরে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলো ফেলার চেষ্টা করেছিলাম। বস্তুতঃ এখন যা-যা বলছি সে-সব কথার অনেক সূচনাই ঐ বইটাতে আছে। মানসীকে *নোটন নোটন পায়রাগুলি* প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। বইটাতে এমন অনেক ইশ্যু বর্তমান, যেগুলিকে নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা হতে পারতো, কিন্তু প্রায় কোনো আলোচনা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের সমালোচনার ধারা এমনিতেই মননবিমুখ, তার উপরে মেয়েদের লেখা বই নিয়ে আলোচনা করাটা তেমন ফ্যাশনেব্‌ল্ নয়।[২]

'এলেন ব্রহ্মচারিণী ছিলেন না'— শিবনারায়ণের এই ঘোষণাটি বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই একটি অর্থবহ খবর; কিন্তু তিনি যদি ব্রহ্মচারিণী থাকতেন, তা হলেও নিশ্চয় আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হতেন। মানসী নিশ্চিত হতে পারেন: বহুগামিতাকে আমি অবশ্যই আবশ্যিক বলি নি বা বলছি না। আমার একটি আগেকার প্রবন্ধ 'বহুমাত্রিক নারী-আন্দোলনের অভিমুখে'-তেও বলেছিলাম যে কেউ কেউ একগামিতাকে চাইতেই পারে; সেটা যেন উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ না হয়ে তাদের স্বনির্বাচিত পথই হয়। একজন মানুষ একা থাকবে, না সঙ্গী গ্রহণ করবে, একগামী হবে, না বহুগামী হবে, সমকামী হবে, না বিপরীতকামী হবে, না উভকামী হবে— এগুলি সেই মানুষকেই

ঠিক করতে হবে। আধুনিক মানুষের তো নিজের পথ নিজে বেছে নেওয়ারই কথা, তবে তার চার পাশের মানুষ তাকে তা করতে দেবে কিনা, বা তার নির্বাচিত পন্থাকে 'সৌজন্যের সঙ্গে স্বীকৃতি দেবে' কিনা— সেগুলি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আপাততঃ এটুকু বলতে চাইছি যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে তার আঁধার আদিম জলাভূমি-উৎস থেকে উৎপাটিত ক'রে বন্ধুত্বের আলোকিত কৃষিক্ষেত্রে পুনরোপণ করা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আধুনিক মানুষের পক্ষে একটি যোগ্য ও বৈধ লক্ষ্য। যাঁরা হয়তো মনে মনে ভাবছেন যে এর দ্বারা প্রেমের তীব্রতায় ভেজাল মেশানো হবে, তা জোলো হয়ে যাবে, তাঁদের জন্য উদ্ধার করছি হিন্দী কবি 'অজ্ঞেয়'র [সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন] 'বন্ধুত্ব' নামে একটি ছোট্ট কবিতা। এটি কয়েক বছর আগে কোনো পত্রিকায় বা সংকলনে ইংরেজী তর্জমাতেই পড়েছিলাম,— মূল হিন্দী রূপের সঙ্গে পরিচয় নেই,— কিন্তু তর্জমার মাধ্যমেও এটি মনে এত দাগ কেটেছিলো যে একটা খাতায় টুকে রেখেছিলাম। কবিতাটি অল্প কথার মধ্যে অনেক কিছুই বলে :

I had asked then:
Among the *rasas*
Is there a *rasa* of friendship?

And today you said:
This meeting after years—
How sad!
It is the same love as always
But is there any name for this new pain?

(অক্টোবর ১৯৯০)

§

এর আগে অরুণ ঘোষ এবং মানসী দাশগুপ্তর চিঠির সূত্রে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এখন লিখছি পত্রিকার ১১ : ২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডুর চিঠিটির সূত্রে।

প্রথমেই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি : 'অনুক্রমিক একগামিতা' বলতে কী বোঝায় তা পত্রলেখক ঠিক বুঝেছেন তো? তিনি যখন লেখেন, 'একে অপরের কাছে "অনুক্রমিক একগামিতা" দাবী করে অনুচ্চারিতভাবে, প্রায় প্রার্থনার মত', অথবা 'অনুক্রমিক একগামিতার অভ্যাসের ফলে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, প্রৌঢ়ত্বে বার্ধক্যে তা খুব নির্ভরতা দেয়' ইত্যাদি, তখন আমার খটকা লাগে, মনে হয় যে ঐ শব্দযুগলের অর্থ নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ঘটেছে। দুজন মানুষ পরস্পরের কাছ থেকে 'অনুক্রমিক একগামিতা' দাবি করতে যাবে কেন? চাইলে বরং চাইবে বিশেষণবর্জিত একগামিতা। আর বৃদ্ধ বয়সের নির্ভরের কথাই যদি ভাবা হয়, তবে তো বৃদ্ধ পতির পক্ষে বিভিন্ন বয়সের একাধিক জীবিত

ভার্যার সেবাই বেশী সুবিধার হতে পারে, এবং এই সেদিন পর্যন্তও তো হিন্দু পুরুষদের সে-সুবিধা ছিলো। শ্যামাপ্রসাদবাবু কি অনুক্রমিক একগামিতাকে নির্জলা একগামিতার সমার্থক মনে করেছেন?

ক্রমিক অথবা অনুক্রমিক একগামিতা হচ্ছে ইংরেজী 'সিরিয়াল মনোগামি'র তর্জমা। অভিধাটি নৃতাত্ত্বিক পরিভাষার অন্তর্গত, এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌রা তাকে ব্যবহার করেন সেই ধরনের ব্যবস্থাকে বোঝাতে, যেখানে ক্রম-মেনে-চলা একগামিতা স্বীকৃত, অর্থাৎ যেখানে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী মারা গেলে বা তার কাছ থেকে ডিভোর্স পাওয়া গেলে পরবর্তী সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধা নেই, কিন্তু একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন নিষিদ্ধ। নকশাটি বিবর্তিত হয়েছে খৃষ্টীয় ইয়োরোপীয় সভ্যতার অভ্যন্তরে। এই প্রথা অনুযায়ী আপনি ক্রম রক্ষা ক'রে পরপর সাতজন স্ত্রীর স্বামী হলেও আপনাকে বহুগামী বলা হবে না, কিন্তু স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় প্রেমিকা গ্রহণ করলেই আপনি ব্যভিচারী হয়ে যাবেন। 'ওয়ান অ্যাট আ টাইম'-এর নিয়মটা মেনে চললে আপনার সাত খুন মাপ। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে অনুক্রমিক একগামিতা ব্যক্তির জীবনে কার্যতঃ একধরনের বহুগামিতা। এর থেকে যথেষ্ট তফাতে আমরা দেখতে পাই সেই জীবনব্যাপী অটল একগামিতাকে, যা ছিলো কিছু কাল আগে পর্যন্তও হিন্দু নারীর একমাত্র অনুমোদিত চলার পথ। ঐতিহ্যিক হিন্দু সমাজ এই মৌল একগামিতাকেই নারীর পথরূপে নির্দিষ্ট করেছিলো, কিন্তু এটাকে প্রাণে ধ'রে পুরুষের পথ ব'লে ঘোষণা করতে পারে নি। এই আপসহীন কঠিন পথে ডিভোর্স ব'লে কোনো জিনিস নেই, এবং সঙ্গীর মৃত্যুতে পর্যন্ত নূতন সঙ্গী গ্রহণ নিষিদ্ধ। যতদূর বুঝতে পারছি, সকলের জন্য এই পথটা কেউই মুখ ফুটে চাইছেন না, যদিও শিক্ষিত হিন্দু সমাজেও এটাই এখনও নারীজীবনের প্রচ্ছন্ন আদর্শ। আমার প্রশ্ন ছিলো: পাশ্চাত্য মডেলের ক্রম-মানা একগামিতাই বা আজকের পক্ষে কতদূর প্রাসঙ্গিক?

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধটিতে [*দ্য আইডিয়াল অফ ইণ্ডিয়ান উমানহুড*] অনুক্রমিক একগামিতার কোনো 'তত্ত্ব' আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন নি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকে ঐরকম চিন্তার একটা কাঠামো ফুটে ওঠে। এদিকে শিবনারায়ণ আমাদের সম্প্রতি জানিয়েছেন যে মানবেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে ঐরকম কোনো তত্ত্বে বা বিবাহনামক প্রতিষ্ঠানে আদৌ বিশ্বাস করতেন কিনা সন্দেহ। একজন র‍্যাডিকাল ভাবুকের পক্ষে সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক, এবং তাই গত চিঠিতে আমি বলেছিলাম যে সে-ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথের দীর্ঘ প্রবন্ধটি কূটাভাসবিজড়িত।

শ্যামাপ্রসাদবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা 'স্বত্ব-সম্পর্কের ধারণার অবতারণা' করেছি কেন। করেছি, তার কারণ ধারণাটা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে একেবারে অঙ্গে অঙ্গে জড়িত। মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্যের একটা বৃহদংশই হচ্ছে ঐ ধারণাটির প্রবল প্রত্যাখ্যান। শ্যামাপ্রসাদবাবু ঠিকই বলেছেন যে ধারণাটা সব সময়েই 'স্পষ্ট রূপ' পেতো না। কিন্তু ব্যাপার এই যে অস্পষ্ট রূপেও, ছদ্মবেশেও তাকে আজ আর গ্রহণীয় ব'লে মনে হয় না। কোনো সামাজিক প্রথা 'এত হাজার বছর টিকে আছে' ব'লেই কি আর তা গ্রাহ্য হয়ে যায়?

অনেক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছে এমন কত প্রথা এবং ধারণাকেই তো আমরা বর্জন করেছি ও করছি। আফ্রিকা মহাদেশে আনুমানিক আট কোটি মেয়ে যৌন অঙ্গের কাটাছেঁড়া দ্বারা নিপীড়িত। সে-সব প্রথা প্রাচীন এবং ঐতিহ্যসম্মত ব'লেই কি তাদের মেনে নিতে হবে? আর হ্যাঁ, নারীর হীনাবস্থা অবশ্যই কেবল 'পুরুষের জোরের' ভিত্তিতে সম্ভব হয় নি : নারী নিজেও তাকে মেনে নিয়েছে, তার মনের বাসিন্দা ক'রে নিয়েছে। নারীনিপীড়নে নারীর ভূমিকা কি অস্বীকার করা যায়? আফ্রিকার যে-বর্বর প্রথাগুলির উল্লেখ করলাম সেগুলি কি মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত আদৌ সম্ভব? মেয়েদের সে-অঙ্গহানি করে মেয়েরাই। আপনাদের নিকটতর সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন : প্রত্যেক শাশুড়ীই একদিন না একদিন নতুন বৌ হয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিলেন, তবু শাশুড়ীদের হাতে বধূনির্যাতন এত সাধারণ ঘটনা কেন? শাসিতকে দিয়ে তার হীনাবস্থার স্বীকরণ এবং সম্পূর্ণ আত্মীকরণ শাসকের কূটনীতির অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই আমাদের আজকের বিদ্রোহ হচ্ছে শাসক-শাসিতের এই মিলিত চক্রান্তের পুরো প্যাকেজটার বিরুদ্ধেই।

দুর্ভাগ্যবশতঃ নারীকে এখনও পুরুষের সম্পত্তি ব'লে ভাবা হয় বৈকি, ভারতে তো বটেই, পাশ্চাত্য সমাজেও। সে-ধারণা সচরাচর 'স্পষ্ট রূপ' পাক বা না পাক, তার নিহিতার্থ ছোটবড় নানা ব্যাপারে পদে পদেই প্রকাশ পায়। উল্টোটাও সত্য : মেয়েরাও পুরুষদের সম্পত্তি হিসাবে ভাবে, অন্ততপক্ষে ভাবার চেষ্টা করে। সেই অত্যাচারে বঙ্গদেশের কত পুরুষের ব্যক্তিত্বকেই কি আমরা চোখের সামনে খর্বীকৃত হতে দেখি না? পাশ্চাত্য মেয়েরাও পুরুষদের 'বেঁধে রাখার' চেষ্টা করে। তাদের সে-চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয় না, কেননা পাশ্চাত্য পুরুষরা অনেক বেশী স্বাধীনতাপ্রিয়, কিন্তু মাঝখান থেকে অনুক্রমিক একগামিতার সম্মানার্থে ডিভোর্সের হার বেড়েই চলে।

দম্পতিদের স্বত্ব-সম্পর্কের আঁটিটা লুকিয়ে আছে যৌন সম্পর্কের মধ্যেই। স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট হোক, পারস্পরিক স্বত্বের একটা ধারণা আছে ব'লেই যৌন সম্পর্কটা অন্য কারও সঙ্গে ভাগ ক'রে নেওয়া বারণ। নয়তো বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা, স্নেহ ইত্যাদির মতো এটাই বা ভাগ ক'রে নেওয়া যাবে না কেন? অভ্যাসের দাস না হয়ে এ ব্যাপারে শিকড়ে গিয়ে চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। পুরুষরা যৌন স্বাধীনতা নেয় ব'লে মেয়েরাও নিতে চাইছে, সেরকম কোনো 'প্রতিশোধ নেওয়া'র ব্যাপারই নয় এটা, তার চাইতে ঢের বেশী মৌল ব্যাপার। বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে যে-কোনো স্বাধীনতা দাবি করা হবে তা লিঙ্গনির্বিশেষেই দাবি করা হবে।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর চিঠিটিতে যুক্তি বিষয়ে যে-দোমনা ভাবটা লক্ষিত হয় তা কি স্বচ্ছ চিন্তার সহায়ক? তিনি লিখেছেন : 'যুক্তি মেনে হয় না', 'জীবন কি সবসময় অব্যর্থভাবে যুক্তি[-]অনুসারী?', 'শুধু যুক্তির নয়', 'যুক্তির অধিক কিছু দাবী করে', 'আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সবটুকু রহস্যকে কি এভাবে যুক্তির ছকে ফেলে বোঝা যাবে?' ইত্যাদি। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি 'গাণিতিক যুক্তি' অবতারণা করেছি। এই শেষ অভিযোগটি সম্বন্ধে আমি বলতে বাধ্য যে আমি কোনো

কালেই গণিতে পারদর্শিতার জন্য খ্যাতিলাভ করি নি। আমার গণিতের দৌড় ১৯৫৪ সালের স্কুল ফাইনালের যে-বাধ্যতামূলক পেপারটি পর্যন্ত, তাতে ক্যালকুলাস্ বা ট্রিগনমেট্রি পর্যন্ত ছিলো না। দুয়ে দুয়ে যে চার হয় সেটুকু আমিও বুঝতে পারি, কিন্তু দোকানে বাজারে নোট দিয়ে খুচরো গুনে নিতে গিয়ে প্রায়ই থতমত খাই, এবং কলকাতার ট্যাক্সিচালকরা মিটারের উপরে 'অত পার্সেন্টি তত পার্সেন্টি' যোগ করতে বললে প্রথমটা তাঁদের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকি, তার পর গম্ভীরভাবে তাঁদের চার্ট বার করতে বলি। কাজেই আমি যে 'গাণিতিক যুক্তি' ব্যবহার করতে আদৌ সক্ষম এই কথাটাই তো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে গ্রাহ্য হবে না। তারা এ কথা শুনলে বিশুদ্ধ কৌতুক অনুভব করবে।

তবে আই. এ.-তে লজিকটা কিন্তু পড়েছিলাম। সেই শিক্ষা থেকে বলি, যেখানে আমরা তর্ক করছি, আলোচনা করছি, সেখান থেকে যুক্তিকে বাদ দিই কী ক'রে? যুক্তিকে বাদ দিয়ে তো কোনো তর্ক হয় না। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের মতো একটা বিষয় আলোচনা করতে বসেছি ব'লে কি আর রীজ্‌ন্‌কে বর্জন করা যায়? বরং এ ব্যাপারে 'র‍্যাশনাল' দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহ দেওয়াই তো আমাদের লক্ষ্য। যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার জন্যই তো এই পত্রিকা। যুক্তিবাদী পুরুষ মানবেন্দ্রনাথের অতীব তর্কমূলক 'পোলেমিকাল' একটি রচনার আলোচনাপ্রসঙ্গে যুক্তিবর্জন কিভাবে সম্ভব?

শ্যামাপ্রসাদবাবুকে অজস্র ধন্যবাদ, তিনি আমার কেন্দ্রিক বক্তব্যকে 'তীক্ষ্ণ যুক্তি' ব'লেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'তীক্ষ্ণ' ব'লেই তা আবশ্যিকভাবে 'গাণিতিক' নয়। তা শাণিত বাস্তবধর্মী যুক্তিও তো হতে পারে। যে-সম্পর্ক বন্ধুত্বগোত্রীয়, আবশ্যিক একগামিতার আদর্শ সেখানে অবান্তর: আমার এই মূল যুক্তিটা 'গাণিতিক' নয়, 'রিয়ালিস্টিক'। শ্যামাপ্রসাদবাবুকে আরও জানাই, এ কথা আমি মোটেও 'যৌবরাজ্যের অধিবাসী' হিসাবে বলছি না। কাগজে কলমে আমার এখন বানপ্রস্থে যাবার বয়স এসে গেছে, অতএব যা-কিছু বলছি তা মধ্যবয়সের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা-অবেক্ষণ থেকেই বলছি। কোনো তথাকথিত গাণিতিক সারল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, আমি বরং বলছি আধুনিক জীবনের জটিল রূপকে স্বীকার ক'রে নিতে।

হ্যাঁ, 'ছোট ছোট ত্যাগ, কিছু ব্যক্তিস্বাধীনতার অবদমন' আমরা সকলেই ক'রে থাকি। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টা তো সেরকম কোনো ছোটখাট ব্যাপার নয়, বরং একটা বিরাট ব্যাপার। কেননা যে-সম্পর্ক বন্ধুত্বগোত্রীয় তার অবদমনে ব্যক্তিত্বের বিকাশেরই অবদমন হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বন্ধুদের সঙ্গে আদানপ্রদান আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরম সহায়ক ব'লেই সে-জাতীয় বিনিময়ের কর্ষণ প্রয়োজন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের ধারণাটার প্রতি যাঁদের আনুগত্য আছে তাঁরা আধুনিক স্ত্রীপুরুষদের মেলামেশা কেমন হবে সে-প্রশ্নটাকে পাশ কাটাবেন কী ক'রে? মেলামেশা হলে কিছু কিছু বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠবেই, বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠলে কোনো কোনো বন্ধুত্বে রঙ লাগবেই, প্রেমে পড়লে মানুষ সে-প্রেমকে রূপ দিতে চাইবেই।

অনুক্রমিক একগামিতার আদর্শটা পাশ্চাত্য সমাজের ভিতরে যে-সময়ে গ'ড়ে উঠেছে সে-সময়ে সেখানেও নারীপুরুষের মেলামেশা তেমন বিস্তার লাভ করে নি। তার ক্ষেত্র তখনও যথেষ্টই সংকুচিত। স্ত্রীস্বাধীনতা তখনও নিতান্ত সীমাবদ্ধ: মেয়েদের শিক্ষালাভ, কর্মক্ষেত্রের প্রসার, ব্যক্তিত্বের বিকাশ আজকের পর্যায়ে পৌঁছয় নি। কাজেই সেকালে অনুক্রমিক একগামিতার বিধান দিয়ে যেমন ক'রে হোক চালানো গেছে। আজকে তা চলছে না। সন্তানধারণ আর সন্তানপালন দিয়ে মেয়েদের আর বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। ঠিক, দশ-বারোটি সন্তানকে মানুষ করতে সারা জীবন কেটে যায় বটে, কিন্তু দু'-তিনটিকে মানুষ করার পর হাতে অনেকটা সময়ই বাকি থাকে। কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষদের বাধামুক্ত মেলামেশার ফলে দীর্ঘীকৃত প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের পর্বে পর্বে সমকক্ষ মানুষদের প্রেমে পড়ার হার অনেক বেশী বেড়ে গেছে। অনুক্রমিক একগামিতার মডেলটা এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। মেয়েদের যদি অন্তঃপুরে ফেরত না পাঠানো হয়, তা হলে আজ না হোক কাল ভারতের শিক্ষিত সমাজকেও অনুরূপ অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই। কিছু সময় আগে আমার এক এতদ্দেশীয়া বান্ধবী, দুই কলেজ-পাঠরত সন্তানের জননী, আমার কাছে এসে সকাতরে নিবেদন করলেন যে তাঁর স্বামী কর্মসূত্রে পরিচিতা এক নারীর প্রণয়াসক্ত। জানি না কেন, এ দেশের বান্ধবীরা আমাকে এ-সব ব্যাপারে বিচক্ষণ পরামর্শদাত্রী ব'লে গণ্য ক'রে থাকেন। আমি আমার বান্ধবীটিকে স্বামীর প্রতি সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করার উপদেশ দিলাম। কিন্তু তিনি সে-উপদেশ বিশেষ কাজে লাগাতে পারলেন না, কেননা তাঁর চোখে তাঁর স্বামী 'বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করেছেন'। আমি বললাম, প্রেমে তো যে-কেউ পড়তে পারে, তিনি নিজেও পারেন, বিশ্বস্ততা ব্যাপারটা কেন একাধিক ব্যক্তির প্রতি রক্ষা করা যাবে না। আমরা তো অনায়াসে একাধিক সন্তান, বন্ধু বা ভাইবোনেদের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে পারি। আমাদের দ্বিতীয়-তৃতীয় সন্তানেরা যখন পৃথিবীতে আসে, তখন কি আমরা আমাদের অগ্রজাত সন্তানদের খুন ক'রে ফেলি অথবা তাদের ডিভোর্স দিয়ে দিই? না, আমাদের ভালোবাসা সহজেই একাধিক সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়। তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা আরেকটু উদার হতে পারছি না কেন? কিন্তু আমার বান্ধবীর 'ওয়ান অ্যাট আ টাইম' নীতির প্রতি আনুগত্য দুর্মর। তিনি আমার কথাবার্তা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারলেন না, যদিও আমি জানতাম যে বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর নিজের জীবনেও এসেছিলো একটি বিবাহবহির্ভূত প্রেমের অনুভব, যা তিনি কঠোরভাবেই অবদমন করেছিলেন। যাই হোক, তিনি আর তাঁর স্বামী এর পর পৃথক্‌ভাবে থাকা আরম্ভ করলেন। এবং তার অনতিকাল পরেই তিনি এসে জয়যুক্ত স্বরে ঘোষণা করলেন, 'আবার প্রেমে পড়েছি।' এই নূতন লোকটিকে কি তিনি সহসা আবিষ্কার করলেন? মোটেও নয়, আগে থেকেই চিনতেন, পছন্দ করতেন, কেবল 'ওয়ান অ্যাট আ টাইম'-এর খাতিরে আকর্ষণটাকে সবলে চেপে রাখছিলেন। এখন যখন স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকছেন (ডিভোর্স অবশ্য এখনও হয় নি, তা এঁরা ঠিক চান কিনা তাও আমার

কাছে স্পষ্ট নয়), তখন আর চেপে রাখা সম্পর্কটির বিকাশে কোনো আপত্তি নেই। ক্রম-মানা একগামিতা তো বজায় থাকছে, তা হলেই হলো। আর এই যে তাঁর জীবনে নবাগত মানুষটি, ইনিই কি প্রেমে অনভিজ্ঞ? কখনোই নয়, এঁর ইতোমধ্যে দুবার বিবাহ ও দুবার ডিভোর্স ঘটেছে, দুই প্রাক্তন স্ত্রী থেকে চারটি সন্তান আছে। এ কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই কেবল উচ্চশিক্ষিত নন, রীতিমতো বিদগ্ধও বটে। কেউই সচেতনভাবে ভণ্ডামি করছেন না, কেবল স্ত্রীপুরুষসংসর্গের যে-আদর্শটা এঁদের সমাজে স্বীকৃত তার সঙ্গে নিজেদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না, না পেরে বিপর্যস্ত হচ্ছেন।

তাই বলছি, আধুনিক স্ত্রীপুরুষদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি কিভাবে নিয়ামিত হবে সেটি আমাদের সময়ের একটি জরুরী প্রশ্ন, যা এখনই আমাদের দরজায় করাঘাত করছে। আমরা কিছু সময় কানে আঙুল দিয়ে শ্রুতি বন্ধ ক'রে ব'সে থাকতে পারি এবং ভান করতে পারি যে কোনো শব্দ আমাদের কানে আসছে না, কিন্তু সমস্যাটা তাই ব'লে চ'লে যাবে না, বরং বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীস্বাধীনতার এটি একটি অনিবার্য ফল, যাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। মেয়েদের লেখাপড়া, অর্থোপার্জনের সুযোগ, চলাফেরার স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ— সব বন্ধ ক'রে দিয়ে তাদের ঘরে বন্দী ক'রে রাখা যায় না। আগেকার দিনের বিধানগুলি আজকে অচল। এই সমস্যার সৃষ্টিশীল সমাধানের অন্বেষণেই আমি বলেছিলাম যে স্ত্রীপুরুষের প্রেম যদি উচ্চস্তরের বন্ধুত্বের দিকে এগিয়ে যায়, তবে সকলের পক্ষে মর্যাদাজনক এবং সমাজের পক্ষে, পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে কল্যাণজনক একটা পথের হদিস পাওয়া যায়। প্রেম যেন বন্ধুত্বের অঙ্গীভূত হয়, বন্ধুত্বকে বাদ দিয়ে যেন না হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রেম তো অবশ্যই কোনো ছেলেখেলা নয়। তা তো কেবলই যৌন আকর্ষণ নয়, তার মধ্যে শ্রদ্ধা মমতা সহৃদয়তা— সবই থাকে, থাকা উচিত। এ ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। গভীর সম্পর্কের দায়িত্ব যাঁরা নিতে পারেন, প্রাপ্তবয়স্ক প্রেম কেবল তাঁদেরই জন্য। প্রেমকে বন্ধুত্বের একটা কাঠামোর মধ্যে ফেলতে পারলে তার ভিতরে ব্যবহারিক সমস্যাগুলির নৈতিক সমাধান নিশ্চয় সম্ভব। আগেকার দিনের স্বস্তিজনক নিশ্চয়তাগুলিকে রক্ষা করা যাবে না, কেননা নূতন পরিস্থিতিতে সেগুলি অরক্ষণীয়, কিন্তু যুগোপযোগী নূতন পথ কেন নির্মাণ করা যাবে না? বলাই বাহুল্য, বন্ধুত্বের কাঠামো কোনো গাণিতিক ছক নয়, বরং একটি বাস্তবধর্মী, মানবধর্মী পরিপ্রেক্ষিত। বন্ধুত্বই সর্বসম্মতিক্রমে সমকক্ষদের অনুরাগের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আমার ধারণা এই কাঠামোটাই ভবিষ্যতের নরনারীদের প্রেমের বিচিত্র প্রকাশকে সব থেকে সুষ্ঠুভাবে ধারণ করতে পারবে। সেই বিকাশ থেকে মানুষের জীবন যে-সমৃদ্ধি লাভ করবে অতীতে তার কথা ভাবা যায় নি। সেই অনাগত দিনগুলির মানুষরা হবে নূতন পুরুষ, নূতন নারী। সেই সম্ভাবনাকে আমরা এখনই অন্ততঃ স্পর্শ করতে, স্বাগত করতে পারি। বাধা আর কোথাও নেই,— যেটুকু আছে তা আমাদের অনিশ্চয়তাভীরু রক্ষণশীল মনের ভিতরে। যাঁদের মধ্যে একটু-আধটু সাহস আছে তাঁদের তো পথিকৃৎ হয়ে ওঠার চেষ্টা ক'রে যেতেই হবে। কতিপয় যাঁরা আমার মতের সঙ্গে তাঁদের

মতের সাযুজ্যের কথা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানিয়েছেন তাঁরাও যদি সাহস ক'রে এই আলোচনায় প্রকাশ্যে অংশ নিতেন, তা হলে আমাকে মঞ্চে-একা দুঃসাহসিকার ভূমিকা পালন করতে হতো না।

ভেবে দেখতে গেলে, বরং অনুক্রমিক একগামিতার ছকটাই বড্ড বেশী গাণিতিক। জীবনে ভালোবাসারা ওভাবে ক্রম মেনে আসে না, যখন-তখন এসে পড়ে। যখন এসে পড়ে, তখন তাদের স্বাগত করতে পারার মধ্যেই আমাদের মনুষ্যত্বের মহিমা, ভঙ্গুর জীবনের সৌন্দর্য। প্রেমের সম্ভাবনাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি নিজেদের দীন ক'রে, আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব ক'রে, আমাদের জীবনকে দীপ্তিহীন ক'রে। আরও স্মরণীয় যে জীবন বিশৃঙ্খল হলেও, যা-কিছু ঘটে সবই একেবারে অকারণে ঘটে না। বুনো ফুল যেখানে সেখানে ফুটে থাকে ব'লেই কি তা আকাশে বা বাতাসে ফুটেছে ভাবতে হবে? তা নয়, খুঁজলে দেখা যাবে শিকড়ের নীচে এক চিলতে মাটি অবশ্যই আছে। স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণও তেমনি,— নেহাৎ অকারণে ঘটে না, ব্যক্তিত্বের প্রতি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের কিছু কিছু কারণ অবশ্যই থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কের দায়িত্ব নেওয়া মানে হলো সেই অন্যোন্য আকর্ষণকে একটা বন্ধুত্বের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করা, নয়তো তার সুস্থ শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু দুজন মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলেই কি আর তারা পরস্পরের টুথব্রাশ এবং অন্য কারও পক্ষে 'অব্যবহার্য' হয়ে যায়? নিশ্চয়ই নয়। আমার তো মনে হয় আমাদের মনুষ্যত্ব তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে।

ডিসেম্বর ১৯৯০

১ এই আড়ালের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একটি কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখতেই হবে। ঠিকই, 'অধিকাংশ নরনারী' আড়াল খোঁজে, এমন কি গণিকারা এবং তাদের খদ্দেররাও তা খোঁজে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু লোক ক্যামেরার সামনে যৌন ক্রিয়াতে এবং সে-দৃশ্যের পণ্যায়নেও সম্মত।

২ এক যদি না লেখিকা 'কাল্ট ফিগার'-এ পরিণত হয়ে যান, যদিও তখনও তাঁর বইয়ের গভীরে নামার চাইতে তাঁর ব্যক্তিত্বের বাইরের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করাটাই অধিক কেতাদুরস্ত হতে পারে। তবু মানতে হয় যে ধীরে ধীরে কিছু পরিবর্তন ঘটছে। *পুরবৈয়াঁ* পত্রিকার 'বিশেষ নারী-ঔপন্যাসিক সংখ্যা'য় (৭ : ১, জুলাই ২০০১) আমার উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীমতী সুমনা দাস সুর।

জিজ্ঞাসা ১১ : ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৭ [১৯৯১]

ভারতীয় যৌনতার স্বরূপসন্ধানে

আমি মনঃসমীক্ষক নই। একজন পেশাদার মনঃসমীক্ষক, মনঃসমীক্ষণ বিষয়টির নিজস্ব নিয়মশৃঙ্খলাকে যিনি ভালো ক'রে আয়ত্ত করেছেন, তার ধ্রুপদী ঘরানা তথা নব্য শৈলীগুলির সঙ্গে তত্ত্বের এবং প্রয়োগের দিক দিয়ে যাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে, তেমন কারও পক্ষে সুধীর কক্কড়ের নতুন বইটির* আলোচনা যে-দৃষ্টিকোণ থেকে করা সম্ভব, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। 'কৌচে' শুয়ে কোনো মনঃসমীক্ষকের বিশ্লেষণের অধীন হবার অভিজ্ঞতাও আমার নেই। যতদূর বুঝি, মনঃসমীক্ষণের মন্দিরের গর্ভগৃহে যে-ত্রিমুখ দেবমূর্তিটি অধিষ্ঠিত সেটির নাম ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স। এই দেবতাটিতে আমার তেমন কোনো আস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে আমি নিতান্ত নাস্তিক না হলেও অন্ততপক্ষে অজ্ঞেয়বাদী। মনের গভীর হাতড়ে তেমন কোনো দেবতার অধিষ্ঠান তো খুঁজে পাই না। অপর পক্ষে, নারীর যৌনতা বিষয়ে ফ্রয়েডের ভাবনাগুলিকে খণ্ডন করেছেন এমন ফেমিনিস্ট গবেষকদের কিছু কিছু লেখা পড়েছি, এবং তাঁদের বিশ্লেষণ ও যুক্তিগুলিকে ন্যায্যই মনে হয়েছে। মনের গভীর হাতড়ে কোথাও কোনো 'শিশ্ন-ঈর্ষা'র চিহ্নও তো পাই না ...।

অথচ সুধীর কক্কড়ের একটি প্রাক্তন বই, *দ্য ইনার ওয়ার্ল্ড, আ সাইকো-অ্যানালিটিক স্টাডি অফ চাইল্ডহুড অ্যাণ্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া*, কয়েক বছর আগে পড়েছিলাম এবং তার কিছু বিশ্লেষণ আমার নিজের একটি বইয়ে কাজে লাগাতেও পেরেছিলাম। যদি এমন মনে করা যায় যে মনঃসমীক্ষকরা তাঁদের ভাবনার নকশাগুলিকে পর্দায় ফেলে একধরনের লীলাখেলা করেন, এবং আলোছায়ার সেই খেলার দিকে তাকিয়ে আমরা হঠাৎ হঠাৎ অনেক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে ফেলি, তা হলে অ-বিশেষজ্ঞ পাঠকরাও মনঃসমীক্ষকদের লেখা প'ড়ে লাভবান হতে পারেন। ভারতীয় যৌনতার রাজ্যে কক্কড়ের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানটি সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়।

বিষয়ের মাহাত্ম্যে অনেকের কৌতূহলই হয়তো উদ্দীপিত হবে, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি প'ড়ে পুলকিত হবার অবকাশ খুব কম। কিছু উপন্যাস-গল্প-সিনেমা, কিছু গৃহীত সাক্ষাৎকার, মনঃসমীক্ষক হিসাবে তাঁর নিজস্ব কিছু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, গান্ধীর জীবনের কতগুলি প্রাসঙ্গিক দিক ইত্যাদি বিবিধ উপাদান বিশ্লেষণ ক'রে, ভারতীয় যৌন জীবনের বিশেষতঃ স্বপ্নের দিকটার উপর আলোকসম্পাত ক'রে যে-ছবি তিনি এঁকেছেন সেখানে ভয়, ক্রোধ, ক্ষোভ, হতাশা মিলিয়ে নঞর্থক দিকটারই প্রাধান্য বেশী। কক্কড়ের মতে ভারতীয় জীবনে দম্পতির শারীরিক সম্পর্কের দিকটাকে সুনজরে দেখা হয় না, আধুনিক

* Sudhir Kakar, *Intimate Relations: Exploring Indian Sexuality*, Viking (Penguin Books India Ltd), Delhi, 1989, pp. 161, Rs 125.

কালেও। সঙ্গম সাধারণতঃ 'একটা লজ্জাজনক ব্যাপার, কামনার তীক্ষ্ণ একটা ছুরিকাঘাত, যাতে প্রেম খুবই অল্প এবং সংরাগ আরও কম'। সাংস্কৃতিক অনুশাসনগুলি যৌনতাকে ঘিরে দ্বন্দ্বকে বর্ধিত করে। ব্যাপারটা অনেকের কাছেই ট'কে যায়, দীন হয়ে যায়। কার্যতঃ বহু পুরুষের এবং অধিকাংশ মেয়েরই যৌন প্রেমকে গভীরভাবে, পূর্ণভাবে জানার অভিজ্ঞতা হয় না। ভারতীয় দম্পতি পরস্পরের শরীরকে সমাদর করতে শেখে না, অথচ শরীরের আধারে ছাড়া আত্মাকে জানবার কোনো উপায় নেই। কক্করের ধারণা এ কথা সমাজের সব শ্রেণীর পক্ষেই কম-বেশী সত্য। উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে মহিলারা যৌন সমস্যাদের সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীন হন। আর গরিব মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে তাঁদের অভিজ্ঞতায় যৌনতার মধ্যে প্রীতিস্নিগ্ধ মধুরতার বদলে শত্রুতার এবং ঔদাসীন্যেরই প্রাবল্য বেশী : এঁদের জীবনে রতিক্রিয়া হচ্ছে অনেক লোকের ভিড়ে ভারাক্রান্ত ছোট একটা ঘরের মধ্যে গোপন একটা ক্রিয়ামাত্র,— কয়েক মিনিটের সংক্ষিপ্ত কারবার,— যার মধ্যে না আছে শরীরের আদর, না আছে মনের আদর ; অধিকাংশ মেয়ের কাছেই এ অভিজ্ঞতা বেদনাদায়ক বা অপ্রীতিকর বা দুইই ; অনেকেই এটা বাধ্য হয়ে মেনে নেন, প্রায়শঃ প্রহারের ভয়ে। গরিব মেয়েদের ক্ষেত্রে তাঁদের জবানবন্দিটা নিশ্চয়ই প্রামাণিক : আর সব কথা বাদ দিলেও, ঘরভর্তি শায়িত লোকের মধ্যে অন্ধকারের সুযোগে কোনোমতে নমো নমো ক'রে সঙ্গম করাটা কোনো মজার ব্যাপার হতে পারে না। তবে অন্যদের বেলায় প্রশ্ন করতে হয়, যাঁরা চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে আসেন কেবল তাঁদের প্রতিবেদন থেকে পুরো ছবিটা পাওয়া যাবে কি ? আধুনিক দম্পতিদের মধ্যে কোনো অংশই কি নেই, যাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্ত্রীর উপার্জন, যৌথ পরিবারের শাসন থেকে মুক্তি, শিক্ষার ফলে মনের মুক্তি— এবংবিধ নানা কারণে উন্নততর মানের দাম্পত্যজীবন উপভোগ করছেন ? আজকালকার শিক্ষিত মেয়েরা কী মনে করেন ?

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে এই বইয়ের সব চেয়ে মূল্যবান অংশ হলো পঞ্চম আর ষষ্ঠ অধ্যায়। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে দুজন বস্তিবাসিনীর টেপে ধরা জবানবন্দির অনুবাদ, যা সমাজের এই স্তরের মেয়েদের বঞ্চিত অপমানিত বিপন্ন জীবনের একটি মর্মস্পর্শী রেখাচিত্র তুলে ধরে। যেটা বিশেষভাবেই ঔৎসুক্যকর সেটা এঁদের চরিত্রের কোমলে-কঠিনে মেলানো রূপটি। এক দিকে এঁরা বাঁচবার তাগিদে শত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ক'রে আগাছার মতো সহিষ্ণু আর শক্ত। আবার অন্য দিকে এঁদের মধ্যে রয়েছে স্নিগ্ধতা, কৌতুকবোধ, বাৎসল্য ; রয়েছে একটা নরম ব্যাকুল মন, যা অমানুষের অপরাধকে বার-বারই ক্ষমা করে, ভেঙে-যাওয়া যুগলজীবনের স্মৃতিচিত্রের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপজীব্য হলো নারীপুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে গান্ধীর চিন্তা এবং মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। এরকম একটি বড় মাপের বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য এর আগেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্যাপকভাবে ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে— গান্ধীর এই বিচিত্র পরিকল্পনাটিকে তাঁর সমকালেই তীক্ষ্ণভাবে বিদ্রূপ করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর *দ্য আইডিয়াল অফ ইণ্ডিয়ান উমানহুড*

নামক প্রবন্ধে। আমি এটির বাংলা অনুবাদ করেছিলাম। অনুসন্ধিৎসুরা সেই সহজলভ্য অনুবাদটির[১] পাতা উল্টে দেখতে পারেন। কৌতূহলীরা আরেকটি প্রবন্ধেরও খোঁজ নিতে পারেন : নৃতত্ত্ববিদ প্যাট কাপলান-এর 'সেলিবেসি অ্যাজ আ সল্যুশন ? মহাত্মা গান্ধী অ্যাণ্ড ব্রহ্মাচর্য'[২]। তবে কক্কড়ের আলোচনাটি আরও পূর্ণাঙ্গ। প্রেমা কণ্টক ও মীরাবেনের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্কের কাহিনীদুটি যুক্ত ক'রে লেখক তাঁর আলেখ্যটিকে বিশেষভাবে আকর্ষক ও ত্রিমাত্রিক ক'রে তুলতে পেরেছেন।

মনে হয় মনঃসমীক্ষকরা তাঁদের অন্বিষ্ট জাতিরূপের বিচার-বিশ্লেষণে যতটা আগ্রহী, টাইপের ব্যতিক্রমকে সেভাবে খুঁটিয়ে দেখতে ততটা আগ্রহী নন। কক্কড় তো অকপটেই স্বীকার করেছেন যে তিনি আলোচনার জন্য এমন দুটি উপন্যাসকেই বেছে নিয়েছেন যেখানে নারীপুরুষের সম্পর্কের চিত্রে এমন সব দিক আছে, যেগুলির মধ্যে 'সামান্যীকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান'। মনঃসমীক্ষকদের এই ঝোঁকের ফলে তাঁদের টর্চের ফোকস্‌টা পড়ে তাঁদের চেনা অসুখগুলোর উপরে, রোগীদের উপরে। যে-মানুষগুলো মোটামুটি সুস্থ আর সুখী তারা একটা আবছা আঁধারে হারিয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মানুষ সমস্যাকে অতিক্রম করে তার সৃষ্টিশীলতার সাহায্যে, তাই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে : এখানে সৃষ্টিশীল, চিন্তাশীল, প্রতিবাদী, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তিদের ভূমিকা কী ? অবশ্য এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে এই বইয়ে গান্ধীর আলোচনা তো সে-উদ্দেশ্যেই। কিন্তু সবাই জানেন যে গান্ধী নিজে যাই ভেবে থাকুন, যৌনতার ব্যাপারে তাঁর প্রদর্শিত পথটি সকলের পায়ে চলার পথ হতে পারে না। প্রতিসাম্যের খাতিরে অন্য ধাঁচের একটি সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের আলোচনা রাখলে ভালো হতো। অর্থাৎ কক্কড় এমন কোনো শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, বা সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা রাখতে পারতেন, যৌনতার প্রতি যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হাঁ-ধর্মী। ভারতেও তাঁরা আছেন। তিনি কি তা করেন নি তাঁর 'সামান্যীকরণ' বিপর্যস্ত হবে ব'লে ? অপিচ ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির সাক্ষ্য এই বইয়ে তিনি প্রায় ব্যবহারই করেন নি। সেই দিকটা অনুসন্ধান করলে কী ধরনের নকশা পাওয়া যেতো, সেগুলি একটু আলাদা কিনা, সে-সব জানবার অবকাশ তিনি আমাদের দেন নি। তা ছাড়া ভারতীয় সমকামের কোনো বিবরণ বা আলোচনাও এখানে নেই, এবং বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

বইটির লেখক একজন প্রতিষ্ঠিত, আন্তর্জাতিক-খ্যাতি-সম্পন্ন মনঃসমীক্ষক, এবং বইটি মূলতঃ গ'ড়ে উঠেছে দেশবিদেশের বিভিন্ন সুধীমণ্ডলীর সামনে পঠিত প্রবন্ধের সমাহারে। তাই এটি কার্যতঃ মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পণ্ডিতগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য ক'রে, তাঁদেরই মনে রেখে লেখা। ব্যাপারটি বোঝা যায় লেখকের শৈলীর একটি ছোট বৈশিষ্ট্য থেকেই। বেশ কিছু অত্যন্ত সাধারণ ভারতীয় শব্দকে তিনি তাঁর টেক্সটের মধ্যেই বন্ধনীর ভিতরে ব্যাখ্যা ক'রে দিতে বাধ্য বোধ করেছেন। সেই-সব শব্দের মধ্যে আছে 'জমিদার', 'গোপী', 'তান্ত্রিক', 'রুটি', 'কালী', 'মোক্ষ' ইত্যাদি। অথচ এমন কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা তিনি দেন নি, যেগুলি অনেক ভারতীয় পাঠকের কাছে অস্বচ্ছ ঠেকতেই পারে।

যেমন জার্মান উৎসের 'কিৎশ্' শব্দটির কোনো মানে দেওয়া নেই; 'নো সেক্স ইন ম্যারেজ প্লীজ, উই আর ইণ্ডিয়ান'— এই রসিকতাটির উৎস একটি বৃটিশ কমিক শোয়ের নাম: 'নো সেক্স প্লীজ, উই আর বৃটিশ'; 'আধুনিক পাশ্চাত্য পুরুষের শিশ্নবিষয়ক অধ্যাস' বলতে তিনি কী বোঝাচ্ছেন তা তিনি ব'লে না দিলে আমাদের বোঝার জো নেই; তেমনি মাতা ও পুত্রের যুগল কেন যে 'সমস্ত মানবিক সম্পর্কের মধ্যে সব থেকে বেশী ধরাছোঁয়ার বাইরে' তা স্পষ্ট হয় নি,— মাতা ও কন্যার সম্পর্কের থেকে সেটা কিভাবে আলাদা?

তাঁর শ্রোতারা যে একটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী, এই ব্যাপারটা লেখকের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর বিশ্লেষণগুলি মনঃসমীক্ষণের আন্তর্জাতিক পণ্ডিতদের কাছে সহজে বোধ্য এবং গ্রাহ্য হবে। ইতোমধ্যেই গৃহীত তত্ত্বদের সঙ্গে সেগুলি খাপ খেয়ে যাবে, তাদের ন্যায্য সম্প্রসারণ ব'লে স্বীকৃত হতে পারবে। হিন্দু পুরুষের মনে অবস্থিত রয়েছে একটি 'যৌন জননী'র মূর্তি: এই তত্ত্বটি এই জাতের। এটি মূলতঃ ইয়োরোপীয় ঈডিপাস-তত্ত্বেরই ভারতীয় সংস্করণ। এই প্রভাবের ফলে হিন্দু সংস্কৃতিতে নারীবর্জনের দিকটা লেখকের বিশ্লেষণে যেমন স্পষ্ট, নারীসমাদরের দিকটা সে-তুলনায় উপেক্ষিত। আমার কিন্তু মনে হয় হিন্দু সংস্কৃতির টানাপড়েনে দু' দিকের সুতোই আছে। উচ্চস্তরের সাহিত্যে সংগীতে চিত্রশিল্পে ভাস্কর্যে নারীর কেবল মাতৃরূপ নয়, প্রিয়ারূপটিও স্বীকৃত ও বন্দিত। মেক্সিকান কবি অক্তাভিও পাস্‌কে একটি টেলি-অনুষ্ঠানে বলতে শুনেছি যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের শিল্পরূপ যে কত উচ্চস্তরের হতে পারে তা তিনি বুঝেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার পরে। এ কথা তিনি কেন বললেন তা ভেবে দেখা যেতে পারে। কক্কড় কিন্তু এই সদর্থক সাক্ষ্যকে ব্যবহার করেন নি। মনুসংহিতা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, অজন্তা-ইলোরা, তামিল প্রেমের কবিতা, রাজপুত মিনিয়েচর চিত্রকলা, উচ্চাঙ্গ সংগীত: এ-জাতীয় উপাদানকে নিয়ে তিনি কোনো প্রকৃত আলোচনা করেন নি।

গণসংস্কৃতির নমুনাদের প্রতি কক্কড়ের আকর্ষণ বেশী। অনুমান করি এর কারণ এদের মধ্যে স্টিরিওটাইপ পাওয়া অনেক বেশী সহজ। তিনি যে-দুটি উপন্যাস ব্যবহার করেছেন সে-দুটি সম্পর্কে বা তাদের লেখকদ্বয়ের সম্পর্কে কোনো আনুষঙ্গিক তথ্যাবলীও তিনি দেন নি। দেওয়া উচিত ছিলো। এ দুটি কি শিল্পবিচারে উঁচু দরের উপন্যাস? আমাদের জানা দরকার। উচ্চমানের উপন্যাস ব্যবহার করলেও কি একই ধরনের নকশা বেরোতো?

ভারতীয় সংস্কৃতিতে কাহিনীর মর্যাদার সঙ্গে দর্শনের ব্রহ্মতত্ত্বের যোগসূত্রটি (পৃঃ ৩) সত্যি কী তা বুঝতে পারলাম না। ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কম ব'লে লোকশিল্প আর ব্যক্তিরচিত শিল্পের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা যায় না, বা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যগুলিতে কাহিনীর চরিত্ররা সাধারণতঃ ব্যক্তিমানুষ নয়, গোষ্ঠীরই ক্ষুদ্ররূপ, এমন দাবি (পৃঃ ৪) আরও অনেক গভীর ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ না দেখালে আমি মেনে নিতে

প্রস্তুত নই। রবীন্দ্রনাথের চরিত্ররা ব্যক্তি নয়? আর ভারতীয় সাহিত্যের যে-'সাধারণ' নিয়মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পড়েন না, তেমন নিয়ম দিয়ে কী লাভ?

কক্কড়ের 'টার্গেট শ্রোতা' প্রধানতঃ ইংরেজীভাষী বিদেশী ব'লেই কি তিনি এমন কথা লিখতে পারলেন যে যাকে ইংরেজীতে বলে 'লাভ-মেইকিং' তারই প্রতিশব্দ হলো হিন্দী 'কাম' ('কাজ' অর্থে), 'ধান্ধা', 'লাগোয়া লেতে হৈঁ' ইত্যাদি? ঐ ধরনের শব্দের সমগোত্রীয় বেশ কিছু 'প্রোলেতারীয়' ইংরেজী শব্দ তো আছে। তুলনা করতে হলে তাদের সঙ্গেই করা উচিত। শারীরিক মিলনের অর্থে ক্রিয়াপদ 'টু মেইক লাভ' বা বিশেষ্যপদ 'লাভ-মেইকিং' কিন্তু খুবই নতুন। এই অর্থ গ'ড়ে উঠেছে প্রায় আমাদের প্রজন্মে। তার আগে অর্থ ছিলো পূর্বরাগ বা কোর্টশিপ বলতে যা বোঝায় সেইটুকুই। শর্টার অক্সফোর্ড অভিধানের যে-সংস্করণটি আমি সর্বদা ব্যবহার করি (১৯৫৯ সালের), তাতে পুরোনো অর্থটাই স্বীকৃত। এই প্রবন্ধের পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ যদি *হাই সোসাইটি* নামে একটি নাম-করা চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করতে পারেন, যাতে অভিনয় করেছিলেন বিং ক্রস্‌বি, গ্রেইস কেলি আর ফ্রাংক সিনাট্রা, তা হলে হয়তো বা স্মরণ করতে পারবেন ঐ ফিল্মের একটি গানকেও: 'মাইণ্ড ইফ আই মেইক লাভ টু ইউ' (কথা ও সুর: কোল্‌ পোর্টার)। সেখানে আপনারা ঐ পুরোনো রোম্যান্টিক অর্থটাই পাবেন।

কক্কড় যখন বলেন যে জনপ্রিয় সিনেমা একধরনের 'কালেক্টিভ ফ্যান্টাসি' বা সমষ্টিগত স্বপ্ন, তখন তা মেনে নিতে পারি, কিন্তু অন্যান্য দেশের জনপ্রিয় সিনেমার সঙ্গে তুলনায় হিন্দী সিনেমা অতিরিক্তভাবেই 'সমষ্টিগত স্বপ্ন', এমন দাবি (পৃঃ ২৬-২৭) অতিশয়োক্তি-ঘেঁষা। হলিউডের সিনেমার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে 'কালেক্টিভ ফ্যান্টাসি' নেই? 'দিবাস্বপ্নের' মর্যাদা (পৃঃ ২৯) কেবল হিন্দী ছবির কেন, বহু পাশ্চাত্য ছবিরও প্রাপ্য। 'ভারতে কোনো-কিছুই কখনো লোপ পায় না, তা হোক না কেন কোনো ধর্মীয় আচার, রাজনৈতিক দল, বা পৌরাণিক মোটিফ' (পৃঃ ৩৫): এমন উক্তি ভারত সম্পর্কে একটা বিদেশী স্টিরিওটাইপেরই পুনরাবৃত্তি। নিঃসন্দেহে ভারতেও অনেক কিছুই লোপ পায়, বিবর্তিত-পরিবর্তিত হয়। ভারত জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কোনো জাদুঘর নয়, কোনো স্থাবর সত্তা নয়। ইয়োরোপে লৌকৈতিহ্য আর ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে, ভারতে নেই, বা ভারতে জনপ্রিয় গণসংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি বা ধ্রুপদী সংস্কৃতির থেকে আলাদা করা যায় না (পৃঃ ৬২), এগুলিও ভারতবিষয়ক স্টিরিওটাইপ। কিছু পাঁচমিশালী এলাকা যেমন ভারতে আছে, তেমন ইয়োরোপেও আছে। আজকে যা ইয়োরোপের 'ধ্রুপদী' ট্র্যাজেডি, তা-ই অতীতে গ্রীসের গণসংস্কৃতিরও অঙ্গ ছিলো। বহু দর্শক সমবেতভাবে খোলা অ্যাম্ফিথিয়েটারে ব'সে ঐসব নাটক দেখতেন। আর যদি সীমারেখা মানতে হয়, তা হলে তা ভারত এবং ইয়োরোপ দুই দুনিয়াতেই মানতে হয়।

কক্কড়ের বইটি অবশ্যই সুধীজনের পাঠ্য এবং এখানে নানা অন্তর্দৃষ্টিই লভ্য। তবে তিনি ভারতের বিষয়ে একটু বেশী পরিমাণেই বিদেশী ধরনের স্টিরিওটাইপ ব্যবহার

করেছেন। এ থেকে মনে হয় ভারতীয় বিদ্যাচর্চায় পাশ্চাত্য চিন্তার মডেলগুলির দাপট এখনও অত্যধিক।

১ *ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ*, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮।

২ দ্রষ্টব্য : Pat Caplan (ed.), *The Cultural Construction of Sexuality*, Tavistock Publications, London & New York, 1987.

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

ার সোপানশ্রেণীতে : শিবনারায়ণ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটে' প্রবন্ধের সূত্রে

মাত্র কিছু দিন আগেই ভারত থেকে টরন্টোগামী একজন বাঙালী অধ্যাপক আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। ক্যানাডার টরন্টোতে মনে হয় ঘন ঘনই ভারতবিদ্যাসংক্রান্ত সভা বসে: অনেককেই ভারত থেকে টরন্টোর পথে এই দ্বীপ ছুঁয়ে যেতে দেখি। কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবীর কবিতার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্থান কোথায়?— আমি তো নানা দেশের কবিতা পড়েছি, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদও করেছি, আমার এ সম্পর্কে কী মনে হয়? আমি উল্টে জানতে চাইলাম, তাঁর মনের মধ্যে ওরকম প্রশ্ন জাগছে কেন? তিনি আরম্ভ করলেন, 'শিবনারায়ণ রায় বলেছিলেন না ...?' এই ব্যক্তি *জিজ্ঞাসা*-র পাঠক নন। তিনি পঁয়তিরিশ বছর আগেকার তর্কটার কথাই ভাবছিলেন।

পদমর্যাদার সোপানশ্রেণীতে কে কতটা উপরে, কে কতটা নীচে, এ ধরনের সূক্ষ্ম বাছবিচার আমাকে কোনো কালেই বড় একটা আকর্ষণ করে নি। না শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে, না জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। দেশে বিদেশে গুণীদের উৎকৃষ্ট কাজের সন্ধান পেয়েই আমি খুশী থাকি। সত্যি বলতে কি, মানুষের সৃষ্টির যে-সম্পদ চতুর্দিকেই ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, উপচে পড়ছে, তার সঙ্গে তাল রাখাই তো মুশকিল। সমস্ত ভালো বই প'ড়ে উঠতে হলে, সমস্ত ভালো সংগীত শুনতে হলে, সব ভালো ছবি দেখতে হলে সেই-সমস্ত পড়া-শোনা-দেখাকেই পেশা করতে হবে, নিজে কোনো-কিছু সৃষ্টি করার সংকল্প ছাড়তে হবে। কিন্তু দেখতে পাই যে পদমর্যাদার সোপানশ্রেণী, ইংরেজীতে যাকে বলে 'হায়ারার্কি', অনেকের কাছেই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কার স্থান কোথায়, এ নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামাতে রাজি। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এর আকর্ষণ না থাকলেও দেখতে পাই যে হায়ারার্কির দাবি অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক জীবন, চাকরিজীবন থেকে শুরু ক'রে শিল্পসাহিত্যের জগৎ পর্যন্ত প্রসারিত।

সাহিত্যের আন্তর্জাতিক মেলায় রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়, এ নিয়ে পঁয়তিরিশ বছর আগে শিবনারায়ণ রায় স্পষ্টতঃই মাথা ঘামিয়েছিলেন। এখনও কেউ কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন। ইতিহাসের অনিবার্য উত্তরাধিকারসূত্রে, বহু দিনের ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণামে এই জিজ্ঞাসা বোধ করি বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে বহুলাংশে তাঁদের আত্মপরিচয়ের এবং আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে জড়িত। এ যেন একটা প্রশ্ন, একটা সংশয়: যিনি আমাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর, তিনি বৃহত্তর দুনিয়াতেও প্রথম শ্রেণীর তো? শিবনারায়ণের বিতর্কিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটে' যে কারও কারও মনে সন্দেহের বীজ

বপন করেছিলো, তার প্রমাণ তো সম্প্রতি পেলাম বাড়িতে ব'সেই, কন্‌ফারেন্সের তীর্থযাত্রী আজকের দিনের অধ্যাপকের মুখেই।

প্রবন্ধটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সেটি পড়েছিলাম কিনা সে-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি না। সুস্পষ্ট স্মৃতি নেই কোনো। প'ড়ে থাকলেও, সেটির তর্কগুলো ঠিক ক'রে বুঝবার মতো বা তাদের নিয়ে তর্ক করবার মতো বয়স তখনও হয় নি। বিতর্কের ঝড় একটা উঠেছিলো, এই পর্যন্ত জানতাম। প্রবন্ধটি প্রথম ঠিক ক'রে পড়ি দশ বছর আগে, শিবনারায়ণের *কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা* প্রবন্ধসংকলনটিতে (প্রকাশ ভবন, ১৯৭৩), এবং তখনই প্রবন্ধলেখককে পত্রের মাধ্যমে কিছু প্রতিক্রিয়া জানাই। প্রবন্ধটি *জিজ্ঞাসা*-য় (১০ : ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৬) পুনর্মুদ্রিত ক'রে বিষয়টি নিয়ে পুনর্বার প্রকাশ্যে আলোচনা করার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন। তিনি যে স্বেচ্ছায় নিজেকে আবারও এভাবে সমালোচনাভাজন হতে দিয়েছেন, এজন্যে তাঁর সাহসের তারিফই করতে হয়।

শিল্পসাহিত্যের আলোচনা যে যতদূর সম্ভব একটা বিস্তৃত, উদার পটভূমিকায় হলেই ভালো হয়, এ কথা আমরা বঙ্গীয় নবজাগরণের উত্তরাধিকারসূত্রে অল্প বয়স থেকেই শুনছি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভটাও বেশ বোধগম্য। কিন্তু গোড়াতেই কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথম সমস্যা 'বিশ্ব' শব্দটাকে নিয়েই। শব্দটা মুখে উচ্চারণ করা বা কলমের আঁচড়ে লিখে ফেলা যতটা সহজ, কার্যতঃ বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করা কিন্তু মোটেও তত সহজ নয়। প্রকৃত অর্থে বিশ্বের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে সাহিত্যের সমালোচনা কেবল তিনিই করতে পারেন, বিশ্বের তাবৎ সাহিত্যিক ঐতিহ্যগুলি সম্বন্ধে যাঁর সম্যক্ জ্ঞান আছে। তেমন সমালোচক কোথায়? বস্তুতঃ, শিবনারায়ণও তাঁর প্রবন্ধে তা করেন নি। তাঁর উল্লেখগুলি থেকে একটি প্রধানতঃ ইয়োরোপীয় পরিপ্রেক্ষিতই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কদাচিৎ দু'-একটি অন্য উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় : মহাভারত, বেদব্যাস, মার্কিন নাট্যকার ও'নীল। কোনো চীনা, জাপানী, আরবী বা ফার্সী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ যদি প্রবন্ধটি প'ড়ে আপত্তি করেন যে তাঁর চর্চার বিশেষ এলাকাটি এখানে হিসাবের মধ্যে ধরাই হয় নি, অতএব প্রবন্ধকারের দৃষ্টি বৈশ্বিক নয়, তা হলে কী-ই বা জবাব দেওয়া যায়? আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বের যে-মানচিত্রটা থাকে তারই ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠে ঐ বিশ্বসংক্রান্ত আমাদের মানসিক প্রতিমাগুলি। শিবনারায়ণের প্রবন্ধটি প'ড়ে মনে হয় যে সেটি লেখার সময়ে তাঁর মনের মধ্যে বিশ্বের সেরা সাহিত্যের যে-আদর্শ প্রতিমাগুলি কাজ করছিলো সেগুলি ছিলো একটু বেশী মাত্রাতেই ইয়োরোপ-ঘেঁষা।

ইয়োরোপীয় সাহিত্য অবশ্যই বিশ্বসাহিত্যের একটা বিরাট সুপুষ্ট শাখা। তার মর্যাদা অনস্বীকার্য। তবুও ইয়োরোপ আর পৃথিবী (বা পশ্চিম আর পৃথিবী) যে সমার্থক নয়, হতে পারে না, এ কথা শিবনারায়ণও নিশ্চয় মানবেন। পৃথিবীর কথা তুললে কাভারেজটাকে আরও অনেক বিস্তৃত ক'রে তুলতে হবে। শুধুমাত্র ধ্রুপদী ঘরানার বিদগ্ধ সাহিত্যের কথা ভাবলেও যথেষ্ট হবে না, এই দুনিয়ার বিচিত্র বহুসংখ্যক লোকসাহিত্যগুলিকেও মানচিত্রের

মধ্যে একটা জায়গা দিতে হবে, কেননা এগুলিও বিশ্বসাহিত্য-নামক বিরাট পরিবারের অন্তর্গত। তেমন কোনো বিশাল মানচিত্রের পটভূমিকা কিন্তু আলোচনায় কদাচিৎ গৃহীত হতে দেখি। সচরাচর দেশবিদেশের পণ্ডিতদের মধ্যেও একটা ঢের বেশী সীমাবদ্ধ আন্তর্জাতিকতাই চলে, এবং তাকেই সম্মানার্থে বৈশ্বিকতার মর্যাদা দেওয়া হয়। কোনো আলোচনা কিছুটা তুলনামূলক হলেই যে আর বৈশ্বিক হয়ে দাঁড়ায় না, এই কথাটা আজকের দিনে বিশেষ ক'রেই মনে রাখার প্রয়োজন আছে। তার কারণ আজকাল জীবনের নানা ক্ষেত্রেই একদিকে যেমন 'বিশ্ব' শব্দটা খুবই শোনা যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমন সেই-সব তথাকথিত বিশ্বজোড়া পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্বের বৃহদংশই প্রায়শঃ বাদ প'ড়ে যাচ্ছে।

তা ছাড়া, আর্টের তুলনামূলক বিচার তো আবশ্যিকভাবেই একটা মন্ময় এবং মোটামুটি মাপের ক্রিয়া। এ কথা সব শিল্পকলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবে সাহিত্য ভাষানির্ভর ব'লে সাহিত্যের বেলায় আরও বেশী ক'রেই প্রযোজ্য। আমরা মাতৃভাষা ছাড়া বড় জোর আর দু'-চারটা ভাষা শিখে নিতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সাহিত্যই আমাদের কাছে পৌঁছবে অনুবাদের মাধ্যমে, কখনও বা দু'-তিন দফা অনুবাদের মাধ্যমে। সে-ক্ষেত্রে দেশবিদেশের সাহিত্যিকরা ওজনে কে কতটা ভারী তা কি নিক্তিতে বসিয়ে তন্ময়ভাবে মেপে নেওয়ার কোনো উপায় কারও জানা আছে? নেই। আমরা বড় জোর দেখতে পাই যে একেকটা ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে সেই সেই ঐতিহ্যের সুধীমণ্ডলীর মধ্যে কালক্রমে একধরনের ঐকমত্য গ'ড়ে ওঠে— যে অমুক অমুক হচ্ছেন আমাদের সেরা সাহিত্যিকবৃন্দ। আমি নিজে এই পর্যন্ত মূল্যায়ন পেয়েই খুশী, এর বেশী দাবি করি না, যদিও মনে রাখতে হবে যে এখানেও যথেষ্ট গণ্ডগোলের সম্ভাবনা। যেমন, সুধীদের ঐক্যমত্যটা যে সাধারণতঃ কেবল প্রবীণ পুরুষদের ঐক্যমত্য সে-বিষয়ে নারী-আন্দোলন আমাদের সতর্ক করেছে। মেয়েদের কৃতির প্রতি প্রায়ই যে সুবিচার করা হয় না, সেরাদের তালিকা থেকে তাঁদের নাম যে হামেশাই অন্যায়ভাবে বাদ প'ড়ে যায়, এ তো আমরা হরদমই দেখতে পাই। তর্কের খাতিরে ধ'রে নেওয়া যাক যে এ ধরনের অবিচার সম্পর্কে চেতনা বাড়ছে ব'লে সুবিচারের পথ ক্রমশঃ সহজতর হবে। এদিকে শিবনারায়ণের প্রবন্ধ বলছে যে বিভিন্ন ঐতিহ্যের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিবেদন থেকে পরবর্তী ধাপে পৌঁছনো সম্ভব। আমার মতে সেটা কিন্তু খুবই কঠিন। কোনো ভুবনজোড়া পরিপ্রেক্ষিতের মিনারে চ'ড়ে সেখান থেকে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের বেছে নেওয়া— সে-কাজ কারা করবে? কাদের সে-দায়িত্ব দেওয়া যায়? ব্যাপারটা কি দ্রুতগতিতে 'সংস্কৃতির রাজনীতি'র অন্তর্গত হয়ে পড়বে না?

সম্ভবপর দৃশ্যটা একটু কল্পনা করা যাক। চিরাচরিত নিয়ম মেনে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেবেই। তখন সালিসি করবে কে? লণ্ডন আর নিউ ইয়র্কের প্রকাশকরা কি তাঁদের বাণিজ্যিক নীতির দড়িদড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না? গণমাধ্যমগুলির সাংবাদিকরা কি নোটবই-পেন্সিল কানে গুঁজে এক হাতে ক্যামেরা ও অন্য হাতে টেপরেকর্ডার নিয়ে প্রচণ্ড হট্টগোল আরম্ভ ক'রে দেবেন না? শ্রেষ্ঠদের গ্যালারিতে আরবী সাহিত্যিকদের যথেষ্ট

পরিমাণে আসন না দিলে জেহাদের ঘোষণা কি এড়ানো যাবে? কত পণ্ডিত ব্যক্তি হাইজ্যাক্‌ড্‌ হবেন বা গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হবেন? কত কত দেশের লোক আপত্তি করবেন যে তাঁদের সাহিত্যিকদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না?

অতএব এ ধরনের কাজ আদৌ করতে হলে ক) পৃথিবীর সেরা সাহিত্য যাঁরা নির্বাচন করবেন সেই নির্বাচকদের দলটাকে যথাসম্ভব বড় এবং সুযোগ্য করতে হবে এবং খ) নির্বাচিত সাহিত্যিকদের দলটাও যাতে যথাসম্ভব ছোট না হয়ে যথাসম্ভব বড় হয় তার চেষ্টাই করতে হবে। বিশ্বটা এত বড় ব'লেই তার সেরা সাহিত্যিকরাও দলে ভারী হবেন এটাই প্রত্যাশিত। পঞ্চাশের দশকের ইয়োরোপ-ঘেঁষা সীমাবদ্ধ আন্তর্জাতিকতা নব্বইয়ের দশকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ঝোঁকটা যেন পড়ে গ্রহণের উপরে, বর্জনের উপরে নয়। কাউকে নিয়ে 'সংশয়ের অবকাশ' থাকলে তাঁকে বাদ না দিয়ে বরং নিয়ে নেওয়াই বিচক্ষণতর; তবেই না সেরা সাহিত্যের বর্গটা শরীরী, সারবান এবং তাৎপর্যান্বিত হবে। শিবনারায়ণের প্রবন্ধটির কেন্দ্রীয় মুশকিল হচ্ছে এই যে সেটির ঝোঁক গিয়ে পড়েছে গ্রহণের বদলে বর্জনের দিকে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটিতে 'রবিঠাকুর' বা 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র' ব'লে দু'-একবার উল্লিখিত হয়েছেন, তা থেকেও ঝোঁকটা ধরা পড়ে।

তবে শিবনারায়ণ বলেছেন ঠিকই যে প্রবন্ধটির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইয়োরোপের 'মডার্নিস্ট' সাহিত্যচিন্তা দ্বারা আবিষ্ট, আত্মজিজ্ঞাসা দ্বারা আক্রান্ত, পঞ্চাশের দশকের পশ্চিমবাংলার রবীন্দ্রোত্তর মননের এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বহুমুখ বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে গোয়েটের সঙ্গে তুলনীয় সে-কথা প্রবন্ধটি আমাদের সুন্দরভাবেই বুঝিয়ে দেয় তো বটেই, অপিচ এখানে একজন বাঙালী পাঠকের গোয়েটে আবিষ্কারের উল্লাস যেভাবে নানা বর্ণে চিত্রিত হয়েছে তা আমাদের পক্ষে একটি অতিরিক্ত প্রাপ্তি। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো যেমন রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার ক'রে 'রবীন্দ্রনাথ পড়বার আনন্দ' নামে তাঁর প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, শিবনারায়ণের এই প্রবন্ধটিও তেমনই একটি ব্যক্তিগত আবিষ্কারের দলিল। 'গোয়েটে পড়বার আনন্দ' এই প্রবন্ধের সাবটাইট্‌ল্‌ হতে পারতো। ভিক্তোরিয়ার প্রবন্ধটির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিলো প্রুস্ত্‌ এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই লেখকের মধ্যে যে-পার্থক্য তাকে স্পষ্ট করা: তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে তাঁর আপন পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রুস্ত্‌ একটা জায়গায় তাঁর সাহিত্যরসতৃষ্ণা মেটাতে পারেন না, পারেন ভিন্ন ঐতিহ্যের রবীন্দ্রনাথ। শিবনারায়ণ দেখিয়েছেন কিভাবে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের গোয়েটে তাঁকে তেমন জিনিস উপহার দিতে পারেন, যা আপন ঐতিহ্যের রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিতে পারেন না। এইভাবে আমাদের ভাবনাকে তিনি যে উদ্বেজিত করেন এখানেই প্রবন্ধটির বৈজিক মূল্য। আবার এটির মধ্যে অনিবার্যতঃই এমন অনেক আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় রয়ে গেছে যেগুলিকে ঘিরে পঁয়তিরিশ বছর বাদে ভিন্ন প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন ক'রে আলোচনার সূত্রপাত করা যায়।

§

প্রবন্ধটিতে শিবনারায়ণের বিচারপদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। দ্বিতীয় অণুচ্ছেদে যেখানে তিনি সাহিত্যিক ভ্রাঁরগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন হলো: 'মুখ্যত সুরের দিক থেকে বিচার করলে কি এদেশের কি পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের রচনার সঙ্গে তার কি সত্যিই কোন তুলনা সম্ভব?' এখানে তাঁকে উল্টে প্রশ্ন করতে হয়: সাহিত্যের কথাই যখন হচ্ছে, তখন আবার রবীন্দ্রনাথের গানকে 'মুখ্যত সুরের দিক থেকে' বিচার করা কেন? বরং গানের লিরিক হিসাবে বিচার করাই কি সঙ্গত হবে না? গীতিকবিতার স্রষ্টা হিসাবে তিনি কি পৃথিবীর সেরাদের একজন ব'লে গণ্য হতে পারেন না? আর যদি গানকে তার পুরো রূপে বিচার করতে হয়, তা হলে বলতে হয় যে কথা আর সুরে মিলিয়ে ছোট মাপের গান একটি মিশ্র প্রকৃতির স্বতন্ত্র ভ্রাঁর; সেখানেও তাকে 'মুখ্যত সুরের দিক থেকে' বিচার করা চলে না। কথার সঙ্গে ছোট মাপের গানের সব সময়ই একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে: কথার প্রতি তার একটা দায়িত্ব থাকে। কথা যখন একটা পারে এসে আটকে যায়, সুর তখন হাত ধ'রে তাকে নদী পার করায়। তাই পশ্চিমেও মুখ্যতঃ সুরভিত্তিক সংগীতের সঙ্গে— তা যন্ত্রসংগীতই হোক বা কণ্ঠসংগীতই হোক— এই ভ্রাঁরের তুলনা করা হয় না। রবীন্দ্রসংগীতকে মুখ্যতঃ সুরাশ্রিত খেয়াল (কথা যেখানে গৌণ) বা পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সোনাটা-কন্‌চের্টো-সিম্ফনি অথবা কাব্য-সংগীত-নাট্য এই ত্রিধারার সম্মিলন বৃহৎ অপেরার সঙ্গে তুলনা না ক'রে দেশবিদেশের ছোট মাপের গানের সঙ্গে তুলনা করাই সঙ্গত। সেভাবে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতস্রষ্টাদের একজন ব'লে নিশ্চয়ই গণ্য হতে পারেন। বিশেষতঃ মনে রাখতে হবে যে তিনি তাঁর গানগুলির কথা এবং সুর উভয়েরই রচয়িতা। পাশ্চাত্য উচ্চমার্গীয় গানের ঐতিহ্যে মধ্যযুগের পর থেকে এমন ঘটনা ব্যতিক্রমই: রেনেসাঁস-উত্তর ইয়োরোপে সুরকাররা সাধারণতঃ অন্যদের লেখা কবিতাতেই সুরারোপ ক'রে থাকেন। ভিয়েনা-জাত সংগীতপ্রতিভা শুবার্ট, মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে যাঁর মৃত্যু হয়, গোয়েটে এবং অন্যান্য কবিদের রচনায় সুর দিয়ে উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে-সব গান সৃষ্টি করেন সেগুলি পাশ্চাত্য সংগীতের ঐতিহ্যে অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। বর্তমান শতাব্দীতে ইংরেজ সুরকার বেঞ্জামিন বৃটেন একাধিক নাম-করা ইংরেজী কবিতায় সুর দিয়েছেন; গ্রীক সুরকার থেওদোরাকিস্‌ স্পেনীয় কবি লোর্কার কতগুলি কবিতার গ্রীক অনুবাদে সুর দিয়ে কয়েকটি আশ্চর্য গান সৃষ্টি করেছেন। এইরকম আরও কত দৃষ্টান্ত আছে। অপেরাতেও সচরাচর লিব্রেটো বা গীতবস্তুটা একজন লেখেন, সুরটা আরেকজন দেন। এ ব্যাপারে ভ্যাগ্‌নার একজন নাম-করা ব্যতিক্রম: তিনি তাঁর অপেরার লিব্রেটো নিজেই লিখতেন। যাই হোক, এ দিক থেকে দেখলে তাঁর গানের দুটো অঙ্গেরই স্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। যেভাবে গানের পর গানে ঐ যুগলের শুভবিবাহ তিনি ঘটাতে পেরেছেন, তা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতেও উল্লেখযোগ্য।

এর পরে আসা যাক সেই বিষয়টিতে— কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদার প্রশ্নে— যা শিবনারায়ণের নিজস্ব প্রতিবেদন অনুসারেই প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশের সময়ে

সব চাইতে বেশী উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলো। পাঠকরা কেন অত উত্তেজিত হয়েছিলেন তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। বস্তুতঃ শিবনারায়ণ বিষয়টা ঠিক ক'রে আলোচনাই করেন নি, একটিমাত্র বাক্যালংকারধর্মী প্রশ্ন উপস্থাপিত ক'রে বিষয়টাকে বিদায় দিয়ে পরের প্রসঙ্গে এগিয়ে গেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ এই বাক্যটিতে রবিঠাকুরে পর্যবসিত। এই ধরনের আল্‌গা ভঙ্গির জন্য ইংরেজীতে একটি উপযুক্ত বিশেষণপদ আছে: 'ক্যাভালিয়র'। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে একজন বাঙালী সমালোচক যদি এরকম 'ক্যাভালিয়র' মন্তব্য করেন, তা হলে বাঙালী পাঠকরা তো উত্তেজিত হতেই পারেন, বিশেষতঃ স্পর্শকাতরতার জন্য বাঙালীদের একটা খ্যাতি যখন আছেই।

পরবর্তী কালে শিবনারায়ণ এ ব্যাপারে একটি টীকা যোগ করেছেন। এই টীকার বক্তব্যের কিয়দংশ নেহাৎ সাদামাঠা কারণেই আমার কাছে অস্বচ্ছ: 'আদ্যোপলীর আপজাত্য' এবং 'ট্র্যাজিক বিষঙ্গ' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা ঠিক ধরতে পারছি না। নানা অভিধানের পাতা উল্টালাম, কিন্তু 'আদ্যোপলীর' শব্দটার অর্থ পরিষ্কার হলো না। আন্দাজ করছি শব্দটা 'আদ্য' আর 'উপলীর'-এর সন্ধিজাত, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটা কোথাও পাচ্ছি না। 'উপলীন' সম্ভব, কিন্তু 'উপলীর' ঠিক কী জিনিস? আর 'বিষঙ্গ' শব্দটার মানে তো দেখছি মনিয়র-উইলিয়মস্‌ অনুসারে 'আটকে থাকা, লেগে থাকা'। সে-ক্ষেত্রে 'ট্র্যাজিক বিষঙ্গ' ঠিক কী বস্তু? ট্র্যাজিক আসক্তি? শিবনারায়ণ এ দুটি ব্যাপারে আলোকপাত করলে হয়তো আরও অনেকেই উপকৃত হবেন।

যাই হোক, মোটামুটি এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে 'মডার্নিস্ট' ধাঁচের কতগুলি একান্তভাবে নঞর্থক অনুভূতির আপেক্ষিক দুর্লভতাই শিবনারায়ণের অতৃপ্তির কারণ। ঐ অনুভূতিগুলির প্রকাশ তাঁর কাছে স্পষ্টতঃই খুব দামী, কিন্তু কাব্যোৎকর্ষের জন্য সেগুলি কেন অতটা জরুরী তা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি। তাঁর নিরিখটা কি এখানে অতিরিক্ত মাত্রায় মন্ময় এবং ইয়োরাপীয়-মডার্নিজ্‌ম্‌-ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে না? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঐ অনুভবগুলির অপেক্ষাকৃত অভাব কি তাঁর অন্য নানা ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ বিশাল কাব্যকৃতির এতটাই মূল্যহ্রাস ঘটায় যে সে-কারণে তাঁকে বিশ্বের সেরা কবিদের ভি. আই. পি. লাউঞ্জটাতে ঢুকতে দেওয়া যায় না? ঐ অনুভবগুলির প্রকাশে দক্ষ হওয়ার সঙ্গে বড় কবি হওয়ার কি কোনো আবশ্যিক, অন্তর্নিহিত যোগ আছে? তা হলে তো মডার্নিস্ট আন্দোলনের প্রাগ্‌বর্তী ইয়োরোপের বড় বড় কবিদেরও ঐ ঘরটাতে ঢোকার জো নেই, অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম।

এটা তো সর্বজনগ্রাহ্য যে মেজাজে, মর্জিতে, রুচিতে, সংবেদনে, জীবন থেকে আহৃত অভিজ্ঞতায় দুজন ব্যক্তির মধ্যে তফাৎ থাকে এবং থাকবে। সেজন্যই তো আমরা ব্যক্তির প্রাতিস্বিক ব্যক্তিতার কথা বলি। তদনুসারে সমালোচকদের মধ্যে যেমন মতভেদ হয়, তেমনই স্রষ্টাদের সৃষ্টিগুলির মধ্যেও বিভিন্ন স্বাদের সঞ্চার হয়ে থাকে। সার্থক কবিদের মধ্যেও অনুভবের কাভারেজে চিরকালই তারতম্য থাকবে। বড় কবি ব'লে গণ্য হতে হলে যে ঠিক বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, রিল্‌কে, ইয়েট্‌স্‌, এলিয়টের মতোই লিখতে হবে, এমন তো

কোনো নিয়ম নেই। তা হলে তো চসর বা কীট্‌স্‌ও বড় কবি নন। (ইংরেজরা কি এ প্রস্তাব মানবেন?) তা হলে তো এমনও বলা যায় যে বড় কবি হতে হলে কেবলই প্রতিবাদের কবিতা লিখতে হবে, বা জীবনকে অর্থহীন ব'লে ঘোষণা করতে হবে, বা কেবলই পুরুষাঙ্গের আর্তনাদকে শ্রুতিগোচর ক'রে তুলতে হবে। ওরকম বলা তো হবে ডগ্‌মা। বড় কবি হয়ে ওঠার ওরকম কোনো ফর্ম্যুলা তো প্রকৃতপক্ষে নেই। কিন্তু একজন বড় কবি যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান, তখন তাঁর ভাব আর ভাষা থেকে আমরা তাঁকে চিনে নিই। আমার বিচারে রবীন্দ্রনাথ ঐরকম একজন বড় কবি, যিনি পৃথিবীর কবিদের পার্লামেন্টেও আসন পাবার যোগ্য। সম্প্রতি তাঁর কবিতা ও গান অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর কবিতাবলী এবং গীতবিতানের পাতা অনেকবারই উল্টাতে হয়েছে, এবং বারে বারে এ কথাটাই মনে হয়েছে যে তাঁর কবিতা ও গানের একটা বৃহদংশ যে-কোনো বিচারে প্রথম শ্রেণীর। তাঁকে যদি পৃথিবীর সেরাদের একজন না ধরা হয়, তা হলে 'পৃথিবীর সেরা কবিরা' ব'লে একটা বর্গ বা ক্যাটেগরি রাখারই কোনো মানে হয় না। যে-যার ঐতিহ্যের সেরা কবিদের নিয়েই না-হয় সন্তুষ্ট থাকলাম, বিশ্বের পটভূমিকার কথা নাই বা তুললাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা পাই না, বা কম পাই, তার চাইতে যা পাই তা যে ঢের বেশী। শিবনারায়ণ তো নিজেই স্বীকার করছেন যে 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুগভীর অনুভবের সন্ধান অবশ্যই মেলে', 'যা তিনি দিয়েছেন তা প্রচুর'। তবে? শেষ বিচারে একজন কবির মর্যাদা তো ঐ নিরিখেই হবে— যা তিনি দিতে পারেন তারই নিরিখে, যা তিনি দিতে পারেন না তার নিরিখে নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মডার্নিস্ট কবিদের ধাঁচে শূন্যতাবোধ, অমঙ্গলবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নির্বেদ ইত্যাদি পাই না; কিন্তু সেখানে 'আনন্দ ও উৎকাঙ্ক্ষা, বিরহ ও প্রতীক্ষা'র যে-'বিচিত্র প্রকাশ' পাই— শিবনারায়ণেরই ভাষায়— তাও তো আবার ঐ মডার্নিস্ট কবিদের মধ্যে পাই না, তার জন্য তো আবার ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথের দরজাতেই। শিবনারায়ণ রবীন্দ্রকাব্যে যে-জিনিসগুলির অভাব অনুভব করেছেন সেগুলি যেহেতু সবই কোনো-না-কোনো ধরনের যন্ত্রণাবোধ, তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যন্ত্রণাবোধের ব্যাপারটা না-হয় দু' মিনিট ভেবে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে বেদনার দান নেই, দুঃখের আঁধার রাত্রির ছায়া নেই, এ কথা কে বলবে? যৌবনের রোম্যান্টিক যন্ত্রণার প্রকাশ দিয়ে যাঁর কবিতার পদযাত্রা শুরু হয়, তাঁকে আমরা দেখি একের পর এক প্রিয়বিয়োগজনিত শোকের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ব্যক্তিগত দুঃখের সুতীব্র দহন থেকে কাব্যের অমৃতদুগ্ধ দোহন ক'রে নিতে। এ ব্যাপারে তিনি তো চমৎকারী ক্ষমতার অধিকারী, সহৃদয় পাঠকের হৃদয়মন্থনকারী। নানা অর্থেই 'আত্মার অন্ধকার রাত্রি' তো তাঁর অজানা নয়। কী সাহসের সঙ্গে সেই নিশীথ তিনি অতিক্রম করেছেন, আবার ভোরের আলো আর পাখীর গানের প্রতিবেদনও রেখে যেতে পেরেছেন। শূন্যতাকে জেনেছেন, আবার সে-শূন্য যে নিছক শূন্য নয় তাও বুঝেছেন, বুঝেছেন যে তার মধ্যেও সম্ভাবনা আছে, তাকেও পূর্ণ করা যায়। একাকিত্বকে জেনেছেন, সাথীহারার ব্যথাকে অকপটেই প্রকাশ করেছেন, আবার সৃষ্টির সাহায্যে সেই একাকিত্বকে কিভাবে লঙ্ঘন করা

যায় তাও শতসহস্রবার দেখিয়েছেন। দাহকে জেনেছেন, কিন্তু নিজেকে ছাই হয়ে যেতে দেন নি, অথবা বলা চলে পৌরাণিক ফীনিক্স পাখীর মতো নিজেরই ভস্ম থেকে নিজেকে বারংবার পুনঃসৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তো একেবারে 'আর্কিটাইপাল' শিল্পী। তেতো হয়ে যান নি, নৈরাশ্যের তমিস্রার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি, প্রশ্ন ক'রে গেছেন, যদিও জেনেছেন যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। অস্তিত্বের শিকড়গত জিজ্ঞাসা তো তাঁর কবিতায় কিছুমাত্র কম পাই না।

শিবনারায়ণ আপত্তি করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'শেষযুগের কবিতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আস্তিক্যচিহ্নিত', কিন্তু আস্তিক্যচিহ্নিত হওয়াটা আবার আর্টের পক্ষে কবে থেকে দোষাবহ হলো ? আস্তিক্যচিহ্নিত হলেই যে কাব্যের কাব্যগুণ, শিল্পের শিল্পগুণ খর্ব হয় না, তা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। বিশ্বের বহু মহৎ শিল্পকর্মই তো নিবিড় আস্তিক্যবোধ দ্বারা ওতপ্রোতভাবে সংক্রামিত ; কাব্য-সংগীত-নৃত্য-চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য সব ক্ষেত্রেই তো এ কথা সত্য। যিনি কাব্যরস পান করতে চান তাঁকে মধ্যে মধ্যে কাব্য আর আস্তিক্যবোধের সহাবস্থান মেনে নিতেই হবে,— এ ছাড়া উপায় নেই,— একজন নাস্তিক পাঠকের পক্ষে ব্যাপারটা যত অস্বস্তিকরই হোক না কেন। এক গভীর আস্তিক্যবোধ তো শেষ পর্বের এলিয়টেও আছে, শেষ পর্বের গোয়েটের মধ্যেও আছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে আমরা যে-আস্তিক্যবোধের অনুরণন পাই তা তো কোনো অতিসরলীকৃত ব্যাপার নয় ; অন্যান্য বড় শিল্পীদের কাজে যেমন, তেমন এখানেও জটিলতা আছে। বেদনায় আর আনন্দে, জিজ্ঞাসায় আর প্রত্যয়ে মেশানো তার স্বাদ। পথের শেষ কোথায়, শেষে কী আছে : এ আর্ত প্রশ্ন তো তাঁরই। আবার যখন তাঁর মনে হয়েছে যে দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, বিরহের দহন আছে, তবু শান্তি, আনন্দ এবং অনন্তও জাগে, তখন তাঁকে সে-কথাটা উচ্চারণ করতে দিতে হবে না কি ? ঈশ্বর ব'লে কোনো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি ঊর্ধ্বে ব'সে আছেন সেরকম কোনো সরল বিশ্বাস তো রবীন্দ্রকাব্য উপভোগের জন্য জরুরী নয়। ওরকম কোনো আস্থা আমারও নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে যে-স্তরান্বিত প্রত্যয়ের শৈল্পিক প্রকাশ দেখতে পাই তাকে বুঝতে এবং তার সহমর্মী হতে আমার তো কোনো অসুবিধা হয় না। ফাউস্ট গ্রেট্‌খেনকে তার অন্তরের ধর্মবিশ্বাস যেভাবে বুঝিয়েছিলো সেই বিখ্যাত ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ের সমধর্মিতাই দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ এটা সেই রবীন্দ্রকথিত 'বিশ্বভূমিকা'রই ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের একটা অতন্দ্র বিশ্বচেতনা ছিলো : মানুষের জীবনকে 'বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে' দেখতে জানতেন। একটা ছোট্ট নাম-না-জানা বুনো ফুলের দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই কথাটাই মনে পড়েছে— যে ঐ ফুলটা আর তিনি উভয়ে একই বিশ্বের অন্তর্গত, দুজনেই এক জটিল অদৃশ্য নিয়মের অধীন : 'যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,/ যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস/ অতীতে ভবিষ্যতে।' এই চেতনা থেকেই তাঁর আমি-র সঙ্গে বিশ্বরূপ তুমি-র নিরন্তর সংলাপ নিঃসৃত হয়েছে। জীবনের পুনরাবৃত্ত ঝড়ঝাপ্‌টার মুখোমুখি বেঁচে থেকে সৃষ্টি ক'রে যেতে হলে এরকম কোনো একটা মৌল অন্তরঙ্গ সংলাপ বোধ হয় লাগে। এ তো

গোয়েটেরও ছিলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং গানে এই সংলাপের প্রকাশ তাঁর জীবনযুদ্ধের অস্ত্রও বটে, জয়ের শঙ্খধ্বনিও বটে। এ তো কখনোই সেই মৃতকল্প জিনিস নয়, এলিয়ট যাকে বলেছেন—

> **The serenity only a deliberate hebetude,**
> **The wisdom only the knowledge of dead secrets**

— বরং এ তো রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত প্রজ্ঞা, যা থেকে পুষ্টি আহরণ করা যায়। আশা করা যায় যে পৃথিবীর মহতী বিনষ্টি না ঘটলে উত্তরসূরিরাও রবীন্দ্রকাব্য থেকে এই পুষ্টি আহরণ করবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়েছে জীবনদেবতা', শিবনারায়ণের এই অভিযোগ আমার ন্যায্য ব'লে মনে হয় না। কাব্যে সেরকম কোনো আচ্ছাদন ঘটে নি। ভাষ্যের কথা আলাদা,— তা কবিরই হোক, বা অন্য কারও। কিন্তু কাব্যটাই মুখ্য, ভাষ্যটা গৌণ। প্রয়োজনবোধে ভাষ্যের স্থূলহস্তাবলেপকে পাশে সরিয়ে রেখে কাব্যের উপরে ফোকস্ করাই যুক্তিযুক্ত।

এতৎসত্ত্বেও শিবনারায়ণ যদি বলেন যে রবীন্দ্রকাব্যে 'নিরুপস্থ পুরুষের যন্ত্রণা, আপতিক অস্তিত্বের নির্বেদ' নেই ব'লে তা একেবারে প্রথম সারির নয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করতে হয় : ঐ দুই যন্ত্রণাবোধের উপস্থিতির উপরে এতটা মূল্য আরোপ করতে হবে কেন ? মেনুটা একটু অন্যরকমের হলেও ডিনারটা কি উৎকৃষ্ট হতে পারে না ? পৃথিবীর অধিকাংশ মহৎ কাব্যে তো মেয়েদের নিজস্ব প্রসবযন্ত্রণা, কাটাছেঁড়া বা ঋতুকালীন ক্লেশের কথাও নেই, কিন্তু তাই ব'লে কি আমরা তাদের খারিজ ক'রে দিচ্ছি ? ধ'রে নিচ্ছি 'নিরুপস্থ পুরুষের যন্ত্রণা' ব্যাপারটা শিবনারায়ণ আলংকারিক অর্থেই বোঝাচ্ছেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথে তা নেই এ কারণে যে তিনি নিজেকে নিরুপস্থ হয়ে যেতে দেন নি ? সেখানেই তো তাঁর জিৎ, তাই না ? তাঁর মধ্যে প্রেমিক পুরুষের, বিরহী পুরুষের, প্রিয়া নারীর মৃত্যুতে শোকাপ্লুত পুরুষের যে-গভীর যন্ত্রণা আছে তা কি যথেষ্ট নয় ? আর 'আপতিক অস্তিত্বের নির্বেদ' সম্পর্কে বলতেই হয় যে সেটা এমন একটা 'সিন্‌ড্রোম' যা থেকে সকলে তো ভোগেন না, কেউ কেউ ভোগেন। 'কে তুমি ?'-র জবাব মেলে না ব'লেই অস্তিত্বটা সকলের কাছে 'আপতিক' হয়ে যায় না ; সমস্ত রহস্য দূর হয় না ব'লে প্রত্যেকের মনের মধ্যেই নির্বেদের মেঘ জমে না। যা-কিছু বোঝা যায়, পাওয়া যায়, তারই সঙ্গে যা-কিছু বোঝা যায় না, পাওয়া যায় না তাকে মিলিয়ে দেখে পাঁচমিশালী অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যেই তো মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য। রবীন্দ্রকাব্যের সামগ্রিক প্রবণতা যে এই স্বাস্থ্যের দিকে তা আমার কাছে তার একটি বিশেষ আকর্ষণ। হয়তো ব্যাপারটা নেহাৎ এরকম যে ঐ স্বাস্থ্যের দিকে যাদের নিজেদের ঝোঁক আছে রবীন্দ্রকাব্য তাদের টানে। আর যারা বিষণ্ণ প্রকৃতির মানুষ, 'আপতিক অস্তিত্বের নির্বেদ' দ্বারা উৎপীড়িত, অথবা যারা কখনও আনন্দের শৃঙ্গে কখনও বিষাদের খাদে বাস করে, তারা লেখক তথা পাঠক হিসাবে অন্য জাতের কবিতায় তৃপ্তি পায়। মডার্নিস্ট আন্দোলন নঞর্থক অনুভবদের প্রকাশকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে একটি

সাহিত্যিক শৈলী বা কেতায় পরিণত করেছে বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট হতে হলে কবিতাকে যে আবশ্যিকভাবে ঐ রীতি অনুসরণ করতে হবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

বরং দেখতে পাই যে বিশ্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তাবোধ থেকে গাঢ় সুস্বাদের আশ্চর্য সব কবিতা আর গান জন্ম নিয়েছে। মাটি-পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সংযোগকে তিনি যেমন সর্বদা মনে রাখেন, তেমনি কখনো ভোলেন না নক্ষত্রপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতকে। তাঁর কবিতায় আমরা পাই পিতৃহৃদয়ের পিতৃত্ব, মাতৃহৃদয়ের মাতৃত্ব, শিশুর শৈশব, প্রেমিকের বিরহবোধ ইত্যাদি মৌল মানবিক অনুভব ও অভিজ্ঞতার অবিস্মরণীয় প্রকাশ। মৃত্যু, অসমাপ্ত সংলাপ, স্থানকালজনিত দূরত্ব ইত্যাদি কারণে মানবিক সম্পর্কে যে-বিচ্ছেদবেদনার অনিবার্য সঞ্চার হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ত তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে। এই কবিতায় আমরা যে-গুণাবলী পাই নারী-আন্দোলন তাদের নতুন ক'রে মূল্য দিয়েছে: একটা ঈর্ষণীয় মানসিক অখণ্ডতা, হার্দ্য উত্তাপ ও করুণা, স্নিগ্ধতা ও সমবেদনা, দৃষ্টির একটা নারীত্ব, একটা জননীত্ব বা পালিকা শক্তি। এখানে যে-স্বাদ লভ্য তা আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে। আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই আমাদের উত্তরসূরিদের পাঠের পক্ষে উপযুক্ত কবি। শান্তি-আন্দোলন থেকে 'সবুজ' আন্দোলন পর্যন্ত যে-সব মৌল আন্দোলন আধুনিক পৃথিবীর সংকটগুলির সঙ্গে যুধ্যমান, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেক প্রাসঙ্গিক সূত্র এবং অনুপ্রেরণার উৎস পেতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও একাধিক এমন প্রজন্ম গ'ড়ে উঠেছে যারা নির্বেদ, অমঙ্গলবোধ এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের উত্তরাধিকারকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে আর প্রস্তুত নয়, যারা বোঝে ঐ উত্তরাধিকার কোথায় ফোঁপরা, তা কেন শেষ বিচারে নিষ্ফল। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে যদি এদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতো তা হলে তিনি বেশ কিছু নতুন শ্রোতাই লাভ করতেন, তবে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা সহজ এমন দাবি করছি না। এ-জাতীয় কাজের জন্য যে-ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশক দরকার তাঁরা চিরকালই দুর্লভ, বর্তমান সময়ে দুর্লভতর। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ও ভোগকে নিয়ে অথবা যুদ্ধের হাতিয়ার তৈরি করা আর সে-সংক্রান্ত বাণিজ্যকে নিয়ে যে-ব্যতিব্যস্ততা, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রকৃত সাংস্কৃতিক উদ্যোগ বিকাশের জায়গা পায় না।

§

প্রতিভার বহুমুখ বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ যে প্রায় অনন্য, এ ব্যাপারে তাঁর একমাত্র দোসর যে গোয়েটে, এ কথাটা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলেও শিবনারায়ণ কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের কোথাও স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা করেন নি যে রবীন্দ্র-অনুসৃত জ্যাঁরগুলিকে আলাদা-আলাদাভাবে না দেখে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকৃতির বা শিল্পকৃতির কথা যদি মনে রাখা যায়, তা হলে সেই সামগ্রিক কীর্তির জোরেই তিনি বিশ্বের সেরা লেখকদের বা শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রতিভাদের অন্যতম ব'লে বিবেচিত হতে পারেন। বরং তিনি দাবি করেছেন যে 'রেনেসাঁসের উত্তরসাধক

হিসেবে' রবীন্দ্রনাথ গোয়েটের চাইতে কম সার্থক, 'রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র গোয়েটের মানবতন্ত্রের তুলনায় অস্তিত্বনিষ্ঠার ক্ষেত্রে' দুর্বলতর, এবং তাঁর মতে 'এই মৌলিক ত্রুটি থাকার ফলে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখককে পৃথিবীর চিরকালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমপর্যায়ে ফেলা চলে কিনা সন্দেহ'। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের নাটকে এবং উপন্যাসে তিনি এই দুর্বলতার প্রকাশ দেখেছেন। তিনি এমন ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন যে 'অসামান্য সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েও' রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু লিখে যেতে পারলেন না যা সাহিত্যমূল্যে মহাভারত বা *অডিসি, ইনফার্নো* বা *কিং লীয়র, ফাউস্ট* বা তলস্তয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি*-র সমতুল্য।

শেষোক্ত ক্ষোভটির কথাই প্রথমে ভাবা যাক। ওখানে মহাভারত বাদে আর প্রত্যেকটি উদাহরণই ইয়োরোপীয়। রবীন্দ্রনাথ মহাভারত বা *অডিসি*-র মতন কিছু লিখে যেতে পার'লেন না কেন, এই ক্ষোভ কতটা প্রাসঙ্গিক? মৌখিক রীতির ঐতিহ্যে প্রোথিত ঐ জাতীয় প্রাচীন মহাকাব্য কি ঠিক কোনো একজন ব্যক্তিকবির রচনা, না স্তরে স্তরে একাধিক কবির দ্বারা একটা বিস্তৃত সময়পরিধির মধ্যে রচিত? অন্ততঃ মহাভারত সম্বন্ধে তো ঐরকম মতই প্রকাশিত হতে দেখেছি। যতদূর বুঝি, মহাভারতকে পণ্ডিতরা ঠিক আধুনিক অর্থে একখানা বই হিসাবে দেখেন না, বরং একটা গ্রন্থাগার হিসাবে দেখেন। বেদব্যাস সেখানে সংকলক, সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক। যে-জিনিস নানাজনের উদ্যমে গঠিত একটা সামূহিক প্রতিবেদন, একটা গোটা সভ্যতার দর্পণের মতো, সেটাই একজন ব্যক্তির করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে, আছে গোঁজামিল দেওয়ার আর সরলীকরণের প্রলোভন। রবীন্দ্রনাথ যে ও কাজ একা হাতে করতে যান নি, এতে তাঁর শৈল্পিক মাত্রাজ্ঞানই সূচিত হয়। কিন্তু মহাভারত, বৌদ্ধ সাহিত্য, রাজপুত বা শিখ ঐতিহ্য থেকে একেকটি গল্প নিয়ে তিনি যেভাবে একেকটি আশ্চর্য কাহিনী-কবিতা রচনা করেছেন, তা তো প্রশংসার্হই বটে।

দীর্ঘকাব্যে আগেকার দিনের কবিরা যে-সব ভূমিকা পালন করতেন সেগুলির অনেকটাই যে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের উপরে অর্সেছে এটা রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন। তবু স্বীকার্য যে উপন্যাস গদ্যের জাঁর: তা কাব্যগুণান্বিত হতে পারে, কিন্তু তার একেবারে কবিতা হয়ে ওঠার পথে বাধা আছে। তলস্তয় যেখানে মুখ্যতঃ গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সেখানে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি কবি। যিনি মূলতঃ কবি তাঁর পক্ষে *যুদ্ধ ও শান্তি*-র মতো উপন্যাস রচনা করা স্বভাবসাধ্য কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। ইয়োরোপের নাম-করা বৃহৎ উপন্যাসগুলির রচয়িতারা প্রায় সকলেই প্রধানতঃ গদ্যশিল্পী। কবিতা আর গান নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাতে হয় নি। অন্তরের তাগিদ ব'লে একটা ব্যাপার থাকে; কবিতার মেজাজ আর আঙ্গিকের প্রতি কবিদের একটা স্বতন্ত্র আনুগত্য থাকে, যা তাঁদের সব কাজকে প্রভাবিত করে। কবিরা যখন উপন্যাস লেখেন তখন তাঁদের কলম থেকে একটু অন্য ধরনের উপন্যাস বেরোয়; যাঁরা প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক তাঁদের কাজের থেকে কবিরচিত উপন্যাসের স্বাদ আলাদা হবে এটাই প্রত্যাশিত।

ইনফার্নো একান্তভাবে মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় ইয়োরোপের জাতক। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা থেকে ওরকম জিনিস কী ক'রে বেরোবে? ভারতীয় ঐতিহ্যে ট্র্যাজেডি নেই; তাই কালিদাসও *কিং লীয়র লেখেন* নি, *অভিজ্ঞানশকুন্তল লিখেছেন*। বস্তুতঃ *ফাউস্ট* প্রথম খণ্ড আর অভিজ্ঞানশকুন্তলের তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় ভারতীয় দৃষ্টি কোথায় ভিন্ন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমের শুদ্ধি সম্ভব। তাদের সন্তানটি কেবল যে বাঁচবে তাই নয়, একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও হবে। ফাউস্ট আর গ্রেট্‌খেনের কপালে সে-জাতীয় ত্রাণ নেই। গ্রেট্‌খেন সুখী জননীর মর্যাদা পায় না, নবজাত সন্তানকে হত্যা করার অপরাধে কারাগারে আবদ্ধ হয়। মৃত্যুর পরে পরলোকে তার ত্রাণ হতে পারে, মৃত্যুর আগে তা সম্ভব নয়। আর ফাউস্টকে আপাততঃ মেফিস্টোর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কালিদাস তাঁর কাহিনীর যে-সমাধান করেছেন সেটাই তো অনেক বেশী সুস্থ, সভ্য, প্রাজ্ঞ। আর সে-জাতীয় সমাধান কালিদাসের একচেটিয়া নয়, তা মহাভারতের সর্বত্র প্রাপণীয়। শকুন্তলা নিজেও একজন ঋষি আর একজন অপ্সরার আপতিক সংসর্গের সন্তান; তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার শৈশবেও একটা সমাধান লেগেছিলো— কণ্বমুনির আশ্রম; পরে তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আরেকটা আশ্রম লাগে। সত্যি বলতে কি, আপনার কন্যাটিকে যদি কখনও এ ধরনের ঝামেলার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, তা হলে আপনি তার জন্য নিদেনপক্ষে শকুন্তলার সমাধানটাই চাইবেন, গ্রেট্‌খেনের ভাগ্য চাইবেন না। তা থেকে কোনো শিল্পী ট্র্যাজেডি সৃষ্টির রসদ নাই বা পেলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, গ্রেট্‌খেনকে শিবনারায়ণ কেন 'বেশ্যার মেয়ে' ভেবেছেন, কেন লিখেছেন যে সে 'বেশ্যার মেয়ে, গরীব, অশিক্ষিত, নির্বোধ', যে তার মধ্যে 'দেবতার অংশ কিছুই নেই', তা কিন্তু বুঝলাম না। আমার কাছে মূল জার্মানে এবং পেংগুইন ক্লাসিক্‌সের ইংরেজী অনুবাদে *ফাউস্ট* আছে। যতদূর বুঝতে পারছি, গ্রেট্‌খেনের বিধবা মা নিম্ন-বুর্জোয়া, পরিশ্রম ক'রে সন্তান মানুষ করেন, ঝি-চাকর রাখেন না। জিনিসপত্র গচ্ছিত নিয়ে টাকা ধার দেবার একটা ব্যবসা তাঁর আছে; তাই পেংগুইন ক্লাসিক্‌সের ভূমিকাটিতে গ্রেট্‌খেনকে বন্ধকী-কারবারীর কন্যা ('পনব্রোকার্স ডটার') বলা হয়েছে। গ্রেট্‌খেনের বাবা তাঁর পরিবারের জন্য বেশ ভালো সম্পত্তিই রেখে গেছেন—বাড়ি আর বাগান। গ্রেট্‌খেনের ভাই সৈনিক। গ্রেট্‌খেন কোনোমতেই বস্তি বা ঝুপড়ির মেয়ে নয়। সে কেবল তার নিজের বাড়িতে মায়ের জন্য খাটে, ঘরের কাজ করে, কিন্তু অন্য কারও বাড়িতে দাসীবৃত্তি সে করে না। সে বেশ্যার মেয়েও নয়, অশিক্ষিতও নয়, নির্বোধও নয়। সে সরল, উজ্জ্বল, সুমিষ্ট, নিষ্পাপ, বুদ্ধিমতী; গির্জায় যায়, পাদ্রির ভাষণ শোনে, ধর্মের মর্ম বোঝে, নির্ঘাত বাইবেলও পড়ে। প্রেমে পড়লে প্রেমিকের কাছে আত্মসমর্পণও করে। বস্তুতঃ জুলিয়েট বা ডেস্‌ডেমোনা বা শকুন্তলার মতো গ্রেট্‌খেনও একজন 'মুগ্ধা' নায়িকা। তাদের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য নেই। মেফিস্টো যখন গ্রেট্‌খেনের কাপড়ের তোরঙ্গে অলংকারের পেটিকা রেখে যায়, তখন সরলস্বভাবা গ্রেট্‌খেন মনে করে যে সেটা তার মায়ের বন্ধকী কারবারের সঙ্গেই জড়িত, যে-কোনো সাধারণ মেয়ের মতো অলংকারগুলি দ্বারা আকৃষ্টও বোধ করে।

কিন্তু তার ধর্মভীরু মা তাকে গয়নাগুলি রাখতে দেন না, সেগুলিকে পাদ্রির হাতে সমর্পণ করেন। কারাগারে ব'সে গ্রেট্‌খেনের যে-গান, যার আরম্ভে আছে 'আমার বেশ্যা মা' ইত্যাদি, তা তো তার বিকলমস্তিষ্ক অবস্থার জাতক, মাথা খারাপ হয়ে যাবার পর ওফেলিয়ার গানের সঙ্গে তুলনীয়। হয়তো গোয়েটে এখানে শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোনো নায়িকা অবশ্য উন্মাদ অবস্থাতেও 'আমার বেশ্যা মা' ব'লে গান আরম্ভ করে নি, কিন্তু তাঁর নায়িকা শ্যামা মূলতঃ প্রাচীন ভারতের অভিজাত বারাঙ্গনা, এবং 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় সত্যকাম নামে ছেলেটিকে তার মা জবালা জানায়: 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে/ বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,/ জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,/ গোত্র তব নাহি জানি তাত'; এবং সত্যকামও ঋষি গৌতমের কাছে ফিরে গিয়ে তার জন্ম সম্বন্ধে সত্য কথাটাই পেশ করে। বেশ মনে আছে, খুব অল্প বয়সে কবিতাটি যখন প্রথম পড়ি, 'বহুপরিচর্যা' শব্দটার মানে বুঝি নি, ভেবেছিলাম ওটার অর্থ বোধ হয় 'বহু (অনেক) পরিচর্যা, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে দাসীবৃত্তি', কিন্তু বিস্তর ঝি-গিরি করার ফলে কেউ কী ক'রে পেটে ছেলে পায় তা বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম।

গ্রেট্‌খেনের কথায় ফিরে আসি। তার মধ্যে দেবতার অংশ না থাকুক, *ফাউস্ট* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তিতে সে যে কেবল পরিশোধিত এবং ত্রাত তাই নয়, সে তার প্রাক্তন প্রেমিক ফাউস্টের ত্রাণের সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, মাতা মেরির সঙ্গে সেই 'শাশ্বত নারীত্ব'-এর অন্তর্গত, যার পরিচালনায় মানুষদের মোক্ষ সম্ভব হয়। লক্ষণীয় যে *ফাউস্ট* প্রথম খণ্ডের সমাধানকে নিয়ে গোয়েটে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে যে-সমাধান রচনা করেছেন তা মিথ-আশ্রিত, ধর্মীয়, ঠিক সেই 'ভাববাদী' সমন্বয় যা শিবনারায়ণ পছন্দ করেন না। সমালোচকরা যদিও মনে করেন যে সাহিত্য হিসাবে প্রথম খণ্ডই দ্বিতীয় খণ্ডের চেয়ে বেশী ভালো, মানবিক উপাদানে বেশী সমৃদ্ধ, তবু মনে রাখা কার্যকর যে দান্তের *দিভিনা কমেদিয়া*-য় যেমন ইন্‌ফার্নোই শেষ কথা নয়, নরক থেকে প্রেতলোক হয়ে স্বর্গলোকে উত্তরণই প্রকৃত উদ্দেশ্য, তেমনি গোয়েটে চেয়েছিলেন যে তাঁর প্রথম জীবনের ট্র্যাজিক দৃষ্টি আর শেষ জীবনের পরিণততর সমন্বয়কামী দৃষ্টিকে যেন মিলিয়ে দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শেষ জীবনেও আস্তিক্যচিহ্নিত ব'লে শিবনারায়ণের যে-ক্ষোভ, তার পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন যে *ফাউস্ট* দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি এতটাই খৃষ্টীয় ভাবলোকের অভ্যন্তরস্থ যে তার সর্বশেষ দৃশ্যটি অবলম্বনে সংগীতস্রষ্টা গুস্তাভ্ মালার (Gustav Mahler, ১৮৬০-১৯১১) রচনা করেন তাঁর স্মরণীয় অষ্টম সিম্ফনি, যেটিতে ঐ সর্বশেষ দৃশ্যের কথাগুলি গীতবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত এবং যেটি কিনা ইয়োরোপীয় ধর্মীয় সংগীতের একটি তুঙ্গ শিখরবিশেষ। এই সেদিন সেটি ইংল্যাণ্ডের সল্‌স্‌বেরি ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তরে গীত-বাদিত হলো; টেলিভিশনে তার সম্প্রচার দেখলাম-শুনলাম। সেজন্য কথাটা বিশেষ ক'রেই মনে পড়ছে।

আমি ইয়োরোপীয় ক্লাসিকগুলির মর্যাদা অবশ্যই মানি, কিন্তু একেকটি ইয়োরোপীয় ক্লাসিক উপস্থিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ কেন ওরকম কিছু লেখেন নি এই ক্ষোভ

আমার কাছে প্রাসঙ্গিক ব'লে মনে হয় না। প্রত্যেক স্রষ্টাই একটা পরিবেশের জাতক, যে-যার পরিবেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতার মধ্যে কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই *ফাউস্ট* লিখতেন না, কারণ ফাউস্টের গল্পটা বিশেষভাবেই ইয়োরোপীয় সভ্যতার মিথ, ফাউস্টের ট্র্যাজেডি ইয়োরোপীয় মানুষের অস্তিত্বের ট্র্যাজেডি, যা বর্তমান শতাব্দীতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। শিবনারায়ণ তাঁর প্রবন্ধে যা বলছেন তার সার কার্যতঃ দাঁড়াচ্ছে এই যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অন্তর্গত না হলে প্রথম সারির স্বষ্টি সম্ভব নয়; তাঁর উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি দেখে মনে হয় যে তাঁর বিচারে এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম মহাভারত। তা ছাড়া সাহিত্যের বিচার করতে ব'সে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসকে তিনি যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন আমি ততটা গুরুত্ব দিতে রাজি নই। তা হলে তো ইয়োরোপের নিজস্ব 'ক্লাসিকাল' (গ্রীক-লাতিন) ঐতিহ্যেরও মূল্যাবনমন করা হয়। অপিচ স্মরণীয় যে অনেকের মতে ইয়োরোপীয় হৃদয়বৃত্তির প্রথম সুসংস্কৃত আধুনিকীকৃত রূপ হচ্ছে ফরাসী ত্রুবাত্বরদের কবিতা, যা প্রাক্-রেনেসাঁস। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের উত্তরসাধক হিসাবে অথবা ইয়োরোপীয় মানবতন্ত্রের অনুসারী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কতটা সার্থক, কতটা ব্যর্থ, গোয়েটের সমকক্ষ, না তাঁর থেকে হীনপ্রভ, এ ধরনের বিচার আমার মতে খুব বেশী অর্থবহ নয়। সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গের তথা ভারতের নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে; তা ছাড়া কোনো শিল্পী কোনো আন্দোলনের, মতবাদের বা তন্ত্রের সাধনাতে কতটা সফল বা বিফল হলেন সেটা একটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন: তার সঙ্গে তাঁর স্বষ্টির শিল্পমূল্যের বিচারকে জুতে দেওয়া ঠিক কি? সেই সাধনা যত প্রগতিশীল ব্যাপারই হোক না কেন, শিল্পীর স্বষ্টিকে যত অনুপ্রাণিতই করুক না কেন, তাকে যত বলিষ্ঠ বা চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলুক না কেন, স্বষ্টির শিল্পমূল্যটা কিন্তু অন্তিম বিচারে সেই সাধনাসাফল্যের উপরেই নির্ভর করে না। শিবনারায়ণ দুটোর মধ্যে যে-কার্যকারণসম্পর্ক খুঁজছেন তা আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না। ঐটে মানলে এমন তর্কও উঠবে যে রবীন্দ্রনাথ খৃষ্টান নন ব'লেই বা বামপন্থায় দুর্বল ব'লেই তাঁর শিল্পস্বষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস এবং ইয়োরোপীয় মানবতন্ত্রের প্রতি শিবনারায়ণের দৃষ্টি একাগ্রভাবে নিবদ্ধ থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং নাটকের প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি। তাঁর মতে উপন্যাস হিসাবে *গোরা*-কে 'খুব উঁচুতে স্থান দেওয়া কঠিন' এবং *ঘরে-বাইরে* একটি 'দীর্ঘ রূপক-কাহিনী'র বেশী কিছু নয়। আমি কিন্তু মনে করি যে *গোরা* আর *ঘরে-বাইরে* দুটোই যথেষ্ট উঁচু দরের উপন্যাস। গোরা এবং নিখিলেশ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: 'গোরা-চরিত্র লেখকের কল্পনায় একটি ভাবরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছে, পুরো মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে নি', 'গোরার বক্তব্য আমাদের ভাবায় বটে, কিন্তু গোরার মনুষ্যত্ব কচিৎ স্পর্শ করে', 'গোরার মত নিখিলেশও প্রায় একটি জ্যামিতিক কল্পনা; তাকে জীবন্ত ব্যক্তি-মানুষ ভাবা অসম্ভব'। আমি এখানে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি না। গোরা আর নিখিলেশ আমার কাছে খুবই জীবন্ত ব্যক্তি-মানুষ; আমি এরকম মানুষ দেখেছি। এমন কি গোরার মধ্যে যে আইরিশ রক্তের উত্তরাধিকার আছে সেটা পর্যন্ত তার

চরিত্রের ঝোঁকগুলিতে ফুটে উঠেছে। তর্ক করা যেতে পারে যে সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্রদের মধ্যে প্রায়ই কিছুটা 'জীবন্ত ব্যক্তি-মানুষ' আর কিছুটা 'ভাবরূপ' মেশানো থাকে। বস্তুতঃ ফাউস্টও তাই— জীবনের অবেক্ষণে আর কল্পনার অভিক্ষেপে মেশানো একটি চরিত্র ; ফাউস্টের গল্পটার মধ্যেও বাস্তবতা আর রূপক-কাহিনীর টানাপড়েন আছে। আমি ফাউস্ট-চরিত্রের উল্লেখযোগ্যতা অস্বীকার করি না, তবে গোরা আর নিখিলেশের জন্যও মর্যাদা দাবি করি। *চতুরঙ্গ*-এর চরিত্রদের সম্বন্ধে শিবনারায়ণ বলেন : 'পাউণ্ডের ভাষায় তারা পার্সন্ নয়, পার্সোনা ; মানুষ নয়, মুখোশ।' পার্সোনা বা মুখোশে যদি এত প্রবল আপত্তি থাকে, তা হলে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির বেলায় কী করা হবে? ঈস্কিলুসের বিদগ্ধতম অভিনয়ে দেখেছি যে মুখোশের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে চরিত্রদের 'ভাবরূপ' ফুটিয়ে তোলাই অভিনেতাদের উদ্দেশ্য। পার্সন নয়, পার্সোনাই সেখানে প্রধান। পার্সন আর পার্সোনার লুকোচুরি অনেক নাটকেই থাকে: সেখানে চরিত্ররা কিছুটা পার্সন, কিছুটা পার্সোনা। শেক্সপীয়রেও এই খেলা আছে। আর একেবারে হাল আমলে আমরা যে-ফ্যান্টাসিভিত্তিক কথাসাহিত্যের উদ্ভব দেখতে পাচ্ছি সেখানে তো পার্সোনা রীতিমতো প্রশ্রয় পাচ্ছে। সাল্‌মান রুশ্‌দির সব কাহিনীই তো 'রূপক-কাহিনী', তাঁর সব চরিত্রই 'পার্সন নয়, পার্সোনা'। বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যে আমি পার্সোনার প্রচুর প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই : পার্সন আর পার্সোনার লীলাখেলা একটা মূল্যবান নাটকীয় আঙ্গিক। উপন্যাসেও এই আঙ্গিকের কম-বেশী ব্যবহার সম্ভব। এখানে রুশ্‌দির বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে তিনি পার্সন আর পার্সোনার খেলাকে ব্যবহার না ক'রে কেবলই পার্সোনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, পার্সনকে প্রায় বর্জন করেছেন।

শিবনারায়ণের মতে *যোগাযোগ* উপন্যাসটি তার সমাপ্তিগত ত্রুটি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের 'সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা'। কেন? না, সেখানে 'জীবনের একটি নিষ্ঠুরতম সত্যকে উদঘাটন করার চেষ্টা আছে, 'সমাধানহীন সমস্যার যন্ত্রণা' আছে। এই বিচার রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে আমাদের যতটা সাহায্য করে তার চেয়ে বেশী সাহায্য করে শিবনারায়ণকে বুঝতে। মনে হয় আর্টে সমাধানহীন আর্তির প্রকাশকেই তিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন ; তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও বোদলেয়র-র‍্যাঁবোর ধরনের যন্ত্রণাবোধের অভাব তাঁকে অতৃপ্ত রাখে ; তাই রবীন্দ্রনাথের ছবির আঁধার মেজাজ তাঁর এত প্রিয়— যে-বিষয়ে তিনি অন্যত্র লিখেছেন। পঞ্চাশের দশকের পশ্চিমবঙ্গের আরও কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তির মতো তিনিও সেই আঁধারের অভিসারী, যা কিনা 'আলোর অধিক'।

হয়তো আর্তির প্রকাশের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতের ফলে শিবনারায়ণ সেই ধরনের শিল্পবস্তুর রস কম উপভোগ করেন, যার মেজাজ অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা, যা কৌতুকপ্রধান, বা যেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টিই প্রধান লক্ষ্য। হয়তো তাই রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যগুলিকে তিনি পাত্তা দেন নি, *শেষের কবিতা*-কে অনর্থক ঠুকেছেন। জীবন সম্বন্ধে কোনো ভারিক্কি জ্ঞান আহরণের জন্য তো আমরা *শেষের কবিতা*-র কাছে যাই না।

ম্যাক্স বীয়রবোমের *জুলেইকা ডব্‌সন*-এর মতো *শেষের কবিতা* একটি শৈল্পিক লীলাখেলা, ফরাসীতে যাকে বলে 'জ্যু দেস্প্রি' (jeu d'esprit), এবং সেটাই তার আকর্ষণ।

এখানে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে আমার একটি প্রাসঙ্গিক চিন্তা পেশ করি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা কেন যে আরও পূর্ণভাবে বিকশিত হলো না তার ব্যাখ্যা কেবলই রেনেসাঁসী বা মানবতান্ত্রিক সাধনায় তাঁর আপেক্ষিক দুর্বলতার মধ্যে নিহিত নয়। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের নাট্যকল্পনার একটা বৃহদংশ ছিলো কাব্যসংগীতনৃত্যধর্মী। এইরকম কল্পনা থেকে যে-জ্যঁারের শিল্প জন্ম নেয় তার ঝোঁকটা পড়ে সৌন্দর্যসৃষ্টির উপরে। এই জাতের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য একটা বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ লাগে,— নৃত্য-সংগীত-কাব্যকলার মঞ্চোপযোগী প্রকাশ যেখানে উৎকর্ষ লাভ করেছে। এ কাজ কেবল একজন-দুজনের চেষ্টায় হয় না, একটা গোষ্ঠীর সমবেত উদ্যম লাগে। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিল্পীরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত ভাগ্যবান: রাজদরবার এবং অভিজাত শ্রেণীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে ঐ ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করেছে, যার ফলে এ-জাতীয় শিল্পকলার দুই বিরাট শাখা অপেরা আর ব্যালে অতুলনীয় বৈভবের অধিকারী হতে পেরেছে। অপেরা আর ব্যালের সঙ্গে যাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির একটা বিরাট সৌন্দর্যাক্রান্ত এলাকাই তাঁদের অজানা, সুন্দরের সাম্রাজ্য যেখানে অপ্রতিহত। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি ঐরকম কোনো ঐতিহ্যের ভিতরে কাজ করতে পারতেন, তা হলে তাঁর নাট্যপ্রতিভা তার স্বাভাবিক স্বকীয় গতিপথ খুঁজে পেয়ে ঈর্ষণীয় ঈশিত্ব লাভ করতো। কিন্তু বাঙালীদের সংস্কৃতির ভিতরে সেই বিকাশের সুযোগ ছিলো না, এখনও নেই। এটা একটা কৌতূহলজনক ঘটনা যে ভারতীয় নৃত্যকলা অভিনয়ের উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও একমাত্র কেরলের কথাকলিতেই তা পূর্ণাঙ্গ থিয়েটার আর্টের রূপ লাভ করেছে। অন্য শৈলীগুলিতে, যেমন কথকনাচে বা ভরতনাট্যমে, ঝোঁকটা পড়ে একক শিল্পীর কাজের উপরে। একজনের কাজের দ্বারা যে-নাটকীয়তা সৃষ্টি করা যায় তা কিছু দূর যেতে পারে, কিন্তু তার পর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য। তা ছাড়া এই নৃত্যশৈলীগুলি সচরাচর তাদের প্রাচীন বিষয়বস্তুগুলির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। ভরতনাট্যমের মতো 'সোলো' (solo) কাজের কলাকে অনেক শিল্পীর দ্বারা অভিনীত নৃত্যকলায় পরিণত করার চেষ্টা করলে তার পক্ষে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তাও জানি না। এটুকু জানি যে বর্তমান শতাব্দীতে কয়েকজন প্রতিভাধর শিল্পী নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, এখনও করছেন। তাঁদের পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান, তবু মোটের উপর এখনও এ কথা সত্য যে ব্যালের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন পূর্ণাবয়ব নৃত্যভিত্তিক নাট্যশিল্পের ঐতিহ্য ভারতে এখনও গ'ড়ে ওঠে নি। গীতভিত্তিক নাট্যশিল্পের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগীতাভিনয়ের তাগিদটা ভারতে চালিত হয়েছে জনপ্রিয় সিনেমার নদীপ্রবাহে। আমি স্নব নই; সেই নদীপ্রবাহ থেকেও যে কিছু কিছু স্মরণীয় কাজ বেরিয়েছে তা আমি অস্বীকার করি না; তবু স্বীকার্য যে অপেরা আর ব্যালে সৌন্দর্যসৃষ্টির যে-স্তরে আরোহণ করে সেটা ঠিক জনগণপ্রিয় সিনেমার চারণক্ষেত্র নয়।

অথচ নৃত্যগীতাভিনয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিলো তা এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইয়োরোপের এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাসঙ্গিক জ্যঁারগুলি যে তাঁর মনে দাগ কাটে, তাঁকে প্রেরণা দেয়, এ কথাও আমরা জানি। একা হাতে ছোট দল গঠন ক'রে তিনি নিজে যা ক'রে গেছেন তা বিস্ময়কর। শিবনারায়ণও বলছেন যে *চণ্ডালিকা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা* এই তিনটি নাটক হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা'। আমার মতে *তাসের দেশ, শাপমোচন*, কবির অল্প বয়সের *বাল্মীকিপ্রতিভা*-ও তারিফ করবার মতো সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের এত চেষ্টা সত্ত্বেও এই জ্যঁারগুলি যেন তাঁর একার সৃষ্টিই রয়ে গেলো, আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারলো না, উত্তরসূরিদের হাতে বিবর্তিত হবার সুযোগ পেলো না।

শিবনারায়ণ আপত্তি করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য অথবা তত্ত্বনাট্য— সব ক্ষেত্রেই চরিত্রসৃষ্টি নিতান্ত অপ্রধান রয়ে গেছে। এসব রচনায় রস অথবা ব্যঞ্জনার অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে জীবন্ত মানুষের। এরা আমাদের আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু "কাথারসিস" ঘটায় না।' যে-তিনটি নৃত্যনাট্যকে তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক ব'লে মনে করেন সে-তিনটিতে তিনি 'জীবন্ত চরিত্রের কিছুটা আভাস' পান, কিন্তু এগুলির ক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথ আভাসের বেশী এগোন নি, 'মূল ভাবটিকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের জটিলতাকে সরল করে এনেছেন'।

কিন্তু শিবনারায়ণ যে-ধাঁচের জটিল বাস্তবধর্মী চরিত্রদের কথা ভাবছেন সেই ধরনের চরিত্রদের সৃষ্টি করা নৃত্যগীতধর্মী নাট্যকলার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, রসসৃষ্টিই তার প্রধান উদ্দেশ্য। অপেরা আর ব্যালের ক্ষেত্রেও এই কথাই সত্য। বাস্তবধর্মী নাট্যকলার স্বাদের থেকে এই জ্যঁারগুলির স্বাদ যথেষ্ট আলাদা। কিন্তু স্বাদটা ভিন্ন হলেও শিল্পকলা হিসাবে এরা প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। অপেরা আর ব্যালেকে ন্যায্য কারণেই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির স্তম্ভ মনে করা হয়।

এই জ্যঁার-দুটির সঙ্গে যাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে তাঁরা যদি *রক্তকরবী* মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তা হলে দেখবেন যে এই নাটকটি প্রকৃতপক্ষে অপেরা অথবা ব্যালের উপাদানে গঠিত। *রক্তকরবী*-র রাজা-চরিত্র অপেরায় বা নন্দিনী-চরিত্র ব্যালেতে আশ্চর্য স্ফূর্তি লাভ করতে পারতো। বেশ কল্পনা করতে পারি, বিশালকায় লুচিয়ানো পাভারত্তি রাজা সেজে গলা ছেড়ে গাইছেন, তন্বী নাতালিয়া মাকারোভা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে নন্দিনীরূপে নাচছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামনে কার্যতঃ সেরকম কোনো ক্ষেত্র ছিলো না; তিনি তাঁর অন্তরের তাগিদকে সাহিত্যগন্ধী নাটকের মাধ্যমেই প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। যে-শিল্পীর নাট্যকল্পনায় নৃত্যগীতের দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক আছে তাঁকে যদি কেবল সংলাপনির্ভর নাটকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে হয়, তা হলে উপযুক্ত আঙ্গিকের অভাবে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ব্যাহত হতেই পারে। *রক্তকরবী*-কে 'ফ্রাস্ট্রেটেড অপেরা' বা 'ফ্রাস্ট্রেটেড ব্যালে' হিসাবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের সমস্যাটা বোঝা যায়। তবু বলবো যে

নাটকও অনেকরকমেরই হতে পারে। এই সেদিন আমার ছোট পুত্রের বন্ধু একটি তরুণের মুখে শুনলাম যে বেকেটের নাকি একটি 'নাটক' আছে যার শরীর হচ্ছে একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাস,— ব্যস্, আর কিছু নয়। একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাসেই নাকি সেই 'নাটক' সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত। আমি অবশ্য সেটি দেখি নি, তবে ন্যূনতম সংলাপে' গঠিত বেকেটরচিত 'মিনিমালিস্ট' আঙ্গিকের দু'-একটি নাটক টেলিভিশনে দেখেছি। সেগুলিও যখন বিদগ্ধ ব্যক্তিদের হাততালি পায়, তখন একটা বিশেষ শৈলীর নাটক হিসাবে *ডাকঘর* অথবা *রক্তকরবী-ই* বা প্রশংসা পাবে না কেন। এগুলিও নিজস্ব পথে উৎকর্ষ লাভ করেছে; এদেরও একটা নিজস্ব আবেদন আছে।

বস্তুতঃ শিবনারায়ণের প্রিয় *ফাউস্ট*-ও পুরোপুরি সাহিত্যিক নাটক নয়,— দ্বিতীয় খণ্ড তো নয়ই, প্রথম খণ্ডও নয়। কোনো কোনো সমালোচকের মতে *ফাউস্ট*-কে নাটক ('ড্রামা') না ব'লে দীর্ঘ নাট্যকবিতা ('লং ড্রামাটিক .পোয়েম') বলাই সঙ্গত। উভয় খণ্ডেই প্রচুর অপেরাটিক উপাদান আছে। *ফাউস্ট* অবলম্বনে অপেরা লেখাও হয়েছে। জার্মানভাষীদের বাইরে অধিকাংশ ইয়োরোপীয়ই ফাউস্টের গল্পটা গোয়েটের রচনার মাধ্যমে জানেন না, জানেন গুনো-র (Gounod) অপেরার মাধ্যমে। শেক্সপীয়রের *ওথেলো*-র কাহিনী অবলম্বনে ভের্দি *ওতেলো*-র মতো অসামান্য অপেরা সৃষ্টি করেছেন; *রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট*-এর কাহিনী অবলম্বনে প্রকফিয়েভের ব্যালেটি জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির কোনো তুলনীয় ক্ষেত্র না থাকায় *রক্তকরবী*-কে ভেঙে সাজাতে কেউ এগিয়ে আসেন নি।

§

শিবনারায়ণের প্রবন্ধটিতে তাঁর সামগ্রিক প্রতিন্যাসের যে-ছবি ফুটে ওঠে তার মধ্যে অসমসত্ত্ব উপাদানদের একটা কৌতূহলজনক সহাবস্থান দৃশ্যমান। একদিকে মৌল বিরোধ, সমাধানহীন সমস্যার যন্ত্রণাবোধ এবং প্রতিকারহীন ট্র্যাজেডি তাঁকে স্পষ্টতঃ টানে। মনে হয় যে অন্য কতগুলি জিনিস, যেমন আনন্দবোধ, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ, স্নিগ্ধতা, করুণা, শান্ত সৌন্দর্য, বিরোধের সমন্বয়, বা কৌতুক তাঁকে অপেক্ষাকৃত কম টানে। এগুলিকে তিনি যদি আরও মূল্য দিতেন, তা হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখে আরও বড় হতে পারতেন। মনে হয় আনন্দের প্রকাশও শিবনারায়ণকে তখনই বেশী টানে যখন তা 'আর্ত আনন্দ'। তাঁর ক্ষোভ: 'গোয়েটের নায়ক যে আর্ত আনন্দের সম্ভোক্তা ... রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পাত্রপাত্রীই সে বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।' 'উদ্দাম আনন্দ আর অসহ্য যন্ত্রণা'র মিশ্রণের প্রতি তাঁর স্বভাবের যে একটা পক্ষপাতিত্ব আছে তা বেশ বোঝা যায়। অন্যদিকে রেনেসাঁসী মানবতান্ত্রিক সাধনার প্রতি তাঁর একটা প্রবল তাত্ত্বিক আনুগত্য এই প্রবন্ধটিতে তো বটেই, তাঁর প্রায় সব প্রবন্ধেই দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত। আমার কিন্তু মনে হয় যে এই দুটো দিকের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ বর্তমান। শিবনারায়ণের মধ্যেও দুটো

মেজাজ কিঞ্চিৎ অস্বস্তির সঙ্গে সহাবস্থিত। তাকে ঠিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলা যায় না ; তা বরং বিস্ফোরক।

ইয়োরোপীয় ট্র্যাজিক চেতনার আদি উৎস নিহিত প্রাচীন গ্রীকদের একটা বিশিষ্ট জীবনবোধের মধ্যে, যেখানে মানুষ নিষ্ঠুর নিয়তির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের অধীন, দেবতাদের সুত্রাধীন অসহায় নাচিয়ে পুতুল। খৃষ্টীয় আবহে এই জীবনবোধের খানিকটা পরিবর্তন হয় : খৃষ্টীয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে, তাঁর অপার করুণাকে স্বীকার ক'রে, কুমারী মাতা এবং তাঁর পুত্রের সহায়তা গ্রহণ ক'রে মানুষ তার অস্তিত্বের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে পারে। গোয়েটের ফাউস্ট-কল্পনা এই খৃষ্টীয় কাঠামোর ভিতরেই। সব কিছুকে জানতে হবে, সব সম্ভোগের শিখর আর যন্ত্রণার গহ্বরকে ছুঁতে হবে— তার স্বভাবের এই বৈশ্বিক তাড়নার ফলে ফাউস্ট শয়তানের সঙ্গে চুক্তি ক'রে বসে, তার হাতের পুতুল হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর নায়ককে শয়তানের হাতে সঁপে দিয়ে গোয়েটে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে পারেন নি। তাঁর অন্তরের তাগিদ তাঁকে তাড়না করেছে *ফাউস্ট* দ্বিতীয় খণ্ডের মাধ্যমে তাঁর নায়কের ত্রাণের ব্যবস্থা করতে। শয়তান চিরকাল ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকবে, উভয়ের বিরোধ কখনো মিটবে না, এই ধারণাটা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত সম্ভবতঃ পারসিক চিন্তার প্রভাবে ব্যাপ্ত স্বীকৃতি পেয়ে থাকলেও তা অবশেষে 'ম্যানিকীয় হেরেসি'-রূপে (Manichean heresy) পরিত্যক্ত হয় এবং খৃষ্টীয় চিন্তার প্রধান ধারা থেকে বর্জিত হয়। কিন্তু চার্চের শিক্ষা থেকে তা বহিষ্কৃত হলেও ইয়োরোপীয় মানসে তার একটা অনুরণন থেকে যায়। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ট্র্যাজিক নায়কদের মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়। ইয়োরোপের মডার্নিস্ট আন্দোলনের মধ্যেও ঐ দ্বিত্ব-চেতনার পুনর্জাগরণ দেখতে পাই।

আমার মনে হয় শিবনারায়ণ তাঁর আপন স্বভাবের প্রভাবে এই দ্বিত্ব-চেতনা দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত ও আবিষ্ট। অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যগুলির পিছনে যে-অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়, তাকে আজকের দিনের সমালোচনার ভাষায় বলা চলে একটি ম্যানিকীয় 'সাবটেক্সট্'।

> বিরোধকে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] প্রায়শই বাইরের ব্যাপার বলে দেখিয়েছেন; অস্তিত্বের গভীরতম স্তর থেকে যে বিরোধের উদ্ভব, তার সঙ্গে সম্ভবত তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল না। অথবা হয়ত পরিচয় ছিল, কিন্তু চেতনার স্তরে তাকে স্বীকার করার সাহস এবং সামর্থ্য ছিল না। ভালো এবং মন্দের পার্থক্য তাই তাঁর অনেক রচনায় অতিমাত্রায় স্পষ্ট, কিন্তু অস্তিত্বের সমগ্র রূপের মধ্যে ভালো আর মন্দ যে কি অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সেটি তাঁর লেখায় বিশেষ ধরা পড়ল না। নিখিলেশ, বিপ্রদাস, অতীন নিছক ভালো ; আর সন্দীপ, মধুসূদন, বটু নিখাদ মন্দ। এ বিশুদ্ধতা নীতিশাস্ত্রে হয়ত চলতে পারে, কিন্তু জীবনে এবং সে কারণে সাহিত্যে এ কল্পনা নিতান্তই খণ্ডসত্য। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট বা

> ওথেলো যে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো পাত্র-পাত্রীর চাইতে প্রাণবন্ত তার কারণ স্রষ্টা এদের ক্ষেত্রে মানুষের আদর্শ গুণাবলীকে রিরংসা, ক্ষমতাস্পৃহা, সন্দিগ্ধতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আদিম বৃত্তি থেকে ছাঁকাই করে আলাদা পরিবেশন করেন নি।
>
> গোয়েটের ফাউস্ট প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করছে। লালসা এবং মমতা, সত্যানুসন্ধান এবং সম্ভোগাসক্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং আতঙ্ক তার চরিত্রে নিয়ত যুধ্যমান। আত্মবিরোধের হাত থেকে সে পালাতে চায় নি, তার মধ্য দিয়ে সে মুক্তির সাধনা করেছে। ফাউস্ট এবং মেফিস্টোর সম্পর্ক তাই শাদার সঙ্গে কালোর সম্পর্ক নয়; তারা একই সঙ্গে পরস্পরের বিরোধী এবং পরস্পরের আত্মীয়। মেফিস্টো যদি ফাউস্টের অস্তিত্বের মূলে না বাসা বাঁধত, তবে ফাউস্টের পক্ষে মুক্তির জন্যে সাধনা করাই সম্ভব হত না। নিখিলেশদের অন্তরে কোনো যথার্থ বিরোধ নেই; তাদের বিরোধ বাইরের সঙ্গে। তাই তাদের মধ্যে না আছে ট্র্যাজেডির স্বাদ, না মুক্তির। গোয়েটের নায়ক যে আর্ত আনন্দের সম্ভোক্তা ... রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পাত্রপাত্রীই সে বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আবারও :

> ... অস্তিত্বের মূলে যে সংঘাত, ভালোমন্দের যে দুঃসমাধেয় সমস্যা, গোয়েটে তাকে আদর্শ বা নীতির নামে সরল বা সহনীয় করার চেষ্টা করেন নি। ... তিনি জানেন যে মেফিস্টোফেলিস ফাউস্টকে বাইরে থেকে প্রলুব্ধ করে নি, ফাউস্টের সমগ্র অস্তিত্ব থেকেই তার উদ্ভব। ভালোমন্দর বিরোধ অস্তিত্বের মূলে; সে বিরোধের যন্ত্রণা যে জানে না, অস্তিত্বের উচ্চতম শিখরও তার অনায়ত্ত।

কিন্তু এটাও কি অস্তিত্বকে দেখবার একটা চশমামাত্রই নয়? শিবনারায়ণ বলতে চাইছেন যে এটাই অস্তিত্ব, অস্তিত্ব এরকমই, অন্য কিছু ভাবা নিছক 'ভাববাদ'। কিন্তু তাঁর নিজের বক্তব্যের টেক্সট্ তথা সাবটেক্সট্ও একধরনের ইডিওলজি, একরকমের 'ভাববাদ', সুপার-স্ট্রাক্চার বা উপরি-কাঠামো। অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যেমনটা ভাবি, ক্রমে ক্রমে আমাদের অস্তিত্বও সেরকম হয়ে ওঠে।

'ভালোমন্দর বিরোধ অস্তিত্বের মূলে': এই আইডিয়াটার প্রতি শিবনারায়ণের প্রবল আকর্ষণ তাঁর রবীন্দ্রনাথকে বোঝার পথে বৃহৎ অন্তরায়। ম্যানিকীয় পথের সহপথিক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বোঝা হয়তো তাঁর পক্ষে সহজতর, কিন্তু *ঘরে-বাইরে*-র সূক্ষ্ম ট্র্যাজেডি এবং নিখিলেশ-চরিত্রের মহত্ত্ব তাঁকে এড়িয়ে যায়। নিখিলেশের ব্যথাটা যে কোথায়, তা তিনি বুঝতে চান না। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষার টানও তিনি পুরোপুরি এড়াতে

পারেন না ; তখন শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যকে স্বীকার করেন, কিন্তু ভাবনাগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি ব্যাপারের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি: অন্ততঃ শেক্সপীয়রে এবং *ফাউস্ট*-এ ভালোমন্দর ম্যানিকীয় দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত প্রকাশ কিন্তু নায়কদের মধ্যেই দৃশ্যমান, নায়িকাদের মধ্যে নয়। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিতে একমাত্র লেডি ম্যাকবেথের মধ্যে এর কিছুটা প্রকাশ পাওয়া যায় ; গনেরিল আর রিগানের মধ্যে বড় একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই,— তারা দ্রুত গতিতেই শয়তানের দিকে চ'লে যায়। গার্টুড এত দুর্বল যে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ফোটে না, সে বেচারী কেবল বিবেকের দ্বারা দষ্ট হয়। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক নায়কদের মধ্যে যতরকমের স্থূলতাই থাক, উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলি বাদে তাঁর নায়িকারা তার অবলেপ থেকে মুক্ত। জুলিয়েট, ওফেলিয়া, ডেস্‌ডেমোনা, কর্ডেলিয়া— প্রত্যেকেই অমলিন, প্রেমময়ী, 'পজিটিভ', মাতা মেরির অংশ, শাশ্বত নারীত্বের অন্তর্গত। বস্তুতঃ শেক্সপীয়রের কমিক নাট্যের কৌতুকময়ীদের আর এদের পাশাপাশি রাখলে দেখা যাবে যে এই-সব মেয়েদের মধ্যে কোনো মৌল পার্থক্য নেই, এরা সকলেই 'ভালো'। কেবল ভাগ্যের খেলার দরুন কারও কারও কপালে ট্র্যাজেডি জুটে যায়। জুলিয়েটের মৃত্যুটা তো একেবারেই আপতিক, ঘটনাভিত্তিক, দুটো পরিবারের কলহজাত নিয়তির জাতক,— খানিকটা গ্রীক ধাঁচে। আর ওফেলিয়া, ডেস্‌ডেমোনা, কর্ডেলিয়া— এদের দুঃখের মূলে এদের জীবনের পুরুষদের— যথাক্রমে প্রেমিকের, স্বামীর এবং পিতার— চরিত্র সক্রিয়। শেষ পর্বের নাটকগুলির অন্যতম *দ্য উইন্টার্স টেইল*-এ হার্মায়নি তার স্বামী লেওন্টেসের সন্দেহগ্রস্ত মনের জন্য বিশেষ দুঃখ ভোগ করে ; তার জন্য লেওন্টেসের সুদীর্ঘ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়। লক্ষণীয় যে শেক্সপীয়রও তাঁর ট্র্যাজেডিগুলির বক্তব্যে পৌঁছে থেমে থাকেন নি, সর্বশেষ পর্যায়ে অন্য এক ধরনের কথা বলতে চেয়েছেন, সমস্যাদের সমাধান খুঁজেছেন, সমন্বয় খুঁজেছেন। সে যাই হোক, বলতে চাইছি যে জুলিয়েট-ওফেলিয়া-ডেস্‌ডেমোনা-হার্মায়নি এদের মধ্যে কোনোরকমের নঞর্থকতা নেই। এদের মধ্যে 'ক্ষমতাস্পৃহা', 'সন্দিগ্ধতা', বা 'নিষ্ঠুরতা' কোথায়? 'রিরংসা' অবশ্য অন্য ব্যাপার: রমণের ইচ্ছা 'আদিম বৃত্তি' হলেও নঞর্থক নয়।

আর গ্রেট্‌খেন? সে নিষ্কলঙ্ক তো বটেই, অপিচ সে সম্পূর্ণভাবেই ফাউস্টের 'ভিক্টিম'। কাজেই অস্তিত্বের গভীরতম স্তরে নিহিত ভালোমন্দের এই যে নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের কথা শিবনারায়ণ বলছেন, তা বস্তুতঃ মেয়েদের অস্তিত্বের পক্ষে কতটা সত্য? ঐরকম কোনো দ্বন্দ্ব যে নারী-অস্তিত্বের মূলে প্রোথিত, তেমন কোনো তত্ত্ব কি সত্যিই শেক্সপীয়র বা গোয়েটে থেকে নিংড়ে বার করা যায়? যা চাওয়া যায় তা না পাওয়ার বেদনা তো আমাদের সকলের মধ্যেই কম-বেশী থাকে, কিন্তু সেটা আর ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব তো এক জিনিস নয়। গ্রেট্‌খেন তো কোনো মন্দ চায় নি ; সে তো তার মা-ভাই-প্রেমিক-সন্তান সবাইকে নিয়ে আনন্দের সঙ্গেই বাঁচতে চেয়েছিলো। দ্বন্দ্বটা কি কেবল ফাউস্টের নয়? তা যদি হয়, তা হলেই কিন্তু শিবনারায়ণ-কর্তৃক উপস্থাপিত অস্তিত্বতত্ত্বে ফাটল দেখা দেয়।

তা ছাড়া শিবনারায়ণ তো নিজেই ইঙ্গিত করছেন যে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে সকলের অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকে না। বলছেন যে রবীন্দ্রনাথের তা সম্ভবতঃ ছিলো না, কিংবা থাকলেও 'চেতনার স্তরে তাকে স্বীকার করার সাহস এবং সামর্থ্য' ছিলো না। তা হলে তিনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? সকলেরই থাকে? না, থাকে না? সকলেরই যে থাকে, তার প্রমাণ কোথায়? না থাকলে, সেটা কি সকলের ক্ষেত্রেই কোনো নিগূঢ় অবদমনের ফল? যাদের মধ্যে নেই, তাদের মধ্যেও কি অনুপস্থিত জিনিসটা কেন্দ্রিক হয়ে উঠবে? এরা কি কখনো প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হয়ে উঠতে পারবে না? প্রবন্ধের উপসংহারে শিবনারায়ণ যখন বলেন যে 'ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য' রবীন্দ্রনাথের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের রূপান্তর জরুরী, তখন ঠিক কী-কী পরিবর্তনের কথা তিনি ভাবছেন? আবালবৃদ্ধবনিতার মনের মধ্যে ভালোমন্দের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের তীব্র যন্ত্রণা চেতিয়ে ওঠাও কি সেই রূপান্তরের আবশ্যিক অঙ্গ?

এই প্রশ্নগুলি থেকে আশা করি অন্ততঃ এটুকু প্রতীয়মান হচ্ছে যে শিবনারায়ণ যে-তত্ত্বটা পেশ করেছেন সেটা নানা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা দৃষ্টিভঙ্গিই বটে, অস্তিত্ব বিষয়ে কোনো প্রমাণিত ধ্রুব সত্য নয়। তাই এর উল্টো দিকে কেউ যদি এমন দাবি করেন যে মানুষের জ্ঞেয় এক বিশেষ ধরনের আনন্দ আছে, যাকে একবার জানলে মানুষ আর কখনো ভয় পায় না, আর্ত হয় না,— 'ন বিভেতি কদাচন',— তখন সেই দৃষ্টিকোণকেও সমান মর্যাদা দিতে হয়। সেই চেতনা থেকে নিঃসৃত সৃষ্টিও যে প্রথম সারির হতে পারে সে-কথাও মেনে নিতে হয়।

§

এর পর প্রশ্ন: রেনেসাঁসী মানবতান্ত্রিক সাধনার কী হবে? ঐ সাধনার সার কথাটা কী? তার সঙ্গে শিবনারায়ণকথিত অন্তর্দ্বন্দ্বটার সম্পর্ক কী? আমি তো বুঝেছিলাম যে মানুষের ভাগ্যকে দেবতাদের তথা অপদেবতাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে ছাড়িয়ে এনে যথাসম্ভব মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণের অধীন করাই ঐ আন্দোলনের লক্ষ্য। ঈশ্বরের পা ধ'রে থাকা যদি ছাড়তে হয়, শয়তানের পোঁ ধরাও কি ছাড়তে হবে না? নিজের ভাগ্যকে নিজে গ'ড়ে নেবার দায়িত্ব যখন নিচ্ছি, তখন অন্তরের মধ্যে শক্তিক্ষয়কারী অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন প্রশ্রয় দেবো? বরং ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে ভালোকেই বেছে নিই না কেন? মন্দকে যথাসম্ভব অবদমিত রেখে ভালোকেই ফুটিয়ে তুলি না কেন? অর্থাৎ নিখিলেশ হয়ে ওঠার দায়িত্ব থেকে মানবতান্ত্রিক মানুষের কি সত্যিই অব্যাহতি আছে?

এইখানেই শিবনারায়ণের চিন্তার দুটি দিকের মধ্যে একটা বিরোধ প্রকট। একদিকে ভালোমন্দের দ্বন্দ্বের শিল্পরূপের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, অন্যদিকে মানবতন্ত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য— এ দুয়ের তীব্র বিততি তাঁর শিল্পসাহিত্যবিষয়ক লেখায় প্রায়ই একটা কূটাভাস রচনা করে। সেই কূটাভাস তাঁর লেখাকে একটা বিশিষ্ট স্বাদও দেয়। কিন্তু যে-

দ্বন্দ্বের রূপায়ণকে তিনি এতটা মূল্য দিচ্ছেন, তা বংশের বিচারে ভগবান আর শয়তানের সুপ্রাচীন 'থিওলজিকাল' ঝগড়ার জাতক, যেটা ভারতীয় দর্শনে প্রশ্রয় তো পায়ই নি, খৃষ্টীয় জীবনদর্শনেও শেষ পর্যন্ত বর্জিত হয়েছে। মানবতন্ত্র অবলম্বনের পরও কি ঐ আঁধার আদিম লড়াইটাকে আমাদের সত্তার অভ্যন্তরে লালন ক'রে যেতে হবে, যাতে আমরা ভালো-ভালো নাটক-উপন্যাস লিখতে পারি, নিদেনপক্ষে আমাদের পর্যবেক্ষণ ক'রে অন্যরা দারুণ দারুণ ফাউস্টীয় দ্বন্দ্বতাড়িত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে? এদিকে আমাদের দ্বন্দ্বের তাড়নায় আমরা মদমত্ত হস্তীর মতো চতুর্দিক লণ্ডভণ্ড ক'রে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করলে ক্ষতি নেই? জীবন আর আর্টের মধ্যে ওরকম দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান কিন্তু আমি মানতে রাজি নই; দুয়ের মধ্যে একটা সেতু, একটা সংলাপ চাই।

মানবতান্ত্রিক চিন্তার কতগুলি দিক আমি সমর্থন করতে পারি না। কখনও কখনও তার মধ্যে একটা অবিনয়, একটা বিপজ্জনক অহংকার দেখতে পাই। যখন তা ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আপন প্রজাতিকে ফের সেই সিংহাসনেই বসিয়ে দেয়, তখন অনর্থ হয়। মানবতন্ত্রের রাজত্বকালে প্রকৃতিকে যেভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে তার ফলে বর্তমান সময়ে আমরা উপনীত হয়েছি পরিবেশগত একটা সংকটে। মানবতান্ত্রিক শকটের এই চরমপন্থাকে রুখতে হলে আমাদের মুখ ফেরাতে হবে প্রকৃতির দিকে, বুঝতে হবে যে মানুষকে প্রকৃতির অন্তর্গত প্রাণী হিসাবে দেখাই যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর। সেই মুখ ফেরানোই কি নয় আমাদের সময়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় মীমাংসা, সেই যুগোচিত নবতম 'এন্‌লাইটেনমেন্ট', তমঃ থেকে জ্যোতির দিকে হেঁটে যাবার পথ, যেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সহপথিক?

অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে যাওয়া, প্রজ্ঞার ফসলকে ঘরে তোলা যে-এন্‌লাইটেনমেন্টের লক্ষ্য, তার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই। বরং বলবো যে আমি সে-যাত্রারম্ভকে স্থগিত রাখতে রাজি নই একেবারেই। অর্থাৎ আমাদের প্রাজ্ঞভাবে বাঁচতে শিখতে হবে এখনই, আজকে থেকেই; সে-কাজ কাল-পরশুর জন্য ফেলে রাখা যায় না। সে-পরিপ্রেক্ষিতে মেফিস্টোর সঙ্গে ফাউস্টের মিতালিকে আমরা কেমন চোখে দেখবো? এ ব্যাপারে জীবন আর শিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধনটা কেমনতর হবে? শয়তানের সঙ্গে জার্মান সাহিত্যের মহানায়ক ফাউস্টের এই যে-মাখামাখি, এর সঙ্গে পরবর্তী কালের জার্মান ভাবলোকে ফ্যাশিস্ট চিন্তার প্রতাপের কোনো সম্পর্ক আছে কি? জীবনে ফাউস্টদের হাতে গ্রেট্‌খেনদের লাঞ্ছনাকে দূর করতে হলে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনীয়? আমি যদি গ্রেট্‌খেন হতাম, তা হলে ফাউস্টের 'অস্তিত্বের মূল' থেকে নচ্ছার মেফিস্টোকে ছুরি দিয়ে কেটে বার ক'রে ফেলে দিতাম। ঐ পাজি ভূতটা আমাকে একদম আকর্ষণ করে না। এবং আমি তাকে আমার অথবা আমার প্রিয়জনদের অস্তিত্বের মূলে বাসা বাঁধতে দিতে কোনোক্রমে রাজি নই।

শিবনারায়ণের বিশ্লেষণ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'মানবতন্ত্র এবং মানুষের মাঝখানে ভাববাদী শুচিতা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে' দাঁড়ায়, কিন্তু গোয়েটে সে-পাঁচিল

'টপকাতে পেরেছিলেন' প্রেমের সাহায্যে। আমি 'ভাববাদী শুচিতা' দ্বারা বাধাগ্রস্ত নই; জীবনে পাঁচিল-টপকানো প্রেমের প্রয়োজন থাকে তাও স্বীকার করি,— যদি সে-ব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার মেনে নেওয়া হয়; কিন্তু আমি মানুষকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধনী হিসাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে। যৌন প্রয়োজনে মানুষকে ব্যবহার করা সেই কোঠায় পড়তে পারে। অন্ততঃ তাঁর যৌবনকালে গোয়েটে কি মেয়েদের বেপরোয়াভাবেই ব্যবহার করেন নি? প্রয়োজন ফুরালে ব্যবহৃতাকে পিছনে ফেলে রেখে অব্যবহৃতার দিকে এগিয়ে যান নি? সেজন্যে বিবেকদষ্টও হন নি? গ্রেট্‌খেন-চরিত্রের রূপকল্পনায় কি সেই অভিজ্ঞতার ছায়া পড়ে নি? যৌবনের বেহিসাবী উদ্দামতার সঙ্গে কোনো মানবতান্ত্রিক উদ্যমের সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া কতটা অর্থবহ? বরং মনে রাখা যেতে পারে যে ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীকে কখনও কখনও 'দ্য গোল্ডেন এইজ অফ সিডাক্‌শন' ('মেয়ে পটানোর স্বর্ণযুগ'?) বলা হয়ে থাকে। প্রাক্‌-জন্মনিয়ন্ত্রণ কালে সেই স্বর্ণযুগ মেয়েদের পক্ষে কতটা সোনালী ছিলো তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যদি মেয়েদের ওভাবে ব্যবহার না ক'রে থাকেন, তা হলে সেটাকে তাঁর সপক্ষে একটা 'প্লাস্‌ পয়েন্ট'ই বলা চলে। এবং সেই সংযম সত্ত্বেও জীবনের শেষ প্রান্ত অবধি প্রেমের কবিতা ও গান রচনা ক'রে যেতে তাঁর তো অসুবিধা হয় নি। আরও বলি, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি 'প্রচ্ছন্ন' রেখেই থাকেন, তাতে ক্ষতি কী? শিল্পীকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সব কাহিনী পাবলিকের সামনে পেশ করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তিনি যদি উল্লেখযোগ্য মাপের শিল্পী হন, তাঁর কাজকে বোঝার জন্য তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি জানা যদি জরুরী মনে হয়, তা হলে পরবর্তী কালে অনুসন্ধিৎসুরাই না-হয় সে-সব খবর খুঁজে বার করবে। কিছু কাজ গবেষকদের জন্যই থাকুক না।

§

উপসংহারে বক্তব্য: বৈশ্বিকতার দাবিতেই বিশ্বসাহিত্যের আসরে নানা স্বাদের ব্যক্তিত্বের জন্য জায়গা রাখা হোক। সেরাদের মধ্যেও নানা স্বাদের আয়োজন না থাকলে দলটা বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। বড় লেখক হতে হলে মৌল বিরোধের কথাটাই বেশী ক'রে লিখতে হবে এ কথা আমি মানতে পারি না। শান্তসুন্দর রসের শিল্পীরাও বড় হতে পারেন। সেরা কবিতার আসরে ত্রুবাদুরদের কবিতা, বাউল-বৈষ্ণব-শাক্তদের কবিতা, চীনা-জাপানী কবিতা, ফার্সী গজল— সবই থাকুক। মেয়েরাও ক্লাসিক্‌সের তালিকায় উঠুন: পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতায় তথা গদ্যে রচয়িত্রীদের এমন অনেক নামই জড়ো হয়েছে, যেগুলি বিশ্বের দরবারে শ্রুতিগোচর হবার যোগ্য। তাঁদের জন্য কোনো 'বিশেষ ওকালতি'রও প্রয়োজন নেই; প্রত্যেকেই নিজের জোরেই সমাদর লাভ করতে পারেন। ক্লাসিক্‌স্‌-বিষয়ক 'ক্লাসিক' আলোচনাগুলিতে সে-সব নাম শুনতে পাই না কেন? শিবনারায়ণের প্রবন্ধটিতে কোনো স্ত্রী-শিল্পীর নামই নেই। তাঁর পক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতে

ইয়োরোপের দু'-চারটা নাম থাকতে পারতো, কিন্তু তাও নেই। এর ফলে হয় কি, পুরুষ সমালোচকদের দ্বারা পরিশীলিত ক্লাসিক্‌সের ধারণাটার সঙ্গে সাযুজ্য বোধ করাই আজকালকার মেয়েদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা আমরা তো জানি যে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিই পুরুষরচিত উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেও ধরা পড়ে না।

পৃথিবীর সেরা সাহিত্যিকদের নামের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নামও যে থাকা উচিত, তা বলাই বাহুল্য।

জিজ্ঞাসা ১১ : ৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৭ [১৯৯০-৯১]

[ঐ একই সংখ্যায় শিবনারায়ণ এ বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য পেশ করেছিলেন তাঁর সম্পাদকীয়তে। অনুসন্ধিৎসুরা দেখে নিতে পারেন।]

আমার রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া-বিষয়ক বইদুটির সূত্রে

মাননীয়া গৌরী আইয়ুব *চতুরঙ্গ* পত্রিকার পর-পর দুটি সংখ্যায় [জুন ও জুলাই ১৯৯১] আমার দুটি বইয়ের* দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন। সংখ্যাদুটি পত্রিকার দপ্তর থেকে ডাকযোগে আমাকে পাঠিয়ে সম্পাদক আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আমার বাংলা বইটি প্রকাশের পর ছ' বছর ও ইংরেজী বইটি প্রকাশের পর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে বইদুটি সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধায়তন সমালোচনার জন্য পত্রিকায় জায়গা করা হয়েছে, তা থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে বিষয়টাকে *চতুরঙ্গ*-এর সম্পাদক নেহাৎ তুচ্ছ মনে করেন না, এবং তিনি যে পত্রিকার ঐ সংখ্যাদুটি আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, এ থেকে অনুমান করি যে আমার দিক থেকে কিছু প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত হবে না। হ্যাঁ, আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। ... আলোচনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে প্রথমে জুনের এবং তার পর জুলাইয়ের সংখ্যায় প্রকাশিত সমালোচনার সূত্র ধ'রে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

§

এ কথা সকলেই জানেন যে আমার বাংলা বইটির নির্মাণে যে-আঙ্গিকগত অভিনবত্ব বর্তমান তা পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি চেয়েছিলাম গবেষণা আর কথাসাহিত্যের পারস্পরিক অভিঘাতের মাধ্যমে কতগুলো কথা বোঝাতে। ভেবেছিলাম যে দুটো পাথরের ঠোকাঠুকিতে পাঠকদের চোখের সামনে কিছু নতুন চেনার আলো জ্ব'লে উঠবে। অনেক পাঠকের বেলাতেই সে-উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সৌভাগ্যক্রমে বেশ কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি এই আঙ্গিককে স্বাগত করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন : 'এ বইয়ে কেতকী যা দিতে চাইছেন, এই বিশেষ আঙ্গিক ছাড়া আর কোনোভাবেই তা দেওয়া যেতো না।' শ্রদ্ধেয় শিবনারায়ণ রায় বইটিকে চিহ্নিত করেছিলেন 'একটি অসামান্য বই' ব'লে। জানি না গৌরী দেবী এঁদের কেবলই আমার 'মুগ্ধ পাঠক' মনে করবেন কিনা। তবে এ খবরও আমার অজানা নয় যে এই আঙ্গিক আরেক দল লোকের পছন্দ হয় নি। দেখা যাচ্ছে যে গৌরী দেবী এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। যে-বিরোধটা ঘটছে তা কেবল দুজন ব্যক্তির

---

* যথাক্রমে *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে* (নাভানা, ১৯৮৫) এবং *In Your Blossoming Flower-Garden: Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo* (Sahitya Akademi, 1988)।

মধ্যে নয়, দু' ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। এ তো কোনো আদালতের মামলা নয়, যে দু'-পক্ষে উকিল লাগিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ক'রে এর কোনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। সাহিত্যের বিচার ওভাবে হয় না। সাহিত্যের মূল্যায়ন হয় একটা দীর্ঘ সময়ের পটে। সুধীজনের মতামত ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে। যে-বই যত নতুন ধরনের হয়, যত পরীক্ষামূলক হয়, তাকে নিয়ে তত ঝড় ওঠে। কত বই প্রকাশকালে বিপুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, আবার কালক্রমে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। কত মর্যাদাবান বই সমসাময়িকদের দ্বারা অবহেলিত হয়, তার পর কোনো সহমর্মী উত্তরসূরির উদ্যোগে তা পুনরাবিষ্কৃত ও সমাদৃত হয়। আমি যাঁদের সাহিত্যিক বিচারকে মূল্য দিই সেরকম কিছু রসিকজনের বিশ্বাস এই যে আমার আলোচ্য বইটির মর্যাদা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীই হবে। বর্তমান কালে কেবল ঐটুকুই বলা চলে— ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে একটা আস্থার উচ্চারণ।

কিন্তু কেন এই আস্থা? এই বিশ্বাসের কি কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে? তাকে কি বিশ্লেষণ করা যায়? হ্যাঁ, হয়তো কিছু দূর করা যায়, কেননা যে-দুই প্রতিন্যাসের বিরোধিতার ফলে তর্কের ঝড়টা উঠছে তাদের উভয়ের গাত্রে কিছু সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক চিহ্ন আছে। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে সূত্রাকারে বলা যায়: একটি দিক সেকেলে, অন্য দিক একেলে। এই দুই পক্ষের ধাক্কাধাক্কিতে একদিন না একদিন প্রথম পক্ষ পিছু হটতে বাধ্য। পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে থাকার প্রয়াস কালের দুর্বার স্রোতে কখনোই স্থায়ী হয় না, শেষ পর্যন্ত জয় হয় নতুনেরই। আমার ধারণা, আলোচ্য বইটার প্রতি এ মুহূর্তে কিছু 'সেকেলে' মানুষের যে-বিরোধিতা, তা ধোপে টিঁকবে না। গৌরী দেবী তাঁর প্রবন্ধে নিজেকে 'সেকেলে' ব'লে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিতই করেছেন। অথচ বইটার জন্য সরাসরি অকুণ্ঠ প্রশংসা আমি আজও পাচ্ছি। তার প্রাণশক্তি যে ফুরিয়ে গেছে তা তো মনে হয় না।

মাত্র কিছু দিন আগে এমন একজনের টেলিফোন পেলাম, যাঁকে সাতাশ-আটাশ বছর চোখে দেখি নি, মধ্যে একবার টেলিফোনেই কথা হয়েছে কেবল। অবসরপ্রাপ্ত মানুষটি বর্তমানে থাকেন লণ্ডনের কাছে, কিন্তু এককালে কলকাতায় আমার কিশোরী-বয়সে তাঁর কাছে সংগীতে কিছু তালিম নিয়েছিলাম। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি আমাকে বললেন: 'তুমি এরকম একটা বই লিখেছো, আর আমাকে জানাও নি। একদিন আমাদের এখানে এসো, একটা গানবাজনার আসর করবো। আমার যন্ত্রটা বার করবো, সারা দিন সারা রাত ধ'রে চলবে সেই আসর। আমরা সেই গানটা বাজাবো— মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চ'লে ...' ইত্যাদি কত কথা। হয়তো গৌরী দেবী বলবেন, ইনি নেহাৎই আমার একজন 'মুগ্ধ পাঠক', কিন্তু সেদিন সত্যি মনে হয়েছিলো, বইটা লেখা অসার্থক হয় নি। সম্পর্কে ইনি আমার গুরুস্থানীয়; অবসর যখন গ্রহণ করেছেন তখন প্রবীণদের কোঠাতেই ফেলতে হবে এঁকে। এঁর সাহিত্যিক মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য আমি কোনোদিন কোনো চেষ্টাই করি নি। সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এঁর প্রশংসা সহসা একদিন আমার টেলিফোনের তারে বেজে উঠেছে, সংগীতের ঝংকারেরই মতো। সহমর্মিতার এই মুহূর্তগুলোই শিল্পীদের জীবনের আসল পুরস্কার। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ইনি নন, কেবল সংবেদনে আমার সহশিল্পী, এবং

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে কোনো কল্পিত ভাইরাসের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তেমন কোনো দায় এই দেশান্তরিত সংগীতপাগল বাঙালী মুসলমান মানুষটির নেই। 'ভাই রে, কলকাতা ঢাকা কোথাও আমার আজ ঘর নেই রে।' হয়তো তাই রবীন্দ্রখ্যাতি বিপন্ন হতে চলেছে তেমন ধরনের কোনো প্যারানইয়াও নেই।

গবেষক আর কথাসাহিত্যিকের 'জাত আলাদা', গৌরী দেবীর এই দাবি কেবলমাত্র আংশিক সত্য, কখনো পুরোপুরি সত্য হতে পারে না। নয়তো কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে একই সঙ্গে গবেষক এবং কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠা সম্ভবই হতো না। কিন্তু মানুষ যে তা হয়। সৃষ্টি আর গবেষণা দুটো জল-অচল কামরা নয়। একই ব্যক্তির মধ্যে যদি দুটো প্রবণতাই বর্তমান থাকে, তা হলে সে-দুটোকে একই বইয়ের শরীরে চারিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বইটির মুখবন্ধে পরিষ্কার ক'রেই বলেছি। অপিচ বলবো, কি শিল্পসাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, কি ইতিহাসের মতো মানবিক বিদ্যায়, উচ্চস্তরের গবেষণা কখনোই নিছক তথ্যসন্ধানের ব্যাপার নয়। তার জন্য সৃজনশীল কল্পনাশক্তি লাগে। একটা অনুসন্ধিৎসার বশবর্তী হয়ে তথ্য খুঁজতে বেরোনো, খুঁজতে খুঁজতে সূত্র ধ'রে একটা পথ থেকে আরেকটা পথে চ'লে যাওয়া, আপাত-অসংলগ্ন তথ্যদের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রে তাদের সাজানো : এই ধরনের কাজ করতে গেলে সত্যিই সৃষ্টিশীল মন লাগে। তাই ভালো গবেষণা আর শিল্পসৃষ্টি এ দুয়ের মধ্যে সেরকম কোনো মেরুবৈপরীত্য নেই। বৈপরীত্যটা বোধ হয় কল্পনা করেন তাঁরাই, যাঁরা নিজেরা কখনো দুটো কাজ করেন নি, কেবল একটাকে নিয়ে থেকেছেন। যাঁরা নিজেরা দুটো কাজই করেছেন তাঁরা ভিতর থেকে জানেন যে আসলে সেরকম কোনো বৈপরীত্য নেই। এ ব্যাপারে সব্যসাচীদের সাক্ষ্যই নিশ্চয় প্রামাণিক ব'লে গণ্য হবে।

আরও বলবো, একজন সৃজনশীল শিল্পীর অন্তর্জীবনকে বুঝতে সৃজনশীল শিল্পীর মন লাগে। একজন শিল্পীর জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিভাবে কবিতায় উপন্যাসে গানে ছবিতে রূপান্তরিত হয়, তা যাঁরা নিজেরা সৃষ্টির কাজ করেন তাঁরা ভিতর থেকে জানেন। রূপান্তরের প্রক্রিয়াটার সঙ্গে তাঁরা অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত। তাই তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিকে ফ্যালনা বলা চলে না। এই বোঝার কাজ কোনো শুকনো ব্যাপার নয়, এর মধ্যে জীবনে জীবন যোগ করার ব্যাপার আছে। এটা বোঝানোর জন্যও আমি মিশ্র আঙ্গিক অবলম্বন করেছিলাম। রবীন্দ্রজীবনে ওকাম্পোর ভূমিকাকে নিয়ে আমার আগে যিনি মাথা ঘামিয়েছিলেন, সেই মানুষটিও কবি।

বিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন 'আন্তর্বিদ্য' চর্চা থেকে নূতন দৃষ্টিকোণ লাভ হয়, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তেমনি মিশ্র আঙ্গিক থেকে লাভ হয়ে থাকে। গানের মধ্যে কবিতা আছে, সংগীতও আছে। অপেরা, ব্যালে, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য— সবই মিশ্র জঁার। উপন্যাসের ভূমিকা এককালে কাব্যেরই অন্তর্গত ছিলো। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে হলে একজন মানুষকে ঔপন্যাসিকও হতে হবে, ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনাও করতে হবে। মহাভারতে ইতিহাস কাব্য আখ্যান পুরাণ ধর্মোপদেশ নীতিকথা— কী না নেই?

ভারতবর্ষের ঐ মহাগ্রন্থটি কি মিশ্রতার এক চূড়ান্ত প্রতিভূ নয়? তার মধ্যে তো ধর্ম আছে, জিরাফও আছে।

মিশ্রতা কোনো কলঙ্ক তো নয়ই, বরং শক্তির উৎস। জীবনের নানা ক্ষেত্রেই মিশ্রতাকে নিয়ে যে-আপত্তি, তা জাতি-শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের ও রক্ষণশীল মানসের আপত্তি। তাঁতী তাঁতীই থাকবে, কুমোর কুমোরই থাকবে, 'মেয়েছেলে' 'মেয়েছেলে'ই থাকবে: এরা কেউ অন্য কোনো-কিছু হয়ে উঠতে পারবে না। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পশ্চাতে টানে। অথচ বলা চলে বস্তুতঃ মিশ্রতাই ভারতীয় সভ্যতার সব থেকে বড় শক্তি। সেখানে যে আর্য-অনার্য দ্রাবিড়-চীন শকহূণদল পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হয়েছে, সেই বহুবাচনিকতাই তার সব থেকে বড় জোর, তার উর্বরতার ও ঋদ্ধির উৎস। অ্যাংলোস্যাক্সনের শক্ত বনিয়াদের উপরে ফরাসী আর লাতিনের শব্দসম্ভারের সৌধকে জুড়ে দিতে পেরেছে ব'লেই ইংরেজী ভাষা বিশেষভাবে জোরদার হয়ে উঠেছে। ভাষার ও ভাবের সংকরতা যে-যুগে দুর্দান্ত প্রশ্রয় পেয়েছে সেই যুগেই শেক্সপীয়রের নাট্যপ্রতিভা বিকশিত হতে পেরেছে। সেই সাহসী নাট্যকার তাঁদের নাট্যরীতির ধ্রুপদী নিয়মকানুন দু' হাতে ভেঙেছেন। নিয়ম ভেঙেই তিনি বড় হয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এসব কথা অতিপরিচিত, প্রায় 'ক্লিশে'। 'হাইব্রিডিজ্‌ম্' যে একটা মস্ত শক্তি, এই তত্ত্বটি আমি কত কাল আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে এবং পঞ্চাশের দশকের কলকাতার সাহিত্যিক আবহাওয়ায় আয়ত্ত করেছি। তার পর থেকে অবস্থাগতিকে সেই তত্ত্বে আস্থা আমার মধ্যে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। মিশ্রতার প্রতি পক্ষপাত আমার মজ্জায় মিশেছে: আজকের শুদ্ধিবাদীরা কড়া সমালোচনা ক'রেও আমার লেখা থেকে সে-বৈশিষ্ট্যকে উচ্ছিন্ন করতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। বঙ্গের নবজাগরণের স্বরূপকে নিয়ে যত তর্কই চলুক না কেন, সেই আলোড়ন যে পুব আর পশ্চিমের উত্তাল মিশ্রণের জাতক, তা অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই মিশ্রণের রাজকীয় অপত্য। তাঁকে 'ডি-কনস্ট্রাক্ট' ক'রে কোনো অবিমিশ্র সংস্কৃতির সন্তান ব'লে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়।

আমার আলোচ্য বইয়ে ছোট ছোট নানান নকশায়, নানা সংলাপে, নানা হাস্যপরিহাসের মাধ্যমে হাইব্রিডিজ্‌মের জয়গান গাওয়া হয়েছে। স্বয়ং ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো যে একধরনের হাইব্রিড ছিলেন, তা-ও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বইটা এক অর্থে মিশ্রতার উৎসব। একজন বাঙালী, একজন ইংরেজ, আর একজন আর্জেন্টাইনের ত্রিকোণ আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বকে বুঝে উঠতে হলে হাইব্রিডিজ্‌মের সমঝদার হয়ে উঠতে হবে। পয়েন্টটাকে আপনাদের হয়তো এভাবে বোঝানো যায়: শুদ্ধিবাদীরা যতই চটুন না কেন, অনামিকাকে যে কল্পনা করতে পেরেছে, হয়তো কেবল সে-ই ঐ ত্রিকোণ বন্ধুত্বকে নিয়ে গবেষণা করতে পারতো। যাঁরা বইটার উপন্যাস-অংশের সমালোচনা করেন, তাঁরাও স্বীকার করেন যে বইটার মধ্যে কিছু মূল্যবান গবেষণা আছে। তাঁদের কি একবারও মাথায় আসে না যে ঐ দুই ধরনের কৃতির মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে? স্প্যানিশ তেমন কিছু কঠিন ভাষা নয়। ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীরই ভাষা। ইংরেজী-ফরাসী বা সংস্কৃত

যাঁদের জানা আছে তাঁদের পক্ষে তেমন দুষ্কর নয় স্প্যানিশটাও একটু-আধটু শিখে নেওয়া। কেন আপনারা কেউ শিখে নিলেন না? আমি তো স্কুলে বা কলেজে স্প্যানিশ পড়ি নি: যেটুকু শিখেছি নিজের চেষ্টাতেই শিখেছি। আপনারাও সেভাবেই শিখে নিতে পারতেন। তার পর, ডার্টিংটন হল্ তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। এল্মহার্স্ট আর্কাইভ্সের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সহযোগী। যে-সব খবর আমি আমার বইয়ে দিয়েছি সে-সব আমার আগে আর কেউ রিসার্চ ক'রে বার করতে পারলেন না কেন? তার কারণ কি এটা হতে পারে না— যে ঐ জাতের অনুসন্ধান করতে যে-ধরনের মন লাগে তা তাঁদের ছিলো না? যে-মন অনামিকাকে কল্পনা করতে পেরেছে, সেই মনই রিসার্চগুলোও করতে পেরেছে। বইটার মিশ্র আঙ্গিকের সেটাই প্রকৃত ভিত্তি।

মনে পড়ছে, বহুকাল আগে একবার কলকাতার দূরদর্শনে মিশ্র বিবাহের উপরে একটি আলোচনা-অনুষ্ঠানে গৌরী দেবী আর আমি দুজনেই অংশ নিয়েছিলাম। আমার মতো তিনিও কি নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকেই জানেন না যে শুদ্ধির জন্য জাত-বাঁচানো ত্বক্-বাঁচানো আকুলতা কখনও কখনও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে পারে, আর মিশ্রতাকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকতে পারে প্রাণশক্তি? আমার আঙ্গিকের মিশ্রতা নিশ্চয়ই আমার ভিতর থেকে হয়ে ওঠা, আমার অন্তরতম সৃষ্টিশীল সত্তা থেকেই নিঃসৃত। গৌরী দেবী যদি একে 'psychic kaleidoscope' বলতে চান, তাতে আমার আপত্তি নেই। সেটাকে কম্প্লিমেন্ট হিসাবেই নেবো। নিছক শিল্পগত বিচারে হয়তো এ ব্যাপারে আমার উপরে দুটি প্রভাব সক্রিয়: একটি পাশ্চাত্য সংগীতের, অন্যটি আধুনিক সিনেমার। এবং এই দ্বিবিধ প্রভাব এই বইয়েই প্রথম পড়ে নি, আমার প্রথম উপন্যাসেও পড়েছে মনে হয়। আমার সমালোচকরা সাধারণতঃ ভুলে যান যে আমার প্রথম উপন্যাসও খুবই পরীক্ষামূলক, আঙ্গিকে তথা বিষয়ে যথেষ্ট নতুন ধরনের। আসলে, যাঁরা আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনা করেন তাঁদের কারোই আমার সাহিত্যিক বিবর্তনকে বোঝার কোনো তাগিদ নেই, তাঁরা কেবল রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে আগ্রহী। রবীন্দ্র-কৌতূহলের সূত্রেই তাঁরা আমার বইটার দিকে এগিয়ে এসেছেন। এঁদের কাছে আমার বইয়ের আঙ্গিকগত পরীক্ষার কোনো মূল্য নেই, কোনো আবেদন নেই।'

এখানে দু'-একটি বাড়তি খবর অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৮১ সালে শ্রদ্ধেয় বিরাম মুখোপাধ্যায় আমাকে রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়ার উপরেই একটি ছোট বই লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার ভিতরে একটা উপন্যাসই রূপ নিচ্ছিলো। বিলেতে ফিরে এসে অনুসন্ধানগুলো করেছি, কিন্তু তথ্যগুলোকে সাজানোর কোনো পদ্ধতি আমার মনঃপূত হয় নি, এদিকে উপন্যাসটা উত্তরোত্তর দাবিদার হয়ে উঠেছে। এক বিনিদ্র রাত্রে হঠাৎ ক'রেই বুঝতে পারলাম, সাংগীতিক অথবা সিনেমাটিক কায়দায় উপন্যাসটার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যগুলো কিভাবে সাজানো যায়। আমার মন ব'লে উঠলো, ইউরেকা। সেই থেকে দুটো জিনিস পরস্পরে প্রবিষ্ট হলো, তাদের গ্রন্থন আর ছাড়ানো গেলো না। তখন দুটো ধারায় মিলে-মিশে বইটা তার বর্তমান রূপে আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে

লাগলো। অস্বীকার পরবর্তী পর্যায়ে যা-কিছু এসেছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা বা আমার কাদম্বরী-চিন্তা, তাদের সাজাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। নিয়ম-না-মানা বইটাকে যখন বিরামবাবুর কাছে পাঠালাম, তখন তিনি গৌরী দেবীর মতো তাকে 'সিংহরিণ' বা 'শ্যামদেশীয় যমজ' ব'লে উপহাস করেন নি বা খারিজ ক'রে দেন নি। কিছুকাল একেবারে নীরব থাকার পর সাদরে তাকে স্বাগত করেছিলেন। যদিও লোকে একে কিভাবে নেবে সে-বিষয়ে তাঁর একটা উদ্বেগ ছিলো। আজ বুঝতে পারি, কী উদার ছিলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি-শিল্পীর উপরে আস্থা স্থাপন ক'রে নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষামূলক কাজকে যাঁরা পরিবেশন করতে দ্বিধা করেন না, তেমন ইম্প্রেসারিওরাই শিল্পীদের যথার্থ বন্ধু। বাঙালীর সংস্কৃতি-জগতে এরকম দু'-একজনকে সর্বদা পেয়ে গেছি ব'লেই এ যাবৎ যা-কিছু করেছি তা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি, এবং আমার বিশ্বাস এঁদের সব সময়ই পাওয়া যাবে।

কিন্তু ১৯৮২ সালে বিরামবাবুর কাছে পাঠানো পাণ্ডুলিপিখানার নাম ছিলো 'ভিক্‌তোরিয়া! ভিক্‌তোরিয়া!' ঐ নামটা গৃহীত হলে অনামিকা আর ভিক্তোরিয়ার মধ্যবর্তী সরাসরি লাইনটা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেতো। আমার গল্পে অনামিকা তার জীবনের প্রথম সংকটকে কাটিয়ে উঠতে তার নবারব্ধ স্প্যানিশ-চর্চাকে অবলম্বন করেছে এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বিজয়াকে বুঝতে বাঙালী কৌতূহলে এগিয়ে গেছে। তার পর তার জীবনের দ্বিতীয় সংকট কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সে প্রেরণা পেয়েছে ভিক্তোরিয়ার ফেমিনিস্ট দিকটার কাছ থেকে, যা তাকে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়েছে রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনা আর কাদম্বরী দেবীর দিকে। ভিক্তোরিয়ার প্রতি অনামিকার আর্ত আবাহনটা তাই এই বইয়ের যোগ্য নাম ব'লে মনে হয়েছিলো আমার। কিন্তু বিরামবাবু বললেন, বইয়ের টাইট্‌লে রবীন্দ্রনাথের নাম রাখতেই হবে। তখন ভেবে নিয়ে তাঁকে বর্তমান নামটা বললাম। এটা তাঁর তৎক্ষণাৎ পছন্দ হলো। অবশ্য নাম যেমনই দেওয়া হোক না কেন, যাঁরা প্রধানতঃ রবীন্দ্রমধুলোভী তাঁরা খবর পেয়ে এই বইয়ের দিকে আসতেনই। তাই ভুল বোঝাবুঝিগুলো কোনোভাবেই এড়ানো যেতো না।

কোনো লেখা লেখকের চরিত্রনিরপেক্ষ হয় না। মিশ্রতা আমার কাছে কোনো দোষাবহ ব্যাপার নয়,— জীবনে নয়, শিল্পেও নয়,— এই ছোট্ট তথ্যটুকু মনে রাখলে পাঠকদের পক্ষে আমাকে বোঝা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। আমার নিজের সন্তানরাই মিশ্র রক্তের, আগেকার দিনের 'সেকেলে' সাহেব-মেমেরা যাদের ব্যঙ্গ ক'রে বলতেন 'হাফ্-কাস্ট্'। হাফ-কাস্ট তো কি? তাতে কি তাদের মনুষ্যত্বে কোনো খাদ মিশেছে? না, মেশে নি। তারা পূর্ণ মানুষ। তেমনি আমার এই হাফ-কাস্ট বইও একটা বৈধ বই, কোনো 'সিংহরিণ' বা 'শ্যামদেশীয় যমজ' নয়। আমার ডক্টরেটের গবেষণাও ছিলো আন্তর্বিদ্য, সাহিত্যে ইতিহাসে মিলিয়ে। সেজন্যেও আমাকে নানা ঝামেলায় পড়তে হয়েছে।

কিছু ব্যক্তিগত কথা এখানে মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি তো সত্যিই একজন ইংরেজের ঘরনী-রূপে জীবনের অর্ধেক কাটিয়ে দিলাম; আমার জীবনটা তো

সত্যিই পুবে পশ্চিমে বেণী-বাঁধা। আমার মনের ক্যামেরাটা দিয়ে তো সত্যিই অহরহ বৃহত্তর পৃথিবীটার আলোকচিত্রগ্রহণ চলেছে। আমি তো সত্যিই প্রাদেশিক বা একসাংস্কৃতিক মানুষ নই, আমি তো সত্যিই আন্তর্জাতিক মানুষ— যেজন্যে রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়া-এল্‌ম্‌হার্স্টের আন্তর্জাতিক কাহিনীটা বোঝা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। আমি তো সত্যিই দুটো ভাষাতে কবিতা পর্যন্ত লিখি— যেজন্যে সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের কাজে আমন্ত্রিত হয়েছি, সে-কাজ করেছি, ক'রে আনন্দ পেয়েছি। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত ও সূক্ষ্মদর্শী, অন্ততঃ তাঁরাও তো আমার লেখা বিশ্লেষণ করার সময়ে এই নৃতাত্ত্বিক মাত্রাটি বিবেচনার মধ্যে নিতে পারেন। যারা নিজেরাই বিভিন্ন সংস্কৃতি ও দেশের মধ্যে সেতুস্বরূপ, তাদের নানা কাজেই একটা মিশ্রতা, একটা সেতুবন্ধনপ্রবণতা ফুটে উঠতে পারে। নানা দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং নানা দেশের চিন্তাভাবনা সাহিত্য গানবাজনা ছবি সিনেমা রান্নাবান্না ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমরা ক্রমশঃ সীমানা লঙ্ঘন করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। ষাটের দশক থেকেই আমার লেখায় এই লক্ষণ পরিস্ফুট। *নারী, নগরী*-কে আমি বলি আত্মজীবনীমূলক স্কেচ, কিন্তু অনেকেই তাকে বলেছেন প্রায়োপন্যাস।

আমি চারণবৈচিত্র্যে প্রচণ্ডভাবে আস্থাশীল। তা থেকে চিত্তের সমৃদ্ধি হয়। রাঁধি ব'লে কি গবেষণা করতে পারি না? গবেষণা করতে পারি ব'লে কি কবিতা লিখতে পারি না? কবিতা লিখি ব'লে কি বিজ্ঞানে আস্থা নেই? *নিউ সায়েন্টিস্ট* পত্রিকাটার পাতা উল্টে থাকি, এবং এই পত্রিকায় কখনও-সখনও আমার চিঠি পর্যন্ত বেরিয়েছে। সম্প্রতি অক্সফোর্ডের মহিলা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের একটি দল আমাকে ধ'রে-বেঁধে তাঁদের সংস্থার সাম্মানিক সদস্য করেছেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিচ্ছি। তাঁরা যে আমার কাছ থেকে কী পাচ্ছেন তা তাঁরাই জানেন, তবে কিছু-একটা নিশ্চয় পাচ্ছেন, নয়তো আমাকে তাঁদের দলে টানতে সচেষ্ট হতেন না।

এবং এটাও উল্লেখ্য যে এই চারণবৈচিত্র্য কেবল আমার একলার নয়, আমার পরিবারের অন্য মানুষগুলির মধ্যেও তাকে নিয়ত ফিরে পাচ্ছি। আমার সঙ্গী মানুষটি বিজ্ঞানের আর প্রযুক্তির জগতের লোক, কিন্তু সে পিয়ানোও বাজায়; সেলাই থেকে কাঠের কাজ, রান্না থেকে প্লামিং— কোনোটাই তার একেবারে অচেনা কাজ নয়। আমাদের একটি ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুরোনো বইকে নতুন করার কাজের কারিগর, সপ্তাহে একটি দিন টেকনিকাল কলেজে সে-বিদ্যায় পাঠ নেয়, অবসরসময়ে ছবি আঁকে। অন্য ছেলেটি এঞ্জিনীয়র হয়ে উঠছে, কিন্তু বেহালাও বাজায়, আর তারও আঁকার হাত আছে। সংগীত আমাদের সকলেরই প্রিয় হওয়ার ফলে আমাদের বাড়িতে তার এমন বন্যা বয় যে তাতে মধ্যে মধ্যে মাথা ধ'রে যায়। তা ছাড়া বাড়ির প্রত্যেকে ঘরের কাজে হাত না লাগালে এ দেশে সংসার চলে না; জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ আমরাই ক'রে থাকি।

অর্থাৎ চারণবৈচিত্র্য এমনভাবে আমার পরিপ্রেক্ষিতের অঙ্গীভূত হয়েছে যে বস্তুতঃ মিশ্রতা আমার কাছে কোনো ইশ্যুই নয়। কিন্তু এটা আমার কোনো মেমসাহেবিয়ানা নয়; আমার এই স্বভাবের সূত্রপাত হয়েছিলো জন্মভূমিতেই। অবিমিশ্র শুদ্ধতার পূজা

আমার লালনের অন্তর্গত ছিলো না। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘর নানারকমের হয়। আমি ঐতিহ্যপন্থী ঘরের মেয়ে নই। আমি নিজে অসবর্ণ বিবাহের সন্তান। যৌথ পরিবারে মানুষ হই নি। আমাদের বাড়িতে আনুষ্ঠানিক শুদ্ধতার কোনো স্থানই ছিলো না। আমরা আশৈশব সকলের হাতে খেয়েছি। আমার বাবার সংস্কারমুক্ত সেক্যুলার মন ছিলো। তিনি নিজে আমাকে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করবার এবং গোমাংস ভক্ষণের অধিকার দিয়েছিলেন। আমার মাকে রান্নাঘরে স্নানের ঘরে শিশুপরিচর্যায় বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে দেখেছি, কিন্তু তাঁকে কখনো প্রাচীনপন্থী শুচি-অশুচির বিচার করতে দেখি নি— বস্তুতঃ তাঁকে কোনোদিন কোনো পূজা-অর্চা বা ব্রতপালনও করতে দেখি নি। ফলে আমার মনটা 'সেকেলে' হয়ে উঠবার কোনো সুযোগই পায় নি।

মনে পড়ছে কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় আমার চোখে যখন অস্ত্রোপচার হয়— আমার জীবনের প্রথম প্রকৃত সংকট, যা আমাকে বড় হয়ে উঠতে অনেকটাই সাহায্য করে— তখন, বাঁধা চোখে হাসপাতালে শুয়ে থাকা অবস্থায়, একটি পরিচারিকা আমাকে পানীয় জল দিতে কী-আন্দাজ দ্বিধা করেছিলো। কেন? না, সে জাতে অস্পৃশ্যা, বেডপ্যান পরিষ্কার করাই তার কাজ। আমি তাকে বলেছিলাম: 'আমাদের বাড়িতে আমরা জাত মানি নে, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া মানি; সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসো, তা হলেই হবে।'

এই যেমন আমি ব্যক্তিগত জীবনে চণ্ডালিকার স্পর্শদোষ মানি নে, তেমন এও মানি নে যে একটি আধুনিক প্রেমকাহিনীর স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্টোরিয়ার গল্পটা কালো হয়ে যেতে পারে। তাঁরাও মানুষ, আমার উপন্যাসের চরিত্ররাও মানুষ। যিনি নিজে একজন লেখক, মানুষের গল্প আর মানুষের অনুভূতি নিয়েই যাঁর কারবার, কয়েকটি ঔপন্যাসিক চরিত্রের সংস্পর্শে তাঁর মধ্যে কোনো দোষ লাগতে পারে, এইটে মনে করাই কি চূড়ান্ত ছেলেমানুষি নয়? রবীন্দ্রনাথ কি একজন স্পর্শকাতর বামুনঠাকুর যে কাল্পনিক চরিত্রদের ছায়া গায়ে পড়লে তাঁর জাত যাবে?

আমার বইটার মিশ্র আঙ্গিক যে কোনো দোষ নয়, বরং গুণ— এ কথা অনেক সমালোচক বলেছেন। গৌরী দেবীর লেখাটি হাতে পাবার পর ফাইল খুলে পুরোনো রিভিউ-এর কাটিংগুলো দেখছিলাম। আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন সমালোচক একটি দৈনিক পত্রিকায় লিখেছিলেন:

> ... মনোযোগী পাঠক যখন এই দুই অংশ মেলাতে গিয়ে দুটি অংশের মধ্যেকার অলিখিত কথনগুলি আবিষ্কার করতে থাকবেন তখন স্পষ্টতই তাঁর মনে হবে যে আঙ্গিককে শিকলে বাঁধার কোন মানে হয় না, 'যে পারে সে আপনি পারে'। কেতকীর এই গ্রন্থের আঙ্গিক নিয়ে যতই বিতর্কের অবকাশ থাকুক না কেন, তিনি যে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পেরেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আঙ্গিকের আলোচনা অবান্তর। বরং গ্রন্থটির গভীরে প্রবেশ করলে অনেক নান্দনিক অনুভূতি মিলতে পারে।

এই মন্তব্যকেও কি একজন 'মুগ্ধ পাঠকের' প্রতিক্রিয়া ব'লে উড়িয়ে দিতে হবে? আমি এঁকে না চিনলেও এই মনোযোগী রসজ্ঞ পাঠক আমাকে তো অনেকটাই চিনেছেন। *চতুরঙ্গ*-এর পাঠকদের মনে রাখতে অনুরোধ করি যে গৌরী দেবীর বিপরীত মতটাও দৃঢ়ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।

এবং বুঝতে পারি না, 'মননশীল লেখিকা' ব'লে সম্পাদক যাঁর পরিচয় দিয়েছেন, তিনি কেন নিজেকে 'সাধারণ পাঠিকা' ব'লে চিহ্নিত করতে চান? একটা 'বিতর্কিত' বইয়ের প্রসঙ্গে *চতুরঙ্গ*-এর মতো পত্রিকায় কলম ধরতে যখন রাজি হয়েছেন, এবং কড়া সমালোচনা লিখতে পিছপা হন নি, তখন 'সাধারণ পাঠিকা'র ছদ্মবেশটা অবান্তর। বিশেষতঃ সম্পাদকীয় পরিচিতিতে যখন তাঁর সম্পর্কে ব'লেই দেওয়া হয়েছে যে 'শুধু লেখার জন্য না লিখে তিনি কলম ধরেন সমাজ, সাহিত্য এবং মানুষের জন্য বিবেকের তাড়নায়, বিশেষ পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে'। ধ'রে নিতে হবে কি যে 'বিবেকের তাড়না'তেই— আমার 'অবিবেকী' লেখনীকে শাসন করার জন্যেই— তিনি কলম ধরেছেন? এদিকে আমরা যারা নেহাৎ লেখক, তেমন আমরা তো সর্বদা কেবল বিবেকের তাড়নায় লিখতে পারি না। আমরা কখনও কখনও লেখার জন্যও লিখি, অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দে, আত্মপ্রকাশের তাগিদেও লিখি। রবীন্দ্রনাথও তো আমাদেরই দলে।

পরের প্রসঙ্গে যাবার আগে বলি, আমার এই বইটা কেবলই তার সন্ধানী গবেষণাকর্মের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলো, গৌরী দেবীর এই ধারণাটি ভুল। পুরস্কারের দ্বারা কোনো শিল্পকর্মের মূল্য নির্ণীত হয় না, কিন্তু পুরস্কার যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা সেটা পুরো বইয়ের জন্যই দিয়েছিলেন, এই কথাটা পাঠকদের মনে রাখতে অনুরোধ করছি। আমাকে যে-সম্মানপত্র দেওয়া হয় সেখানে গ্রন্থের দুটি দিককেই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

§

ডরিস মায়ার যে তাঁর ওকাম্পো-জীবনচরিতে ঐ মহিলার প্রেমজীবনের চাইতে তাঁর জীবনের অনুরাগগুলির উপরেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন, এতে গৌরী দেবী স্বস্তি বোধ করেছেন। ঐ ঝোঁকপ্রদান কিছুটা মায়ারের স্বনির্বাচিত, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সেটা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনো পথও ছিলো না। ভিক্তোরিয়া তখনও বেঁচে, এবং তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আত্মজীবনী বার করেন নি। কোনো কৃতী ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাঁর প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা কখনোই সম্ভব নয়, কেননা জীবিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হয়। ভিক্তোরিয়ার মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মজীবনীর খণ্ডগুলি ক্রমে ক্রমে বেরোতে থাকে। আমার বাংলা বইটা যে-সময়ে লিখি (১৯৮১-১৯৮২) তার একেবারে শেষের দিকে ঐ আত্মজীবনীর প্রথম দুটি খণ্ড আমার হাতে আসে। বইয়ে তার উল্লেখও আছে। কিন্তু তৃতীয় খণ্ড বেরোনোর আগে ভিক্তোরিয়ার প্রেমজীবনের বিস্ফোরক সংরক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করা যায় নি। ঐ খণ্ডের প্রকাশ লাতিন-মার্কিন বিদ্যাচর্চার

জগতে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সেটি আমি পড়লাম ১৯৮৩ সালে, শান্তিনিকেতনে দু' মাস কাটিয়ে বিলেতে ফিরে আসার পরে। তখন আমি রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার চিঠিপত্র সম্পাদনা করবার দায়িত্ব নিয়েছি, এবং বাংলা বইটা ছাপতে গেছে, যদিও নানা কারণে বইটা ছেপে বেরোতে আরও দু' বছর দেরি হয়। সে যাই হোক, আমি সে-বছর বিলেতে ফিরে অক্সফোর্ডের গ্রন্থাগারে পা দিয়েই *সুর* পত্রিকার উপরে গবেষণারত তরুণ গবেষক জন কিং-এর মুখে শুনলাম : 'তৃতীয় খণ্ড দেখেছেন ?'

এ কথা আজকে জোর দিয়েই বলতে হবে যে ভিক্তোরিয়ার জীবনে তাঁর ভালোবাসার জীবন আর জীবনের ভালোবাসাগুলি দুটোই ছিলো সমান গুরুত্বপূর্ণ, সমান দাবিদার। মায়ার অনিবার্য কারণে দ্বিতীয় দিকটার উপরেই জোর দিয়েছেন, এবং কর্মে প্রেমে মিলিয়ে ভিক্তোরিয়ার যে সমগ্র জীবন তার আলেখ্য হিসাবে মায়ারের বইটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ। 'লাভ্ লাইফ' আর 'লাভ্স্ অফ লাইফ' এ দুয়ের নিরবচ্ছিন্ন টেন্শন ভিক্তোরিয়ার জীবনের একেবারে কেন্দ্রে,— এই জিনিসটা না বুঝলে তাঁকে বোঝা হয় না। জিনিসটা আমি গোড়া থেকেই আন্দাজ করেছিলাম, এবং ঠিক সেই কারণেই ঐ ধরনের একটা টেন্শনকে অনামিকার জীবনেও সঞ্চারিত করেছিলাম। পরবর্তী কালে যা-কিছু জেনেছি সে-সমস্তই পশ্চাদ্দৃষ্টিতে আমার বাংলা বইয়ের নকশাটাকে সমর্থন করে।

'লাভ্ লাইফ' নিয়ে যে-সব আধুনিকারা জট পাকিয়ে ফ্যালেন তাঁদের উদ্দেশে গৌরী দেবী বক্রোক্তি করেছেন। বলেছেন, সেই জটের ফাঁস ছাড়াতেই নাকি তাঁদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। মূল বিষয় (অর্থাৎ আমার বই) থেকে স'রে এসে তাঁর সমালোচনার এই অংশে তিনি বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে আধুনিক মেয়েদের ঠুকেছেন। বুঝতে পারছি না এই আক্রমণের লক্ষ্য কতটা আমি, কতটা অন্যরা। *পরমা* নামটার উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। বৃটিশ টেলিভিশনের কল্যাণে অপর্ণা সেনের যে-দুটি ছবি দেখেছি সে-দুটি খুবই ভালো লেগেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ *পরমা* ছবিটাই আমার কখনো দেখার সুযোগ হয় নি, যদিও অনেকের কাছেই তার প্রশংসা শুনেছি। সেই ছবি নিজের চোখে না দেখে অপর্ণা সেখানে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বলা শোভা পায় না। আমি কেবল আমার বইয়ে কী বোঝাতে চেয়েছি তার আভাস দিতে পারি। গৌরী দেবীর ভাষার জের টেনে বলা যায়, নারীর মুক্তিযুদ্ধে শয্যা কখনোই একমাত্র 'রণক্ষেত্র' হতে পারে না, তবে তা অন্যতম রণক্ষেত্র। প্রেম ও কর্ম দুয়েরই প্রয়োজন থাকে জীবনে, এবং দুয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় যোগও থাকে। অন্তর্লীন প্রেমজীবন থেকে জীবনের সৃষ্টিশীলতা প্রবাহিত হয়। ভালোবাসতে পারার ক্ষমতাই ভিক্তোরিয়ার জীবনের সমস্ত শক্তির উৎস, যদিও প্রেমের বেদনা তাঁকে ছিন্ন করেছে। প্রেম পুরুষের সৃজনশীলতাকে কিভাবে প্রেরণা দেয় রবীন্দ্রনাথ সে-কথা বারে বারে বলেছেন। নারীর সৃষ্টিশীলতার বিকাশেও প্রেমের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই সত্যটার প্রকাশ্য স্বীকৃতির জন্য আজকের মেয়েরা যদি লড়াই করেন তো তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। দরিদ্র মেয়েদের অন্য লড়াইগুলির জন্য আমার গভীরতম সহানুভূতি বর্তমান; গৌরী দেবী আমার অন্যান্য লেখা পড়লে তার পরিচয় পেতেন।

জীবনের অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমারও আছে। কিন্তু প্রেমের প্রয়োজন কেবল উঁচুতলার মেয়েদের একচেটিয়া নয়। দরিদ্র মেয়েদের জীবনেও যে প্রেমের প্রয়োজন থাকে তা সমাজসেবিকা গৌরী দেবী নিশ্চয় জানেন। এই প্রয়োজন সর্বজনীন।

গৌরী দেবী রবীন্দ্রনাথের চরিত্র মৃণালের কথা তুলেছেন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অবশ্যই তারিফ করবার মতো, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, যৌথ পরিবারের গণ্ডির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেও, শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করা ছাড়া মৃণাল আর কী কী করবে তা আমরা জানি নে, গল্পে তার হদিস নেই। কাহিনীর শেষে সে যে মীরাবাঈ থেকে উদ্ধৃতি দেয়, এ থেকে হয়তো ধ'রে নেওয়া যায় যে ধর্মীয় জীবনকে আশ্রয় ক'রেই সে বাঁচবে। সে হয়তো বাঁচবে মীরার মতো ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত সাধিকা হয়ে। কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রেম ও কর্ম যে ঢের বেশী ইহজাগতিক হবে, এমনটাই তো প্রত্যাশিত।

আমার উপন্যাসের নায়িকা কিন্তু অনেক কিছু করছে। সে স্প্যানিশ শিখছে, লাদিনো গান অনুবাদ করছে, যে-গবেষণা বঙ্গের অন্যান্য পণ্ডিতরা করলেন না এই মেয়েটি তার দায়িত্ব নিয়েছে। তার 'লাভ্ লাইফ', 'লাভ্স্ অফ লাইফ' : দুটোকেই সে সামলাচ্ছে; প্রথমটার জট ছাড়াতে গিয়ে মোটেও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে যে তার প্রেমজীবনের অভিজ্ঞতা তাকে যে-অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছে সেটাকে সে তার অনুসন্ধানে বিশ্লেষণে কাজে লাগাতে পারছে। তাই জানি না হঠাৎ কেন গৌরী দেবী তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন : 'এর পরেও কি আমাদের বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হবে এক শয্যার পরিবর্তে একাধিক শয্যায় আমাদের অধিকার সাব্যস্ত করতে ?' এখানে তিনি কাকে ঠুকেছেন তা বুঝতে পারছি না, কেননা আমার নায়িকা তো ওভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমাকেই ঠুকেছেন নাকি ? আমি ওভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছি এমন কোনো খবর কি তিনি পেয়েছেন ?

হ্যাঁ, অবশ্যই : 'অত্যাধুনিক কাহিনীতেও' একটি মেয়ের পক্ষে প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা যে কত কঠিন তার আভাস দেবার প্রয়োজন থাকে। এটা কোনো 'অভিমানী অভিযোগ' নয়, সত্যের স্বীকৃতিমাত্র। এই দেখুন না কেন, এই যে আমি ঐ বইটা লিখেছি— সেই লিখনকর্মও কি আমার (গ্রন্থকর্ত্রীর) ব্যক্তি হয়ে ওঠার অঙ্গ নয় ? এবং আপনারা সকলে দেখতেই পাচ্ছেন এই 'হয়ে ওঠা' কত সুকঠিন, কেননা গ্রন্থপ্রকাশের ছ' বছর বাদে আজও আমাকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এবং 'ব্যক্তি হয়ে ওঠা' বজায় রাখার জন্য, তারই নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্বপালনে,— পালিয়ে না গিয়ে, তীর্থে না ছুটে, নিঃশেষ না হয়ে,— পয়েন্ট ধ'রে ধ'রে সমালোচনার জবাব দিতে হচ্ছে।

আমি নিশ্চয়ই মানি যে পুরুষদের পক্ষেও প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা নেহাৎ সহজ নয়, তাদের আত্মবিকাশের পথও গোলাপের পাপড়িতে ছড়ানো নয়। বাড়ির ভিতরে, বন্ধুদের মধ্যে, বৃহত্তর সমাজে— সর্বত্রই কি অহরহ তাদের আত্মবিকাশের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছি না ? তবু তুলনামূলক বিচারে বলতেই হয় যে এখনও পর্যন্ত তাদের লড়াইয়ের চাইতে মেয়েদের লড়াইটাই বেশী রক্তাক্ত— প্রায় সব দেশেই। প্রায় সমস্ত সমাজেই ক্ষমতার

আসল কলকব্জা এখনও পর্যন্ত পুরুষদেরই হাতে। গৌরী দেবী ভালোভাবেই জানেন যে দরিদ্রদের মধ্যেও মেয়েরা দরিদ্রতর একটি দল। ওখানে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার বইয়ের সমালোচনা লিখতে ব'সে বেমক্কা 'উইমেন্স লিবের শৌখিন পাঁয়তারা'কে ঠোকা, বা যাঁরা 'সেমিনারে, সিম্পোসিয়ম-ওয়ার্কশপে নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন নানা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফাউনডেশানের অর্থানুকূল্যে' তাঁদের আক্রমণ করা, বা যে 'গুটিকয় কৃতী মহিলা মই বেয়ে সমাজের সর্বত্র মগডালে উঠে পড়েছেন' তাদের উপরে হঠাৎ খেপে ওঠা বিসদৃশই দেখাচ্ছে, কেননা আমার বইটা কোনো উইমেন্স লিবের শৌখিন পাঁয়তারাও নয়, আমি কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে লড়াই করতেও নামি নি, আর আমি মই বেয়ে কোনো সমাজের মগডালেও চাপি নি, চাপতে চাইও না।

জানি না কেন গৌরী দেবীর এমন ধারণা হয়েছে যে ভিক্তোরিয়া 'তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, বিবাহ, পুরুষসংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে ... শক্ত হাতে মোকাবেলা করার পর সেসবকে অতিক্রম করে চলে যেতে পেরেছিলেন দূর-দূর ক্ষেত্রে'। ভিক্তোরিয়ার জীবনের প্যাটার্নটা মোটেও ওরকম নয়। সেখানে প্রেম আর কর্মের মধ্যে মোটেও ওরকম কোনো আগে-পরে নেই। দুটোই এগিয়েছে মোটামুটি হাত ধরাধরি ক'রে। প্রেমের বেদনায় ছিন্ন হতে হতেই তিনি কাজ করেছেন,— ব্রহ্মচারিণী হয়ে গিয়ে নয়। একেকজন পুরুষের সান্নিধ্য তাঁর আত্মবিকাশের ও কর্মজীবনের একেকটি নতুন দিগন্তকে খুলে দিয়েছে। এটাই তাঁর জীবনের প্যাটার্ন। আমি জানি, ডরিস মায়ারের বইটাতে এই জিনিসটা খানিকটা চাপা পড়েছে। যেন অপরিণামদর্শী বিবাহ, জনৈক আইনজীবীর সঙ্গে গোপন প্রণয়, এবং তিনজন পৃথিবীখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মোকাবিলার পর তিনি শুধুই তাঁর কর্মজীবনকে নিয়ে থেকেছেন, পুরুষের প্রেমে সেই জাঁদরেল মহিলাকে আর নাকানি-চোবানি খেতে হয় নি। এই ধারণা সর্বাংশে ভ্রান্ত। আমার ইংরেজী বইটাতে এই ভ্রান্তিনিরসনের কিছুটা চেষ্টা করেছি, কিন্তু যেহেতু সেখানেও খুব সংযতভাবেই কলম চালিয়েছিলাম, কোনো বাড়াবাড়ি করি নি, তাই সেই বইয়ের দ্বারাও সকলের ভ্রান্তি দূর করা যায় নি। পরে আমার ইংরেজী বইটার সমালোচনার সূত্রে এ বিষয়ে আরও কিছু খবর দিয়েছিলাম *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার ৯ : ৩ সংখ্যায় ; অনুসন্ধিৎসুরা দেখে নেবেন।[২]

এ কথা ঠিক যে *সুর* পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভিক্তোরিয়া তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে একটা বিরাট আশ্রয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর 'লাভ্ লাইফ' থেমে থাকে নি। তাঁর তিরিশের দশকের বিবর্তনের আলোচনাসূত্রে ফরাসী লেখক দ্রিয় লা রশেল-এর সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের কথা আমার ইংরেজী বইতে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ বিষয়ে ভিক্তোরিয়া খোলাখুলি লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীর পঞ্চম খণ্ডে, যেমন তাঁর প্রথম অসামাজিক প্রণয়ের কথা লিখেছেন চাঞ্চল্যকর তৃতীয় খণ্ডে। দ্রিয়র পরেও আর্জেন্টাইন লেখক এদুয়ার্দো মাল্লেয়া ও ফরাসী লেখক রজে কাইওয়া তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এগুলি বন্ধুত্ব বটে, প্রেমও বটে। এসব বিদিত তথ্য। রজে কাইওয়ার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে আমি নিজে প্যারিসে ইন্টারভিউ করেছিলাম। এঁরা ছাড়া আরও দু'-একজন

ভিক্তোরিয়ার প্রেমিক হয়েছিলেন। শুনেছি পূর্বপ্রত্যাখ্যাত অর্তেগাও অবশেষে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

কথা হচ্ছে, রক্ষণশীল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভিক্তোরিয়ার জীবনের এই দিকটাকে কোনোমতেই বোঝা যাবে না। নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে, তার সৃজনশীলতার প্রস্ফুটনে যৌন প্রেমের ভূমিকা ভারতীয় সমাজে স্বীকৃতি পায় নি। মেয়েদের কর্মে অধিকার সহজেই স্বীকৃতি পেয়েছে, কেননা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, গীতার বচনের সঙ্গে তাকে অনায়াসেই খাপ খাওয়ানো যায়। এমন কি, সেই সুযোগে মেয়েদেরকে দিয়ে আরও বেশী ক'রে খাটিয়ে নেওয়া যায়। এর ফলে মেয়েরা আজকে ঘরে-বাইরে আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ বেশী খাটছেন। কিন্তু মেয়েদের প্রেমে অধিকার, প্যাশনে অধিকার, প্লেজারে (pleasure) অধিকার ভারতীয় সমাজে স্বীকৃতি পায় নি। যারা সেই স্বীকৃতির জন্য লড়ছে, তাদের কি গৌরী দেবীদের মতো নিরলস বিবেকী সমাজকর্মীদের হাতে ইঁট-পাটকেল খেতে হচ্ছে না? এই আলোচনাই কি তার প্রমাণ নয়?

এই ব্যাপারে গৌরী দেবীর আর আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূলগত প্রভেদ থাকায় আমার বাংলা বইটার উপন্যাস-অংশের রসগ্রহণ তিনি করতে পারেন নি। একজন আধুনিক মেয়ে কেমন হয়, তার কেমন হওয়া উচিত— সে-বিষয়ে তাঁর মনের মধ্যে একটা স্টিরিওটাইপ তৈরি হয়ে আছে। সেই ভাবমূর্তি পিউরিটান ছাঁচে গড়া, মনে হয় ব্রাহ্ম মডেলেরই বিবর্তন। সেই আদর্শ মেয়েটি অভিমানের ভাষা ব্যবহার করে না, পুরুষদের কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে, তাদের 'শক্ত হাতে' দমন ক'রে কাজের দিকে এগিয়ে যেতে জানে। আমার নায়িকা তার সঙ্গে মেলে না। তাই তাঁর মনের আয়নায় অনামিকা নামে মেয়েটির যথোচিত প্রতিফলন হয় নি। তিনি তাকে পদে পদে ভুল বুঝেছেন। সেই সব খুঁটিনাটির মধ্যে যাবার আগে গ্রন্থমধ্যস্থ সাধুভাষার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু ব'লে নিই।

§

বইয়ের মাঝখানে দুটি অধ্যায়ে কেন সাধুভাষা ব্যবহার করেছি, গৌরী দেবী এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেন এটা করেছি? না, তিনি যা-যা ভেবেছেন, তা নয়। এটা প্রধানতঃ একটা শৈলীগত, নান্দনিক সিদ্ধান্ত। সংগীতে নৃত্যে অভিনয়কলায় সিনেমায় মেজাজ ও লয়ের বদলের, একটা 'মুভমেন্ট' থেকে আরেকটা 'মুভমেন্ট'-এ চ'লে যাবার যে-অবকাশ থাকে তাকে আমি নিছক শব্দশিল্পী হিসাবে বরাবরই ঈর্ষা করি। আমার একটা ইংরেজী কবিতায় একবার লিখেছিলাম : 'Music's more eloquent...'। নানান মাধ্যমের শিল্পকলার রসগ্রহণ ক'রে বেড়াই ব'লেই শব্দদের সীমাবদ্ধতা আমাকে প্রায়ই পীড়া দেয়। বিষয়বস্তু একটা লয়-বদল দাবি করছে, কিন্তু শব্দদের মাধ্যমে তাকে কিভাবে বোঝানো যায়? আমার তাগিদটা যেন সিম্ফনিক, কিন্তু সিম্ফনি তো লিখছি না, লিখছি উপন্যাস। হঠাৎ ওখানে একটা নতুন বাদ্যযন্ত্র ঢুকিয়ে দেবো, তার তো কোনো অবকাশ নেই। তা হলে একটা সম্পূর্ণ নতুন ছন্দের

ইঙ্গিতকে— বিষয় যা দাবি করছে— ভাষায় কিভাবে চারিয়ে দেওয়া যায়? সৌভাগ্যবশতঃ বাংলায় চলিতভাষা থেকে সাধুভাষায় চ'লে যাবার সুযোগ আছে। টেকনিক হিসাবে সেটিকে গ্রহণ করলাম। ওখানে সাধুভাষার আকর্ষণ প্রধানতঃ তৎসম শব্দদের জন্যে নয়। তৎসম শব্দ আমি দরকার পড়লেই ব্যবহার ক'রে থাকি, তা নিয়ে আমার কোনো সংকোচ বা মাথাব্যথা নেই। আমার কাছে ওখানে সাধুভাষার প্রধান আকর্ষণ ছিলো তার আকারে দীর্ঘতর ক্রিয়াপদগুলির মন্দমন্থরতর গতি (বলতে পারেন 'গজগমন'), তার ধীরতর অলংকৃততর রাজকীয়তর ছন্দ। ঐ পরিবর্তনের সাহায্যে আমি আমার বিবৃতিতে একটা অন্য মাত্রা আনতে চেয়েছিলাম, যা বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে খাপ খায়। একই সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলাম আয়রনির একটা সূক্ষ্ম আভাস। অনামিকা তার এই এনকাউন্টারটার কাছে যে-প্রত্যাশা নিয়ে এসেছে তা এই মুহূর্তে তাকে কিছু দিলেও তা যে প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ হবে না— তারই একটা ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলাম। সে এখনও তা জানে না, কিন্তু ঐ রাত্রিটুকুর আর পুনরাবৃত্তি হবে না। তা ক্রমশঃ দূরে চ'লে যাবে, ঠিক যেমন সাধুভাষা আমাদের জগৎ থেকে দূরে চ'লে গেছে। কেবল অনামিকার স্মৃতিতেই তার অস্তিত্ব থাকবে। তাই আমি তার ঐ অভিজ্ঞতাটার চার দিকে একটা গণ্ডি টেনে দিতে চেয়েছিলাম, ছবি আঁকা হয়ে গেলে চিত্রশিল্পী যেমন তাকে ফ্রেমে বেঁধে ফেলতে পারেন— অনেকটা সেইভাবেই। আমার সাধুভাষা সেই গণ্ডি, সেই ফ্রেম। তার ভিতরে যা রইলো তার একটা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু তা তখনই দূরে স'রে যাচ্ছে।

বেশ কিছু পাঠক কিন্তু এই অধ্যায়দুটির শৈলীকে মনোজ্ঞ মনে করেছিলেন। কলকাতার একটি ইংরেজী কাগজে একজন পাঠক তাঁর ভালো-লাগাকে ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে :

> ... this reader will cherish these pages as one of the boldest and most sensitive portraits of a tense, turbulent night when the conflicting motives of lovers crisscrossed in between copulations to reveal two differing hearts behind a common craving.

অবশ্য গৌরী দেবী এই প্রতিক্রিয়াকে একজন 'মুগ্ধ' পাঠকের প্রশস্তি ব'লে উড়িয়ে দিতে পারেন।

§

এবারে আসছি উপন্যাস-বিষয়ে গৌরী দেবীর মন্তব্যগুলির খুঁটিনাটিতে। এক জায়গায় আমার 'দৈব' শব্দের ব্যবহারে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'দেখা- যাচ্ছে ইমানসিপেটেড মহিলারাও প্রয়োজনমত দৈবের উপর খানিকটা দায়িত্ব চাপিয়ে আরাম বোধ করেন।' 'দৈব' বলতে ওখানে ভাগ্য বা অদৃষ্টকৃত আপতিক ঘটনাসমাবেশকেই বোঝানো হয়েছে। আমাদের

জীবনের অনেক ঘটনাতেই ভাগ্যের আশ্চর্য খেলা দেখা যায়, যার ফলে আমাদের জীবন বদলে যায়, মোড় নিয়ে নেয়— এ কথা কি অস্বীকার করা যায় ? এর পর 'একজন স্বাধীন আধুনিক মহিলার মুখে' সামান্য একটু অভিমানের ভাষাও তাঁর কানে 'বেমানান' ঠেকেছে। কিন্তু আমি তো উপন্যাস লিখছি, আদর্শ চরিত্রের মডেল তো তৈরি করছি না। মান-অভিমানের ভাষাকে বাদ দিয়ে যে কোনো প্রীতির সম্পর্ক হয়, তা তো আজ অবধি দেখলাম না। কী মুশকিল, আমি তো দেখেছি পুরুষরা পর্যন্ত অভিমান করে। আর ভিক্টোরিয়া নিজে কী-আন্দাজ অভিমানিনী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের উপরেও কত অভিমান করেছেন। আর হ্যাঁ, অনামিকা অশনিকে অবশ্যই 'ব্যবহার' করতে চায় না। সে ব্যবহৃতও হতে চায় না, কাউকে ব্যবহার করতেও চায় না।

গৌরী দেবী তাঁর সমালোচনায় 'মোহ্-অঞ্জন' আর 'মোহমুক্ত' শব্দদুটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা আমাদের সংবেদনের পার্থক্যের সূচক। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ একরকমের কেমিস্ট্রি : মোহের অঞ্জন তার মধ্যে থাকবেই। জীবনের এই সত্যটাকে কী ক'রে উপেক্ষা করি ? আমি তো হিতোপদেশ লিখতে বসি নি।

তার প্রাক্তন রতিকুশলতা সম্পর্কে অশনির প্রভাতী মন্তব্যটি কখনোই 'উল্লসিত' মেজাজে নয়, একটা স্মৃতিবিধুর নস্টালজিয়ার মেজাজে। ওখানে গৌরী দেবী আমার ভাষার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে ধরতে পারেন নি। ঐরকম একটা স্বীকারোক্তি পুরুষরা কখনোই উল্লসিত মেজাজে করবে না, তার মধ্যে একটা বেদনা থাকবে। পুরুষ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন— এর বেশী আর কী বলতে পারি ? অনামিকার প্রভাতী বিষণ্ণতাই বা গৌরী দেবীর কাছে এত দুর্বোধ্য ঠেকেছে কেন জানি না। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মেজাজের যে-ওঠানামা দেখিয়েছি, আমার কাছে সেইটেই স্বাভাবিক। তা ছাড়া 'রমণোত্তর বিষাদবোধ' মনস্তত্ত্বেও স্বীকৃত।

জন স্টলওয়ার্দির কবিতা থেকে বরফ-পড়া বিষয়ে যে-লাইনগুলি অনামিকা আওড়ায়, তাদের তাৎপর্যও গৌরী দেবীকে এড়িয়ে গেছে মনে হয়। তিনি প্রশ্ন করেছেন : 'আধুনিকারাও এত অল্পে "bruised" হন ?' বস্তুতঃ ঐ উদ্ধৃতিতে পৃথিবীর বিক্ষত অবস্থার কথাই বলা হচ্ছে, আর যে-মানবিক ক্ষতিবোধের ইঙ্গিত অভিপ্রেত তা নায়িকার অকালবৈধব্যের। তার সেই ব্যথার উপরে নতুন অনুরাগের প্রলেপ পড়ছে, তাকে শান্তি দিচ্ছে— তুষারপাতের মতো। কিন্তু এখানেও একটা আয়রনি আমার অভিপ্রেত : এই অনুরাগ তাকে শান্তি দেবে না। উদ্ধৃতিটুকুতে কবি-ব্যবহৃত প্রেমবাচক ইংরেজী শব্দটি থাকায় ঐ পবিত্র শব্দটির অপবিত্রীকরণে গৌরী দেবীর 'সেকেলে মন হায় হায়' ক'রে উঠেছে। এদিকে আমার 'একেলে মন' যে বলছে : হায় হায়, গৌরী দেবী যে দেখছি প্রেমের কাহিনীর আলোছায়া বোঝেন না— মোহবন্ধন বা মায়ার খেলার মধ্যে ধরা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে একটু একটু ক'রে তা'ল কেটে যাওয়া আরম্ভ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাল কেটে গেলেও যে সত্যিই প্রেমে পড়েছে সে যে সুরটাকে অনেকক্ষণ ধ'রে

রাখতে চেষ্টা করে, তার কানে সেই রেশ যে অনেকক্ষণ লেগে থাকে, এগুলো তো মনস্তাত্ত্বিক সত্য।

একেকসময় তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা বোঝাতে গিয়ে গৌরী দেবী বহুবচনের আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে তিনি সুবিধা নিচ্ছেন। নিজে সমালোচনা লিখছেন, নিজের কথা বলুন, বা বড় জোর বলতে পারেন : 'আমি আর আমার বন্ধুরা মনে করি' ইত্যাদি। কিন্তু গৌরবে সার্বিক বহুবচন ব্যবহার করাটা তাঁর পক্ষে সমীচীন নয়। সব পাঠকের প্রতিভূ তো তিনি নন।

মারগ্রিট যখন ব্রাইটনে বেড়াতে আসে তখন অশনির সঙ্গে তার সম্পর্ক যে ঠিক কিরকম তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। সে অশনির শয্যাসঙ্গিনীরূপেই এসেছে কিনা তা সঠিক জানা যায় না। সেখানে একটা কুয়াশা আছে। সেটাই আমার অভিপ্রেত। হয়তো ব্রাইটনে থাকাকালেই সে প্রথম অশনির শয্যাসঙ্গিনী হয়, কিন্তু সেটাও হলফ ক'রে বলা যায় না। টয়লেটের জলে যে-জন্মনিরোধকটা ভাসছে সেটা কিছুই প্রমাণ করে না। সেটা যে অশনিরই পরিত্যক্ত তা বলা যায় না, কেননা সেটা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ছাত্র জেফ্-নামক যুবকটিরও কীর্তি হতে পারে— তার বৌ ম্যাণ্ডি তাকে দেখতে এসেছে। এই দ্ব্যর্থকতা আমার অভীষ্ট নকশার অন্তর্গত। আমি দুঃখিত যে এই সব খুঁটিনাটির ইঙ্গিত গৌরী দেবীকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে।

অনামিকার মুখে আমি যে-কথা সাবালিকার ক্রোধের ভাষা হিসাবে বসিয়েছি সেটা গৌরী দেবীর কানে 'খণ্ডিতা নারী'র, 'চিরকালের এক্সপ্লয়টেড সামান্যা মেয়ের' কপাল চাপড়ানোর মতো মনে হয়েছে। এখানে নাকি 'আধুনিক স্বাধীন রমণীর গুমর ... খানখান হয়ে' গেছে, তাঁর নাকি পড়তেই লজ্জা করে। কিন্তু তিনি এখানে আমার ভাষার ব্যঞ্জনাই ধরতে পারেন নি। অনামিকা এখানে কপাল চাপড়াচ্ছে না, সে চ'টে গেছে। আবার, চ'টে গেছে ব'লেই যে সে পরমুহূর্তে পাততাড়ি গোটাবে এইটে ভাবলে মানুষের মনকে বোঝা হয় না। আধুনিক মেয়ে হওয়া মানে কোনো কাগজের মানুষ বা যান্ত্রিক পুতুল হওয়া নয়, কোনো কাটা-ছাঁটা ফর্মুলার অনুসরণ নয়। গৌরী দেবী লিখেছেন, 'কিন্তু বুঝতে পারি না, অনামিকার আশা করার ক্ষমতা অসীম, না তার নির্বুদ্ধিতা।' প্রেমে পড়লে মানুষের আশা করার ক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তার আচরণ অপরাপর সামাজিক জীবদের কাছে নির্বুদ্ধিতার মতো ঠেকে— এইটেই জীবনের বাস্তবতা। একজন আধুনিক মেয়ে যখন প্রেমে পড়ে, তখন তার মধ্যেও এই সামান্য লক্ষণ ফুটে ওঠে। অশনি না প'ড়ে থাকুক, অনামিকা তো প্রেমে পড়েছে। সে তো একরাত্রির মোলাকাত চায় নি, একটা সম্পর্ককেই গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে। প্রেম তো তার কাছে দর কষাকষির ব্যাপার নয়। তাই ক্ষণে ক্ষণে তালভঙ্গ হতে থাকলেও তার আলেয়াকে সে যে আরও কিছু দূর অনুসরণ করবে, অশনিকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করার জন্য ঝাঁটা হাতে ধেয়ে যাবে না— এটাই প্রত্যাশিত। হাজার হোক, যে গবেষণায় অধ্যবসায়ী, তার পক্ষে প্রেমেও অধ্যবসায়ী হওয়াটা বিচিত্র নয়। কিন্তু গৌরী দেবীর কাছে এই অধ্যবসায় দুর্বোধ্য। তিনি বিরক্ত হন এই দেখে যে 'যথাস্থানে মানে মানে

নিরস্ত হওয়া' অনামিকার 'স্বভাবে নেই'। না, নেই; ঐ যে তার নিজের বক্তব্য বোঝানোর তাগিদ— ওখানেই সে আধুনিকা, গৌরী দেবীর মনের ভিতরে যে-মডেলটা আছে তার নিয়ম মেনে নয়, ভিন্ন এক মডেলের আধুনিকা। সেখানে ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গেই তার সাদৃশ্য। তিনিও মানে মানে নিরস্ত হওয়ার মেয়ে ছিলেন না।

বিরহের 'কাল্ট' সম্বন্ধে অনামিকার বিশ্লেষণটা গৌরী দেবীর কাছে 'অসহ্য ধৃষ্টতা' ব'লে মনে হয়েছে। অথচ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিস্পানিক হরাইজন' পত্রিকায় অধ্যাপিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-কৃত সমালোচনায় এই বিশ্লেষণটি সপ্রশংস উল্লেখ পেয়েছিলো। শুনেছি ভারতীয় উপন্যাস হচ্ছে সুপণ্ডিত বহুভাষাবিদ্ মীনাক্ষী দেবীর বিশেষ চর্চার ক্ষেত্র। তাঁর কাছ থেকে প্রশংসামূলক সমালোচনা পেয়ে গর্বই বোধ করেছিলাম। হায়, তিনিও কি আমার একজন 'মুগ্ধ' পাঠিকামাত্র? গৌরী দেবী দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন, 'আমার কষ্ট হয়েছে এই জন্য যে এমন সংবেদী লেখিকার কাছ থেকে আমি আর-একটু সফিস্টিকেশান প্রত্যাশা করেছিলাম।' কিন্তু উপন্যাস আর গবেষণার রেখাগুলো পরস্পরকে কোথায় কোথায় কাটে তা যদি তাঁকে বোঝাতে না পেরে থাকি, তা হলে 'সংবেদী লেখিকা' আর হলাম কিসে? সে-ক্ষেত্রে ও কথা বললে আমাকে ব্যঙ্গই করা হয়। বরং এ কথা বললেই অকপটতর হতো যে তাঁর চোখে আমি 'সংবেদী লেখিকা' হয়ে উঠতে পারি নি। ওদিকে মীনাক্ষী দেবী যে তাঁর রিভিউ-এ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন:

> It is difficult to summarize the complex argument about feminine identity and female sexuality that is spread over nearly a hundred pages in the book touching upon a wide range of human thought ..., but it indicates the maturity and complexity of argument that is the hallmark of the book.

তিনি যে এই বইকে বলেছিলেন 'a powerful book that defies categorization'? তা হলে কোন্ সমালোচক ন্যায্য কথা বলছেন? কে বেশী নির্ভরযোগ্য, কে সঠিক পথের দিশারী? আমিও কি উল্টে বলতে পারি না— 'গৌরী আইয়ুবের মতো মননশীল সমালোচকের কাছ থেকে আমি আরেকটু সফিস্টিকেশন প্রত্যাশা করেছিলাম'?

আসলে গোলমালটা কেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে গৌরী দেবীর একটা আগ্রহ আছে; তাই তাঁর সম্পর্কে গবেষণাটুকু তাঁর কাছে গ্রহণীয়। 'চপলতার স্পর্শ'টুকু বাদ দিয়ে সেই অংশটা তিনি নিতে পারেন নীর বর্জন ক'রে ক্ষীর গ্রহণের মতো। অবশ্য আমার ধারণা, গুরুদেব অনামিকার মেয়েলী চপলতাটুকুও ক্ষমা ক'রে দিতেন। এদিকে উপন্যাসটাকে কিন্তু গৌরী দেবীর নেহাৎ 'পরগাছা' ব'লেই মনে হয়েছে। অনামিকা মেয়েটাকে তাঁর একদম বাজে লেগেছে। অশনির সঙ্গে তার অপরিণামদর্শী ঘনিষ্ঠতার কাহিনীটা তাঁর শুচিতাবোধকে পীড়া দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার গল্পটা 'মানবিক-সাহিত্যিক আবেদনে কী অসম্ভব সুন্দর', আর অনামিকার গল্পটা এত খারাপ যে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন: 'কী বস্তু যে এই

গবেষণার গায়ে লেপটে দেওয়া হয়েছে ...'। তাঁর লেখা প'ড়ে মনে হয় আমি যেন পূজার ফুলের গায়ে ইচ্ছে ক'রে বিষ্ঠা লেপ্‌টে দিয়েছি। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেবার সময়ে তাঁর কলম সরছিলো না— এমনই অপবিত্র আমার উপন্যাসটা। তবু কোথায় তাঁর আপত্তি তা বোঝাবার জন্য তিনি স্পষ্টোক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। কেন যে কবি ও বিজয়ার ঐ গল্পে আমি 'খাদ' মেশাতে গেলাম? এখন এটাই তো গৌরী দেবী আর আমার মধ্যস্থ ইডিওলজিগত ব্যবধান। ঐ নামী দুজনের গল্পটা সোনা আর অন্য দুজনের গল্পটা খাদ— আমার বই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু জানতেন যে একটা জায়গায় আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।

গৌরী দেবীকে অনুরোধ করছি, তাঁর অবস্থান যে কতদূর আয়রনিকাল তা একটু চেষ্টা ক'রে বুঝে নিতে। প্রেমজীবনের অসামাজিকতাই যদি বিচারের নিকষ হয়, তা হলে ভিক্তোরিয়া আর অনামিকার মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। ভিক্তোরিয়ার প্রেমজীবন সামাজিক নিয়মের ধার ধারে নি; পরবর্তী কালের কথা যদি ছেড়েও দিই, তবু মনে রাখা যেতে পারে যে ঐ ১৯২৪ সালে, রবীন্দ্রনাথকে অতিথিরূপে পাবার সময়ে ভিক্তোরিয়া যে-মানুষটির গোপন প্রণয়িনী, তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর 'কাজিন', অর্থাৎ ভারতীয় বিচারে মানুষটি তাঁর 'তুতো' সম্পর্কের ভাশুর বা দেওর। এতে আমার কিছুই যায়-আসে না, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমে না, কিন্তু মানতেই হবে যে রক্ষণশীল বিচারে ভিক্তোরিয়া 'কুলবতী নারী' ছিলেন না। তিনি কবির বিজয়া ব'লে পার পাবেন, আর বেচারী অনামিকা তার সংক্ষিপ্ত ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য নিন্দিত হবে, এই দুজনের জন্য দু'-রকমের মানদণ্ড আমার কাছে অগ্রাহ্য।

গৌরী দেবীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার কাহিনীর সমান্তরালে অশনি-অনামিকার কাহিনীটা পরিবেশিত হতে পারে না— 'যৌক্তিক, নান্দনিক কোনো বিচারেই'; পাঠকদের ঐ জিনিসটা গিলিয়ে আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতাভাজন হই নি। আমার বিবেচনায় তাঁর এই বিচার বালির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর যুক্তি যে নান্দনিক নয়, এক ধরনের শুচিবায়ু, এ কথা তিনি স্বীকার করবেন না তা আগে-ভাগেই ব'লে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করুন, বা নাই করুন, তাঁর বিচারপদ্ধতিটা সত্যিই নান্দনিক নয়, তাঁর বিশেষ ঘরানার শালীনতাবোধের প্রয়োগমাত্র। আর সেই শালীনতাবোধের মাপকাঠিটাও কার্যতঃ বালিতে ডুবে যাচ্ছে। ভিক্তোরিয়া তাঁর স্বামীর জীবৎকালে স্বামীর তুতো-ভাইয়ের গোপন প্রেমিকা; অনামিকা বিধবা, তার প্রেম অন্বেষণ অবৈধ নয়, সে একটি রাত একজনের সঙ্গে কাটিয়েছে। কে বেশী 'খারাপ মেয়ে' তা কি মেপে দেখানোর কোনো উপায় আছে?

গৌরী দেবীর নীতিবোধ তাঁর: তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু তাঁর বিচার সাহিত্যসমালোচনা হয় নি। এই বইয়ের উপন্যাস-অংশটার প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি। এর মধ্যে অনেক খুঁটিনাটির কাজ আছে: কারুণ্য আছে, কৌতুক আছে, একটা বিশেষ আবহ আছে, গার্হস্থ্য জীবনের ছবি আছে, কিশোর-কিশোরীদের আর প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের প্রতিকৃতি আছে, লাদিনো গানের গীতলতার সাহায্যে বইটার দুটো দিকের মধ্যে

সাঁকো বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কোনো-কিছুকেই তিনি পাত্তা দেন নি। নৈতিক কারণে অনামিকাকে তাঁর ভালো লাগে নি ব'লে পুরো গল্পটাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু সাহিত্যসমালোচনা ওভাবে হয় না। উপন্যাসটা যদি খারাপ মনে হয়ে থাকে, তবে তা কেন খারাপ? সমকালীন অন্যান্য বাংলা উপন্যাসের পাশাপাশি কিসে নিকৃষ্ট? আমার নিজের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি কোথায় কোথায় ত্রুটিযুক্ত? তিনি নিজেই আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'কৃতী সাহিত্যিক' হিসাবে। এ বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা শোভনই হতে পারে না। কেবল তর্কের খাতিরে তাঁর কথা মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে: তা বেশ তো, তা যদি হয়, কোনো কৃতী সাহিত্যিকের লেখা খারিজ ক'রে দেবার সময়ে সমালোচকের কিছু দায় থাকে কিন্তু। যেমন ধরুন, যে-জিনিসটা খারিজ ক'রে দিচ্ছেন সেটা আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। একজন প্রকৃত সাহিত্যসমালোচক কোনো কৃতী লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস খারিজ ক'রে দেবার সময়ে তাঁর প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখাবেন কেন দ্বিতীয় কাজটা তেমন ভালো হয় নি, তা কোথায় কোথায় দোষযুক্ত, কেন প্রথমটা জমজমাট আর দ্বিতীয়টা ফিকে। গৌরী দেবী এ-সমস্তর মধ্যেই যান নি। যদি তিনি সত্যিই আমার প্রথম উপন্যাসটার সঙ্গে দ্বিতীয়টা মিলিয়ে নিতেন, তা হলে দেখতে পেতেন যে দুটো বই-ই এক হাতের কাজ: প্রথম বইটাও আঙ্গিকের দিক দিয়ে পরীক্ষামূলক, অনামিকা নোটনেরই উত্তরসূরি। বইটার শেষে নোটন স্প্যানিশ শিখছে। সেই মেয়েটাও মানে মানে নিরস্ত হয় না, লম্বা লম্বা চিঠি লেখে, ডায়েরির পাতা ভরায়। তাকে ঘিরে আছে আরও কত বাক্‌সমর্থ মেয়ে। পূরবী আর সৌগতর পূর্বসূরিরাও ওখানে আছে। এমন কি, নোটন নামে মেয়েটাকে মিশ্রতার সপক্ষে পর্যন্ত সোচ্চার হতে দেখা যায়। তার বান্ধবী রোহিণীকে সে লেখে:

> সঙ্করতা আমার প্রিয়। যেসব জিনিস মিশ্র, দোআঁশলা, অবিশুদ্ধ, সেসব আমার বরাবরই পছন্দ, তুই তো জানিসই, রোহিণী। যখন একটার মধ্যে অন্যটার আভাস আসে, ছায়া দোলে, ছোঁয়াচ লাগে, সন্দেহ জাগে, তখন সে প্রপঞ্চের রহস্যময়তা বড্ড টানে আমাকে।

এই লাইনগুলিকে পরবর্তী বইটার 'মটো' বলা যায়, যদিও লাইনগুলি যখন লিখেছি তখন পরের বইটার কোনো আদরাও মাথায় রূপ নেয় নি।

কিন্তু গৌরী দেবীর কাছে এ ধরনের তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত অবান্তর, কেননা আমার সাহিত্যিক বিবর্তনে তাঁর কোনো কৌতূহলই নেই, তিনি মূলতঃ রবীন্দ্রকৌতূহলী। এ কথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে সাহিত্যিক কেতকীকে খানিকটা না বুঝলে আলোচ্য বইটা বোঝা যাবে না; যাঁরা প্রথমটাকে ফালতু কাজ মনে ক'রে বইটা থেকে শুধুই রবীন্দ্রবিষয়ক গবেষণাটুকু নিংড়ে নেবার চেষ্টা করবেন, তাঁরা তাঁদের সাচ্চা ছানাটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, কিন্তু তাঁরা পুরো বইটার যথার্থ বিচারক হয়ে উঠতে পারবেন না।

তাই গৌরী দেবী তাঁর জুন মাসের সমালোচনার একেবারে শেষে হীরে আর কাচের যে-তুলনাটা টেনে এনেছেন সেটা দিশারী নয়। তাঁর ভাষার জের টেনে বলি, না, হীরেজহরতের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমি কাচের বেসাতি ক'রেই খুশী। কাচ একটি মূল্যবান জিনিস— কাচের চুড়ি থেকে জলপানের গেলাস, শৌখিন মদিরাপাত্র থেকে বেলোয়ারী লণ্ঠন, আয়না থেকে চশমার কাচ, আলমারির কাচের পাল্লা থেকে জানলার শার্শি, কলঘরের জানলার ঘষা কাচ থেকে গির্জার জানলার রঙিন চিত্রময় কাচ: কত রকমের যে তার ব্যবহার। কাচকে বাদ দিলে ল্যাবরেটরি থেকে হাসপাতাল কিছুই চলবে না। কাচের প্রধান উপাদান হচ্ছে সিলিকন; তা দিয়ে তৈরি হয় সিলিকন চিপ্, যা কিনা আধুনিক ইলেক্‌ট্রনিক্সকে সচল রাখে। তাকে ছাড়া আজকের সভ্যতার চলবেই না। অতএব মনে করুন না কেন যে আমার ঝুড়িতে সবই কাচের জিনিস: কোনোটা সাদা বা ম্যাড়মেড়ে, কোনোটা রঙিন বা ঝকমকে, কিন্তু সবই কাচনির্মিত। আমি কাউকেই ঠকিয়ে হীরের সঙ্গে কাচ গছিয়ে দিতে চাইছি না, বরঞ্চ গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আমার প্রত্যেকটা মালই কাচের জিনিস। ইচ্ছে হলে নেবেন, নয়তো অন্য দোকানে যাবেন, কিন্তু একটু সাবধানে ব্যবহার করবেন, কারণ কে না জানে যে অসাবধান হলে কাচ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে পারে, আর তখন হাত-টাত কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে পারে।

§

এবার জুলাই মাসে প্রকাশিত গৌরী দেবীর লেখাটির সূত্রে আমার বক্তব্য রাখছি। অনুমান করি তিনি বাংলা বইটার দ্বিতীয় মুদ্রণ পড়েছেন। সেটি খুব তাড়াহুড়ো ক'রে করা, এবং ও ব্যাপারে আমার কোনো তত্ত্বাবধানও ছিলো না। কেন যে ঐ মুদ্রণটির এমন কালি-ধেবড়ানো চেহারা তা আমারও অজ্ঞাত।[৩] আর ইংরেজী বইটার 'নয়নশোভন' লে-আউটের কৃতিত্ব আমার স্বামীর। এ বইটার পাতাগুলির 'ক্যামেরা-রেডি কপি' আমরাই বাড়িতে তৈরি ক'রে দিল্লীতে পাঠিয়েছিলাম; সেখানে অফসেটে ছাপা হয়। এখানে ছাপার ভুল পেলে আমাকে দোষ দেবেন; টাইপ নির্বাচন আর পৃষ্ঠাগুলির বিন্যাসের দায়িত্ব ছিলো আমার স্বামীর। আমি খুশী যে এ ব্যাপারে গৌরী দেবীকে আরাম দিতে পেরেছি; আমি নিজেও বড় সাইজের টাইপ আর ফাঁক-ফাঁক ছাপা পছন্দ করি— আজকাল যা সহজে মেলে না।

ইংরেজী বইটার ছাপার প্রশংসার পরই আমাকে হোঁচট খেতে হয় একটি ব্যাপারে। গৌরী দেবী ফিরে গেছেন আমার বাংলা বইটাতে, এবং আমার ভাষাকে তুলোধোনা করেছেন। ভালো বাংলা গদ্য আমি নাকি মধ্যে মধ্যেই লিখে ফেলি— 'অসচেতনভাবে'! সব মাটি হয়ে যায় যখন খামখেয়ালবশতঃ 'কষ্টকৃত বাক্‌ভঙ্গি' এনে ফেলি! ওদিকে যাকে বলে 'রানীর ইংরেজী' সেটা নাকি আমি রীতিমতো ভালো লিখি। যা দেখছি, এর পর কলকাতা গেলে শুনতে হবে: 'বাংলাটা কেতকী ভুলেই গেছে, আর ওর ইংরেজী বইগুলো মন্দ নয়, কেননা ওগুলো ওর বরই লিখে দেয়।'

কোনো লেখকের স্টাইল কোনো পাঠকের ভালো লাগা বা না লাগার ব্যাপারটা অনেকাংশে রুচির প্রশ্ন, তবু দু'-একটি কথা এখানে বলা যায়। ইংরেজী বইটা অ্যাকাডেমিক গদ্যে লেখা। তার পিছনে একটা সুধীজনমান্য মডেল আছে। বাংলা বইটা ঢের বেশী পরীক্ষামূলক: তার মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখা তো আছেই, প্রবন্ধধর্মী লেখাও আছে, স্প্যানিশ আর ইংরেজী থেকে অনুবাদ আছে, অনুবাদকর্মের অসুবিধা নিয়ে আলোচনা পর্যন্ত আছে। লাদিনো গানের অনুবাদের কাজ দিয়ে বইটা আরম্ভ হচ্ছে; ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় ভাষান্তরের দুরূহতা সম্পর্কে মন্তব্যগুলি কি গৌরী দেবী খেয়াল করেছেন? সবিনয়ে নিবেদন করি, কোনো পাঠকের যদি হাল আমলের পরীক্ষামূলক বাংলা লেখার চাইতে অ্যাকাডেমিক স্টাইলের ইংরেজী গদ্যের সঙ্গেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে ইংরেজী বইটা পড়া সহজতর হতেই পারে। অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরই বেশীর ভাগ পড়াশোনা ইংরেজী ভাষায়: ইংরেজী গদ্য— সাংবাদিক বা বিদ্যাজাগতিক গদ্য— পড়তে তাঁরা অভ্যস্ত। আধুনিক বাংলা লেখা পড়তে তাঁদের অসুবিধা হয়। আবার এঁদেরই হাতে যদি কোনো অত্যাধুনিক ইংরেজী উপন্যাস বা কবিতার বই ধরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তেমন লেখা পড়তে এঁদেরও অসুবিধা হতে পারে। যাঁরা বাংলাভাষার শরীরে যুগোপযোগী নতুন নতুন দ্যোতনা যুক্ত করার চেষ্টায় থাকেন, আধুনিক চিন্তার নানা স্রোত বাংলার প্রবাহে সঞ্চারিত ক'রে দেবার জন্য পরিশ্রম করেন, তাঁদের লেখা পড়তে গেলে আরেকটু সহিষ্ণু তো হতেই হবে। আমাদের ভাষাটা রেডি-মেইড জিনিস নয়; পথ চলতে চলতেই সেটা আমরা তৈরি ক'রে নিচ্ছি। এর মধ্যে নিয়ত ভাঙা-গড়া চলেছে। তাই এর সবটাই আপনাদের চিরচেনা মাতৃভাষা হবে না; এর মধ্যে নানা বিস্ময় থাকবেই। গৌরী দেবী আমার অস্বচ্ছন্দ শৈলীর যে-দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছেন, সেখানে অনেকগুলি সমাসবদ্ধ শব্দের ভগ্নদশা ঘটেছে। এই ভুলগুলির উৎস তাঁরই পাণ্ডুলিপি কিনা, অথবা কি *চতুরঙ্গ*-এর মুদ্রণ— তা তো জানি না। এই টুকরোগুলো সঠিক ছাপা অবস্থায় নিজ নিজ প্রসঙ্গে পুরো বাক্যের মধ্যে মানিয়ে যায় ব'লেই আমার ধারণা। আমি ওদের ওভাবে লিখে খুশী। 'নেপথ্যের অজ্ঞাতনামা কলকাকলি থেকে গার্হস্থ খুদকুঁড়োর আশায় বেরিয়ে আসে একটি কি দুটি ব্যক্তি-পাখি' বা 'বিলেতের বৃষ্টিবরফ যে জুতোর চামড়ার শ্রেণীশত্রু, এবং কালিই যে তার শ্রেণীমিত্র' আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। 'plate tectonics' ব্যাপারটার আভাস দিতে 'ভূত্বকের অস্থির থালাগুলির পরস্পর ধাক্কাধাক্কি'কে অনেকে লাগসই এবং witty ব'লেই মনে করবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বইটার পুরো পাণ্ডুলিপি যত্ন ক'রে পড়েছিলেন নাভানার তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিরাম মুখোপাধ্যায়। ভাষার ব্যাপারে তাঁর মতো দিশারী কমই দেখেছি। কোনো শ্রীহীনতা তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। তাই গৌরী দেবীর আপত্তিকে খুব-একটা সিরিয়াসভাবে নিতে পারছি না।

এর পর সিরিয়াস বিষয়ে আসা যাক। গৌরী দেবীর ধারণা 'বইয়ের বিষয় রবীন্দ্রনাথ'। এখানে গোড়াতেই ভুল হলো। বাংলা বইয়ের টাইট্‌লে যেমন, ইংরেজী বইটার সাবটাইট্‌লে তেমনি দুজন লোকের নাম আছে। বইটার নাম আপনাদের পরিষ্কার ক'রেই

ব'লে দিচ্ছে এর বিষয়টা কী : Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo। অর্থাৎ এঁরা দুজনেই সমানভাবে এই বইয়ের বিষয়বস্তু, দুজনের উপরেই সমান ফোকস্ পড়বে। এই কেন্দ্রিক ব্যাপারটা মনে না রাখলে নানা ভুল বোঝাবুঝি তো ঘটতেই পারে।

গৌরী দেবীর এই ধারণাটা ঠিক নয় যে আলোচ্য বিষয়টা এত দিন কেবল বাঙালীদেরই ঔৎসুক্যের ব্যাপার ছিলো। তাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে আর্জেন্টিনা ব'লে একটা জায়গা আছে এবং সেখানেও এই কাহিনীটা সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল বর্তমান। একজন প্রবাসী বাঙালী এঞ্জিনীয়রের মুখে শুনেছি, তিনি একবার একজন আর্জেন্টাইনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যাঁর ধারণা ছিলো যে ভিক্তোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে বিয়েই করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভিক্তোরিয়ার সেই পায়ের ধুলো নিয়ে শ্রদ্ধানিবেদনের ভঙ্গিটা গৌরী দেবীর মন কেড়েছে। তাঁকে মনে রাখতে অনুরোধ করছি যে এর মধ্যে কিন্তু গভীর আয়রনি আছে। বই প'ড়ে দূর দেশের 'দাম্পত্য-প্রথার তাৎপর্য' যিনি বুঝেছিলেন, তিনি কিন্তু তাঁর আপন দেশে নিজের স্বামীর সঙ্গে একেবারেই মানিয়ে চলতে পারেন নি, স্বামীর পায়ের ধুলো নেওয়া তো দূরের কথা।

গৌরী দেবী আমার ইংরেজী বইটার শৈলীর প্রশংসা করলেও বইখানি খুঁটিয়ে পড়েছেন এমন মনে হয় না। মনে হয় কেবল পাতা উল্টে গেছেন। এই বইটা আলোচনা করতে গিয়েও তিনি বাংলা বইটা থেকেই বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সামাজিক ও ব্যক্তিগত পটভূমিকা বাঙালীদের কাছে স্বল্পজ্ঞাত ব'লে আমি বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম যাতে এই দ্বিতীয় বইটাতে ভিক্তোরিয়ার আর্জেন্টাইন স্বরূপ যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে ধরা পড়ে। দুটো বই লেখার মধ্যবর্তী সময়ে আমি অনেক নতুন বই পড়েছিলাম। অনেক নতুন দলিল আবিষ্কার করেছিলাম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে বুয়েনোস আইরেসের *লা নাসিয়ন* পত্রিকায় আমার ইংরেজী বইটার দীর্ঘ প্রশংসামূলক রিভিউ বেরিয়েছে; সেখানে সমালোচক স্বীকার করেছেন যে আমার বইটা প'ড়ে তিনি তাঁর দেশের মেয়ে ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোকে— বিশেষতঃ তাঁর জীবনের আর্ত অস্পষ্ট দিকটাকে— অনেক বেশী ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছেন। তাঁর বিচারে ওকাম্পোর নিজস্ব আত্মজীবনীর পর আমার ইংরেজী বইটাই এ যাবৎ প্রকাশিত একমাত্র বই যা *সোলেদাদ সোনোরা*-র রচয়িত্রীর সূচনাপর্বকে কাছ থেকে এবং উজ্জ্বলভাবে চিনিয়ে দেয়। এই সমালোচক তার আগেই আমাকে চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, আমিই যেন ভিক্তোরিয়ার সামগ্রিক জীবনী রচনার দায়িত্ব নিই।

গৌরী দেবীর সমালোচনায় কিন্তু আমার কাজের আর্জেন্টাইন দিকটার কোনো স্বীকৃতি নেই। বাংলা বইটা পড়ার পর ইংরেজী বইটাতে প্রবেশ ক'রে তার স্বাদ নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সেই মেয়েটিকে কি তিনি আরেকটু অন্তরঙ্গভাবে চিনলেন? মনে তো হয় না। হয়তো চিনতে চানও না।

এ বইটা আমি দু' দিকের জন্যই লিখেছি। কোনো-কিছু 'ফাঁস' করি নি ; কোনো কথা 'চেপে যাওয়া'ও আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। গৌরী দেবী যদি জানতেন, এই গল্পটা সম্বন্ধে আর্জেন্টাইনদের কতটা কৌতূহল। কতজন আমাকে বলেছেন, 'আচ্ছা, ওঁরা কি সত্যি পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন ? আপনি কী মনে করেন ? আপনি যা-কিছু পাবেন, সব বইয়ে দেবেন, কিছু চাপবেন না কিন্তু, কেননা ওঁদের ভালোবাসা ঠিক কী ধরনের ছিলো তা আমরা জানতে চাই।' আর্জেন্টাইনদের এই জিজ্ঞাসার প্রতি গবেষক হিসাবে আমার একটা দায়িত্ব ছিলো। সেটা আমি এড়িয়ে যেতে চাই নি। এবং এখানে আপনাদের সবাইকেই একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি। বাঙালীরা যেমন মনে করেন বিদেশিনী বিজয়াই রবি-অনুরাগিণী হয়ে পড়েছিলেন, আর্জেন্টাইনরা তেমন মনে করেন যে বিদেশী কবিই তাঁদের দেশের মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলেন।

আমার বিশেষ দুঃখ এই যে বিশ্বভারতী ও সাহিত্য আকাদেমি-কর্তৃক অনুমোদিত ৪৭৭ পৃষ্ঠার এই অ্যাকাডেমিক বইটাতে আমার অনেক পরিশ্রমের ফসলকে তার ন্যায্য পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে পশ্চিমবঙ্গের কিছু সীমাবদ্ধ দৃষ্টির পাঠক আদেখলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন একটিমাত্র পৃষ্ঠার উপরে, লুব্ধ শিশু যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মণ্ডা-মিঠাইয়ের উপরে। আমি স্তম্ভিত যে মাননীয়া গৌরী আইয়ুবও এই কাজটি করেছেন। বস্তুতঃ, কেবল একটি ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতেই তাঁর নিজস্ব সুরুচিবোধের তাড়নায় (বা যাঁরা তাঁর সুরুচিবোধের শরিক তাঁদেরও প্ররোচনায়) তিনি কলম ধরেছেন, নয়তো বৃহদায়তন বইটাতে আলোচিত আর কোনো ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনো মতামত নেই।

এ কথা ঠিক নয় যে বুয়েনোস আইরেসে গিয়ে 'কাগজপত্র ঘেঁটে' তবেই আমি ঘটনাটি প্রথম 'আবিষ্কার' করি, এবং এ কথা একেবারে ঠিক নয় যে ওটি আমি 'সোৎসাহে' পেশ করেছি। গৌরী দেবী লেখার পূর্বে কিছুটা অনুসন্ধান ক'রে নিলে পারতেন ; বিতর্কিত বিষয়ে লেখার আগে রিসার্চ বা হোমওয়ার্ক (যাই বলুন) ক'রে নেওয়াটা বেশ দরকারী। অনুসন্ধিৎসুদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার ৯ : ৩ সংখ্যায় প্রকাশিত এ বিষয়ে আমার পূর্বোল্লিখিত আলোচনাটি প'ড়ে নেন।

সংক্ষেপে আবারও বলি, আলোচ্য ঘটনাটির প্রতিবেদন বইয়ে না দিয়ে আমার উপায় ছিলো না। এর একটা ভাঙাচোরা রূপ আমি পাই আর্জেন্টিনায় যাবার আগেই অক্সফোর্ডে একজন আর্জেন্টাইনের মুখে। বুয়েনোস আইরেসের আর্কাইভ্‌সে পৌঁছে এই বিবৃতিটির খোঁজ পেতে আমাকে বিশেষ 'কাগজপত্র ঘাঁটতে' হয় নি। প্রথম দিনই, কাজ আরম্ভ করার আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্যারাগ্রাফটি পড়েছিলাম। ফাইলটি লেখ্যাগারের রক্ষাকর্ত্রীরাই হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এর প্রতিবেদন আমি বইয়ে দিতে বাধ্য ছিলাম। 'চেপে গেলে' নিরপেক্ষ গবেষণার নিরিখে অন্যায় কাজ হতো। প্রথমতঃ, ঘটনাটি যেহেতু গোপন নয়, মুখে মুখে ফেরে, তাই একদিন না একদিন সাতমুখ ঘুরে বিকৃততর অবস্থায় এটি নিশ্চয়ই ভারতে পৌঁছতো। তখন বিদ্বজ্জনরা আমাকে দোষ দিতেন, আমি কেন এ কথা জেনে-শুনেও চেপে গেছি; অত টাকা খরচ ক'রে আমাকে আর্জেন্টিনায় পাঠানো

হয়েছিলো সে কি রিসার্চের ফলাফল চেপে যাবার জন্যে? গবেষক হিসাবে আমার কর্তব্য ছিলো ভিক্তোরিয়ার নিজের বিবৃতিটুকু ঠিক ক'রে উদ্ধার করা। দ্বিতীয়তঃ, ওকাম্পোর জীবনীকার ডরিস মায়ার প্রশ্ন করেছেন, ভিক্তোরিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা কি শুধুই আধ্যাত্মিক ছিলো, না অন্য কিছুরও মিশাল ছিলো তাতে? গবেষক হিসাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি বাধ্য ছিলাম।

ঘটনাটি আমি 'সোৎসাহে' পেশ করেছি, এটি আমার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ। যাঁরা নিজেরা বইটা ঠাণ্ডা মাথায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়বেন, তাঁরা দেখবেন যে আমি শান্ত অ্যাকাডেমিক স্টাইলেই বিবরণ দিয়েছি, অন্য অনেক খবর দেবার পর তবেই। আমার ভাষায় কোথাও কোনো উৎসাহ বা সস্তা চটকদারি নেই। আমি যদি বলতাম, 'একটা ব্যাপার জানি, কিন্তু বলবো না', তা হলে আরও অশোভন হতো। আমি যেভাবে লিখেছি সেটাই আমার বিচারে শোভনতম ভঙ্গি।

দোহাই আপনাদের, 'ফাঁস' যা করবার তা করেছেন স্বয়ং ভিক্তোরিয়া। এবং ঘটনাটি অনায়াসে তাঁর ছাপা আত্মজীবনীতেই স্থান পেতে পারতো। স্থান না পাবার প্রকৃত কারণ ওখানে তাঁর জনৈক অনুগত শিষ্যার হস্তক্ষেপ পড়েছে, যিনি ভারতের গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর গুরুস্থানীয়ার প্রেমের কাহিনীটাকে নিষ্কলঙ্ক ভারতপ্রেমের গোত্রভুক্ত ক'রে রাখতে চান। ফরাসী খসড়াটাই আত্মজীবনী চতুর্থ খণ্ডের আসল আকর। এর কোনো স্প্যানিশ রূপ ভিক্তোরিয়া নিজে তৈরি ক'রে গেছিলেন ব'লে মনে হয় না। খোঁজ নিয়ে যতদূর জেনেছি, এই খণ্ডটির স্প্যানিশ রূপের মধ্যে অনেক গোঁজামিল আছে। গোঁজামিল যে আছে, তা বইটা পড়লে এমনিতেই সন্দেহ হয়, এবং সে-কথা আমি আলোচনাও করেছি আমার বইয়ে।

আমার ধারণা, এবং অন্যরাও এ ধারণা সমর্থন করেন, যিনি এই খণ্ডটির স্প্যানিশ রূপ তৈরি করেছেন, তিনিই কাটছাঁট করেছেন। আমরা যাঁর কথা ভাবছি তিনিই যদি অনুবাদিকা হয়ে থাকেন, তা হলে বলতেই হয় যে তাঁকে আমার রবীন্দ্র-ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে হয় নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মিরালরিও ব'লে কোনো বাড়ি নেই, রবীন্দ্রনাথ ভিক্তোরিয়ার বাপের বাড়ি ভিলা ওকাম্পোতেই উঠেছিলেন। ওখানকার ভারতীয় দূতাবাসকেও সেরকম বোঝানো হয়েছে। ভারতীয়রা গেলে তাঁদের ভিলা ওকাম্পো ঘুরিয়ে দেখানো হয়, বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ওখানে ছিলেন। লোকে তা বিশ্বাসও করে, বইপত্র না প'ড়েই। আপনারা সকলেই জানেন, এটা মিথ্যা কথা। আরেক প্রচার অনুসারে মিরালরিও ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই, সন্ত্রাসবাদী বোমায় তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কথাও ভিত্তিহীন। মিরালরিও এখনও জলজ্যান্ত আছে— সেই বাড়ি, সেই দোতলার বারান্দা, সেই নদী, সেই বাগান, সেই 'তিপা' গাছ। আমি সেই বাড়ি স্বচক্ষে দেখেছি। গত বছর ওকাম্পোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মিরালরিওর কিছু আধুনিক রঙিন ফোটোগ্রাফ-সহ *লা নাসিয়ন* পত্রিকা আমার বইটা সম্বন্ধে রবিবাসরীয় ম্যাগাজিনে 'কাভার স্টোরি' করে। জানি না তার পরেও মিরালরিওর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে কিনা। এই প্রচারের কারণ

জানি। ভিলা ওকাম্পোর জন্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজনীয়তাই এর আসল কারণ। মিরাল্‌রিও নেই বা কখনো ছিলো না— এ কথা বললে ভিলা ওকাম্পোই ওখানকার একমাত্র রবিতীর্থ হয়ে দাঁড়ায়, এবং রবীন্দ্রনাথের নাম ক'রে ভারত বা অন্য সূত্র থেকে পাওয়া অর্থসাহায্য কেবল ওখানেই চ্যানেল ক'রে দেওয়া যায়। এই পলিটিক্সটুকু বুঝতে আপনাদের নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না।

গৌরী দেবীর ঐ যে ধারণা— 'বিধিনির্দিষ্ট' দায়িত্বে নিজেকে দেখতে পেয়ে আমি 'পরম সন্তোষের সঙ্গে' খবরটি পেশ করেছি, এটি আমার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ। তাঁর দৃষ্টি এখানে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় টেক্সটের পাঠও তাঁর ঠিক হয় নি। তিনি লিখেছেন : '... কেতকী পরম সন্তোষের সঙ্গে জানান যে রবীন্দ্রনাথের ওই মৃদু সন্তর্পণ স্পর্শটুকু ভিক্তোরিয়া প্রত্যাখ্যান তো করেনই নি, বরং 'motherly tenderness'-এর বশে বৃদ্ধের ভুল ভাঙাবার কোনো চেষ্টাও করেন নি।' কিন্তু বইয়ের ২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠায় আমার বিবৃতি ঠিক ওরকম নয়। পাঠকরা নিজেরা প'ড়ে দেখতে পারেন। ওখানে কোনো 'motherly tenderness'-এর কথা নেই। 'maternal tenderness' শব্দদুটি আছে এই ঘটনার বিবৃতির আগে, ২৬৭ পৃষ্ঠায়। গৌরী দেবী আগেকার কথা পরবর্তী অংশে 'সুপারইম্পোজ' করেছেন।

২৭৪ পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্যের ব্যঞ্জনা মোটেও এ নয় যে কেবল এই ঘটনাটির সূত্রে ভিক্তোরিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ওরকম কোনো ছেঁদো কথা আমি বলি নি। গৌরী দেবী আমার ইংরেজীর প্রশংসা করলেও তার সুয়ান্স ধরতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। এই ২৭৪ পৃষ্ঠার বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরেকবার ঐ প্রাক্তন ২৬৭ পৃষ্ঠার তিনটি বক্তব্যকে টেনে এনে একটা জট পাকিয়েছেন। পাঠকরা নিজেরা দেখে নেবেন। পাঠঘটিত এই দোষকে সমালোচনায় বলা হয় কন্‌ফ্লেশন (conflation)। এর ফলে আমার বক্তব্যকে বিকৃত ক'রে ফেলা হয়েছে।

এ কথা ঠিকই যে মিরাল্‌রিওতে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতে পেরেছিলেন যে নারীর প্রেমের মূল্যবান উপহার তিনি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি প্রথম দিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওখানে সপ্তাহখানেক থেকে চ'লে যেতেন, তা হলে তাঁর জীবনে ভিক্তোরিয়ার প্রভাব কতটা গভীর হতো তা আমরা বলতে পারি না। দুটো মাস থাকলেন ; স্মৃতির তহবিলে আরও কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্তের দান জমা পড়লো ; একত্র ভ্রমণ কবিতাপাঠ আলোচনা খাওয়াদাওয়া মান-অভিমান পরিহাসবিনিময়, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি চিঠি লেখালেখি— এই সব প্রাত্যহিকতার মাধ্যমে দুজনে আরও কাছাকাছি এলেন ; তবেই না বিদেশিনী মেয়েটি ক্রমশঃ 'বিজয়া' হয়ে উঠলেন। ছোট্ট ঘটনাটির কোনো প্রতিবেদন যদি না পাওয়া যেতো, তা হলেও 'গভীর সম্পর্ক' সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করতাম না, কিন্তু খবরটুকু পাওয়ায় বোঝা গেলো যে মেয়েটির প্রতি কবি একটি সামগ্রিক আকর্ষণই অনুভব করেছিলেন। এটা একটা 'কনফার্মেশন'। এখানেই তার গুরুত্ব। ঐ খবরটুকু আমি যদি না দিতাম, তা হলে কিছু লোক এখনও ব'লে যেতেন, বিজয়ার প্রতি

কবির প্রেম কেবলই আধ্যাত্মিক ছিলো, তার বেশী কিছু ছিলো না। এখন আর তাঁরা সে-কথা বলতে পারছেন না।

আমার ধারণা, সামগ্রিক প্রেমানুভূতি থেকেই উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা জন্ম নেয়; তাই ঐ খবরটুকু দিতে পেরে গবেষক হিসাবে আমি দায়িত্বপালন করেছি। কিন্তু ওটিকে আমি 'প্রায় অপরিহার্য' মনে করেছি, বা 'এই সোনার চাবি আচমকা হাতে পেয়ে গিয়ে উল্লসিত' হয়ে উঠেছি— এভাবে বললে আমার বইয়ের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়। আমি কোথাও একে সোনার চাবি বলি নি। তা আচমকা হাতে পাই নি। পড়ার আগে কানে শুনেছিলাম। আমার ভাষায় কোথাও উল্লাসের সুর লাগে নি। তা সর্বত্রই শালীন ও সংযত থেকেছে।

কেন যে এই প্রতিবেদন গৌরী দেবীর ভাষায় 'অত্যন্তই মর্মাহত করেছে অনেককে', তা আমার কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবে আন্দাজ করছি যাঁরা মর্মাহত হয়েছেন তাঁদের আর আমার মধ্যে বিশ্ববীক্ষার একটা দুস্তর ব্যবধান বর্তমান। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য : মর্মাহত হবার অধিকার তাঁদের নেই। এই অধিকার তাঁরা কোথা থেকে পাচ্ছেন? কে সেটা দিয়েছে?

না, গৌরী দেবী, কবির ঐ হাত বাড়িয়ে দেওয়াটুকুকে আমি তাঁর 'মানুষী দুর্বলতা' ব'লে মনে করি না। ওটা আমার কাছে তাঁর সবলতারই চিহ্ন, তাঁর পৌরুষের মাধুর্যের অভিজ্ঞান। এখানেই আমাদের বিশ্ববীক্ষার ফারাক। আমার কাছে ওটি একটি মধুর মুহূর্ত। ওখানে কোনো গ্লানি নেই, কোনো দুর্বলতা নেই, কোনো দৈন্য নেই। রবীন্দ্রনাথ কোনো অন্যায় করেন নি। ঘটনার সময়ে তিনি নাবালক নন। মহিলাটিও নাবালিকা ছিলেন না। ওটি নিয়ে কারও লজ্জা পাবার কারণ তো নেইই, লজ্জা পাবার অধিকারও নেই। যাঁরা লজ্জা পাচ্ছেন, তাঁরা কোন্ সাহসে লজ্জা পাচ্ছেন? তাঁদের কুণ্ঠা তাঁদের স্পর্ধার নামান্তর। তাঁরা কি ঐ মৃত মহাকবির 'নৈতিক অভিভাবক' যে শরমে ম'রে যাচ্ছেন? তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও তাঁরা তাঁর 'মরাল গার্জেন' হয়ে থাকতে চান? এতে যে তাঁর প্রতিই অশ্রদ্ধা ও অসৌজন্য দেখানো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাবক হবার এই মহালোভ তাঁদের ত্যাগ করা উচিত। তিনি আপনাদের বালক সন্তান নন, সম্পত্তি নন। তাঁকে আঁচলে বেঁধে রাখবেন না। তাঁকে যেতে দিন।

ঐ ঘটনার সমান্তরালে গৌরী দেবী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে যে-ঘটনাটির প্রতিবেদন দিয়েছেন, সেটি প'ড়ে হতবাক্ হলাম। এ থেকে তাঁর মনের কিছুটা আন্দাজ পাচ্ছি। তাঁর কাছে প্রেমের শারীরিক প্রকাশ আর টয়লেটে যাওয়া তা হলে সমগোত্রীয়?

আমি জানি না গৌরী দেবীর কাছে শরীর জিনিসটা এত নোংরা কেন। একজন অসহায় বৃদ্ধকে এক নিমেষ বেডপ্যানে বসা অবস্থায় দেখে ফেলাতে তাঁর মনের মধ্যে এত তীব্র একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে কেন? এটা কী-এমন মনে রাখবার মতো ঘটনা? এতে ক'রে বৃদ্ধটির প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে কেন? মানুষ যে কত অসহায়, তা কি গৌরী দেবী সেদিন প্রথম বুঝলেন? তার আগে বোঝেন নি? অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের যে-কাউকেই তো

ডাক্তার-নার্সের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাঁরা তো নিত্যই আমাদের অসহায়তার দর্শক। শরীর সম্পর্কে গ্লানিবোধ থাকলে সেবা দেওয়াই বা যাবে কিভাবে, আর নেওয়াই বা যাবে কিভাবে?

তুলনা দিয়ে বোঝাতে পারি, আর্কাইভ্‌সে ব'সে ঐ প্যারাগ্রাফটি পড়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে কী ধরনের। যেন আপন মনে একা-একা কোনো আর্ট গ্যালারিতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা নির্জন ঘরের কোণে সুন্দর একটা ছবির মুখোমুখি হয়ে গেলাম। লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় চিত্রশিল্পী Bronzino-র একটি বিখ্যাত ছবি আছে, যেটি চিত্রজগতে 'An Allegory of Venus and Cupid' এই নামে পরিচিত। সেখানে কিশোর কিউপিড প্রেমের দেবীকে চুমো খাচ্ছে; তার বাঁ হাত দেবীর মাথা আর ডান হাত দেবীর বাম স্তনকে ধ'রে আছে। দেবী চুম্বনরত কিশোর মদনকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছেন; তাঁর ডান হাতে তার একটি বাণ। হ্যাঁ, আমার কাছে ওকাম্পোর লেখা লাইনগুলির মুখোমুখি হওয়া আর এইরকম কোনো ছবির সামনাসামনি এসে যাওয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই রসগ্রাহী হয়ে উঠতে হলে দেহবিষয়ক পাপবোধের ঠুলিটাকে বাইরে খুলে রেখে আসতে হবে।

গৌরী দেবী বিনয় ক'রে নিজেকে 'ছোটো মাপের মানুষ' ব'লে চিহ্নিত করেছেন। তা না ক'রে তাঁকে বরং ভেবে দেখতে বলি, এ ব্যাপারে তিনি নিজে নন, তাঁর দৃষ্টিটা ছোট মাপের হয়ে যাচ্ছে না তো? হয়তো দৃষ্টিটাকে বড় করতে পারলে দেখার বাধাটা কেটে যাবে। আর যত দিন তা করতে অসুবিধা হচ্ছে, তত দিন না-হয় ও পাতাটা বাদ দিয়ে চ'লে যান। ওটা পড়তে হলে দৃষ্টির একটা প্রাপ্তবয়স্কতা লাগবে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি ব'লেই মনে করি যে ঘটনাটুকু চেপে গেলে তাঁর প্রতি অভিভাবকত্ব ফলানো হতো, অতএব অমার্জনীয় অপরাধ হতো। প্রতিবেদনটুকু বইয়ে রেখে আমি একজন সিরিয়াস গবেষকের দায়িত্ব পালন করেছিমাত্র। এবং আপনাদের মনে রাখতে অনুরোধ করি, যিনি বা যাঁরা ভিক্তোরিয়ার প্রকাশিত আত্মজীবনীর চতুর্থ খণ্ড থেকে উক্ত অংশটুকু (এবং এল্‌ম্‌হার্স্টকে নিয়ে তুলনীয় অংশটুকু) বাদ দিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন। তাঁরা ভিক্তোরিয়াকে সেন্সর ক'রে তাঁর উপর গার্জেনি করেছেন। এই কাঁচির কাজের কোনো দরকারই ছিলো না, কেননা গ্রন্থপ্রকাশের সময়ে আলোচ্য তিনজন ব্যক্তিই মৃত। আমার বিবেচনায় এই সেন্সরশিপ ধৃষ্টতা। এর ফলে এবং অন্যান্য সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের ফলে চতুর্থ খণ্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত, তৃতীয় বা পঞ্চম খণ্ডের মতো উজ্জ্বল নয়। আলোচ্য অংশদুটি এবং প্রাসঙ্গিক আরও কিছু লাইন ফরাসী ফাইলটি থেকে উদ্ধার ক'রে লেখিকা ভিক্তোরিয়ার প্রতিও আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আমার মতে এই উদ্ধারগুলি ঐ ত্রিকোণ বন্ধুত্বের নিহিত আলো-ছায়াকে বুঝতে মূল্যবান সাহায্য করে।

শালীনতা আর অশালীনতার মধ্যে তফাৎ আমিও ক'রে থাকি। সাল্‌মান রুশ্‌দির *শয়তানী পদাবলী*-র বিরুদ্ধে আমিও কলম ধরেছিলাম। কিন্তু আমার এ বইয়ে কোনো শালীনতাহানি, কোনো দায়িত্বচ্যুতি ঘটেছে, এ কথা মানতে পারি না। প্রসঙ্গতঃ জানাই,

প্রকাশের আগে বইটার পুরো পাণ্ডুলিপি দুজন বিদগ্ধ ব্যক্তি পড়েছিলেন— তাঁদের মধ্যে একজন প্রকাশকের তরফে। দুজনের একজনও শালীনতাহানির অভিযোগ আনেন নি।

আসলে এ ধরনের গবেষণা কোনো 'divine quest'-ও নয়, কোনো 'unholy curiosity'-ও নয়। রবীন্দ্রনাথ, ওকাম্পো, এল্‌ম্‌হার্স্ট— এঁরা কেউই অশরীরী দেবতা নন। প্রত্যেকেই মানুষ। এঁদের নিয়ে জীবনীসংক্রান্ত গবেষণা কোনো দেবতার ছিদ্রান্বেষণ নয়, মানুষকে মানুষের নিকষেই দেখতে শেখা। গুরুবাদী সংস্কৃতিতে এই শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। মহৎ ব্যক্তিদের মানুষ ব'লে চিনতে-জানতে শিখলে তবেই তাঁদের প্রকৃত মানবিক মহত্ত্বের আদল পাওয়া যায় এবং নিজেদের জীবনে তাঁদের প্রাসঙ্গিক ক'রে তোলা যায়। নয়তো উঁচু আসনে বসিয়ে এঁদের কেবল পুজো ক'রে গেলে এঁরা দূরেই রয়ে যান। তাঁদের কাছ থেকে যা শিখতে পারতাম, তা আর শেখা হয়ে ওঠে না। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই যাঁরা বড় তাঁদের কাছে টানতে শিখতে হয়।

প্রবন্ধের একেবারে শেষে গৌরী দেবীর যে-বক্তব্য— রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কীর্তির চেয়েও রবীন্দ্রনাথ নামে মানুষটা এই ছন্নছাড়া যুগকে অনেক বড় আশ্রয় দিতে পারে— এর তাৎপর্য কিন্তু বুঝলাম না। রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি এখানে প্রচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতে চেয়েছিলেন যে তাজমহলের চেয়ে প্রেমিক শাহ জাহানের হৃদয় মহত্তর। কিন্তু এখানে সেই উক্তির প্রতিধ্বনি করা কি অর্থবহ? রবীন্দ্রনাথ মানুষটা আর নেই। আমরা, যারা তাঁর উত্তরসূরি, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানি নি। যাঁরা তাঁকে ওভাবে জানতেন, তাঁরা যে একে একে গত হবেন— এটাই জগতের নিয়ম। তাই উত্তরসূরিরা তাঁকে জানবেন তাঁর কীর্তির মাধ্যমেই : আর তো কোনো পথ নেই। তাঁর কীর্তিই আমাদের সম্পদ, এবং এ জিনিস তো কোনো গোষ্ঠীর, কোনো প্রতিষ্ঠানের, কোনো দেশের একলার সম্পত্তি নয়। বিশ্বের সুধীজনের ও রসিকজনের তাতে অধিকার রয়েছে। দ্বার রুধলে চলবে না। তিনি এত বড় যে যুগ যুগ ধ'রে দেশে-বিদেশে তাঁকে নিয়ে গবেষণা হবে। সেই অনাগত দিনের গবেষকরা আমার চেয়ে কম অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা দাবি করবেন না। হয়তো আজকে আমি তাঁদের হয়েই লড়ছি। আর আমার এই 'জবাব' গৌরী দেবীর উদ্দেশে কোনো ব্যক্তিগত সমালোচনা নয়। আমি কেবল বলতে চাইছি তাঁর তর্ক আমার কাছে গ্রাহ্য নয়, বাংলা বইটার বেলায় সাহিত্যিক কারণে, আর ইংরেজী বইটার বেলায় অ্যাকাডেমিক কারণে।

পরিশেষে জানাই, ইংরেজী বইখানার ২১ পৃষ্ঠায় অন্নপূর্ণা তরখড়ের সঙ্গে কবির পরিচয়ের স্থান অনবধানতাবশতঃ দেওয়া হয়েছে আহমেদাবাদ। ওটা হবে বোম্বাই। ভুলটা আমার চোখে পড়েছে বই বেরিয়ে যাবার পরে! এই ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত। বইটার কল্পিত গলদ নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা যদি এইরকম আরও দু'-একটা সত্যিকারের ভুল বার করতে পারতেন, তা হলে তা সম্পূর্ণ বৈধ সমালোচনা হতো, এবং আমিও উপকৃত হতাম।[৪]

১ আমার উত্তরের প্রত্যুত্তরে গৌরী দেবী যা লেখেন, সেখানে তিনি কন্‌ফার্ম করেন যে তিনিও এঁদেরই দলে।

২ এই লেখাটি বর্তমান বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৩ আমার ধারণা, বইটি পুরস্কার পাবার পরে সেটির প্রথম প্রকাশক নাভানা যখন খুব তাড়াহুড়ো ক'রে তার পুনর্মুদ্রণ বার করেন, তখন সেই প্রক্রিয়াতেই কোনো গণ্ডগোল ঘটে। বইটির দে'জ়-প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণ (১৯৯৭) এই ত্রুটি থেকে মুক্ত।

৪ ইংরেজী বইটির পুনর্মুদ্রণে (১৯৯৬) একটি শুদ্ধিপত্রে ভুলটি শুধরে দেওয়া হয়।

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৮, ডিসেম্বর ১৯৯১

[আমার এই জবাবের একটি পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন গৌরী আইয়ুব *চতুরঙ্গ* পত্রিকার পরের সংখ্যায় (বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৯, জানুয়ারি ১৯৯২), কিন্তু আমার কিছু অনুরাগী পাঠকের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আমি আর কোনো জবাব দিই নি, কারণ এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিলো যে তাঁর সঙ্গে তর্ক চালিয়ে কোনো লাভ নেই, আমাদের মানসিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে কখনো মেলানো যাবে না। বিশেষতঃ যখন দেখলাম যে তিনি কবুল করেছেন যে আমার সাহিত্যিক বিবর্তনকে বোঝার কোনো তাগিদ তাঁর নেই, তখন মনে হলো, আমি কী করতে চেয়েছি তা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে আর কী লাভ।]

ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন : 'বিনির্মাণ' ?

জিজ্ঞাসা-র ১২ : ২ সংখ্যায় 'ডানা-মেলা পাথর : য়িরি কারেন-এর কবিতা'-নামক তাঁর প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবাল দাশগুপ্তকে 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন'-এর বাংলা হিসাবে 'বিনির্মাণ' শব্দটিকে উপস্থিত করতে দেখে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছি। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে 'বি' উপসর্গটার মধ্যে এমন একটা বিপজ্জনক দ্ব্যর্থকতা আছে যা নতুন শব্দের নির্মাণে তার ব্যাপক প্রয়োগের পরিপন্থী। 'বি' উপসর্গ কখনও কখনও অর্থকে উল্টো দিকে চালিয়ে দেয় (যেমন 'বিক্রয়', 'বিরাগ'), আবার কখনও কখনও নিহিত অর্থকেই তীব্রতর করে (যেমন 'বিজয়', 'বিনাশ')। তাই নতুন শব্দের গঠনে এই উপসর্গ ব্যবহার করতে গেলে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনীয়, যাতে ভুল বোঝাবুঝি প্রশ্রয় না পায়। 'ডি-সেন্ট্রালাইজেশন' বোঝাতে 'বিকেন্দ্রীকরণ' আমার কাছে গ্রাহ্য, কিন্তু 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন' বোঝাতে 'বিনির্মাণ'কে গ্রহণ করতে পারছি না। তার কারণ 'বিশেষরূপে নির্মাণ' অর্থে 'বিনির্মাণ' শব্দটি এখনই অভিধানসম্মত এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। সেই অর্থের সূত্রে 'বিনির্মিত', 'বিনির্মাতা', 'বিনির্মিৎসু' ইত্যাদি সবই অভিধানসম্মত এবং দরকারী শব্দ। কোনো সেতু বা বিমান, যন্ত্র বা শিল্পকর্ম যে বিনির্মিত, সুনির্মিত— এইটে বলার অধিকার আমি ছাড়তে রাজি নই। সংস্কৃত আমাকে এই অধিকার যখন দিচ্ছে, তখন তা ছাড়বো কেন? বাংলায় হঠাৎ 'বিনির্মাণ' শব্দটির সম্পূর্ণ উল্টো, অভিধানবিরোধী, সংস্কৃতবিরোধী অর্থ চালু করা বিভ্রান্তিকর হবে। ইংরেজী শব্দের আদিতে 'ডি' দেখলেই যে তাকে 'বি'তে রূপান্তরিত করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। ঐরকম হুবহু নকল বাংলার স্বভাবকেই নষ্ট করে। বরং ভেবে দেখা যাক না কেন, ইংরেজী শব্দটার প্রকৃত অর্থ কী। 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্ট' বা 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌শন' ইংরেজীতেও নবনির্মিত শব্দ। যতদূর বুঝি, নির্মাণকে খুলে ভেঙে দেখানোই এদের অর্থ। সে-ক্ষেত্রে 'নির্মাণ-ভাঙা', 'নির্মাণ-মোচন', 'নির্মাণ-উন্মোচন', 'গ্রন্থন-মোচন', 'গ্রন্থন-উন্মোচন' ইত্যাদি শব্দ বাংলায় অনেক বেশী উপযুক্ত হবে।

তেমনি, 'ডি-কলোনাইজেশন'-এর বাংলা হিসাবে 'বিউপনিবেশন'ও (শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও মানবেন্দ্রনাথ', *জিজ্ঞাসা* ১২ : ২, পৃঃ ১৮৪) আমার কাছে গ্রাহ্য ঠেকে না। বিশেষতঃ ওখানে বাংলার স্বভাব সন্ধি দাবি করে, এবং যদি হঠাৎ 'ব্যুপনিবেশন' ব'লে কোনো শব্দ দেখি তো ভাববো যে 'ব্যুৎপত্তি' যেমন 'বিশেষ উৎপত্তি', 'ব্যুপনিবেশন'ও তেমনি 'বিশেষরূপে উপনিবেশ স্থাপন'। ইংরেজী 'সিট্-ইন্' অর্থাৎ জায়গা জুড়ে ব'সে প'ড়ে যে-প্রতিবাদজ্ঞাপন বা ধর্মঘট, তার প্রতিশব্দ হিসাবে 'ব্যুপনিবেশন' লাগসই। তাই 'ডি-কলোনাইজেশন'-এর বেলাতেও আমাদের এমন কোনো শব্দ তৈরি করতে হবে যা দ্ব্যর্থকতা

এড়িয়ে গিয়ে দ্বিধাহীনভাবে উপনিবেশতন্ত্রের পাততাড়ি গোটানোকেই সূচিত করে। 'ডি'র জায়গায় মাছিমারা কেরানীর মতো 'বি' বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই। নতুন শব্দটা একেবারে নতুন ধরনেরও হতে পারে। বরং একেকজনে একেকরকম লিখুন, তাও ভালো, কিন্তু ইংরেজী শব্দগুলোর হুবহু অনুকরণে প্রতিমা গড়তে হবে এমন নিয়ম আমি মানতে রাজি নই। বাংলাভাষার সম্পদ ও সম্ভাবনা যথেষ্ট। সৃষ্টিশীল হতে এবং পরীক্ষা করতে আমরা এত ভয় পাই কেন ?

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

জিজ্ঞাসা ১২ : ৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৮ [১৯৯১-৯২]

রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানি

শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী 'বিদেশী'দের মধ্যে ডঃ মার্টিন ক্যেম্প্‌শেন একটি আকর্ষক ব্যক্তিত্ব। 'বিদেশী' কথাটাকে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখলাম ইচ্ছে ক'রেই : যে-জায়গাটাতে বিশ্বের একনীড় হয়ে যাবার কথা দেশী-বিদেশীর প্রভেদ তো সেখানে বস্তুতঃ অবান্তর। ক্যেম্প্‌শেনের মতো একজন পণ্ডিতকে এবং আন্তর্জাতিক স্বাদের ব্যক্তিত্বকে শান্তিনিকেতন যে এখনও ধ'রে রাখতে পারছে, তাঁর বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারছে, এ থেকে অন্ততঃ এটুকু আশ্বাস পাওয়া যায় যে নানা সমস্যা দ্বারা উৎপীড়িত হলেও শান্তিনিকেতনের প্রাণশক্তি এখনও ফুরিয়ে যায় নি।

ক্যেম্প্‌শেনের বিনয়ী, নিরহংকার, দ্বৈসাংস্কৃতিক স্বভাব আমাকে সহজেই টানে। জার্মান সাহিত্যে ডক্টরেট-সমেত তাঁর শিক্ষার প্রথম পর্যায় কাটে ইয়োরোপ মহাদেশেই। ১৯৭৩ সালে ভারতে আসার পর সূচিত হয় তাঁর জীবনের ও শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। বিশ্বভারতীতে দ্বিতীয়বার ডক্টরেট করেছেন—তুলনামূলক ধর্মে। বাংলা শিখেছেন, স্বীকার করেন যে এখনও শিখছেন, বাংলা থেকে জার্মানে অনুবাদ করেছেন (রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ), ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে একটি গ্রন্থ-সিরিজও সম্পাদনা করেছেন। সম্প্রতি কলকাতায় এবং অন্যত্র সুনীল দাশের সহযোগিতা-সহ জনৈক জার্মান পরিচালকের পরিচালনায় 'সংবর্ত' নাট্যদল-কর্তৃক *ডাকঘর*-এর যে-চিত্তহারী অভিনয় হয়ে গেলো, সেই উদ্যমের পিছনে আছে মার্টিন ক্যেম্প্‌শেনের একটি উজ্জ্বল অবদান। ক্যেম্প্‌শেন-কৃত অনুবাদ প'ড়েই জার্মান পরিচালক এই নাটকটিকে রূপ দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ক্যেম্প্‌শেনের যে-বইটির* কথা আজকে আলোচনা করছি সেটি রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তো বটেই, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও একটি মূল্যবান অবদান। এখানে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশিষ্ট জার্মান লেখক আর পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়ার কিছু নির্বাচিত, প্রতিনিধিস্থানীয় অংশ। এই সব প্রতিক্রিয়াকে ঠিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হলে যে-ধরনের সম্পাদকীয় ভাষ্যের আবশ্যক হয় তা-ও সরবরাহ করা হয়েছে। মূল জার্মান টেক্সট্‌গুলির নিজস্ব সাহিত্যমূল্য যেখানে অবিসংবাদিত, সেখানে ইংরেজী অনুবাদের পাশাপাশি সেগুলিও দেওয়া হয়েছে : যাঁরা জার্মান পড়তে পারেন তাঁদের পক্ষে এটা একটা অতিরিক্ত প্রাপ্তি। টীকা, গ্রন্থপঞ্জী এবং ছবি-সহ বইটি সরস এবং মনোহারী।

* ***Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation***, **English Language Editor: Jeanne Openshaw, translations by S. V. Raman and Martin Kämpchen, Max Mueller Bhavan, Goethe Institut, Calcutta, 1991, Rs 100.**

আমি খুশী যে ক্যেম্প্‌শেন সাহস ক'রে তাঁর দলিলগুলির মধ্যে পাঁচটি মজাদার কার্টুনও রেখেছেন। এই কার্টুনগুলির মধ্যে তিনটির বিষয়বস্তু হলো রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের প্রতি বিদেশিনীদের তর্কাতীত আকর্ষণ। যাঁদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই মুখটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে রাখতে হবে, তাঁদের হাঁড়িপানা গাম্ভীর্যের মেঘকে বোধ করি একমাত্র এই কৌতুকরসের উজ্জ্বল রোদই দূর করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যে এককালে জার্মানিতে একটা স্তরে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন এ খবর হয়তো অনেকেই রাখেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে সে-দেশে যেমন হৈচৈ হয়েছিলো, তেমনি তার পাশাপাশি তাঁর সম্পর্কে অন্য নানাবিধ প্রতিক্রিয়াও যে হয়েছিলো সে-খবরটা অপেক্ষাকৃত কম-জানা। তাঁর প্রতি একটা বিরূপতাও কোনো কোনো কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, ধ্বনিত হয়ে উঠেছে একপ্রকারের শ্বেতকায় সাংস্কৃতিক দম্ভ। কেউ থেকেছেন উদাসীন, কেউ বা দেখিয়েছেন মৃদুহাস্যযুক্ত সহনশীলতা। কেউ তাঁকে একেবারেই বোঝেন নি, কেউ বা বিদ্রূপ করেছেন। এমন কি তাঁকে ইহুদী প্রমাণ করবার জন্য ফ্যাশিস্ট চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে : সময়টা যেহেতু দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী তাই এতে অবাক হবার তেমন কিছু নেই। আসলে প্রতিক্রিয়ার এই বৈচিত্র্যই বাস্তবতা-সঙ্গত।

ক্যেম্প্‌শেন-সংকলিত প্রত্যেকটি দলিলই আমাদের মনোযোগ দাবি করে। কিছু নমুনা পেশ করা যাক। *ঘরে-বাইরে*-কে ব্রেখ্‌টের মনে হয়েছিলো 'একটি আশ্চর্য বই— শক্তিশালী এবং নম্র'। ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-র জ়িদ-কৃত ফরাসী অনুবাদ প'ড়ে রিল্‌কে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ঐ ইংরেজী রূপটার জার্মান রূপান্তর করতে তিনি সম্মত হন নি। অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের যে-পরিচয় পেয়েছিলেন টমাস মান, তা থেকে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মনে হয়েছিলো 'চিত্রময়, কিন্তু ম্লান', এবং মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো যে তিনি একজন 'চমৎকার প্রবীণা ইংরেজ মহিলার মতো'। *সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের রচয়িতা হার্মান হেসে-র বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের জার্মান প্রকাশক কুর্ট হ্বোল্‌ফ্‌ রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রি ক'রে বিস্তর মুনাফা লাভ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে বরিস পাস্তেরনাককে লেখা তাঁর একটা চিঠি থেকে বোঝা যায় যে বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই গ'ড়ে ওঠে নি।

ক্যেম্প্‌শেন দেখিয়েছেন যে জার্মান লেখকদের চাইতে জার্মান পণ্ডিতরাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশী সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। পণ্ডিতরা যে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে তেমন গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এমন নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীল মানবতান্ত্রিক দিকটাকে তাঁরা সহজেই চিনতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও সমস্ত বইটার মধ্যে যে-প্রতিবেদনটি আমাকে সব থেকে বেশী আকর্ষণ করেছে সেটি একজন লেখকেরই— স্টেফান ৎসোয়াইগ্‌-এর। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে অসমবয়সী দুজন লেখকের সংলাপের আকারে পরিবেশিত ৎসোয়াইগের এই আলোচনাটির বিষয়বস্তু হলো *সাধনা*— যা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক টেক্সট্‌ নয়। অর্থাৎ আমাদের একটি সিদ্ধান্তে না

পৌঁছে উপায় নেই: সেকালে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অনুবাদের অনুবাদে জার্মানিতে পৌঁছেছিলেন সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ব্যাপার অনেকটাই ঘটেছিলো। তাঁকে নিয়ে একটা হুজুগে মাতামাতি হয়েছিলো, তাঁর বইগুলি গণ-আবেদনের একটা মাত্রা অর্জন করেছিলো, কিন্তু তাঁর যে-রূপটা সকলের সামনে আলোচিত হয়ে উঠেছিলো সেটা মুখ্যতঃ তাঁর প্রজ্ঞাবান ঋষি-রূপ। সাহিত্যশিল্পী হিসাবে তাঁর পূর্ণ পরিচয় জার্মান সুধীমণ্ডলীর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে নি। সত্যি বলতে কি, এতে অবাক হবার কিছুই নেই, কেননা কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই সব জার্মান অনুবাদ যে-সব ইংরেজী 'অনুবাদ' থেকে করা সেই অনুবাদগুলি মোটেই উজ্জ্বল নয়। আমাদের বুঝতে হবে যে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে বিদেশীদের কাছে তুলে ধরতে হলে আরও অনেক ভালো অনুবাদ লাগবে— মূল থেকে সরাসরি অনুবাদ, অন্য কোনো ভাষার মধ্যস্থতায় নয়, এবং এমন অনুবাদ যা নির্ভরযোগ্য তো বটেই, অপিচ সাহিত্যিক স্বাদে ভরপুরও বটে। যাঁরা এ কাজ করবেন তাঁদের বিচক্ষণতর এবং বিদগ্ধতর হতে হবে। যে-পাঠকবর্গের জন্য অনুবাদ করা হচ্ছে তাঁদের সাংস্কৃতিক রুচি এবং বৌদ্ধিক অবস্থান সম্পর্কে অনুবাদকদের প্রখরভাবে সচেতন হতে হবে।

বলা প্রয়োজন যে জার্মানিতে রবীন্দ্র-অভিঘাতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই বইয়ে প্রাপ্তব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবিরও একটি উল্লেখযোগ্য অভিঘাত জার্মানিতে ঘটেছিলো, রাবীন্দ্রিক অনুপ্রেরণায় সে-দেশে কিছু সংগীতও রচিত হয়েছে। সেই দিকগুলি এই বইয়ের নিরীক্ষণের মধ্যে স্থান পায় নি। ক্যেম্প্‌শেনের মুখে শুনেছি যে ঐ দিকগুলি নিয়ে বিস্তৃততর গবেষণা করার ইচ্ছা তাঁর আছে। আশা করি সেই প্রশংসার্হ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় মদত তিনি পাবেন। রবীন্দ্রানুরাগী এই পরিশ্রমী গবেষক অবশ্যই বাংলার সুধীমণ্ডলী ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতা পাবার যোগ্য। তিনি এ যাবৎ যে-গবেষণা করেছেন, যার ফসল এই বইয়ে দিয়েছেন, তার জন্য বাঙালীদের অভিনন্দন তাঁর নিশ্চয়ই প্রাপ্য। এই উদ্যমের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে ম্যাক্সমূলর ভবনও আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মে ১৯৯২

[যোগ করা প্রয়োজন যে এর পরে প্রকাশিত অন্য দুটি বইয়ে ক্যেম্প্‌শেন তাঁর গবেষণার পরবর্তী পর্বের ফসল আমাদের উপহার দিয়েছেন। কিছু নতুন উপাদান তিনি দিয়েছেন জয়কৃষ্ণ কয়াল-কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত একটি বাংলা বইয়ে (*জার্মানিতে রবীন্দ্র-বীক্ষা*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৯), আরও কিছু একটি ইংরেজী বইয়ে (*Rabindranath Tagore in Germany: Four Responses to a Cultural Icon*, Indian Institute of Advanced Study, রাষ্ট্রপতি নিবাস, সিমলা, ১৯৯৯)। যে-কাহিনীটি আমাদের মন সর্বাধিক কাড়ে তা রবীন্দ্রানুরাগী এক বিদগ্ধ দম্পতির। হেলেনে মায়ার-ফ্রাংকের রবীন্দ্রানুরাগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী বইটিতে সামান্যই ছিলো। ইনি বাংলা শেখার চেষ্টা

করেছিলেন, বাংলা শিখে মূল টেক্স্‌ট্ থেকে অল্প-কিছু রবীন্দ্রানুবাদও করেছিলেন। মূল বাংলা থেকে জার্মানে রবীন্দ্রানুবাদের ব্যাপারে এই মহিলা ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁর ব্যাকুল রবীন্দ্র-অন্বেষণে তাঁর অধ্যাপক স্বামী হাইন্‌রিশ্ মায়ার-বেনফ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ক্যেম্প্‌শেনের গবেষণার এই নতুন ফসল সম্পর্কে আমার আলোচনা বেরোয় ক্যানাডা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা *বাংলা জর্নাল*-এ (১ : ৩, পৌষ ১৪০৬, ডিসেম্বর ১৯৯৯)। আর এও হয়তো উল্লেখ করা উচিত যে রবীন্দ্রচিত্রকলায় জার্মান প্রভাব সম্বন্ধে সুশোভন অধিকারী আর আমি অনেক তথ্য সরবরাহ করেছি আমাদের বই *রঙের*

সম্পাদিকার কলমে

[*জিজ্ঞাসা*-র ১৩: ২ সংখ্যাটির অতিথি-সম্পাদনার ভার পড়েছিলো আমার উপর। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করি ঐ সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে। অনেক বিবেচনার পর এবং দু'-একজন বন্ধুর মতামত যাচাই করার পর সেই সম্পাদকীয় রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ এখানে সংকলিত করা হচ্ছে। এই বইয়ের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এটির চিন্তার সামীপ্য, এমন কি 'সাযুজ্য সংরক্ত' রয়েছে ব'লেই আমার বিশ্বাস। বাস্তব কতগুলি ঘটনা থেকে সঞ্জাত চিন্তা দিয়ে তৈরি একটি প্রবন্ধ এর মধ্যে বিধৃত রয়েছে বললে ভুল হয় না। সেই অর্থে এটি আমার ভাবনার ভাস্কর্যের অন্তর্গত, এবং আমার জীবনের একটি সংগ্রামের সাক্ষীও। আমার লেখালেখি এবং গবেষণার জীবনপথে যে-সব অদ্ভুত ধরনের শক্তিক্ষয়কারী লড়াইও আমাকে করতে হয়েছে তাদের একটি নমুনা এই সম্পাদকীয়র মধ্যে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে ইতিহাস আছে। আমার ধারণা, সহৃদয় যে-পাঠকরা আমার চিন্তার ধারাবাহিক বিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তাঁরা অন্যান্য রচনার পাশাপাশি এটিকেও বর্তমান সংকলনের দুই মলাটের মধ্যে পেলে খুশীই হবেন।

লেখাটি এখানে রাখা উচিত কিনা সে-ব্যাপারে আমি প্রথম দিকে একটু দোমনাই ছিলাম, কিন্তু চলতি বছরে (২০০০) যখন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা থেকে কবির নোবেল পুরস্কারের স্বর্ণপদক এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি গেলো তখন আমার দ্বিধাটা কেটে গেলো। ঐ চুরির খবর আমাকে মর্মাহত করে। কতগুলি কারুসামগ্রী, আমাদের সংস্কৃতির কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে যাদের একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিলো, সেগুলি খোয়া গেলো তুচ্ছ সোনার কারণেই। হতভাগ্য আমরা, কবির আদর্শগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা তো দূরের কথা, তাঁর নোবেল পুরস্কারের স্মারক পদকটাকে পর্যন্ত সামলে রাখতে পারলাম না। দেখলাম, প্রকৃত গবেষকদের পাচারকারী বলা যত সহজ, নিছক স্বর্ণলোভী খাঁটি চোরদের ঠেকানো তত সহজ নয় মোটেই, বরং সুকঠিন। সমাজে এমন-কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে নোবেল পুরস্কারের বা ও ধরনের যে-কোনো পুরস্কারের কোনো অর্থই নেই, শুধু সোনাটুকুর অর্থ আছে। সংগ্রহশালার জানালা-দরজা আধুনিকতম ইলেক্‌ট্রনিক পদ্ধতিতে আরও অনেক সুরক্ষিত না ক'রে নিয়ে আপামরসাধারণকে ঠুনকো কাচের বাক্সে সোনার জিনিস দেখানো যায় না, প্রযুক্তি সম্পর্কে অনীহার মনোভাব নিয়ে বিপুল আধুনিক গণসমাজের সঙ্গে লেনদেন করা যায় না— এই শিক্ষাটাও বিশ্বভারতীর পাবার ছিলো। গবেষকদের বেলায় নিয়মকানুনে আরও 'বজ্র আঁটুনি' চেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা কি খেয়াল করেছেন সিঁধেল চোরদের মুখোমুখি প্রাতিষ্ঠানিক গেরোটা কী-আন্দাজ ফস্কা ছিলো।

এই সম্পাদকীয়র শেষাংশে পত্রিকার ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত অধুনাপ্রয়াত অধ্যাপক অশোক রুদ্রের একটি প্রবন্ধের সূত্রে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কবিষয়ক আমার ভাবনাচিন্তার প্রসারণ ছিলো। যেহেতু সে-বিষয়ক ডিসকোর্স বর্তমান বইয়ের অন্যান্য রচনায় অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে, তাই এই অংশ থেকেও কিছুটা তুলে দেওয়া হলো। এ অংশ মূলতঃ সিরিয়াস, কিন্তু তারই বুনটের মধ্যে বন্ধুজনোচিত এবং বিষয়োপযোগী কৌতুকের মিশালও বর্তমান, কেননা রুদ্র মহাশয় এমনই এক মানুষ ছিলেন যাঁর সঙ্গে ধুন্ধুমার তর্ক আর কৌতুকময় আড্ডা দুইই জমতো ভালো। গৃহীত অংশের আগে অন্যান্য লেখকদের রচনা সম্পর্কে ভূমিকাস্বরূপ ছোট ছোট কিছু মন্তব্য ছিলো ; সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে কিছু প্রয়োজনীয় টীকাও জুড়ে দিলাম।]

•

সময়টা অমেয় ব্যস্ততার। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায় ; আমি কূল পাই না। *জিজ্ঞাসা*-র বর্তমান সংখ্যার বৃহদংশ সম্পাদিত হয়ে কলকাতায় চ'লে গেছে ; বাকি আছে গ্রন্থসমালোচনাগুলি জড়ো ক'রে পাঠানো এবং একটি সম্পাদকীয় লেখা। নিজের গবেষণার কাজ বেশ কিছু দিন ধ'রে বন্ধ। *আনন্দবাজার*-এর ডেডলাইন মেনে একটি প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ এক্সপ্রেস ডাকে রওনা ক'রে দেওয়া গেলো। অক্সফোর্ডের 'নারীবিষয়ক আন্তঃসাংস্কৃতিক গবেষণাকেন্দ্র'র জন্য সম্পাদনার যে-কাজটি করছি[১] সেই কাজে আমার সহকর্মিণী যে-কোনো দিন এসে পড়বেন হংকং থেকে ; তখন তাঁর সঙ্গে ব'সে সেদিকে আবার মনোনিবেশ করতে হবে। জিজ্ঞাসার জন্য সম্পাদকীয়টি তার আগেই লিখে ফেলা দরকার। জুনের বর্ষণে প্রবলভাবে আশকারা পাওয়া আমার আঙিনার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তারই জন্য পাঁয়তারা কষছি।

মিথ্যাবাদিনী নই, অমূলপ্রত্যক্ষ দেখে তাকে বাস্তব সত্য ব'লে চালাই না, রবীন্দ্রনাথ আর এল্‌ম্‌হার্স্ট সান ইসিদ্রোতে যে-বাড়িটাতে ছিলেন সেটা নিজের চোখে দেখে এসেছি— *জিজ্ঞাসা*-র আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য দীর্ঘীকৃত গ্রন্থসমালোচনার সূত্রে এ-সমস্ত কথা গুছিয়ে লিখতে পেরে মনটা যখন হালকা হয়েছে,[২] এমন কি খুশী-খুশী বোধ করছে, সখ্য ও প্রণয় বিষয়ে অশোক রুদ্র মহাশয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বন্ধুজনোচিত তর্ককে সম্পাদকীয় পর্যালোচনার মধ্যে কিভাবে সুচারুরূপে বিন্যস্ত করা যায় সেই ভাবনা ভেবে ইতোমধ্যেই নথিবদ্ধ কতগুলি 'পয়েন্ট' যখন মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করেছি,[৩] এমনই সময়ে সভয়ে অবগত হলাম একটি শোচনীয় তথ্য। পাতায় পাতায় বার্তা রটেছে যে আমি একজন আন্তর্জাতিক পাচারকারিণী হতে পারি বটে। বার্তা রটিয়েছেন *গণশক্তি* ও *আজকাল* নামে কলকাতার দুটি দৈনিক পত্রিকা। কালি উল্টে দেওয়া হয়েছে আরও কয়েকজনের নামের উপর, যাঁরা নাকি আমার কুকর্মের সহচর।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পূর্বেই এলো অর্থব্যয়ের নিদারুণ জরুরত ; শিকেয় তুলে রাখতে হলো দুশো টাকা ডাকখরচে বিলেত থেকে *জিজ্ঞাসা*-র সম্পাদনা কিভাবে সম্পন্ন করা যায় সে-সম্পর্কে বৈধ ক্ষোভকে ; নিজের এবং অন্য তিনটি মানুষের নিষ্কলঙ্কতার জানান দিতে গিয়ে প্রাথমিক দফাতেই টেলিফোনে টেলিগ্রামে ডাকখরচে জেরক্সিং-এ

বাঁধনহারা বৃষ্টিধারার মতো কয়েক দিনের মধ্যে বেরিয়ে গেলো আপনাদের হিসাব অনুযায়ী কয়েক হাজার মুদ্রা।

সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত মশাইকে[৩] এক ফাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়েছিলাম, এই ঘটনার পরও তাঁরা আমার সম্পাদনায় *জিজ্ঞাসা* বার করতে ইচ্ছুক কিনা। তাঁর জবাবটি বাহুল্যবর্জিত : 'আপনার সম্পাদনার পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।' মনে হয় গোড়ার দিকের পাতাগুলো ছাপতে চ'লেই গেছে। অর্থাৎ কিনা সম্পাদকীয়টি লেখার দায় থেকে আমার অব্যাহতি নেই।

এই-সব লাইন ছাপা হয়ে বেরোতে বেরোতে ঘটনাবলী কী রূপ নেবে তা বলা যায় না, তবে আপাততঃ ব'সে আছি ঝড়ের নাভিকেন্দ্রে। একটিমাত্র ক্লিপিং দেখে লেখা আমার প্রতিবাদ-পত্রের বৃহদংশ *আজকাল*-এ ছাপা হয়েছে, যদিও তাঁরা আমার দাবি মেনে মিথ্যা অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করেন নি অথবা ক্ষমাপ্রার্থনা করেন নি। অন্যান্য ক্লিপিং দেখার পর *গণশক্তি*-র উদ্দেশে চিঠি এই সবে ডাকে দেওয়া হয়েছে। তার পরেও পৌঁছেছে অন্য একটি কাগজ থেকে আরও দু'-একটি ক্লিপিং। প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রে ভ'রে উঠেছে একটা ফাইল। আমি নাচার : এই অবস্থাতেই আমাকে এই সম্পাদকীয় লিখতে হচ্ছে। এবং স্বভাবতঃই অনুভব করছি এই ঘোলা জলের প্লাবন থেকে সুশিক্ষার কিছু সারকে ছেঁকে নেবার একটা তাগিদ।

কিন্তু তার আগে খানিকটা সূত্র ধরিয়ে দিতে হয় এই পত্রিকার সেই-সব পাঠকপাঠিকাদেরকে, যাঁরা এই জীবনের কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলির বশবর্তী হয়ে ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর 'পরিধি'র নানা কোণকানাচে, ফলে *গণশক্তি* বা *আজকাল*-এর কেন্দ্রিক সন্দেশ সেবন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, এবং তৎকারণবশতঃ দর্পণে এই চোরাকারবারীর ঘৃণ্য ছায়াটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। তাঁদের সুবিধার্থে সংক্ষেপে নিবেদন করি, সাহিত্যে চিত্রকলায় মিলিয়ে রবীন্দ্রসংক্রান্ত একটি আন্তর্বিদ্য গবেষণায় ব্যাপৃত আছি, যার সূত্রে ১৯৯১-৯২-এর কয়েকটি মাস শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় কাটিয়ে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে নিজ নিবাসে প্রত্যাবর্তন করেছি। এই কাজেরই সূত্রে আমি ও আমার সহকারী অক্সফোর্ডের জনৈক গবেষক (শ্রদ্ধেয়, কৃতবিদ্য, পদমর্যাদাসমন্বিত) সম্পূর্ণ বৈধ চ্যানেলে আবেদন ক'রে বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়ের পূর্ণ অনুমতিক্রমে যথানির্দিষ্ট ফী জমা দিয়ে দুটি ভিডিওটেপের একটি সেট পেয়েছি, যার মাধ্যমে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির একটা বড় অংশের একটা অস্পষ্ট আদল পাওয়া যায়। অনেকেই হয়তো জানেন না, রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে কোনো কাজ করতে যাওয়া কী ঝকমারি। রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহ বন্দী থাকে স্ট্রংরুমে : অনুমতি নিয়ে কয়েকটি-কয়েকটি ক'রে দেখতে হয়। এই মূল্যবান সংগ্রহের কোনো ছাপা অ্যালবাম পাওয়া যায় না। স্লাইড-সেট পেলেই আমরা খুশী হতাম, কিন্তু আমাদের জানানো হলো যে স্লাইড-সেটের ডুপ্লিকেটের বদলে ভিডিওটেপ দেওয়াই সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র বিভাগের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। মূল ছবি থেকে নয়, দশ বছরের পুরোনো স্লাইড-সংগ্রহ থেকে তৈরি করা এই কাঁপা-কাঁপা ঝাপসা টেপে ছবিগুলির একটা

মোটামুটি চেহারা পাওয়া যায় মাত্র, মূলের নকশা অথবা রঙ কোনোটাই খুব একটা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই টেপ কেবলই আমাদের গবেষণার সাহায্যকল্পে : এর যাতে বাণিজ্যায়ন না হয়, এ থেকে যাতে ছবি ছেপে দেওয়া না হয় (বলাই বাহুল্য সে-প্রিন্ট অত্যন্ত বাজে হবে), তার জন্য বিদ্যাজগতের নীতি মেনে আমরা অবশ্যই দায়বদ্ধ। কিন্তু এই ছবির প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি যে আদৌ আমাদের দেওয়া হয়েছে সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই শান্তির নিকেতনে চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠেছে।

টেপদুটি যখন নিশ্চিন্ত মনে শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটী-নামধেয় অতিথিনিবাসে আমার ঘরের আলমারিতে দুটি মাস কাটায়, তাদের গায়ে উই লাগতে পারে কিনা তা নিয়ে যখন মাঝে-মধ্যে মাথা ঘামিয়েছি, সেই সময়ে তারা কোনো স্থানীয় গোয়েন্দা-গোষ্ঠীর দুশ্চিন্তা উদ্রেক করতে পারে নি। তাঁদের টনক নড়েছে অনেক দিন পরে, যখন সামগ্রীদুটি আমার সুটকেসবদ্ধ হয়ে রয়াল জর্ডনিয়ান বিমানলাইন দ্বারা বাহিত হয়ে আম্মানে রাত্রিযাপন ক'রে লণ্ডন বিমানবন্দর ছুঁয়ে কিডলিংটন-নামক গ্রামে শুভপ্রবেশ ক'রে গেছে তো বটেই, আমার বাড়ির একটি আলমারিতে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে অভ্যস্তও হয়ে গেছে। গোয়েন্দাদের টনক নড়েছে যখন ঐপ্রকার আরেকটি সেট গেছে নৈহাটির এক অধ্যাপকের কাছে। নৈহাটিতে মাল চালান যাওয়ার পরে ধরা পড়েছে যে কিডলিংটনের মালটা বামাল, আন্তর্জাতিক 'পাচার'-এর মাল, বিশ্বভারতীকে ব্ল্যাকমেল ক'রে ভারতবর্ষ থেকে ছিনিয়ে আনা শিল্পৈশ্বর্য। কারও কারও ধারণা হয়েছে যে আমাদের অসদুদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য আমি ও আমার সহগবেষক রবীন্দ্রভবনের মুখ্য প্রশাসক ও আলোকচিত্র বিভাগের প্রধানের সঙ্গে 'যোগসাজশ' ক'রে থাকতে পারি, তাঁদের লক্ষ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়ে থাকতে পারি। এমন কি, আমি ইয়োরোপ-আমেরিকায় ব্যাপকভাবে সক্রিয় একটি বৃহৎ পাচারকারী চক্রের অন্তর্গতও হতে পারি। কুড়ি-পঁচিশটি টেপ এভাবে 'পাচার' হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। শান্তিনিকেতনেরই অভ্যন্তরস্থ তথ্যসরবরাহকারীদের দ্বারা বাহিত হয়ে আতঙ্ক পৌঁছেছে সি-পি-এম পার্টির মুখপত্র *গণশক্তি*-তে, বিবেকী বামপন্থী কাগজ *আজকাল*-এ, বোলপুরের কর্মতৎপর বিধায়কের কানে। বিচক্ষণ বিধায়ক বিলম্ব না ক'রে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন একেবারে রাজ্যের তথ্য- ও সংস্কৃতি-মন্ত্রীর দপ্তরে। বলুন আপনারা, অকুস্থল থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ব'সে একগুচ্ছ কর্তিতপত্রে এই ধরনের 'চাঞ্চল্যকর' কাহিনী পড়তে পেলে, তার মধ্যে থেকে থেকে নিজের নামটা দেখতে পেলে কার না প্রথমে রক্ত শীতল ও পরমুহূর্তে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয় ?

এই রোমাঞ্চকর থ্রিলার-মুভিতে দিল্লী থেকে বিশ্বভারতীতে নবাগত উপাচার্য মহাশয়ের ভূমিকাটা যে ঠিক কী তা ডিরেক্টরদারা এখনও স্পষ্ট ক'রে বলছেন না। সম্ভবতঃ ওনাদের স্ক্রিপ্টটা এখনও পুরোপুরি রেডি হয় নি। কিংবা সেটা পরীক্ষামূলক থিয়েটারের নিয়ম মেনে পথ চলতে চলতে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে ওঠে। মনে হয় তাঁর ভূমিকা হচ্ছে মুখে-রুমাল-গোঁজা দড়ি-দিয়ে-হাতপা-বাঁধা অবস্থায় প'ড়ে থাকা। তাঁর নাম সব্যসাচী ব'লে তাঁর দুটো হাতই বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তিনি আমাদের ষড়যন্ত্রের

শিকার ও অসহায় দর্শক ; আমাদের ছলনায় ভুলে মন্ত্রীর (রবীন্দ্রভবনের মুখ্য প্রশাসকের) কুমন্ত্রণায় ম'জে অশুভ লগ্নে আমাদের দরখাস্তপত্রে দস্তখত ক'রে ব'সে আছেন। হয়তো বাঁ হাত দিয়েই সই করেছেন। কোনো পুরোনো আমলের ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেয়ানা সায়েবও বুঝি কোনো মোগল বাদশাহ্‌কে এমন ফাঁদে ফ্যালে নি। হাতপা-বাঁধা অবস্থাতেই, মুখে ঠোসা রুমালের ভেতর দিয়েই গোঙাতে গোঙাতে বাদশাহ্ বসিয়েছেন তদন্ত-কমিটি। কিন্তু অধ্যাপকরা, ছাত্ররা, কর্মীরা রক্ত দাবি করছেন, বলছেন ডাকতে হবে সি-বি-আইকে। হ্যাঁ, সি-বি-আইকে। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইন্‌ভেস্টিগেশন্স। বিলেতী টেলিভিশন-সিরিয়াল *দ্য গুডিজ়* যদি আপনারা কেউ দেখে থাকেন, তা হলে সিনারিওটা ভালো বুঝবেন।

উত্তেজক নয় এই সব সংবাদ ? তথাচ সবাই আমাকে বলছেন উত্তেজিত না হতে, এবং আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয়া এতদ্দেশীয়া এক হিতাকাঙ্ক্ষিণী, পূর্বোক্ত নারীবিষয়ক আন্তঃসাংস্কৃতিক গবেষণাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ, আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে এই সম্পাদকীয়টি আমাকে লিখতে হবে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে, ফেমিনিস্ট বিক্ষোভকে বল্গাবদ্ধ অশ্বের মতো সুসংযত ক'রে রেখে, 'শুষ্ক কৌতুক' দ্বারা আমার ভাষাকে পরিশীলিত ক'রে নিয়ে ...।

কিন্তু জয় মা কালী ব'লে ইংরেজদের দেশে কয়েক দশক কাটিয়ে দিলেও আমি তো রক্তের উত্তরাধিকারে ইংরেজ নই; তা ছাড়া আমার কানে বাজছে ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর মন্ত্রণা : 'এসব কথা ঠাণ্ডা রক্তে কী ক'রে লেখা যাবে, যখন ইচ্ছে করে এগুলিকে চীৎকার ক'রে বলতে ?' তাই আমার এই নিজস্ব প্রতিবেদনের রণাঙ্গনে নেমে প্রথমেই জানান দিচ্ছি : এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি— এই কেচ্ছাকাহিনীর সঙ্গে জড়িত আর প্রত্যেকেই কিন্তু পুরুষ, একলা আমি নারী। যাঁরা আক্রমণ করেছেন, যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, যাঁরা খবর সরবরাহ করেছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে— এই গোটা নাটকের, থুড়ি, ছদ্ম-গুডিজ়-এপিসোডের প্রত্যেকটি চরিত্রই বেতনভোগী পুরুষ, স্যালারিড জেন্টল্‌মেন, একা আমি স্ত্রীজাতীয়া ফ্রী-লান্সার। আমার হাতে কেবল একটা স্বাধীন বর্শা আছে, সেটাই ব্যবহার করা হবে। আমার যা বলবার তা একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্না স্বাধীন-বর্শাওয়ালীর মতো ক'রেই বলবো।

দেখুন, দেখুন আপনারা : কয়েকজন বেতনভোগী পুরুষ, স্যালারিড জেন্টল্‌মেন, নেমেছেন তাঁদের নিজস্ব নিয়মের ষাঁড়ের লড়াইয়ে, এবং ভেবেছেন, তাঁদের স্বার্থসিদ্ধিকে সুগম করতে একটি দূরবর্তিনীর সুনাম যায় তো যাক, যদিও বা হতে পারেন তিনি (*আজকাল*-এর প্রতিবেদীর ভাষায়) একজন 'বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ'। 'বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ' যদি চোরাকারবারী না হবেন, তবে সংবাদপত্রের পাঠকদের লোমহর্ষ হবে কী উপায়ে ? পাঠকদের গায়ের লোম খাড়া না হলে পত্রিকার চলবে কেন ? এখানে কতজনের কতরকমের স্বার্থ যে জড়িয়ে আছে তার ঠিকঠাক হিসেব করতে পেশাদার অর্থনীতি-পণ্ডিত লাগবে। তুলনায় একজন মহিলা রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞের সুনাম কিছুই না। মহিলাদের সুনাম গেলে কিছু যায়-আসে না। 'বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ' ! হুঁ ! অমন মেয়ে

তাঁরা ঢের দেখেছেন। আর মাপ করবেন, আমিও কি জীবনে কিছু পুরুষ, বীরপুরুষ, কাপুরুষ ইত্যাদির নমুনা দেখি নি?

> A woman knows very well that, though a wit sends her his poems, praises her judgment, solicits her criticism, and drinks her tea, this by no means signifies that he respects her opinion, admires her understanding, or will refuse, though the rapier is denied him, to run her through the body with his pen.
> — Virginia Woolf

(ডরিস মায়ার তাঁর ওকাম্পো-চরিতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন; আমি সেখান থেকেই পুনরুদ্ধার করলাম।) কেবল এ ক্ষেত্রে তফাৎ এই— পরিণতবয়স্ক যে-মস্তানরা তাঁদের কলমটাকে অসি ক'রে আমার ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না, তাঁদের কাউকেই আমি wit আখ্যা পর্যন্ত দিতে পারি না। তাঁদের বুদ্ধি এতটাই সীমাবদ্ধ যে তাঁরা এটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি— তাঁদের অসিচালনা (প্রকৃতপক্ষে মসীচালনা) দ্বারা আখেরে আমার লেখনীরই তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অধিকতর। আপনারা ভেবে দেখুন, প্রকৃত প্রস্তাবে কী-আন্দাজ মাল-মশলা আমার লেখিকা-সত্তার কিচেন-টেবিলে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই এতগুলো সংবাদপত্রকর্তিকা! একপ্রকারের ছদ্ম-পর্নোগ্রাফি। অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা, তাঁরও জননী পিতামহী কুমারী মেরি, আপনাদের এ কী দাক্ষিণ্য! হাঃ, শত্রুমিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ইংরেজী প্রবচনটিকে উল্টিয়ে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে না কি?— With such enemies, who needs friends? (বিশেষতঃ, অশোকদা, আপনার 'বিশুদ্ধ টাইপ'-সম্মত অকেজো বন্ধুগুলোকে তো একেবারে নির্মমভাবেই বাদ দেওয়া যায়: দেখুন না কেন, শত্রুরা কত বেশী কাজে লাগে।)[৫] কিন্তু এর পর শিক্ষাগ্রহণের পালা।

§

১) বাক্‌স্বাধীনতা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবশ্যিক শর্ত: এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। কিন্তু স্বাধীনতা— তিনি তো কোনো কলা-বৌ নন, তিনি এক অগ্নিগর্ভা স্বেচ্ছাবিহারিণী; তেনার তেজস্ক্রিয় অঞ্চলের চঞ্চলতার পরিণামে এই ধরনের ঘটনা যে মধ্যে মধ্যে ঘটবে এমনটা ধ'রেই নেওয়া যায়। সকলেই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নয়, কেউ কেউ রীতিমতো দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত স্বার্থবুদ্ধিচালিত মিথ্যাবাদী; আদর্শপ্রেম বা শুভবুদ্ধির চাইতে স্বার্থবুদ্ধিই নাকি অধিকতর শক্তিশালী, মানবেতিহাসের বলবত্তর নিয়ামক— রাজনীতির অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকগণের মতে। (এই সংখ্যাতেই বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গ্রন্থসমালোচনাটি দেখুন না।)[৬] তাই এতে সত্যিই অবাক হবার কিছু নেই যে কেউ কেউ অম্লানবদনে আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যে কথা কাগজে ব'লে দেবে, কাগজেও সে-সব কথা

দ্বিগুণ রঙ ফলিয়ে ছেপে দেবে। দুশো টাকা জমা দিয়ে নিয়ম মেনে দুটো টেপ নেওয়া কোনো গল্পই নয়; জরুরী তার সৃজনশীল রূপান্তর। লাখ লাখ ডলারের বিনিময়ে 'হল্যাণ্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এবং আমেরিকায়' কুড়ি-পঁচিশটা টেপ পার করাতে পারলে তবেই না একটা ভদ্রগোছের কেচ্ছা হয়। 'বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ'-সহ একসঙ্গে অনেককেই বাঁশ দেওয়া যায়। এ থেকে বংশদণ্ডপ্রাপ্ত আমাদের বেদনা ক্রোধ উত্তেজনা শক্তিক্ষয় সময়ক্ষয় অর্থক্ষয় সমস্তই হবে; তবে বন্ধুগণ, স্বীকার্য যে আরও বেশী শোচনীয় হয় যদি এই বাক্‌স্বাধীনতা হয় ব্যাহত— দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কেবল আক্রমণকারীর আক্রমণ করার ক্ষমতা থাকে, আক্রান্তের আত্মরক্ষার ও আত্মপক্ষসমর্থনের অধিকার স্বীকৃত না হয়। এই অধিকার যে পশ্চিমবঙ্গে সৌভাগ্যবশতঃ অদ্যাপি স্বীকৃত, সেটি দেখে আমি বিলক্ষণ আশান্বিত হয়েছি। ২৭ জুন তারিখের সকালে কিডলিংটন-নামক পৃথিবীর 'পরিধি'র একটি গ্রাম থেকে রেজিস্টার্ড এক্সপ্রেস ডাকে সমর্পিত আমার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদপত্র ৭ জুলাই তারিখেই *আজকাল*-নামক কেন্দ্রিক পত্রিকাটিতে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। সম্প্রতি জেনেছি যে রবীন্দ্রভবনের নবনিযুক্ত অস্থায়ী অধ্যক্ষের তরফে একটি শান্ত বিবৃতিপত্রও ৩ জুলাইয়ের *স্টেট্‌স্‌ম্যান*-এ ছাপা হয়েছে। অতএব, বন্ধুগণ, আমি সর্বপ্রথমে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অগ্নিগর্ভা বাক্‌স্বাধীনতাকে এবং আধুনিক বিশ্বের বিদ্যুন্নিভা যে-প্রযুক্তিবিদ্যা তাকে সম্ভব করে তাকেও, উভয়কেই, এই দুই শক্তিশালিনী নানাকর্মপটীয়সী দেবীকেই, আমার হস্তস্থ স্বাধীন বর্শার উত্তোলন ও কম্পন সহকারে অভিনন্দনসূচক থ্রী চীয়ার্স জানাতে চাই। হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে। আশা করা যায় *গণশক্তি*-ও এ ব্যাপারে আমাকে হতাশ করবে না।

২) তার পর জিজ্ঞাস্য: এমন একটা ন্যায্যতর প্রেস-প্রতিবেদনের ব্যবস্থায় কি আমরা পৌঁছতে পারি না, যেখানে তাঁদের বক্তব্যের জন্য প্রতিবেদীদের আরেকটু দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা যায়? কোনো দুর্মুখ-রচিত কুৎসাধর্মী অমূলক প্রতিবেদন যখন সুবিধে বুঝে স্বাক্ষরবর্জিত অবস্থায় ছাপা হয়, তখন সেই লিখনের জন্য সামগ্রিকভাবে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষকেই দায়িত্ব নিতে হবে, হয় স্বত্বাধিকারীকে, নয় সম্পাদকমণ্ডলীকে। এবং ব্যয়সাধ্য দীর্ঘসূত্রী আইন-প্রক্রিয়ার সাহায্য না নিয়ে অন্য কোনো দ্রুততর চ্যানেলে এ ধরনের অন্যায়ের যাতে প্রতিকার করা যায় তারই একটা সুব্যবস্থা প্রত্যেক স্বাধীন-প্রেস-সমন্বিত আত্মমর্যাদাবান সমাজের মধ্যে রাখা দরকার, একটা জনবসতিবহুল শহরে যেমন অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে দমকলবাহিনীর একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা লাগে। স্বাধীনতা একপ্রকারের অগ্নিক্রীড়া ব'লেই তার ঝুঁকির মোকাবিলায় এটা প্রয়োজনীয়। খেলতে খেলতে দৈবাৎ আগুন লেগে গেলে উকিল ডাকিয়ে মামলা ক'রে আগুন নেভানো যায় না।

৩) কিন্তু আলোচ্য কেসে প্রেসের স্বেচ্ছাচারিতার চাইতেও যা আমাকে বিস্মিত করেছে তা হচ্ছে প্রেসের কাছে তথ্যসরবরাহকারী বিশ্বভারতীর কর্মীদের ১০০% বিবেকবর্জিত আচরণ, তাঁদের নিজেদের গায়ে আঁচড়টুকু না লাগিয়ে সহকর্মীদের পিঠে ছুরি মারার ভয়ংকর স্বাধীনতা, যা কোনো প্রতিষ্ঠানের বরদাস্ত করা উচিত নয়, এবং একই

প্রক্রিয়ায় ক্যাম্পাসের বিদেশী অতিথিদের নামে মিথ্যা অপবাদ রটানোর নিপট-নিশ্চিন্ত অধিকারটুকুও, যা যে-কোনো বিদ্যাঙ্গনের মর্যাদা ও বিদ্যাচর্চার স্বাধীনতাকে ছিন্নভিন্ন করে। আপনারা ভেবে দেখুন, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের লক্ষ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়ে একটা দেশের বহুমূল্য শিল্পসামগ্রীকে বিদেশে 'পাচার' করার অভিযোগটি প্রকৃতপক্ষে কত দূর গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো-কোনো কর্মী প্রেসের সঙ্গে কত দূর অশালীন 'যোগসাজশে' লিপ্ত হলে তবেই ঐ ধরনের 'নিউজ় স্টোরি' ছাপা হয়ে বেরোতে পারে।

বিশ্বভারতীর বেতনভোগী সেই সব ব্যক্তি,— হ্যাঁ, পুরুষ, চাকুরিজীবী বেতনভোগী পেনশনসমন্বিত সেই সব আখের-গুছানে পুরুষ,— যাঁরা এই স্বাধীন-বর্শাওয়ালীর সঙ্গে হেসে কথা বলেন, হয়তো তাকে চা-ও খাওয়ান, কুছ পরোয়া না ক'রে, কথাটা সত্য কি মিথ্যা তা আমাকে একবার জিজ্ঞেস না ক'রে প্রেসে এমন প্রতিবেদন পাঠালেন, বোলপুরের এম. এল. এ.-কে দিয়ে কলকাতার মন্ত্রীকে এমন চিঠি লেখালেন, যার মানে দাঁড়াচ্ছে: আমি ও আমার সহগবেষক তাঁদেরই দুজন সহকর্মীর সঙ্গে 'যোগসাজশ' ক'রে লক্ষ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে ভারতীয় ঐশ্বর্য বিদেশে 'পাচার' ক'রে থাকতে পারি। অভিযোগ সত্য হলে আমার এই সম্পাদকীয়-রচনাকারী শ্রীহস্ত-সমেত চারজোড়া হাতেই হাতকড়া পড়তে পারে।

আজকাল-এর যে-প্রতিবেদনগুলি আমার হস্তস্থ হয়েছে তাদের মধ্যে অন্ততঃ দুটি কোনো রাখ্ ঢাক্ না ক'রে বিশ্বভারতীর এমন একজন কর্মীর নামাঙ্কিত, যাঁকে আমি ন' বছর ধ'রে চিনি, যাঁর ঘরে চা খেয়েছি, যাঁর বাড়িতেও একবার গেছি, আমার দু'-দুটি বইয়ে যাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি কিনা চোখের পাতা না কাঁপিয়ে স্বনামে প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিলেন: 'বিশ্বভারতীর কয়েকটি মহল থেকে ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে যে শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ কেতকী কুশারী ডাইসনের মাধ্যমে এই ক্যাসেট বিদেশে পাচার হয়েছে।' এক মিনিট! 'কয়েকটি মহল থেকে ... অভিযোগ উঠেছে' মানে? কোন্ কোন্ মহল? রঙমহল, খাসমহল, শিশমহল, মহিলামহল? কারা বলেছে এই কথা? কোন্ ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়ের ছক্কা শর্মণ অথবা পঞ্জা বর্মণ? কেন তাদের সাহস নেই আমার মুখোমুখি হবার? একমাসের বেশী হলো এই-সব খবর কাগজে বেরোতে আরম্ভ করেছে, তবু কেন আজ পর্যন্ত এঁদের কারও কাছ থেকে সরাসরি কোনো পত্র পেলাম না? পত্রিকায় আমার প্রতিবাদ বেরিয়ে গেলো, কিন্তু মূল অভিযোগকারীদের দস্তখত আজও দেখলাম না। তাই বলছি, খবরটা প্রেসে দেবার আগে আমার পরিচিত উক্ত ব্যক্তি কেন আমাকে একটিবার জিজ্ঞেস ক'রে নিলেন না, এই গুরুতর ব্যাপারে আমার অভিমতটা কী? আমার ঠিকানা রবীন্দ্রভবনে কোনো গোপন তথ্য নয়, এবং সাধারণ মানবিক সৌজন্যের কিছু দাবিও জীবনে মানতে হয়। 'বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ' হয়েও আমি যদি পাচারকারিণী হই, তা হলে আমার বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞতার প্রভা কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে, এবং এই ধরনের পিঠ চাপড়ানি দিয়ে পরমুহূর্তেই গালে থাপ্পড় দেওয়া যে মহিলা স্কলারদের

কাজকে খাটো করার একটা প্রচলিত কৌশল সে-সম্পর্কে আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। বহুদিনের ফেমিনিস্ট চর্চার ফলে এ বিষয়ে আমার সম্যক্ ধারণা বর্তমান।

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা অতিথিদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করার যে কোনো আইনগত বা কূটনৈতিক মাত্রা থাকতে পারে, সে-সম্পর্কে এঁদের বোধ করি কোনো ধারণাও নেই। সহকর্মীদের বিরুদ্ধে কারও কোনো সঙ্গত বক্তব্য থাকলে তাকে চ্যানেল করবার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। যা বলবার ন্যায্য চ্যানেলে বলুন, সামনাসামনি বলুন। একটা গ্রুপের মধ্যে থেকে কাজ করতে হলে টীম স্পিরিট ন্যূনপক্ষে সেটুকু দাবি করে। প্রেসের কাছে নালিশ করতে চান তো চাকরি ছেড়ে দিন আগে। একটা প্রতিষ্ঠানের খেয়ে-প'রে সেই প্রতিষ্ঠানকেই এভাবে অপমান করবার অধিকার কেন কোনো কর্মী পাবে? কেননা, শেষ বিচারে এই কেচ্ছায় উপাচার্যসুদ্ধ বিশ্বভারতীকেই অপদস্থ করা হয়েছে। হয়তো আমি বহুকাল ইংরেজদের সমাজের ভিতরে বাস করেছি ব'লে আমার নিজের আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের 'ডিস্‌লয়াল্টি' কুশ্রী দেখায়।

৪) এর পর আসছে বিদ্যাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু মূলগত কথা। আমাদের টেপছুটি পাওয়া নিয়ে প্রেসে তথা শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে যাঁরা তুলকালাম করেছেন, যাঁরা এটাকে 'চুরি' বা 'পাচার' নামে ভূষিত করেছেন, মন্দিরের গা থেকে মূর্তি খুলে নেওয়ার সঙ্গে তাকে তুল্যমূল্য মনে ক'রে সম্পাদকীয় লিখেছেন, মূল ছবি আর তার প্রতিচ্ছবির মধ্যেকার ভেদটুকু ইচ্ছে ক'রে অস্পষ্ট ক'রে দিয়ে মধ্যে মধ্যে জল ঘোলা ক'রে পত্রিকার অর্ধমনোযোগী পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে 'রবীন্দ্রচিত্রকর্ম'ই, তাঁর আঁকা মূল ছবিই আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, প্রতিমা দেবীর নাম পর্যন্ত স্মরণ ক'রে বিলাপ করার চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রভবনকে নিয়মের নিগড়ে আরও আঁট ক'রে বাঁধা হোক এই ধরনের আওয়াজ দিতে আরম্ভ করেছেন, বিদেশী মানেই অনির্ভরযোগ্য এই জাতীয় ইঙ্গিত যাঁদের ওষ্ঠলগ্ন— ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় এই তাসের-দেশ মানসতার লোকেরা যাতে রবীন্দ্রভবনকে একটি অচলায়তন ক'রে ফেলতে না পারেন সেই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক 'mandarin' মনোবৃত্তির একদল লোক আছেন, যাঁরা 'গেলো গেলো' রব তুলে নিয়মের জন্যেই নিয়মকে সিংহাসনে বসাতে পারলে আর কিছু চান না। কিন্তু আমরা যারা বিদ্যাচর্চা করি তারা এর বিরুদ্ধে। বিশ্বভারতী যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর কত লেখাতেই যে তিনি একে বিদ্রূপ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমি নিশ্চিত জানি, তাঁর ছবি নিয়ে গবেষণা করার সূত্রে কেউ সেই ছবির রিপ্রোডাক্‌শন পেয়েছে এই খবরে তাঁর (অথবা তাঁর পুত্রবধূর) 'আত্মা' কখনো ব্যথিত হতে পারে না, বরং খুশীই হবে।

ডিসিপ্লিন এক জিনিস, প্রতিক্রিয়াশীল মানসতার নিয়মানুবর্তিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক জিনিস। বিশ্বভারতীর কোনো কোনো কর্মী সহকর্মীদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বভারতীর অতিথিদের বিরুদ্ধে প্রেসের কাছে অবলীলাক্রমে কেচ্ছা করেছেন, এইখানে ডিসিপ্লিন-ভঙ্গ

হয়েছে। এই ধরনের চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে 'ডিসিপ্লিনারি অ্যাক্শন' অসঙ্গত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রভবন কোনো নিয়মে চলে না, নিয়মগুলোকে আরও আঁট করা দরকার— এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: ক) কারও কারও মুখে কালি মাখানো, খ) সিরিয়াস গবেষণায় বাধা দেওয়া। আমি গত ন' বছরে তিনবার দীর্ঘ সময়ের জন্য রবীন্দ্রভবনে কাজ করতে গেছি। কোনোবারই কোনো অধ্যক্ষকে পাই নি। কিন্তু তাই ব'লে আমার কাজ আটকে থাকে নি। ভবনের অন্যান্য কর্মীদের কাছ থেকে সর্বদাই প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়েছি। একটা কথা জোর দিয়েই বলা দরকার: বিদ্যাজগতের সঙ্গে যুক্ত একটা প্রতিষ্ঠানে নিয়মের ভূমিকা হওয়া উচিত শুধুমাত্র মেশিন অয়েলের মতো, কলকব্জাকে সচল রাখার জন্য। তার চেয়ে একচুল বেশী নিয়মপ্রেম চাই না, নয়তো সে গলার ফাঁস হয়ে উঠে প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্যকেই হত্যা করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

§

এসব কথা কি এই পত্রিকায় অবান্তর ? নাঃ, তার কোনো চান্সই নেই। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালীদের কাল্চারের কেন্দ্রস্থানীয় মূর্তি, প্রায় তার সংজ্ঞার অন্তর্গত, প্রায় তার প্রতীক। তাঁর আর্কাইভ্স্ ও ছবির বৃহত্তম অংশ যখন রবীন্দ্রভবনেই রক্ষিত, তাঁকে নিয়ে গভীরভাবে কোনো কাজ করতে গেলে এই ভবনের সহযোগিতা যখন একান্তই জরুরী, তখন এই ভবন যাতে একটি আধুনিকমনস্ক খোলা শৈলীর প্রতিষ্ঠান থাকে, একটি মধ্যযুগীয় বুঁদির কেল্লায় পরিণত না হয়, তার জন্য আমাদের সকলকেই চেষ্টা করতে হবে, এবং এ বিষয়ে কথা বলবার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে। এই পত্রিকার নিয়মিত সম্পাদকও তাঁর সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রভবন-অধ্যক্ষতার কালে এরই জন্য লড়েছিলেন।

রবীন্দ্রভবন যেন একটি স্তূপে পরিণত না হয়, যার মধ্যে ভগবান বুদ্ধের পাদনখকণা, হজরত মহম্মদের কেশ, বা মধ্যযুগের গির্জার শৃঙ্খলিত বাইবেলের মতো কিছু কিছু পবিত্র জিনিস অধিষ্ঠান করবে, আর তীর্থযাত্রীরা লাইন দিয়ে এসে গ্যাঁদাফুল রেখে যাবে। আমাদের কাল্চারের মধ্যে যে-দিকটা পৌত্তলিকতা দ্বারা আক্রান্ত সেই দিকটা ক্রমাগত আমাদের প্রত্যেকটি সজীব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঠেলে দিতে চায় স্তূপীভবনের দিকে। এই প্রবণতাকে রোধ ক'রে রবীন্দ্রভবনকে আধুনিক রবীন্দ্রচর্চার উপযুক্ত প্রাঙ্গণ ক'রে তোলাই হবে আজকের দিনের চ্যালেঞ্জ। দরজা বন্ধ ক'রে নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগকে দৃঢ়তর ক'রেই তার মোকাবিলা সম্ভব। এই ভবন থেকে নানা গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসাংস্কৃতিক আন্তর্বিদ্য সৃজনশীল কাজ বেরোতে পারে, যদি খোলা আবহাওয়াটা বজায় রাখা যায়। সেইজন্যই বলছি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় একদল লোক যাতে জায়গাটাকে 'টেইক্-ওভার' ক'রে তাকে একটা চিতোর-গড় ক'রে ফেলতে না পারে সেদিকে আমাদের সবাইকে তৎপর হতে হবে।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিত্রসংগ্রহ ও আর্কাইভাল সম্পদ যে কোনো-একটি দলের, গোষ্ঠীর, পারিবারিক চক্রের, বা ঐ ভবনের কর্মীদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি বা জমিদারি হতে পারে না, এই কথাটা বিদ্যাজগতের সবাইকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে। মানতে হবে যে জ্ঞানান্বেষীদের, গবেষকদের, কলারসিকদের এই সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হবার, বিদ্যার্চর্চার সূত্রে তাকে ব্যবহার করবার অধিকার আছে। এই ন্যায্য 'অ্যাকাডেমিক অ্যাক্সেস'-এ যদি বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, তা হলে এই-সব জিনিস সুরক্ষিত ক'রে রাখারই কোনো অর্থ থাকে না, সে-সংরক্ষণ হয় কবর দেওয়ার শামিল। এ ছাড়াও স্বীকার্য যে চিত্রসংগ্রহটি দেখার অধিকার কেবলই পণ্ডিতদের নয়, চিত্রকলায় আগ্রহী সাধারণ দর্শকদেরও আছে। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তার আগে স্পষ্ট ক'রে জানান দিতে চাই, যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই, 'বিশ্ব' যার নামের অন্তর্গত তেমন প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে, আর বিশ্বের যেখানে একনীড় হবার কথা সেই 'বিশ্বভারতী'তে তো বিশেষ ক'রেই, বিদেশীবিদ্বেষের কোনো স্থান থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাজ করবার অধিকার বিদেশের বিদ্বজ্জনদেরও নিশ্চয়ই আছে। কোনো গুণীই কেবল তাঁর স্বজাতির সম্পত্তি নন। প্রত্যেক গুণী বিশ্বের সন্তান ; সমগ্র পৃথিবীই তাঁর সৃষ্টির উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা : ইতিহাসের একটা বিশেষ সন্ধিলগ্নে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য এই দুই জগতের একটা বিরাট ধাক্কাধাক্কি তাঁকে সৃজন-লালন করেছে। তিনি এত বড় মাপের প্রতিভা ছিলেন, তাঁর কাজের এমন একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা বর্তমান যে তাঁকে নিয়ে আগামী অনেক দিন ধ'রে নানা দেশের গবেষকরা গবেষণা করতে চাইবেন, যতদিন না ক্ষেত্রটা পুরোপুরি কর্ষিত হয়। ঘটনাচক্রে আজকে আমি বাঙালী হয়েও 'বিদেশী' হয়েছি ব'লে এঁদের তরফে— 'বিদেশী'দের তরফে, অনাবাসী ভারতীয়দের তরফে, আমাদের বংশধরদের তরফে, অনাগত প্রজন্মের ভারতীয়-বংশোদ্ভূত তথা অ-ভারতীয় রক্তের বিদেশী ছাত্রদের ও গবেষকদের তরফে— আমি লড়তে চাই। এঁরা, আন্তর্জাতিক সারস্বত সমাজ থেকে আসা জিজ্ঞাসুরা, রবীন্দ্রভবনে (বা বিশ্বভারতীর অন্য কোনো ভবনে) কাজ করতে এসে যাতে অপমানিত না হন, যেভাবে আমরা হলাম, তার একটা ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। সি-বি-আই-কে ডাকা দরকার ব'লে যাঁরা তর্জনগর্জন করছেন, 'রাজকোষ হতে চুরি ! ধরে আন্ চোর' ব'লে লম্ফঝম্প করছেন এবং বিদেশী বজ্রসেনদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন, তাঁদের বলতে চাই : 'এক মিনিট দাঁড়ান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা দুজন স্কলারের শোচনীয় অপমান আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে (ক্রমাগত ক্লিপিং আসছে), আগে তার তদন্ত হোক।' কিভাবে এবং কোন্ যোগসাজশে আমাদের সম্বন্ধে নানা মিথ্যে কথা পল্লবিত হয়ে খবরের কাগজে পৌঁছেছে এবং পৌঁছচ্ছে, সর্বাগ্রে জরুরী তারই তদন্ত। বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে বিদেশী স্কলারদের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার্থে এমন একটা সংস্থা চাই, যেখান থেকে আমরা মদত পেতে পারি, যেখানে আমরা আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে পারি। নয়তো জায়গাটা বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতির অযোগ্য হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রভবনের যে-দুজন অফিসারের

মানহানি করা হয় তাঁদের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমি নিজে এক মুহূর্ত দ্বিধা করি নি, কিন্তু আমার এবং আমার বিদেশী সহকারীর অসম্মানমোচনের জন্য লড়বে এমন কোনো সংস্থা তো ওখানে নেই। এর একটা প্রতিবিধান হওয়া দরকার।

বেদনার সঙ্গে স্মরণ না ক'রে পারছি না, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পিছনে সক্রিয় ছিলো আন্তর্জাতিক মিলনের প্রতি একটি মানুষের কী সুগভীর এক অঙ্গীকার। সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ ও জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা— দুটোকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং সবরকমের চরমপন্থা থেকে নিজেকে বিযুক্ত রেখে, কোনোরকমের জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে উৎত্রস্ত হতে না দিয়ে আন্তর্জাতিকতার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারে অটল থাকা তাঁর পক্ষে সহজ কাজ হয় নি। অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা উত্তেজিত উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ত জনতা যখন ডাইনী-দাহের মতো ক'রে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব কিছুকে, তার যাবতীয় চিহ্নকে পোড়াচ্ছিলো, তখন তাঁর মনে এক প্রগাঢ় আশাভঙ্গের সঞ্চার হয়। গান্ধীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

> আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার যে-দৌত্য তা কি চিত্তের, না পশুশক্তির? গান্ধী আমাকে বললেন যে তিনি নিশ্চিত যে ইয়োরোপীয় সব-কিছুকে নষ্ট করা দরকারী,— বিজ্ঞান তথা রীতিনীতি, পশ্চিমের সঙ্গে যা-কিছু সম্পৃক্ত সে-সমস্তই। দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক হয়েছিলো সেই আলোচনা। অবশেষে আমি তাঁকে বললাম, আপনার কর্মসূচী রাজনৈতিক; আমি হচ্ছি কবি এবং শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ নই। এবং আমি তৎক্ষণাৎ সংকল্প করলাম যে পশ্চিমের সঙ্গে প্রেমের এবং মিলনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করবো।
>
> (আন্দেস্ জাহাজে ৬ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে *লা নাসিয়ন* কাগজকে প্রদত্ত কবির সাক্ষাৎকার, ঐ কাগজে ৭ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে প্রকাশিত)[৭]

তাঁর সেই অঙ্গীকারকে নতুন ক'রে স্বীকার করার, আবার উচ্চারণ করার সময় এসেছে।

§

কিন্তু তার মানে কি এই, যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিবেচনা না ক'রে যে-কোনো আবেদনকারীর হাতেই মূল্যবান জিনিস তুলে দিতে হবে? তা তো বলছি না। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারলে তবেই একজন মানুষকে স্কলার বলা হয়। প্রমাণসমর্থিত বিদ্বজ্জনকে তাঁর কর্মসংক্রান্ত উপাদানে যথাসম্ভব 'অ্যাকাডেমিক অ্যাক্সেস' দিতে হয়: সভ্য জগতের সারস্বত সমাজের এইটেই মান্য রীতি। কে কী কাজ করেছেন সে-সব তো গোপন তথ্য নয়। যাঁরা লেখেন এবং লেখা প্রকাশ করেন তাঁদের প্রকাশিত কাজের মধ্যেই তাঁদের

পরিচয় বিধৃত থাকে। প্রকাশিত রচনাবলী এবং অন্যান্য বায়োডেটার দিকে ঠিক ক'রে তাকালে অবশ্যই বোঝা যায় কে অধিকারী, আর কে-ই বা অনধিকারী। হাইজ্যাকারদের প্রশ্রয় না দিয়েও প্রকৃত বিদ্বজ্জনদের পথকে বাধামুক্ত রাখা প্রশাসকদের পক্ষে মোটেও দুরূহ হওয়া উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। সমাজের গণতান্ত্রিকীকরণের একটা পরিণাম এই যে কতগুলি ইশ্যুকে ঠিক ক'রে না বুঝে, কেবলমাত্র ভাসা-ভাসাভাবে বুঝে কিছু লোক এঁড়ে তর্ক করতে থাকেন। এঁরা মনে করেন, তর্কটা ছাপা অক্ষরে হচ্ছে ব'লেই বুঝি খুব উচ্চমার্গের তর্ক হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবিই যে অদ্যাবধি 'অপ্রকাশিত', অর্থাৎ ছাপা হয়ে বেরোয় নি, এবং সেই কারণেই যে গবেষকদের ঐ চিত্রসংগ্রহের রিপ্রোডাক্শন দেওয়া অবৈধ: এইরকম একটা তর্ক চালু হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই তর্কের কোনো যৌক্তিকতা নেই।

'প্রকাশিত' ও 'অপ্রকাশিত' এই ধারণাদুটি মুদ্রণবিপ্লবের পরবর্তী আধুনিক সাহিত্যজগৎ থেকে নেওয়া; দৃশ্যকলার জগতে এদের তেমন কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। ছাপা বইয়ের যুগের আগে, পুঁথি-বইয়ের বা মৌখিক সাহিত্যের আমলে সাহিত্যজগতেও এই ধারণাদুটির বিশেষ কোনো অর্থ ছিলো না। একটা কাব্য রসিকদের সভায় উচ্চারিত বা পঠিত হলেই তা 'প্রকাশিত' হয়ে যেতো। চিত্রী যে-মুহূর্তে একটা ছবি আঁকা শেষ করেছেন এবং দু'-চারজন বন্ধুকে ডেকে দেখিয়েছেন, সেই মুহূর্তেই সে-ছবি প্রকাশিত হয়ে গেছে, আর কোনো প্রকাশের অপেক্ষা সে রাখে না। রবীন্দ্রনাথের সব ছবিই এই অর্থে প্রকাশিত। ছাপা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের দেখার অধিকারের কোনো সম্পর্ক নেই।

চিঠিপত্রের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আর চিত্রকলার মধ্যে এই ব্যাপারে একটা মূলগত ভেদ বর্তমান। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের প্রাইভেসি থাকে; যত দিন কপিরাইট চলছে তত দিন সে-সব কাগজপত্র কেবল প্রমাণিত গবেষকের চোখের জন্য, সকলের জন্য নয়। শিল্পীর ছবি কিন্তু সকলের চোখের জন্য; সকলে তাকে দেখলে কোনো দোষ নেই। লোকে তাকে চোখ মেলে দেখবে, উপভোগ করবে, সেই উদ্দেশ্যেই শিল্পী তাকে এঁকেছেন, অন্ধকারে তাকে শুইয়ে রাখার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি আর আর্কাইভ্‌সের অন্যান্য কাগজপত্র একই স্ট্রংরুমে বন্দী হয়ে থাকে ব'লে কারও কারও মনে একটা বর্গীকরণ-সংক্রান্ত বিভ্রান্তি জন্মেছে (আবারও আমাকে বর্গীকরণের প্রসঙ্গ আনতে হচ্ছে!) যে দুটো জিনিস বুঝি একেবারে একই বর্গের। তা নয়।

দুটো জিনিসই মূল্যবান। কিন্তু কাগজপত্রের স্থান আর্কাইভ্‌সের আলমারিতেই। তাদের মধ্যে সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি আছে, চিঠিপত্রও আছে। অনুমতি নিয়ে গবেষক দেখতে পারেন। আরও একটা জিনিস অনেকে জানেন না: আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চিঠিপত্রের ব্যাপারে কপিরাইট পত্রপ্রাপকের এস্টেটের নয়, পত্রলেখকের এস্টেটের। কপিরাইট চলাকালীন দুই ব্যক্তির পরস্পরকে লেখা পত্রগুচ্ছ বার করতে হলে দুই দিকের সহযোগিতা লাগবে। তা ছাড়া যে-কোনো দিকে বিশেষ নিষেধও থাকতে পারে। যেমন, এতগুলি বছর

গত না হলে কাউকে কোনো চিঠি দেখতেই দেওয়া হবে না। তবে সাধারণতঃ তেমন ক্ষেত্রে কাগজপত্র ব্যাংকে অথবা ব্যক্তিগত সংগ্রহেই গচ্ছিত থাকে। কাগজপত্র কোনো লেখ্যাগারে আসার মানেই হলো, সাধারণভাবে, যে এবারে গবেষকরা অনুমতি নিয়ে সে-সব দেখতে পারেন। আরও একটা ব্যাপার অনেকে বোঝেন না : একটা কাগজের স্বত্বাধিকার আর তার মধ্যে যে-লিখন রয়েছে সেই লিখিত বস্তুর স্বত্বাধিকার এ দুটো এক জিনিস নয়। কপিরাইট নামক ধারণাটা কেবল দ্বিতীয় অধিকারের বেলায় প্রযোজ্য। এরকম হতেই পারে যে নিছক সামগ্রী হিসাবে একটা কাগজের স্বত্ব 'ক'-চিহ্নিত সংগ্রহশালার, কিন্তু তার লিখিত বস্তুর কপিরাইট এখনও 'খ'-চিহ্নিত এস্টেটের সঙ্গে সংসক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু শিল্পীর আঁকা ছবি একটা ভিন্ন জিনিস। তার জায়গা প্রকৃতপক্ষে পাবলিক গ্যালারিতেই, যার নিরাপত্তা সুরক্ষিত, কিন্তু যেখানে দর্শকদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। কোনো ধনী ব্যক্তি যখন কোনো বিখ্যাত ছবি কিনে ফেলে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে বন্দী ক'রে রাখেন, পাবলিককে দেখতে দেন না, তখন কলারসিকদের মনে সঙ্গত কারণেই ক্ষোভ হয়ে থাকে। রবীন্দ্রভবনের রবীন্দ্রচিত্রসংগ্রহ যে বাধ্য হয়ে যক্ষপুরীতে বন্দী হয়ে থাকে তার প্রধান কারণ এখানে অনেক ছবি আছে অথচ এদের মাধ্যম অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর। এই সংগ্রহের পাবলিক ডিস্‌প্লে হতে হলে বিরাট এবং বিশেষ ব্যবস্থা চাই। লাগবে প্রচুর গ্যালারি স্পেস, নিরাপত্তার বিরাট ব্যবস্থা, এবং ভঙ্গুর মাধ্যমগুলি সম্পর্কে আধুনিকতম জ্ঞান ও প্রযুক্তি। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নেওয়াটা মূঢ়তা হবে। তাঁরা এমনও বলতে পারেন যে কোনো পাবলিক প্রদর্শন না হওয়াই ভালো। এত সব দায়িত্ব নেবে কে? অত সব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে রবীন্দ্র-এস্টেটের পক্ষে সহজতম কাজ হচ্ছে তাঁদের উত্তরাধিকারকে কিং অফ দ্য ডার্ক চেম্বার ক'রে রেখে দেওয়া, এবং সেটাই তাঁরা করেন। কিন্তু এই সংগ্রহ যে স্ট্রংরুমে থাকে সেটা কতগুলি বিশেষ কারণেই, চিত্রকলার কোনো নিহিত ধর্মের জন্যে নয়।

কোনো ছবি 'প্রকাশিত' অর্থাৎ 'ছাপা' হয় নি ব'লে তা আমাদের দেখা বারণ এটা একেবারে বাজে তর্ক। 'ছাপা' হলে তবেই ছবি দেখার অধিকার পাওয়া যাবে, এ কথা কে বলেছে? ছবি তো দেখার জন্যেই, ঢেকে রাখার জন্যে তো নয়। কপিরাইট আর দর্শনাধিকার দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। থাকুন গে বিশ্বভারতী তাঁদের কপিরাইটকে আঁকড়ে, কিন্তু দেখার অধিকার তো সকল কলারসিকের। কপিরাইট বজায় রেখেও বিশ্বভারতী এই সংগ্রহ আমাদের দেখাতে পারেন। গবেষকরা সেই বোঝাবুঝিতেই রিপ্রোডাক্‌শন পেয়ে থাকেন।

আমাদের নিবেদন : ক) ভঙ্গুর রবীন্দ্রচিত্রকলার সংরক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক, সংরক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তার অন্তর্গত হোক ; খ) এই সংগ্রহ ভঙ্গুর ব'লেই এবং তাকে গ্যালারিতে ঝোলাবার স্বীকৃত অসুবিধা আছে ব'লেই অবিলম্বে সমগ্র সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য রিপ্রোডাক্‌শনের ব্যবস্থা করা হোক— নানা মাধ্যমে, অ্যালবামে, প্রিন্টে, স্লাইড-সেটে, ভিডিওতে। আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিলো

না ব'লেই তো রবীন্দ্রভবনের আলোকচিত্র বিভাগ আমাদের যা দিতে পেরেছেন আমরা তাই নিয়েছি। মূল ছবি বারে বারে নাড়াচাড়া করার বদলে এটাই তো বিহিততর পন্থা। অনুমতি দিয়ে কর্তৃপক্ষ তো ঠিকই করেছেন।

§

উল্লেখ করা উচিত, এই সম্পাদকীয় লিপি প্রস্তুতির সময়ে কেন্দ্র থেকে পরিধিতে নিউজ্-ক্লিপিং আসা থেমে থাকে নি। গতকালও দুটো ক্লিপিং পৌঁছেছে। বিশ্বভারতীর নিজস্ব 'অভ্যন্তরীণ তদন্ত' চলাকালীনই তদন্তকারীদের চৌবাচ্চায় যা পেশ করা হচ্ছে প্রেসের কল দিয়ে তা চুইয়ে পড়ছে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার কিছু লোকের সঙ্গে প্রেসের যোগসাজশ দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে কিছু জঘন্য নবনির্মিত মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে, যার দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রভবনের আরও দু'-একজন অফিসার গুরুতরভাবে কর্দমাক্রান্ত হলেন। প্রেসের নিজস্ব মসী-আন্দোলন সৃষ্টিশীল পথ ধ'রে চলেছে। *আজকাল*-এর জনৈক রিপোর্টার একটি রীতিমতো রহস্য-উপন্যাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। খেয়াল করবার মতো জিনিস— নৈহাটির অধ্যাপককে রেয়াত দিয়ে কুৎসার পিচকারি এখন বিশেষভাবেই তাক করা আছে সহজ টার্গেট বিদেশীদের দিকে।

গণতান্ত্রিক বাক্‌স্বাধীনতার উপজাত এই সমগ্র পরিস্থিতিকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ট্রায়াল বাই প্রেস', প্রেসের কাঠগড়ায় বিচার। এই বিচার পরিচালিত হয় 'অপরাধী প্রমাণিত হবার আগে পর্যন্ত নির্দোষ' এই মান্য রীতির বিপরীত নীতি দ্বারা : 'নির্দোষ প্রমাণিত হবার আগে পর্যন্ত অপরাধী'। এটা স্পষ্ট যে এই উৎত্রাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে হেয় করা, আমাকে অনির্ভরযোগ্য স্কলার-রূপে প্রতিপন্ন করা, আমার লেখকনামকে কালিমালিপ্ত করা, এবং রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্র থেকে আমাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করা। আমি আশা করি আমার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা এটা ঘটতে দেবেন না, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। শেষ বিচারে সভ্য সমাজে আমরা পরস্পরের জামিন।

সমস্ত ঘটনার গতির মধ্যে সমাজের কাঠামো-নিহিত পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতাও চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। পিতৃতন্ত্রে পিতারা আর পিতৃস্থানীয় পতিরা মেয়েদের সুনামের রক্ষক। আমি জন্মসূত্রে সৌভাগ্যবতী, এলিট শ্রেণীর দুহিতা। আমার বাবা তাঁর কর্মজীবনে একজন ডাকসাইটে রাজপুরুষ ছিলেন। স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাঘা-বাঘা মন্ত্রীর জন্যে কাজ করেছেন,— বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীসমেত। কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, আজকে আমার বাবা কলকাতায় বেঁচে থাকলে কুশ্রী ঘটনাগুলি এত দূর এগোতে পারতো না। কিন্তু কোনো মেয়ের বাবাই চিরকাল বেঁচে থাকতে পারেন না।

অবশ্য ইতোমধ্যে— অনেক দিন আগেই— আমার অন্য রক্ষাকর্তা নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই লোকটি বিদেশী। তার প্রতি আমার দেশীয় সমাজের মনোভাব আবশ্যিকভাবেই দ্ব্যর্থক। সমগ্র ভারতবর্ষে কোথাও আমার শ্বশুরকুলের প্রতিনিধি নেই।

অথচ আমার নির্বাচিত লেখকজীবনের সূত্রে সেই ভূখণ্ডের সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। নির্বাচিত লেখকজীবনের পরিণাম হচ্ছে পাবলিকের দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ানো এবং তার ফলাফল ভোগ করা। জনশ্রুতি অনুযায়ী আমি স্পষ্টবাদিনী, বিতর্কযোগ্য বই লিখি, গতানুগতিক ছকের বাইরে নানা অভিমত প্রকাশ ক'রে থাকি। আমার আক্রমণকারীরা নিশ্চয় ভেবেছেন যে আমি বেশ 'সফ্‌ট্ টার্গেট'। স্বীকার করি, এই আক্রমণগুলির মাধ্যমে আমার এক ধরনের প্রতীকী 'ধারাবাহিক ধর্ষণ'-এর অভিজ্ঞতা হলো। তবু মনে হয় আমার সুবিধাবাদী আক্রমণকারীরা আমার স্বাধীন বর্শার শক্তি, বাড়ির লোকের নির্ভর এবং বন্ধুদের শুভেচ্ছা-সহযোগিতার পরিমাণ ঠিক বুঝতে পারেন নি।

বিশ্বভারতী যাতে একটা খোলা জায়গা হয়, সেভাবে থাকে, তার জন্যে প্রাজ্ঞ প্রবীণ উপাচার্যরা এর আগে ল'ড়ে গেছেন। নতুন উপাচার্য আমার প্রজন্মের; প্রেসিডেন্সিতে আমার মাত্র এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। নবীনতর তাঁর কাছে আমার সময়োচিত আরজি: প্রেসের সঙ্গে বিশ্বভারতীর কর্মীদের অশালীন যোগসাজশ বন্ধ করুন, প্রতিক্রিয়াশীল আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচান, যে-উদার আদর্শে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো তাকে পুনরুজ্জীবিত করুন। শান্তিনিকেতনের সবাইকেই এই উদ্যোগে অংশ নিতে অনুরোধ করছি।

§

হয়তো কেউ কেউ ভাবছেন, অক্সফোর্ডের একটি গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগ স্বীকার ক'রেও আমি কী ক'রে ফ্রী-লান্সার হই। এটা কোনো ব্যাপারই নয়। *আজকাল* আমার সম্বন্ধে যে-রহস্যকাহিনী লিখছে তার তুলনায় এই জিনিসটার ব্যাখ্যা দেওয়া অনেক বেশী সহজ। গৃহিণীর গৃহকর্ম থেকে *জিজ্ঞাসা*-র জন্য সম্পাদকীয় লেখা পর্যন্ত ইহলোকের নানা কাজেরই গুরুত্ব বা মর্যাদা আছে, নগদ টাকায় পারিশ্রমিক নেই। বিলেতের বিদ্যাজগতে বেশ বড়রকমের একটা 'ইনফর্ম্যাল সেক্টর' গ'ড়ে উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যার যোগ আছে, যেখানে লোকে কাজও ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু যেখানে অর্থাভাব স্থায়ী, এবং মাইনে ব'লে কোনো জিনিস নেই। যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়েরা এই দলের একটা বড় অংশ। আমাদের এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষেরও বেতন নেই।

....

§

এই সংখ্যায় অশোক রুদ্রর যে-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো' সেটি লেখার জন্য তিনি কিছু দিন যাবৎই তৈরি হচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন এটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পেরে সন্তোষ লাভ করেছি। তাঁকে প্রথমেই আশ্বস্ত করি, তিনি আমাকে তাঁর যে-যে লেখা

পড়তে দিয়েছেন সে-সমস্তই আমি পড়েছি। হয়তো প'ড়ে উঠতে একটু সময় লেগেছে, কিন্তু পড়েছি, এমন কি মার্জিনে দাগ দিয়েছি, মন্তব্য লিখেছি। বস্তুতঃ, নানা পয়েন্টে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করার অভিপ্রায় আমার ছিলো, কিন্তু তাঁকে এবারে এতই ব্যস্ত দেখেছি যে সেরকম কোনো আলোচনার অবকাশ হয় নি।[৯]

তাঁর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আমার দৃষ্টিকোণের প্রধান পার্থক্য এই যে তিনি বাস্তব জীবনে অলভ্য বিশুদ্ধ টাইপের যে-দীর্ঘ আলোচনা করেছেন[১০] তার প্রাসঙ্গিকতা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মডেল আর শুদ্ধ টাইপ বলতে তিনি একই বস্তুকে বোঝেন। আমি কিন্তু মডেল বলতে বুঝিয়েছিলাম এমন এক মূর্তি বা রূপকে, যাকে চোখের সামনে রাখা যায়, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়, যা অনুকরণযোগ্য, যেমন আর্টিস্টের মডেল।

সখ্য আর প্রণয় এই দুই নাম দিয়ে যে-দুটি পৃথক পরস্পরবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাদের মধ্যে বাস্তববিযুক্তি এতটাই প্রকট— তিনি ব'লেই দিয়েছেন যে বাস্তব জীবনে তাদের কখনো ওভাবে দেখতে পাওয়া যায় না[১১]— যে এই বিমূর্ত যুগলই যে আবার কিভাবে মূর্তকে, বাস্তবকে বোঝার কাজে আমাদের সাহায্য করবে তা আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। সাহায্য করতে পারে কেবল নঞর্থকভাবে। বলা যেতে পারে : বাস্তব জীবন ওরকম হয় না। 'অসুখী বন্ধুত্ব বলে কিছু হয় না'[১২]— এ কথা ব'লে কী লাভ, যখন আমরা প্রত্যেকেই জানি যে জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে অসুখী বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়। ভয়াবহ কুটিলতা ও দখলদার মনোবৃত্তির দ্বারা শাসিত ঐ 'বিশুদ্ধ' প্রণয়, যার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, সেই বিশ্রী জিনিসটা আবার কী ক'রে নান্দনিক নিকষে 'প্রেমবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপবর্গ'[১৩] হয় ?

বন্ধুত্ব একটা সমতার সম্পর্ক ব'লেই তো আমি তাকে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের আদর্শ করতে চেয়েছি। সেজন্যই তো বলেছি যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের আদর্শে নির্মাণ করা উচিত, সেই দিকে একটা ধাক্কা দেওয়া উচিত। আমার নিজের আলোচনা ছিলো কিছুটা বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিত থেকে জাত, বাকিটা আদর্শের অভিমুখে যাত্রা। তা ছাড়া তার মূল উৎস ছিলো মানবেন্দ্রনাথের সেই ছোট্ট বইটা— *ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ*। আমার ধারণাগুলির স্থিতিমাপ (প্যারামিটার) তো আমার আলোচনার মধ্যেই ধরিয়ে দেওয়া আছে : 'মানুষের যৌনতা যখন হবে সমকক্ষদের প্রেমের প্রকাশ, ক্ষমতার প্রসঙ্গ থেকে তাকে যখন ছাড়িয়ে আনা হবে, ...' ; 'স্ত্রীপুরুষের যে-যৌন সম্পর্ক প্রজননার্থে নয়, যা স্বত্বের সম্পর্ক নয়, যা কেবল সমকক্ষদের অনুরাগের প্রকাশ,— যা স্পষ্টতঃ মানবেন্দ্রনাথের আদর্শ,— তা বস্তুতঃ কী জাতের সম্পর্ক ?' এরই উত্তরে আমি বলেছিলাম, এই সম্পর্ক কি বর্গের বিচারে এক ধরনের বন্ধুত্ব নয় ? আমি নিজে তো এখনও পর্যন্ত এর মধ্যে যুক্তির শিথিলতা দেখতে পাচ্ছি না। এর যৌক্তিকতার ছক তো বাক্যগুলির মধ্যেই নিহিত।

অধিকাংশ মানুষের জীবনে সখ্যসম্পর্ক আর প্রণয়সম্পর্কের ওভারল্যাপ বা পরস্পরপ্রাবরণের যে বড় জায়গাটা থাকে আমি সেটাকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছি এবং চাইছি। আমার বিবেচনায় যে-কোনো স্থায়ী সম্পর্কে বন্ধুত্বটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান ; সফল দাম্পত্যেও সেটাই সব থেকে কাজের চাবিকাঠি। সেই জিনিসটার লালনই আমার কাছে আমাদের এই যুগসন্ধিক্ষণে জরুরী ব'লে মনে হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহ যৌন স্বত্বাধিকারের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইখানেই তো যত গণ্ডগোল। ব্যক্তির উপরে ব্যক্তির স্বত্বাধিকারের ধারণাটা অতীত মানবেতিহাসের উত্তরাধিকার। তা ক্রমশঃ অগ্রাহ্য, অচল হয়ে পড়ছে। ভাবী কাল তাকে মেনে নেবে ব'লে মনে হয় না। ব্যক্তির উপরে ব্যক্তির মালিকানা আমাদের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে, বৃদ্ধিকে বিঘ্নিত করে। র‍্যাডিকাল বিশ্লেষণে এই মালিকানার সপক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। লিঙ্গনির্বিশেষে ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার যত বাড়বে, যৌন-স্বত্ব-ভিত্তিক বিবাহকে মানুষ ততই প্রত্যাখ্যান করবে।

অথচ স্বীকার্য যে সন্তানপালনের জন্য কোনো এক প্রকারের পারিবারিক কাঠামোর প্রয়োজন আছে। দুই প্রকারের দাবিকে কিভাবে মেটানো যায় ? সামঞ্জস্যসাধনের কোনো একটা নতুন উপায় খুঁজতে হবে। সেটাই আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ।

আমি যে-লাইনে সমাধান দেখি তা এইরকম। ক) স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে যৌন স্বত্বের বদলে বন্ধুত্বের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়। খ) পারিবারিক কাঠামোকে আরও অনেক নরম আর নমনীয় ক'রে আনা যায়। গ) সেই পরিবর্তিত কাঠামোর ভিতর দিয়ে অন্যান্য সম্পর্কদের যাতায়াতের পথকে সুগম করা যায়।

এই কর্মসূচী কেবল এই শর্তেই সফল হতে পারে যে বন্ধুত্ব বলতে আমরা বোঝাচ্ছি একটা স্তরান্বিত সমৃদ্ধ বিনিময়প্রক্রিয়াকে। 'শুদ্ধ টাইপ'-এর বিবরণ দিয়ে সেখানে ঠিক কোন্ কাজটা এগোবে ? অশোক রুদ্র লিউইসের[১৪] চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু লিউইসের বন্ধুত্ব-চিন্তা আমাদের এই আলোচনার কন্‌টেক্সটে কতটা প্রাসঙ্গিক ? বস্তুতঃ, সখ্য, প্রণয়, বা যৌনতা— কোনোটারই যে দেশকালনিরপেক্ষ, কাল্‌চার-নিরপেক্ষ, শ্রেণীনিরপেক্ষ, লিঙ্গনিরপেক্ষ শুদ্ধ-টাইপ-বিবরণ দেওয়া যায় তা আমি বিশ্বাস করি না। লিউইসের বন্ধুত্ব-বর্ণনাকে তো পরিষ্কারভাবেই তাঁর সমকালীন অক্সফোর্ডের পুরুষ অধ্যাপকদের মার্কামারা ব'লে চিনতে পারা যায়। আমার তো ঐ বর্ণনাটাকেই 'exquisitely arbitrary and irresponsible' বলতে ইচ্ছে করে।[১৫] বেশ বুঝতে পারি, ফুরফুরে বাতাসের মতো ঐ দায়হীন বন্ধুত্বের মডেলটা কিভাবে নির্মিত হয়েছে— সেকালের অক্সফোর্ডের 'মেন্ ওন্‌লি' কলেজের সিগারেটধূমায়িত সিনিয়র কমনরুমে ব'সে শেরিতে মৃদুমন্দ চুমুক দিতে দিতে, 'হাই টেবিল'-এর নারীবর্জিত ঝামেলাবর্জিত টেনশনমুক্ত ডিনারের স্বস্তিকর প্রতীক্ষায়। সেখানে গৃহিণীর অভিযোগ-অনুযোগ নেই, বাচ্চাদের কান্নাকাটি নেই। বন্ধুত্বের এ-জাতীয় মডেল থেকে বন্ধুত্বভিত্তিক আধুনিক দাম্পত্যের জীবনচর্যায় কিভাবে পৌঁছনো যায় ?

মেয়েরা বন্ধুত্বের মধ্যে অনেক বেশী মালমশলা প্যাক্ করতে ভালোবাসে এবং চায়। এ নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের যথেষ্টই দ্বন্দ্ব বাধে। যার মধ্যে বন্ধন নেই, বিনিময়

নেই, যা অকেজো— তা কেমন বন্ধুত্ব? অন্তঃসারশূন্য ফাঁকিবাজির থেকে তা কোথায় ভিন্ন?

বন্ধুত্ব বলতে আমি বুঝি ভুষিসুদ্ধ লাল আটার রুটির মতো পুষ্টিকর সারবান্ একটা জিনিসকে। প্রতিতুলনায় 'শুদ্ধ টাইপ'-এর বন্ধুত্ব যেন ময়দা দিয়ে তৈরি শৌখিন ফুলকো লুচি— জলখাবার হিসাবে মাঝে-মধ্যে এক-আধটা খাওয়া যায়, কিন্তু তাকে রোজকার রাতের ডিনার করা যায় না; খুব একটা স্বাস্থ্যকর বা সারবান্ নয়, বেশীর ভাগটাই হাওয়ায় ভর্তি।

সেই ধরনের বন্ধুত্বই আমাদের কাজে লাগবে যা বেশ শক্তপোক্ত, মজবুত, কিছু ঘা সইতে পারে; যার মধ্যে আছে সহপথিকত্ব, সহ-অনুভূতি, রুচির কিছু সমধর্মিতা, নানা সাধারণ বিষয়ে আগ্রহ, পরস্পরকে সাহায্য করার ইচ্ছা, অঙ্গীকার এবং চেষ্টা। বন্ধুত্বের মধ্যে এই-সব গুণ থাকলে তবেই তাকে স্ত্রীপুরুষের নতুন ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিভূমি করা যায়।

বন্ধুত্বের মধ্যে নেই কোনো বন্ধন?[১৬] অথচ দুটো শব্দই বন্ধ্ ধাতু থেকে এসেছে। সংস্কৃত অভিধানে বন্ধু বা বান্ধব বলতে সর্বপ্রথমে বোঝায় আত্মীয়কে: অর্থটা 'আত্মীয়' থেকে প্রসারিত হয়ে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছে। বোঝা যায়, এককালে আত্মীয়রাই মানুষের যথার্থ বন্ধু ছিলো, আত্মীয়গোষ্ঠীর বহির্ভূত লোকেদের উপর নির্ভর করা যেতো না।

এই নির্ভরযোগ্যতা আজও মেয়েদের কাছে বন্ধুত্বের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। তার কমে আমাদের চলে না, এবং নির্ভরযোগ্যতার অভাবে সম্পর্কটাকে আমরা বন্ধুত্ব বলবো কিনা সন্দেহ। রুদ্র লিখেছেন, কেউ যদি বন্ধুকে সাহায্য না করে, তা হলে বন্ধুটি মনে দুঃখ পেতে পারে, কিন্তু সমাজে লোকটির কখনোই নিন্দা হয় না। বটে? অ্যাদ্দিনে বুঝলাম। সমাজে আপনার কোনো নিন্দে হবে না সেটা ঠিকঠাক জেনেই বুঝি আমাকে সাহায্য করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন, অশোকদা? একটু সাহায্য করুন না, *আজকাল*-এর রিপোর্টারদের একটু বুঝিয়ে বলুন না যে আমি পাচারকারিণী হতে পারি না। আমি যে ওদের নিয়ে ভ্যালা মুশকিলে পড়েছি। মানে, বলতে চাইছি, আপনার বিশুদ্ধ মডেলের হৃদয়হীন সমাজ আর ফাল্‌তু বন্ধুত্ব দিয়ে আমাদের আজকের কাজ কতটা এগোবে?

সদৃশ কারণে সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনায় বেশী দূর এগোনো যাবে না। সাহিত্যের চরিত্ররা লেখকদের কল্পনাজাত, সৃষ্ট। তারা সত্যিকারের মানুষ নয় যে আজকে তাদের না বুঝলেও কাল বা পরশু তাদের 'ইন্ ডেপ্‌থ্ ইন্টারভিউ' ক'রে আরেকটু বুঝে নেওয়া যাবে। শ্যামার প্রতি উত্তীয়র প্রেম ঠিক কেমন ছিলো তা জানবার কোনো উপায়ই নেই।[১৭] *সেকাল* ব'লে কোনো কাগজ নেই যার রিপোর্টার এসে আমাদের জানাতে পারে: 'বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জেনেছি যে ...।' রবীন্দ্রনাথ যেটুকু টেক্সট্ দিয়েছেন সেটুকুই আমাদের সম্বল। যদি সাবটেক্সটের কথা বলেন তো তা এককে পাঠকের ক্ষেত্রে একেকরকমের হবে। আমার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বলে যে কিশোরদের ঐরকমের প্রেমাহত অবস্থার মধ্যে কিছুটা কামনার উপাদান মেশানো থাকে। *জাস্‌মিন*-এ রুদ্র নিজে হয়তো

সচেতনভাবেই কামনাহীন প্রেমের ছবি আঁকতে চেয়েছেন, কিন্তু জিনিসটা সেভাবেই ফুটে উঠেছে কিনা তা আরেক প্রশ্ন।[১৮]

আমি বলেছিলাম, যে-সম্পর্ক বন্ধুত্বগোত্রীয়, আবশ্যিক একগামিতার আদর্শ সেখানে অবান্তর। আমি এখনও তাই মনে করি। রুদ্র বলছেন যে আমার এই বক্তব্যে যুক্তির কাঠামো খুব শিথিল। কেন, তা ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর নিজের চিন্তা-কাঠামোয় একাধিক প্রণয়সম্পর্কের ভিত্তিটা কী ?

'প্রেমের সঙ্গে মাছের তুলনা' কেন এত খারাপ হবে বুঝতে পারছি না। স্বর্গীয় ফুলের প্রসঙ্গ আমি নিজে কখনোই আনতাম না, কেননা প্রসঙ্গ ওখানে একটা বাস্তবভিত্তিক ইমেজই দাবি করে। স্বর্গে তো এখনও যাই নি, সেখানকার বাগানে কাঁটা এড়িয়ে ফুলও তুলি নি। তবে কাঁটা বেছে উপাদেয় মাছ খাবার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার তুলনাটা জীবনের থালা থেকেই তুলে নেওয়া : যে-কেউ পরখ করতে পারেন। আর আপনার তুলনাটা, অশোকদা, যাচাই করার কোনো উপায়ই নেই : স্বর্গে গিয়ে দেখে-শুনে ফিরে এসে যে ফের তর্ক করবো তার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না। এইখানেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক।[১৯] (যদিই বা ওখান থেকে ফিরে আসি, আপনি তো নির্ঘাত দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকবেন, আমাকে আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না; বলা যায় না— গোপনে *আজকাল*-এ টেলিফোন ক'রে খবরও দিতে পারেন। অতঃপর পূর্বপল্লী-প্রত্যাগত বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদনটি কল্পনা করতে পারি : 'অশোককুঞ্জে পাচারকারিণীর প্রত্যাবর্তন— প্রেতিনী-রূপে'। জীবিত বন্ধুকে সাহায্য না করাই যদি আপনার বন্ধুত্বের মডেলের অন্তর্গত হয়, তবে প্রেতিনীর ক্ষেত্রে আপনি যে সদয়তর হবেন এমন মনে করা যায় না।)

আপনি নিশ্চয়ই এই তর্কের মধ্যে অনেক ত্রুটি দেখতে পাচ্ছেন, অশোকদা। ব্যাপার হচ্ছে, জীবনে কোনো তর্কই যে 'বিশুদ্ধ টাইপ'-এর তর্ক হয়ে উঠতে চায় না। তার মধ্যে কত খাদ মেশানো থাকে, কত গোঁজামিল দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান ছাড়া অন্য কোথাও আপনি প্রেমের অনুষঙ্গে বন্ধুত্বের ভাষা খুঁজে পান নি, এটা কেমন তর্ক হলো ? বৈষ্ণব কবিতায়, পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকায় প্রেমিককে বন্ধু বলা হয় নি ? কালিদাস গৃহিণী আর সখীর সাযুজ্য কল্পনা করেন নি ? মহামতি শেক্সপীয়র তাঁর সনেটে লেখেন নি— 'To me, fair friend, you never can be old'? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পুরুষ, না নারী, সে-তর্কে কী এসে যায় : মহান্ সনেটগুচ্ছ যে প্রেমের কবিতা তা কি অস্বীকার করা যায় ? সাধারণ মুখের ভাষাতেও আমরা কি রোজই প্রণয়সম্পর্ক বোঝাতে 'বয়ফ্রেণ্ড', 'গার্লফ্রেণ্ড', 'বান্ধব', 'বান্ধবী' ব্যবহার করি না ? আমরা কি বলি না, সিমোন্ দ্য বোভোয়ার 'সার্ত্রের বান্ধবী' ছিলেন ? ছিলেনই তো, প্রেমিকাও ছিলেন। অর্থাৎ প্রণয়সম্পর্ককে যে বন্ধুত্বসম্পর্কের উপবর্গ হিসাবে দেখা যেতে পারে তার নজির তো আমাদের সাধারণ ভাষাব্যবহারের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে আছে।

....

এত সব তর্ক থেকে একটা জিনিস কি স্পষ্ট হচ্ছে না— যে এ বিষয়ে আমরা প্রত্যেকে একরকম ভাবি না, ভাবতে পারি না। প্রকৃতিভেদেও প্রতিন্যাসের ভেদ হতে বাধ্য, তা ছাড়া আছে আরও কত রকমের অবস্থার হেরফের। প্রত্যেককে ঠিক একই নিয়ম মেনে চলতে হবে কেন? আবারও সেই তাসের দেশ? যে যার মতো ক'রে বাঁচবার আরেকটু অধিকার আমরা পাই না কেন? পেলে কী লোকসানটা হয়? অবশ্য তর্ক যেভাবেই করুন, অশোক রুদ্র শেষ পর্যন্ত সে-অধিকার আমাদের দেন। সেখানে আমরা একমত।

প্রণয়বিষয়ক ভাবনাচিন্তা যে দেশকালনিরপেক্ষ নয়, হতে পারে না, তার আভাস দিতে একশো বছর আগেকার একটি বাংলা প্রবন্ধ[২০] দিয়ে এই সংখ্যা আরম্ভ করা হলো। এটির সন্ধান দেবার জন্য আমি ঋণী সুশোভন অধিকারীর কাছে ...। সেকালের প্রগতিশীল ভাবুক বলেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণনৈপুণ্যেরও একটা বড় কারণ তাঁর তুলনামূলক আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত। তা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থান আমাদের এখনকার অবস্থানের থেকে আবশ্যিকভাবেই ভিন্ন। তাঁর সময়কার হিন্দু সমাজে নারীর একগামিতা বাধ্যতামূলক অথচ পুরুষের বহুগামিতা অনুমোদিত। অতএব তিনি বলতে পারেন: 'স্বামী ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, সুতরাং অন্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত জানিলেও স্ত্রীর কিছু বলিবার অধিকার নাই। ... অভ্যাসবশতঃ পুরুষের অন্যানুরক্তি স্ত্রীর নিকট তেমন গুরুতর কিছুই নহে।' আজকে থেকে একশো বছর পরে প্রগতিশীল ভাবুকরা কী লিখবেন কে বলতে পারে? কেউ যে লিখবেন না, 'অভ্যাসবশতঃ স্ত্রীর অন্যানুরক্তিও আমাদের কালে পুরুষের কাছে কিছুই নহে', এমন তো বলা যায় না। দেখুন না কেন, এই সংখ্যার মারাঠী থেকে অনূদিত রচনাটিতে[২১] গিরিজা ব'লে একটি মেয়ে কেমন স্পষ্ট ক'রেই বলছে যে সে একাধিক সম্পর্কে, মাল্টিপ্‌ল্ রিলেশ্যনশিপ্‌সে বিশ্বাস করে।

অতএব আমাদের এই তর্কে শুধুমাত্র নিজেদের সংস্কারের পরিমাপ অনুযায়ী অন্যদের আচরণের সীমারেখা টেনে দিয়ে বেশী দূর এগোনো যাবে না। লাগবে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত, এবং পরিবর্তন-বিবর্তনের স্রোত কোন্ দিকে বইছে সে-সম্বন্ধে তথ্যসমর্থিত সম্যক্ ধারণা। কিছু কিছু মৌল পরিবর্তন ঘ'টে গেছে। পিতৃতান্ত্রিক প্রাধিকার ও শাসন দ্বারা ধ'রে রাখা কাঠামোগুলি যে চিরকাল চ্যালেঞ্জের বাইরে অবস্থান করবে না, চিরকাল জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের বুকের উপরে চেপে ব'সে থাকবে না, তার কিছু কিছু আভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার চাপে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিবর্তনের পর্যায়গত তারতম্যও লক্ষিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই মানুষ আজ নানা ব্যাপারেই সার্বিক ঢালাও নীতির পরিবর্তে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা এবং অধিক মাত্রায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দাবি করছে। জানতে চাইছে, গোষ্ঠীর ক্ষতি না ক'রে ব্যক্তির পূর্ণতর বিকাশের জন্য আরেকটু জায়গা যদি পাওয়া যায়, তবে তা নেওয়া যাবে না কেন? আলোচ্য প্রসঙ্গে গোষ্ঠী ও ব্যক্তি উভয়ের মঙ্গলের পরস্পরাভিমুখী অভিস্থিতি কিভাবে সম্ভব হতে পারে তার একটা আদরা দেবার চেষ্টা করেছি। অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, নারীনরসম্পর্কবিষয়ক এই

আলোচনায় যাঁরা ছাপা অক্ষরে অংশগ্রহণ করছেন না তাঁরাও কিন্তু চিন্তাভাবনা এবং মৌখিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। অতএব আলোচনা নিশ্চয়ই থেমে থাকবে না, চলবে।

মৌল পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের এই বাক্‌স্বাধীনতারই উল্লেখ করা যায়। এই যে এই পত্রিকায় আমরা দলধর্মবর্ণলিঙ্গনির্বিশেষে যে-যার অবস্থানমতো কথা বলার সুযোগ-স্বাধীনতা পাই, এ এক বহুমূল্য স্বাধীনতা, একপ্রকারের ঐশ্বর্য। পৃথিবীর অনেক সমাজই এখনও এই ঈর্ষণীয় সম্পদের দ্বারে পৌঁছতে পারে নি। এই স্বাধীনতার এক নিজস্ব ন্যায় আছে। তাকে ঠেকানো যায় না। তা ক্রমাগত নব নব স্বাধীনতার অভিমুখে আমাদের যাত্রাপথকে বাধামুক্ত করে। তাই অভাব-অনটন ও সহস্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েও হীনম্মন্যতায় না ভুগে এই রত্নোপম সমাদরযোগ্য বাক্‌স্বাধীনতার সংরক্ষণে ও দায়িত্বযুক্ত বিবর্ধনে আমাদের তৎপর থাকতে হবে। এইটি ব্যাহত হলে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সংগ্রামই করা যাবে না।

নিজের মতো ক'রে কিছু কথা বলার যে-সুযোগটুকু পেলাম তার জন্য এই পত্রিকার নিয়মিত সম্পাদক আমার বিশেষ ধন্যবাদভাজন হলেন। ...

২৫ জুলাই ১৯৯২

১ *Bilingual Women: Anthropological Approaches to Second-Language Use*, ed. by Pauline Burton, Ketaki Kushari Dyson, and Shirley Ardener, Berg Publishers, Oxford and Providence, 1994 (Cross-Cultural Perspectives on Women, Vol. 9)।

২ দ্রষ্টব্য এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'একটি কূটনৈতিক ব্যায়াম: বিষয়— ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো'।

৩ এই রচনার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৪ *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার তৎকালীন ব্যবস্থাপক।

৫ এই রচনাব শেষাংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬ আমার সম্পাদিত এই সংখ্যাটির জন্য অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বর্গোদ্যানের রাজনীতি' এই শিরোনামে ভিক্টর লালের ফিজি-বিষয়ক নাম-করা বইটির (*Fiji: Coups in Paradise: Race, Politics and Military Intervention*, Zed Books Ltd., London and New Jersey, 1990) সমালোচনা লিখেছিলেন।

৭ দ্রষ্টব্য এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছনোর অব্যবহিতপূর্বে রবীন্দ্রনাথ'।

৮ প্রবন্ধটির নাম 'সখ্য, প্রণয়, যৌনতা'।

৯ বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি যে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করার সুযোগ আমার আর এ জন্মে হয় নি। ১৯৯২ সালের এপ্রিলেই আমাদের শেষ দেখা। বর্তমান লেখাটি তিনি পড়েছিলেন,

কিন্তু তার অল্প পরেই তিনি মারা যান। *জিজ্ঞাসা*-র পরবর্তী সংখ্যাতেই তাঁর মৃত্যুর খবর বেরোয়।

১০ তিনি লিখেছিলেন : "আমি এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে প্রেম, প্রণয়, সখ্য ও শৃঙ্গার, এই চারটি শব্দ ব্যবহার করে চার রকমের মানবিক সম্পর্ক তথা অনুভূতির বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য বিচার করব। বলাই বাহুল্য, সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করে এই চারটি ধারণার যে শুদ্ধ বা আইডিয়াল টাইপ তার আলোচনা করব। বাস্তবজীবনে শুদ্ধ টাইপ কখনই পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা শুদ্ধ টাইপগুলির মিশ্রণ। কিন্তু শুদ্ধ টাইপ, যাকে বিজ্ঞানে অনেক সময় 'মডেল' বলা হয়ে থাকে, তার সাহায্য ব্যতিরেকে তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভবই না।"

১১ 'আবারও মনে করিয়ে দিই, আমরা প্রণয় ও বন্ধুত্বের শুদ্ধ টাইপের আলোচনা করছি। বাস্তবজীবনে অনেক ক্ষেত্রেই এই টাইপগুলির মধ্যে যে তারতম্য আমি প্রদর্শন করব তা স্পষ্ট আকার নেয় না।'

১২ 'বন্ধুত্বের সম্পর্কটা সুখদায়ী। অসুখী বন্ধুত্ব বলে কিছু হয় না। বন্ধুত্বের সম্পর্কে অ-সুখের কারণ ঘটলে সেই সম্পর্ক ধীরে ধীরে লোপ পায়।'

১৩ 'নান্দনিক কষ্টিতে প্রেমবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপবর্গের স্থান দিতে হয় প্রণয়কে।'

১৪ অশোক রুদ্র C. S. Lewis-এর *The Four Loves* (1960) বইটির কাছে ঋণস্বীকার করেছিলেন।

১৫ লিউইস বলেছিলেন যে বন্ধুত্বের অন্তর্গত প্রীতি 'exquisite arbitrariness and irresponsibility' দ্বারা চিহ্নিত।

১৬ 'বন্ধুত্বের মধ্যে নেই কোন বন্ধন, নেই কোন শৃঙ্খল।'

১৭ 'শ্যামার প্রেমের কথা আলোচনা করেছি। তার প্রেমে অবশ্যই ছিল দেহমন সবকিছু। কিন্তু শ্যামার প্রতি উত্তীয়র প্রেম ? জোর করেই কি ধরে নিতে হবে যে তারও ছিল শ্যামার প্রতি দৈহিক কামনা ?'

১৮ অশোক রুদ্র তাঁর আলোচনায় তাঁর নিজের ক্ষুদ্র উপন্যাস *জাস্মিন্*-এর উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর দাবি, তিনি ওখানে তীব্র অথচ দৈহিক কামনার ছায়াবর্জিত প্রেমের চিত্র এঁকেছেন। অনেক কাল আগে *জিজ্ঞাসা*-য় আমি এই উপন্যাসটির সমালোচনা লিখেছিলাম। সেই রচনাটি আমার *ভাবনার ভাস্কর্য* (দে'জ পাবলিশিং, ১৩৯৫) বইয়ে পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে আমার নিজের কী মনে হয়েছিলো তা সেখানে লিপিবদ্ধ আছে।

১৯ দ্রষ্টব্য এই বইয়ের অন্তর্গত 'নারীত্বের আদর্শের সূত্রে (দুই)'। সেখানে লিখেছিলাম, "প্রেমের কষ্টের মধ্যে যে-অংশটা স্বত্ববোধজাত, ঈর্ষাজাত, সেই অংশটাকে চেষ্টা করলে উৎখাত করা যায়, মাছের কাঁটার মতো বেছে ফেলে দেওয়া যায়। তা করতে পারলে প্রেমে 'আর্তি'র অংশ কমে, আনন্দের অংশ বাড়ে। প্রেম তখন নব ঐশ্বর্য লাভ করে। তার দেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায়, জীবন থেকে পাবার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। তার সৃষ্টিশীলতা শতধা প্রবাহিত হয়। তেমন প্রেম মানুষের জীবনে এক মহৎ আশীর্বাদ।" রুদ্র তাঁর প্রবন্ধে

লিখলেন যে তিনি আমার সঙ্গে 'সম্পূর্ণ একমত', কিন্তু মাছের কাঁটার উপমাটা তাঁর পছন্দ হয় নি— 'আমি হলে বলতাম, প্রণয়কে যদি স্বর্গীয় ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয় (হায় কেতকী হায়! প্রেমের সঙ্গে মাছের তুলনা!), তো সেই ফুলকে ঘিরে থাকে অনেক কাঁটা (না না, মাছের নয়, গাছের কাঁটা!)— যেমন ঈর্ষা, দখলদার মনোবৃত্তি, সন্দেহবাতিকতা ইত্যাদি। এই কাঁটাগুলিকে যদি বাদ দেওয়া যেত তো ফুল আরো বেশী উপভোগ্য হয়ে উঠত।'

২০ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রেম : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (দ্বিতীয় অংশ)।

২১ বিনয়া খরপেকড় (সংকলয়িত্রী), 'নারীমুক্তিবাদী মা : মতাভিমত'। এটির বাংলা অনুবাদ ক'রে দিয়েছিলেন অধ্যাপিকা বীণা আলাসে।

[টীকাগুলি সবই ২০০৪ সালে বর্তমান বইয়ের সংকলনকালে সংযোজিত হয়েছে।]

জিজ্ঞাসা ১৩ : ২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯ [১৯৯২]

সম্পাদিকার কলমে : উত্তরকথা

[এর আগে যে-লেখাটি সংকলিত হয়েছে তার একটি উত্তরকথা আছে। লেখাটি প'ড়ে যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে 'একজন সাধারণ পাঠকের' আত্মপরিচয়ে বর্ধমান থেকে নিয়মিত সম্পাদককে পত্র দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু। তাঁর চিঠি *জিজ্ঞাসা*-র ১৩ : ৩ সংখ্যার 'আলোচনা' বিভাগে ছাপা হয়। তাঁর উচ্চারিত বিবাদ ছিলো সম্পাদকীয়ের শেষাংশের সঙ্গে নয়, প্রথমাংশের সঙ্গে। তাঁর মনে হয়েছিলো যে লেখাটি *জিজ্ঞাসা*-র সম্পাদকীয় নয়, সামান্য কিছু অংশ বাদ দিলে সেটিকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' শিরোনামে বার করা যেতো। পত্রিকার ব্যবস্থাপককে তিনি ভেবে দেখতে বলেছিলেন "মাগ্‌গীগণ্ডার বাজারে এতখানি নিউজপ্রিন্টের অপচয় 'জিজ্ঞাসা'র মত একটি আর্থিকঅনটনক্লিষ্ট পত্রিকার পক্ষে শোভন ও সংগত হয়েছে কিনা"। তিনি আরও বলেছিলেন যে শিবনারায়ণ রায় "এই সম্পাদকীয়টি 'এডিট' করলে পারতেন"।

তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি *আজকাল* বা *গণশক্তি* পড়েন না— 'কারণ দুটোই পার্টির কাগজ— অসত্য, অর্ধসত্য ও নানা উদ্ভট সংবাদ পরিবেশন করাই ওদের মুখ্য কাজ ... এই প্রথম এরকম অসত্য সংবাদ ও আজগুবি সম্পাদকীয় ওসব কাগজে বেরোলো না।' প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর মতো একজন পাঠক কাহিনীটা *জিজ্ঞাসা*-র সম্পাদকীয় প'ড়ে জানবেন কেন। আমাকে আদালতের দরজা দেখিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে কাগজদুটোর বিরুদ্ধে কেস করা যেতো— 'প্রতিবাদের তো নানা পদ্ধতি খোলা আছে'। আমার লেখাটি থেকে ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন : "তাছাড়া 'আমার বাবা থাকলে দেখে নিতেন' জাতীয় কথাবার্তাও বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বেমানান।" এবং পরিশেষে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্ত্রীই রুটি-রোজগেরে— "কেতকী পাছে 'তুমিও পুরুষ' বলে আক্রমণ করে বসেন— সেই জন্য এই নিতান্ত ব্যক্তিগত তথ্য সরবরাহ করলাম।"

আমি তাঁর চিঠির জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। একজন লেখককে কিভাবে প্রকাশ্য মঞ্চে জবাব দেওয়ার জটাজালের মধ্যে জড়িয়ে প'ড়ে ক্লেশ স্বীকার ক'রে তর্কের খুঁটিনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে তর্কের সেই আসরটার চেহারা ঠিক কিরকম হতে পারে, তার সাক্ষ্য এখানে আছে।]

... শ্রীশ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডুর চিঠিটি সম্পর্কে আমার তরফ থেকে কিছু বলা উচিত মনে করি। তিনি লিখেছেন, আমার সম্পাদকীয়টি যে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নয় সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। এর দ্বারা তিনি ঠিক কী বোঝাতে চান তা জানি না। ঐ মুহূর্তে আমি নিমন্ত্রিত

সম্পাদক ; আমি যা লিখেছি তা কারও ভালো লাগুক কি না লাগুক, ঐ সংখ্যার ওটিই সম্পাদকীয়। তিনি লিখেছেন, তাঁর মতো পাঠকদের কথা ভেবে শিবনারায়ণ আমার সম্পাদকীয়টি 'এডিট' করলে পারতেন। তাঁর মতো বলতে কী বোঝায় তাও প্রথমে স্পষ্ট নয়, তবে চিঠির শেষে তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন 'একজন সাধারণ পাঠক' হিসেবে। এই প্রথম নয়, এর আগে অন্যান্য বিতর্কেও খেয়াল করেছি, কেউ যখন যুক্তিধর্মী তর্ক থেকে অব্যাহতি পেতে চান তখন খামোকা নিজেকে 'সাধারণ' পাঠক (অথবা পাঠিকা) হিসেবে চিহ্নিত ক'রে বসেন। কী মুশকিল, সাধারণ পাঠকদের অবসরবিনোদনের জন্য বাংলায় বেশ কিছু পত্রিকা তো আছে। যে-সমস্ত ইশ্যু বাংলাভাষী চিন্তাজীবীদের ভাবনার ন্যায্য বিষয়, তাদের নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা কি এই পত্রিকাতেও করা চলবে না? বলা বাহুল্য, শিবনারায়ণ আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন ব'লেই অতিথি-সম্পাদনার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছিলাম। যদি তিনি শর্ত আরোপ করতেন যে আমার সম্পাদকীয়র ওপরে তিনি ফের পুনঃসম্পাদনার কলম চালাবেন— যা বস্তুতঃ তাঁর কাছ থেকে কল্পনাই করা যায় না— তা হলে তাঁর নিমন্ত্রণ কখনোই গ্রহণ করতাম না। আমার সম্পাদকীয় তো আমি আমার নিজের মতো ক'রেই লিখবো, তাই না, শিবনারায়ণের অন্ধ অনুকরণ ক'রে নিশ্চয় নয়। আমি যতদূর বুঝেছি, এই পত্রিকার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিত্বের 'কাল্ট' সৃষ্টি করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। তবে আমি যে-সম্পাদকীয়টা লিখেছি সেটা এই পত্রিকার মূল মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় ব'লেই ধারণা আমার।

দুঃখের বিষয় এই, ওখানে আমি যা-যা বলতে চেয়েছিলাম তার পুরো ছবিটা তাঁর চোখের সামনে খোলা থাকলেও শ্যামাপ্রসাদ তা ধরতে পারেন নি, অথবা দেখেও দেখতে চাইছেন না। ওটা মোটেও 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' নয়, এমন কতগুলো ইশ্যু ওখানে স্পষ্ট ক'রে ধরিয়ে দিয়েছিলাম, যেগুলো এই পত্রিকার পাঠকদের অবশ্যই কনসার্ন করে, করা উচিত। যেটুকু ব্যক্তিগত সেটুকু কেবল সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্যে, প্রেক্ষাপটটা দৃষ্টিগোচর করার জন্যে। কেবলই দুটো কাগজের বিরুদ্ধে কিছু খুচরো প্রতিবাদ আমার লক্ষ্য ছিলো না মোটেই। আরও কতগুলো লক্ষ্যকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলাম। শ্যামাপ্রসাদ আমাকে আদালতের দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ব্যয়সাধ্য এবং দীর্ঘসূত্রী আইন-প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে প্রেস-প্রতিবেদনকে সাধারণভাবেই ন্যায্যতর ক'রে তোলা যায় কিনা, আমি তুলেছিলাম সেই প্রশ্নটা। তা ছাড়া প্রেসের সঙ্গে একটা বিদ্যাচর্চার ক্যাম্পাসের ওরকম যোগসাজশ থাকবে কেন, কাজের মালমশলা জোগাড় করতে গিয়ে গবেষকদের কুৎসা-অভিযানের সম্মুখীন হতে হবে কেন, এই প্রশ্নগুলোর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। বিশ্বের যেখানে একনীড় হবার কথা সেই বিশ্বভারতীর আঙিনায় বিদেশীবিদ্বেষের অসুন্দর আবির্ভাবের বিরুদ্ধে বেদনার্ত প্রতিবাদ আমার সম্পাদকীয়র অন্তর্গত ছিলো। সর্বোপরি, রবীন্দ্রভবন যাতে একটা বন্ধ দুর্গ বা স্তূপ না হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রচর্চার মুক্ত অঙ্গন হিসেবে যাতে টিঁকে থাকে, তার সম্পদে জিজ্ঞাসুদের ন্যায্য প্রবেশাধিকার যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়— এই সব দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম। আমি তো মনে

করি বিদ্যাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐ ধরনের মূলগত কথার পক্ষে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিশেষভাবেই উপযুক্ত স্তম্ভ। না, শ্যামাপ্রসাদবাবু, লড়াইটা কেবল দুটো কাগজের সঙ্গে নয়, যারা রবীন্দ্রভবনের উত্তরাধিকারকে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক'রে রেখে দিতে চান, রবীন্দ্রগবেষণার পথকে অকারণে বাধাসঙ্কুল ক'রে রাখেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও। এবং এখানে একটি ছোট ব্যাপারে ভ্রমসংশোধন ক'রে দিতে চাই। ভিডিওটেপ-দুটি আমরা ফী জমা দিয়ে রিসার্চের সহায়ক হিসেবে পেয়েছি, কিনি নি। লেনদেনটা ঠিক কেনাবেচার নয়। জ়েরক্স সংগ্রহ করার মতো।

আমি স্তম্ভিত শ্যামাপ্রসাদের এই 'সিনিকাল' তর্কে যে যেহেতু ও দুটো 'পার্টির কাগজ' তাই ন্যায্য প্রতিবেদনের দায়িত্ব থেকে তাদের রেয়াত দেওয়া চলে। ওরা পার্টির কাগজ, ওরকম গালগল্প পরিবেশন্ করবেই, ওরা পার্টির গুণ্ডা, মারদাঙ্গা করবেই— এরকম তর্ক মেনে নিলে গণতন্ত্র কি প্রহসনে পরিণত হয় না? একটা কাগজ যে-কোনো পার্টির সঙ্গে জড়িত হোক না কেন, বাক্‌স্বাধীনতার উল্টো পিঠ হিসেবে কিছু দায়িত্ব তাকে নিতে হবে বৈকি। এবং সেজন্য চাপসৃষ্টি করার দায়িত্ব তো আমাদেরই। শিক্ষিত, অবহিত, সোচ্চার জনমত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আবশ্যিক শর্ত। সেখানে ফাঁকি দিলেই গণতন্ত্র আমাদের নাগালের বাইরে চ'লে যায়। শ্যামাপ্রসাদবাবু নিজে কোন্ কাগজ পড়েন বা পড়েন না— সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, কোনো গণমাধ্যমে একাধিক লোক সম্পর্কে বাজে খবর বেরোবে কেন, কোন্ এক্তিয়ারে? তা ছাড়া কেবল নিজের সুনাম রক্ষার জন্যও আমি লড়ি নি; আমার ইংরেজ সহগবেষক, অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত রবীন্দ্রভবনের কিছু অফিসার— সকলের জন্যই লড়েছি। কাউকে অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হতে দেখলে আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি না। সেটা আমার স্বভাব। শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন, তিনিও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'তীব্র প্রতিবাদ' জানাচ্ছেন। কিন্তু এটা একটা কথার কথা, নেহাৎ বলতে হয় তাই বলছেন। তাঁর চিঠিতে বিশেষ কোনো সহানুভূতির কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে না। তিনি কি সে-সময়ে কোনো সক্রিয় প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন? কাগজে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, বা কোনো যুক্ত প্রতিবাদপত্রে সই দিয়েছিলেন? তাঁর তর্কের লাইন আমি অনুসরণ করতে পারছি না। তিনি এক দিকে বলছেন যে ওসব বাজে কাগজ তিনি পড়েন না। মেনে নিলাম। আবার অন্য দিকে তিনি বলছেন যে *জিজ্ঞাসা*-র পাঠক এসব কথা *জিজ্ঞাসা*-র সম্পাদকীয় প'ড়ে জানবেন কেন? কেন জানবেন না? জানলে ক্ষতিটা কোথায়? কলকাতায় এবং তার বাইরে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প'ড়ে ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়ে কেউ কেউ আমাকে সমর্থন জানিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বৈকি। খবরগুলো কোনো-না-কোনো উৎস থেকে জানতে তো হবে, নয়তো কোনো আলোচনা আরম্ভ করা যাবে কী ক'রে? আমি সে-মুহূর্তে *জিজ্ঞাসা*-র আমন্ত্রিত সম্পাদক তো বটেই, এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই আমি এর গ্রাহক, পাঠক, ও নিয়মিত লেখক। তা ছাড়া তিন দশক ধ'রে আমি দেশান্তরিত অবস্থায় নানা অসুবিধা ও আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাভাষার সেবা ক'রে যাচ্ছি। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে যাঁরা বাংলার মাধ্যমে বুদ্ধির চর্চা করেন এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের

একটা সংলাপ এবং সলিডারিটি সম্ভব হয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই এই পত্রিকার একটা কৃতিত্ব। আমার সংকটের সময়ে এই পত্রিকার পাঠকদের কাছ থেকে আমি কি কোনো সহমর্মী শ্রুতি দাবি করতে পারি না? নেহাৎ ব্যক্তিগত জীবনের সংকট তো ছিলো না সেটা; ছিলো আমার লেখকজীবনকে কেন্দ্র ক'রেই,— পাবলিকের দৃষ্টিপথে সংঘটিত অন্যায় আক্রমণ, এমন একটা ঘটনা যা অনেকগুলি মূলগত ইশ্যুকে স্পর্শ করে। সম্পাদকীয়টি যখন লিখতে বসেছি কুৎসা-অভিযানটি তখন তুঙ্গে। তাকে এড়িয়ে যাওয়াই তো আমার পক্ষে একরকমের অসাধুতা হতো। ওরকম ন্যাকামি আমার আসে না। আমি মনে করি যে-যে ইশ্যু আমার সম্পাদকীয়তে আমি কাভার করেছি তাদের প্রত্যেকটাই এই পত্রিকার সম্পাদকীয়র পক্ষে ন্যায্য আলোচ্য ইশ্যু। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয়ের 'টপিকাল' হওয়াই রীতি। সেদিক দিয়ে আমার সম্পাদকীয় ছিলো পুরোপুরি 'টপিকাল'— কালোপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক। কৌতুকবোধেরও অভাব ছিলো না।

তা ছাড়া সম্পাদকীয়তে ঐ সংকটের গুরুত্ব যতটা ফুটেছে প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো তার থেকেও গুরুতর। লেখাটি ডাকে দেবার পরে আরও কাটিং পাই। তা থেকে ছবিটা স্পষ্টতর হয়। রিপোর্টার পাঠিয়ে আজগুবি অর্ধসত্য 'স্টোরি' তৈরি করা হয়— অর্ধসত্য ব'লেই সেগুলো ছিলো আরও বিপজ্জনক। চিঠিপত্রের কলামে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। জনৈক অধ্যাপক স্বনামে নিজেকে সনাক্ত ক'রে আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক অসাধুতা এবং কুম্ভীলকবৃত্তির অভিযোগ পর্যন্ত আনেন। এক লাইন প্রকাশ করার আগেই কেউ কী ক'রে চোর সাব্যস্ত হয় জানা নেই আমার। আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়— আমাদের আসলে কোনো যোগ্যতাই নেই, আমরা নাকি 'রাতারাতি' গবেষক হবার চেষ্টা করছি। আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিবাদপত্র *আজকাল* ছাপে নি, আমার সমর্থনে কিছু চিঠিও চেপে দিয়েছে। *গণশক্তি* আমার চিঠি ছাপে নি, উল্টে আমাকে বলেছে 'কদর্য ভাষার কারবারী'। আর এদিকে শ্যামাপ্রসাদও বলছেন— আমার সম্পাদকীয়টা শিবনারায়ণ 'এডিট' করলে পারতেন। হায়, তসলিমা নাসরিন, আপনি কোথায়? পশ্চিমবঙ্গেও আপনাকে আমাদের দরকার। আগুন জ্বেলে বই পোড়ানো ছাড়াও মেয়েদের চেপে দেবার অন্য অনেক কসরত আছে।

একটা জিনিস আমাকে বেদনা দিয়েছে। আপনি সাধারণ পাঠক হোন বা অসাধারণ হোন, তর্ক ক'রে সম্পাদকের দপ্তরে চিঠি দেবার সময়ে ঠিক ক'রে উদ্ধৃতি দেওয়াটা কিন্তু জরুরী, তর্কে অংশগ্রহণ করবার ন্যূনতম শর্ত। 'আমার বাবা থাকলে দেখে নিতেন' কোথায় বলেছি আমি? ওরকম স্থূল বাক্য আমার কলম দিয়ে বেরোয় না। ওখানে যা আছে তা হচ্ছে: 'আজকে আমার বাবা কলকাতায় বেঁচে থাকলে কুশ্রী ঘটনাগুলি এত দূর এগোতে পারতো না'। আমার এই বক্তব্য একেবারে আলাদা। বিশেষ বেদনা অনুভব করেছি এইজন্যে যে আমার বাবা কাউকে 'দেখে নেবার' মতো মানসতার লোকই ছিলেন না।

আরও একটি জিনিস আমাকে বেদনা দিয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর নিজের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন, এই ভয়ে— পাছে আমি 'তুমিও পুরুষ' ব'লে তাঁকে আক্রমণ ক'রে বসি। ছি ছি। তাঁর এই আতঙ্কের প্রয়োজন ছিলো না। তাঁকে আমি মনে করিয়ে দিতে বাধ্য— আমি কাউকে আক্রমণ করি নি, এবং এখনও করছি না। আমি 'আক্রান্ত' হয়েছিলাম, এবং আত্মরক্ষা করেছি। কোনো ব্যক্তি পুরুষ— কেবল সেই কারণে তাঁকে আমি আক্রমণ করবো, এ কথা একেবারে অশ্রদ্ধেয়। খোঁজ নিয়ে দেখুন— আমার 'শত্রুরাও' এমন কথা বলেন না। ঐ সম্পাদকীয়তে ফেমিনিস্ট বিশ্লেষণ যেটুকু ছিলো সেটুকু সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। এটা একটা তথ্য যে গোটা কেচ্ছা-কাহিনীটাতে আমি ছিলাম একমাত্র মেয়ে, এবং যাঁরা আমার পেছনে লেগেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বেতনভোগী পুরুষ। এই তথ্যটা উপেক্ষা করা যায় না। এবং উচিতও নয়। সম্পূর্ণ সিচুয়েশনটার ওটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা বৈকি।

শ্যামাপ্রসাদ ঠিকই বলেছেন— প্রতিবাদের নানা পদ্ধতি আছে। এবং আমি অনেকগুলিই অবলম্বন করেছি। ঐ সম্পাদকীয় তাদের মধ্যে একটিমাত্র। লণ্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনকে বলেছি। বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'ভারতীয় বিদ্যার চর্চা' কেন হ্রাস পাচ্ছে তার তদন্তে হাই কমিশনের একটি নবারব্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি মিটিং ডাকা হয়। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে গেছি এবং সেখানে বলেছি— কেন হবে না, এই তো অবস্থা, বাইরে থেকে ভারতীয় ক্যাম্পাসে কাজ করতে এলে এরকম আক্রমণের শিকার হতে হয়, এবং তার প্রতিকার মেলে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী লণ্ডনে এলে তাঁর হাতে একটি নিবেদনপত্র তুলে দেওয়া হয়, তাঁর পরামর্শমতো কলকাতায় তার কপি পাঠানো হয়। যতদূর জানি, প্রশাসনের তরফে কিছু 'অ্যাক্‌শন' নেওয়াও হয়েছিলো। কিন্তু কোনো কাগজের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক প্রতিবাদ তো রবীন্দ্রভবনকে রবীন্দ্রচর্চার বাধামুক্ত প্রাঙ্গণ ক'রে তুলতে পারে না। তার জন্যে চাই সুধীজনের সুশিক্ষিত মদত। সেখানে *জিজ্ঞাসা*-র মতো মননশীল পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম ঢের বেশী প্রাসঙ্গিক। সে-সুযোগ সে-মুহূর্তে দৈবাৎ মিলেছে, এবং তা নিয়েছি। কেন নেবো না, নিশ্চয় নেবো। জ্ঞানচর্চার তরফে যে-লড়াই, তা নিশ্চয় এই প্ল্যাটফর্ম পেতে পারে, পাওয়ার যোগ্য। আমি যে লড়বার জন্য একটু জায়গা পেয়েছি— এতে শ্যামাপ্রসাদবাবু এতটা অসন্তুষ্ট কেন?

আমার সম্পাদকীয়র সমর্থনে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে লেখা দুটি চিঠি থেকে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রথমটি যাঁর লেখা তিনি একজন পুরুষ, আমার চাইতে বয়সে ছোট, কলকাতায় অধ্যাপনা করেন, এবং এই পত্রিকা নিয়মিত পড়েন। তিনি লিখেছেন:

> গত ক'মাস ধরে আপনার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। এর আঘাত শুধু আপনাকেই নয়, আমরা যারা আপনার গবেষণার সততায় বিশ্বাস রাখি তাদেরও ঘা দিয়েছে। ... আপনার সদ্য সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা'য় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত

হয়েছে তা পড়ে কোনরকম ধোঁয়াশা তো থাকার কথাই ওঠে না। ... আপনার শাণিত মুক্তবর্শা আপনি আরও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করবেন এই আশা রাখি।

চিঠি যাঁর লেখা তিনি মহিলা, বয়সে তথা অভিজ্ঞতায় প্রবীণা, শান্তিনিকেতনের একেবারে ভিতরের লোক, এবং এই পত্রিকার আজীবন সদস্যদের একজন। তিনি লিখেছেন :

"জিজ্ঞাসা"য় গতকাল তোমার জ্বালাময়ী [শব্দটি আণ্ডারলাইন করা] সম্পাদকীয় পড়লাম। দারুণভাবে তারিফ করছি তোমায়। অন্য কেউ হলে ... তোমার মতো এমন দীপ্ত ভাষায় এই ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতিবাদ করতে পারত না। ... "কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি, আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি।" (রবীন্দ্রনাথ) বাল্মীকিপ্রতিভায় ১ম দস্যুর উক্তি— দারুণ উক্তি। ... ব্যাপারটিতে ভাবীকালের গবেষকদের যে কত উপকার হল তা সবাই এখন অনুভব করছেন। ঝড়টা তোমার উপর দিয়েই পুরোটা বয়ে গেল; বুক পেতে তুমি তার সঙ্গে লড়েছ, জিতেছ। রবীন্দ্রভবনের উপকার হবে অনেক। তোমাকে নিয়ে আমাদের গর্ব [আণ্ডারলাইন করা] তাই।

অর্থাৎ আমার সম্পাদকীয় দ্বারা 'মাগ্‌গীগণ্ডার বাজারে' অর্থাভাবক্লিষ্ট পত্রিকার 'নিউজপ্রিন্টের অপচয়' ঘটেছে— শ্যামাপ্রসাদবাবুর এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কোণে অবস্থিত মতও বর্তমান। এখন কী করা। দেখুন, অর্থাভাবের মধ্যে আমরা অনেকেই কাজ করছি। নিউজ্‌প্রিন্টের শোচনীয়তর যে-সব অপচয় পশ্চিমবঙ্গে হামেশা হয়ে থাকে (আলোচ্য নিন্দা-অভিযান-সমেত) তাদের বিরুদ্ধেও শ্যামাপ্রসাদ কলম ধরেন তো? *জিজ্ঞাসা*-র নিউজ্‌প্রিন্টের আরও অপচয় ঘটানো থেকে এবং এই চিঠি পাঠানো বাবদ নিজের খরচ আরও বাড়ানো থেকে আপাততঃ নিবৃত্ত হচ্ছি।

৯ মে ১৯৯৩

জিজ্ঞাসা ১৪ : ১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০০ [১৯৯৩]

নারী ও হিন্দুধর্ম

> ধর্মের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ককে নিয়ে আজকাল যে-পর্যাপ্ত কৌতূহল প্রকাশ করা হয় তা জন্ম দিয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জকে: মেয়েদের কেবলই কোনো অত্যাচারী ইডিওলজির নিষ্ক্রিয় বলি হিসাবে দেখলে চলবে না, দেখতে হবে তাদের নিজস্ব সদর্থক নির্মাণসমূহের সক্রিয় কর্ত্রী-রূপেও ; হয়তো প্রধানতঃ এভাবেই তাদের দেখতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছ থেকে কাজ দাবি করে গবেষণার দুটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে: ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠানসংক্রান্ত শাস্ত্রের অর্থনির্ণয়ে, এবং মেয়েদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে।

এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলা করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিপ্রায় নিয়ে হাজির হয়েছে একটি সংকলনগ্রন্থ,* যেখানে আছে সম্পাদিকা-সমেত নানা দেশের মোট নয়জন গবেষক-গবেষিকার দশটি গবেষণা-প্রবন্ধ। সম্পাদিকার ভূমিকাটিকে ধরলে সমগ্র বইয়ে এগারোটি প্রবন্ধ আছে বলা চলে: তিনটি সম্পাদিকা জুলিয়া লেস্‌লির, অন্য আটটি অন্য আটজনের। বইটির মূল উৎস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন এলিজাবেথ হাউজের সঙ্গে সংযুক্ত 'সেন্টার ফর ক্রস্‌-কাল্‌চারাল রিসার্চ অন উইমেন'-এ জুন ১৯৮৭-তে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা, যার বিষয়বস্তু ছিলো 'মেয়েরা এবং ভারতীয় ধর্ম'। সেখানে অবশ্য ভারতের সব প্রধান ধর্মই জায়গা পায়; আলোচ্য বইয়ের জন্য নেওয়া হয়েছে কেবল হিন্দুধর্মসংক্রান্ত কয়েকটি পেপার। চলতি সময়ে আমি নিজে এই গবেষণাকেন্দ্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যদিও ১৯৮৭-র জুনে এঁদের সঙ্গে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, ফলে ঐ কর্মশালাতে আমি উপস্থিত ছিলাম না। জুলিয়া লেস্‌লির সঙ্গে ১৯৮৯ সালে ঐ কেন্দ্রের সূত্রেই পরিচয় হয়, যদিও বর্তমানে তিনি যুক্ত আছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ়'-এর সঙ্গে। এঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর তাঞ্জোরের রাজসভানিবাসী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ত্র্যম্বকযজ্বনের স্বল্পপরিচিত সংকলনগ্রন্থ *স্ত্রীধর্মপদ্ধতি*-র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।[১] এই কাজটিতে শ্রীমতী লেস্‌লির পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়েছিলাম; তাই তাঁর সম্পাদিত নতুন বইটি সম্পর্কে স্বভাবতঃই আগ্রহ বোধ করি। এখানে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ভারত সম্পর্কে কমবেশী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

* Julia Leslie, ed., *Roles and Rituals for Hindu Women*, Pinter Publishers, London, 1991, £35.00; ভারতে মতিলাল বারাণসীদাস কর্তৃক প্রকাশিতব্য।

সমস্ত বইটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শাস্ত্রীয় আচারে হিন্দু স্ত্রীর ভূমিকা ('দ্য রিচুয়াল ওয়াইফ্')। এই অংশে আছে দুটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে ফ্রেডরিক এম. স্মিথ (Frederick M. Smith) টেক্সট্-ভিত্তিক আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন বৈদিক শ্রৌত বিধিতে মেয়েদের মর্যাদাকে কিভাবে খাটো করা হয়েছে। তৈত্তিরীয়সংহিতা অনুযায়ী দেবরাজ ইন্দ্র যখন বিশ্বরূপকে খুন করেন তখন তাঁর ব্রাহ্মণহত্যার পাপের তিনভাগের একভাগ মেয়েদের ঘাড়ে চালান ক'রে দেওয়া হয়, যারই ফলে নাকি মেয়েদের মাসিক রক্তক্ষরণ, যে-অবস্থায় তারা অশুদ্ধ ও বিপজ্জনক। লেখকের মতে ভারতের মেয়েদের পক্ষে এটি ছিলো একটি অশুভ মুহূর্ত। পত্নীর উপস্থিতি ছাড়া যজমানের যজ্ঞ সফল হবে না ; এদিকে বেচারী পত্নী ইন্দ্রের পাপের সংক্রামে কলুষিত। যজ্ঞে পত্নীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে এবং তদ্দ্বারা বৈদিক আচারে নারীর ভূমিকাকে কিভাবে নানা বিধিব্যবস্থার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত, সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলা হয়— খুঁটিনাটিসহ তা-ই দেখিয়েছেন প্রবন্ধলেখক। এই নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারসংকোচন সূচিত হয় মুঞ্জাঘাসের মেখলা দ্বারা যজমানপত্নীর কটিদেশবন্ধনে। এই বাঁধনের দ্বারা নারীকে পুরুষদের এবং পুরুষদেবতাদের দৃঢ় শাসনের অধীনে আনা হয়। বলাই বাহুল্য, লেখক কেবল শাস্ত্রবাক্যের বিশ্লেষক নন, ভারতে দীর্ঘকাল ধ'রে প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধান করার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। আধুনিক ভারতে কয়েকটি যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সেখানে মেয়েদের ভূমিকাকে তিনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁর নেওয়া তিনটি আলোকচিত্রও প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে প্রাচীন ভারতের নারীদের ধর্মজীবনের প্রকৃত স্পন্দনকে এই সব পুরুষরচিত বিধির মধ্যে ছোঁয়ার উপায় নেই।

প্রথম অংশের দ্বিতীয় প্রবন্ধের রচয়িতা হের্নার এফ. মেন্স্কি (Werner F. Menski) হিন্দু বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিবর্তনকে পর্যালোচনার অধীন করেছেন। ঐ বিবর্তনের তিনটি বিশেষ ঐতিহাসিক ধাপকে অনুসরণ ক'রে তিনি তুলে ধরেছেন নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনশীল এক চলচ্চিত্রকে। তাঁর আলোচিত প্রথম টেক্সট্ ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। এই পর্যায়ে বিবাহনাটকের চরিত্রেরা হচ্ছে প্রধানতঃ বর ও বধূ, উভয়ের পরিবারভুক্ত মানুষেরা, এবং আবাহন-করা কয়েকজন দেবতা। বিবাহ এখানে মূলতঃ দেবতাদের অনুমোদন নিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে একটা কার্যনিষ্পাদন। ঝোঁক পড়ে বধূর জনয়িত্রী-ভূমিকার উপরে, যা বরের পরিবারের কাছে বিশেষভাবেই জরুরী, কিন্তু তাদের দুশ্চিন্তা থাকে বধূর কৌমার্যহরণজনিত রক্তপাত সম্পর্কে, যা অমঙ্গলসূচক। যে-বর এই অমঙ্গলের সংক্রামকে এড়াতে চাইবে সে প্রথম রজনীর রক্তচিহ্নিত বস্ত্রটি দিয়ে দেবে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে, যিনি ঐ অমঙ্গলকে দূর ক'রে দেবার গোপন উপায় জানেন। এইভাবেই অমঙ্গলনাশের খিড়কি-দুয়ার দিয়ে বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুরোহিতঠাকুরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হিন্দু বিবাহের মেন্স্কি-আলোচিত দ্বিতীয় পর্যায় অথর্ববেদের অংশবিশেষকে আশ্রয় ক'রে। এই পর্যায়ে বধূরক্তপাতের অশুভ সম্ভাবনা নিয়ে দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে, ফলে পুরোহিতমহাশয়ের ভূমিকাও বেড়েছে। বধূ এখন রীতিমতো

বিপজ্জনক এক ব্যক্তি; তার স্পর্শে বরের পরিবারের যে-অকল্যাণ ঘটতে পারে তার দূরীকরণকল্পে পুরোহিতের উদ্যম খুবই জোরালো। বর ও বধূকে পাশে সরিয়ে পুরোহিতই হয়ে ওঠেন বিবাহনাট্যের মুখ্য অভিনেতা। রক্তপাতজনিত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ শোধনের পর পুরোহিতের প্ররোচনায় প্রায় পুরো একটা বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হওয়াটা এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। এই ইতিহাসের তৃতীয় ধাপকে লেখক সংগ্রহ করেছেন গৃহ্যসূত্রাবলী থেকে। এই তৃতীয় পর্যায়ে পুরোহিতই সমস্ত অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু বধূরক্তপাতের বিপদকে দূর করার ভূমিকাটা তিনি পরিত্যাগ করেছেন— সেটা এখন বর্ষীয়সী আত্মীয়াদের দায়িত্ব। অনুমান করা যায় (এবং মেন্স্কিও অনুমান করেন) যে পুরুষরচিত টেক্সট্ থেকে প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েদের ভূমিকাটা ঠিক কেমন ছিলো তার পুরো চেহারাটা কখনোই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আধুনিক হিন্দুদের নানা বিবাহ-অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ ক'রে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শুভের বর্ধন এবং অশুভের নাশই এই অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য বটে, তবে কী সেই অশুভ যাকে নাশ করা দরকার সে-সম্পর্কে উচ্চারণ সুস্পষ্ট নয়। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে কতগুলো জিনিস চাপা প'ড়ে গেছে। তবে বর্ষীয়সী মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে বধূরক্তপাতের বিপদ সম্পর্কে তাঁরা অবহিত এবং অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে নানা স্ত্রী-আচারের মাধ্যমে তাঁদের উদ্বেগ এবং অকল্যাণ-দূরীকরণের চেষ্টা প্রকাশ পেয়ে থাকে। রক্তচিহ্নিত বস্ত্রটি আজকাল সাধারণতঃ কোনো দাই বা নাপিতানীকে দেওয়া হয়ে থাকে।

বইয়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনার বিষয় গৃহে নারীর ক্ষমতা ('পাওয়ার ইন দ্য হোম')। এই অংশে তিনটি প্রবন্ধ। মেরি ম্যাক্‌গীর (Mary McGee) আলোচনার বিষয় মেয়েদের জীবনে ব্রতপালনের ভূমিকা। পুরুষরচিত শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ব্রতপালন মেয়েদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে এবং সে-কাজ থেকে তাদের মোক্ষলাভ তথা ঐহিক লাভ সম্ভব। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কথা ব'লে লেখিকা জেনেছেন যে নিষ্ঠাবতী হিন্দু নারী ব্রতপালনকে ঠিক ইচ্ছানির্ভর কাজ নয়, অবশ্যকর্তব্য ব'লেই জানেন, এবং সে-কাজের উদ্দেশ্য তাঁর নিজস্ব কোনো লাভ ততটা নয় যতটা পারিবারিক কল্যাণসাধন তথা ঐ উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেকে বিশেষ অর্থে— দাম্পত্য অর্থে— 'সৌভাগ্যবতী' ক'রে তোলা। বিভিন্ন সামাজিক পটভূমিকা ও জাতের একশো-আটজন মেয়ের সঙ্গে কথা ব'লে তিনি তাঁর ফলাফল পরিবেশন করেছেন এভাবে :

ব্রতপালনে মেয়েদের উদ্দেশ্য	
দাম্পত্য সন্তুষ্টি ('সৌভাগ্য')	৯৪%
স্বামীর স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও সমৃদ্ধি	৭১%
সন্তানদের স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও সমৃদ্ধি	৬৫%
সন্তানকামনা	৪২%
নিজের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি	৪২%

ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়া	৩৭%
ধনলাভ	৩২%
মোক্ষলাভ	৩০%
ক্ষমতালাভ ('ঐশ্বর্য')	২১%

একই ব্রত একাধিক কারণে পালিত হতে পারে ব'লে একই প্রশ্নের জবাবে মেয়েরা একাধিক উদ্দেশ্য দেখিয়েছেন। ঘুরে-ফিরে পৌঁছতে হয় একটিই সিদ্ধান্তে: বস্তুতঃ বিবাহিতা হিন্দু নারীর পক্ষে বিবাহিত জীবনের 'সৌভাগ্য'কে বাদ দিয়ে 'মোক্ষ' ব'লে আলাদা কোনো লক্ষ্য নেই। 'সংসারের মধ্যেই' তার 'মোক্ষ'। 'স্ত্রীধর্মের' আচরণের মধ্যেই তার মুক্তি।

দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় প্রবন্ধে এলেন স্টর্ক (Hélène Stork) তামিলনাড়ুর একটি গ্রামে তাঁর সরজমিনে তদন্তের ভিত্তিতে শিশুপালনে জননী ও ধাত্রীর ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। জানা যাচ্ছে যে তাঁর অবেক্ষণগুলি দুটি ফিল্মে ধরা আছে। শিশুপালনের রীতিনীতির অনেকটাই জুড়ে আছে আধা-ঐন্দ্রজালিক আধা-ধর্মীয় বিশ্বাস, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাগ্বর্তী কালের মানস থেকে যা চ'লে আসছে। শিশুরা অসুখে ভুগতো, মরতো— এখনও ভোগে, মরে,— কেন তা বোঝা যেতো না। মায়েরা আর ধাত্রীরা মনে করতেন (এবং এখনও করেন) যে ঐসব অকল্যাণ ঘটছে কোনো কুদৃষ্টির প্রভাবে, কোনো অশুভ শক্তির প্ররোচনায়। অকল্যাণ-দূরীকরণ তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই উদ্যোগের মধ্যে অনেকটাই আমরা আজকাল কুসংস্কার বলতে যা বুঝি তা-ই। তবে সবটাই কুসংস্কার নয়। শিশুপালনের কোনো কোনো সাবেক প্রথার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখানো যেতে পারে। পরম্পরাসূত্রে পাওয়া কোনো কোনো প্রথা শিশুর শারীরিক বা মানসিক বৃদ্ধির সহায়ক। প্রবন্ধলেখিকা তাই বলেন যে কোনো প্রথা ঐতিহ্যাগত ব'লেই তাকে খারিজ ক'রে দেওয়াটা ঠিক নয়। ঐতিহ্যিক কোন্ কোন্ জ্ঞান ও নৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া জ্ঞান ও নৈপুণ্যকে মেলানো যায় সেটাই আমাদের দেখতে হবে।

দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় প্রবন্ধটি লিখেছেন সম্পাদিকা নিজে। সংস্কৃত টেক্সট্, পুঁথিচিত্র ও মন্দিরভাস্কর্যের সাক্ষ্যকে অবলম্বন ক'রে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন দুটি দেবীচরিত্রকে— শ্রী (লক্ষ্মী) ও জ্যেষ্ঠা (অলক্ষ্মী)। জ্যেষ্ঠা ব'লে হিন্দুদের যে কোনো দেবী আছেন (বা ছিলেন— অধুনা তাঁর পূজা নাকি অবহেলিতই বটে) এটা আমার জানা ছিলো না, যদিও অলক্ষ্মীর ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম ('হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা ...')। জ্যেষ্ঠা-নাম্নী এই দেবীর মধ্যে লেখিকা পেয়েছেন বহুগামী হিন্দু পুরুষের সংসারে জ্যেষ্ঠা পত্নীর চেহারাকে। এই মানবী-তথা-দেবীর বয়স হয়েছে। সে মোটাসোটা হয়ে গেছে; তার রূপের জলুস আর নেই। কিন্তু সে ক্ষমতার অধিকারিণী, সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। তাকে চটানো বিপজ্জনক; তাকে মেনে চলা দরকার।

বইয়ের তৃতীয় অংশটি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এখানে ফোকস্ পড়েছে নৃত্যের উপরে ('দ্য রিচুয়াল অফ ডান্স')। প্রশ্ন করা যেতে পারে: নাচের সঙ্গে মেয়েদের ধর্মজীবনের আবার সম্পর্ক কী? পাশ্চাত্য নর্তকীরা যখন ব্যালে নাচেন, তখন কি খৃষ্টধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোনো বিশেষ সম্পর্ক ফুটে ওঠে? তা হয়তো ফুটে ওঠে না, কিন্তু ভারতবর্ষ যে নটীর পূজার দেশ। প্রথম প্রবন্ধটিতে সাস্কিয়া সি. কের্সেনবোম (Saskia C. Kersenboom) তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তিরুত্তণির মন্দিরনর্তকীদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বিবরণ পেশ করেছেন। দেবদাসীদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আধুনিক ভারতীয়দের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। হল্যাণ্ডের মেয়ে শ্রীমতী কের্সেনবোম তিরুত্তণির শ্রীসুব্রহ্মণ্যস্বামী মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবদাসী-পরিবারের শ্রীমতী পি. রঙ্গনায়কীর কাছে নাচ শিখেছেন। শ্রীমতী রঙ্গনায়কী এই বিদেশিনীকে তাঁদের দেবদাসী-পরম্পরার উত্তরাধিকারিণী-রূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত দিয়েছেন। সেই স্বীকৃতির কারণে এই প্রবন্ধের সাক্ষ্য বিশেষভাবেই তাৎপর্যমণ্ডিত। দেবদাসী-ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্বল্প পরিসরের মধ্যে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য যাঁরা পেতে চান তাঁরা এই প্রবন্ধটিতে তা পেয়ে যাবেন। হিন্দু নারীত্বের মাঙ্গলিক মর্যাদার সোপানশ্রেণীতে দেবদাসীদের স্থানটি বিশিষ্ট। সধবা সন্তানবতী নারী যে 'সুমঙ্গলী' সে-কথা আমাদের সকলেরই জানা। বেচারী বিধবা মেয়েটি যে নিতান্তই অমাঙ্গলিক এবং শুভানুষ্ঠানে বর্জনীয় তা কে না জানে। কিন্তু আমাদের অনেকেরই হয়তো খেয়াল নেই যে দেবদাসী হচ্ছে 'নিত্যসুমঙ্গলী'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত: একটা নিরিখে তার মূল্য সুমঙ্গলীরও উর্ধ্বে।

কের্সেনবোমের প্রবন্ধটির যোগ্য পরিপূরক অ্যান-মারি গ্যাস্টনের (Anne-Marie Gaston) লেখা পরবর্তী প্রবন্ধটি, যেখানে আলোচিত হয়েছে আধুনিক ভারতে ভরতনাট্যম্-চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ক্যানাডার মেয়ে অ্যান-মারিকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ইনি ভরতনাট্যমে তথা ভারতীয় নৃত্যের আরও অন্যান্য শৈলীতে ভারতের নানা জায়গায় সরজমিনে দীক্ষা নিয়েছেন, ভারতে অনেক বছর কাটিয়েছেন। ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক চিন্তা দুইই আছে। পুরাণে এবং মূর্তিকলায় নটরাজ শিবের রূপ নিয়ে তাঁর একটি গবেষণা-গ্রন্থ[১] বর্তমান। 'অঞ্জলি' নটী-নামে তিনি নেচে থাকেন, এবং তাঁর নাচও আমি অক্সফোর্ডে একটি অনুষ্ঠানে দেখেছি।

দেবদাসী-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নৃত্য-ঘরানার যে-অংশটিকে বলা চলে অপেক্ষাকৃত লৌকিক, রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য পরিশীলিত, সেই অংশটিকে আশ্রয় ক'রে বর্তমান শতাব্দীতে নৃত্যকলার যে-নবজাগরণ ঘটে তাকেই আমরা আজকাল ভরতনাট্যম্ শৈলী ব'লে জানি। ইতোমধ্যে ১৯৪৭ সালে দেবদাসীদের মন্দিরে নাচা আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। নৃত্য-রেনেসাঁসের প্রথম পর্যায়ের শিল্পীরা সাধারণভাবে তাঁদের আর্টকে মন্দিরের সংস্রব থেকে ছাড়িয়ে এনে মঞ্চোপযোগী শিল্পকলারূপে পরিবেশন করতে আগ্রহী ছিলেন। 'সাধারণভাবে' বলা হলো এজন্যে যে সকলেই এই চিন্তার শরিক ছিলেন না। এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই একটা দোলাচলবৃত্তি দেখা যায়। অধিকাংশ শিল্পী

তাঁদের নৃত্যকলার একটা লৌকিক রূপকে গ'ড়ে তুলতে চাইলেও— এঁদের মধ্যে আছেন স্বনামধন্যা বালসরস্বতী, 'বালা' ডাকনামেই যিনি সমধিক পরিচিতা,— রুক্মিণী দেবীর মতো একজন প্রভাবশালিনী নর্তকী কিন্তু প্রথম থেকেই এই নাচের ধর্মীয় অনুষঙ্গকে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই এই ক্ষেত্রে দু'-রকমের ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছে। যাকে আমরা ভাবি আবহমান কালের ঐতিহ্য তার ইতিহাস যে কখনও কখনও কতটাই সংক্ষিপ্ত হতে পারে তার খবর রাখেন সেই-সব নৃতাত্ত্বিক গবেষকরা, যাঁরা লোকাচার নিয়ে সরজমিনে তদন্ত চালিয়ে থাকেন। শ্রীমতী গ্যাস্টন ভরতনাট্যমের দ্ব্যর্থক 'ট্র্যাডিশন' নিয়ে যে-অনুসন্ধান করেছেন তা কালোপযোগী। নাচের সময়ে মঞ্চে দেবমূর্তি (সাধারণতঃ নটরাজের মূর্তি) রাখা এবং সেই মূর্তিকে যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে তবেই নাচ আরম্ভ করা— এটা কি ঠিক, না বেঠিক, ভরতনাট্যম্-ঐতিহ্যের অন্তর্গত না বহির্ভূত ? এর কোনো সহজ জবাব নেই। একেকজন একেকরকমের কথা বলেন। বালা মঞ্চে নটরাজের মূর্তি রাখতেন না। তাঁর এক সহকর্মিণীর জবানিতে: 'উনি ও ধরনের জিনিসে বিশ্বাস করতেন না, ঐ মন্দিরকে মঞ্চে টেনে আনায়। উনি এর বিরোধী ছিলেন।' বালা বলতেন যে মন্দিরের পরিপ্রেক্ষিতটা মনের মধ্যে রেখে কিন্তু মঞ্চে উহ্য রেখেই কাজ করা উচিত। এদিকে রুক্মিণী দেবী বলেছেন: 'লোকে মঞ্চে নটরাজ রাখে তার কারণ আমিই ওটা আরম্ভ করি। আমি যা করি অন্যেরা তার নকল করে। নৃত্য তো একরকমের পূজা। তা হলে নটরাজ থাকবে না কেন ? আমি ভক্তিমতী ও ধার্মিক। আমার কাছে ঐ মূর্তি কেবল একটা অলংকরণ নয়।' জনৈক আধুনিক দক্ষিণভারতীয় সমালোচকের মতে: 'বালার মতো পুরানো দিনের নাচিয়েরা কখনো নটরাজ রাখতেন না বা পূজা দিয়ে আরম্ভ করতেন না। এখন ওটা দর্শকদের আকর্ষণ করবার জন্য একটা স্টান্ট। ওরা যখন রঙিন আলোর মালায় সজ্জিত নটরাজকে দ্যাখে, তখন ওদের মধ্যে একটা ভক্তিভাবের উদয় হয়। কিন্তু একজন প্রকৃত আর্টিস্ট একটা ভক্তিরসের ব্যাপার দিয়ে তাঁর নাচ আরম্ভ করেন না। বালা ছিলেন প্রকৃত অর্থে আর্টিস্ট।' এখানে শ্রীমতী গ্যাস্টন তাঁর প্রতিবেদনে আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চারের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বোতামের উপর আঙুল রেখেছেন। এই কাল্‌চারের চেহারা কেমন হবে, তার মধ্যে ধর্মীয় আর সেক্যুলার উপাদানের মিশ্রণ কী অনুপাতে হবে ও কেমন রূপ নেবে: এগুলি অবশ্যই বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আধুনিক পশ্চিমবঙ্গে কোনো কবিদের মজলিসে পূজা দিয়ে কবিতাপাঠ আরম্ভ হচ্ছে বা পূজা দিয়ে কোনো চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হচ্ছে— এটা কি আমরা ভাবতে পারি ? হয়তো কেউ কেউ পারেন ; আমি তো পারি না। কিন্তু জানা যাচ্ছে যে ভারতে তথা বিদেশপ্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা নটরাজের পূজা দিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ করাকে মোটেও বে-স্টাইল মনে করেন না। এমন কি এমিগ্রে সমাজের কতগুলি পরিচিত প্রবণতার গতিপথ মেনে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ভরতনাট্যমের ধর্মীয়করণের দিকে একটা সুস্পষ্ট ঝোঁকই দেখা যায়, জানান শ্রীমতী গ্যাস্টন।

শ্রীমতী গ্যাস্টনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে আধুনিক ভারতের সংস্কৃতিজগতের কয়েকটি কৌতূহল-উদ্রেককারী অন্তর্বিরোধ। প্রেক্ষাপটটি সরল নয়। মেয়েদের ভরতনাট্যম্ শেখার ব্যাপারটা আজকের ভারতবর্ষের নাগরিক বিত্তবান শ্রেণীগুলির মধ্যে যে-গুরুত্ব অর্জন করেছে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য মেয়েদের ব্যালে শেখার গুরুত্বের কোনো তুলনা হয় না। একজন পাশ্চাত্য মেয়ের ব্যালে শেখা তার শিল্পী-জীবনের অঙ্গ; কিন্তু একজন ভারতীয় মেয়ের ভরতনাট্যম্ শেখা তার চাইতে বেশী: সে-শিক্ষার একটা সামাজিক, এমন কি জাতীয়তাবাদী মাত্রা আছে। আজকের ভারতে ভরতনাট্যম্ ভারতীয় ঐতিহ্যিক কাল্চারের একটি ব্যঞ্জনাময় প্রতীক, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় আত্মপরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। শ্রীমতী গ্যাস্টন বলেন: 'একমাত্র মাদ্রাজেই প্রতিবছর শত-শত নৃত্যানুষ্ঠান হয়। "ভালো পরিবার"-গুলি থেকে (বিশেষতঃ উচ্চবর্ণ বা ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে) বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক মেয়ে নাচ শিখতে আসে। দিল্লী-বোম্বাই-বাঙ্গালোর এবং অন্যান্য শহরেও যথেষ্ট উদ্যম বর্তমান। এ অবস্থা তো বরাবর ছিলো না।'

নাচ শেখবার এবং মঞ্চে নাচবার প্রবল তাগিদে অনুশীলনসংক্রান্ত পরম্পরাগত কোনো কোনো নিষেধকে পাশে সরিয়ে রাখতেও আজকের দিনে অনেকের দ্বিধা নেই। এককালে ঋতুমতী অবস্থায় নাচের ক্লাসে আসা বা মঞ্চে নাচা কঠোরভাবেই নিষিদ্ধ ছিলো। দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যপন্থী চিন্তায় ঋতুমতী নারীর অশুদ্ধি তর্কাতীত।[৩] একজন নর্তকী ঐ অবস্থায় নাচবে বা নাচ শিখবে, এটা আগেকার দিনে কখনোই বরদাস্ত করা হতো না। কিন্তু গত বিশ বছরে দৃষ্টিভঙ্গি এতটা পাল্টেছে যে এই টাবু অনেকাংশেই শিথিল হয়ে এসেছে, জানান শ্রীমতী গ্যাস্টন। আবার তারই বিপরীতমুখী প্রবণতায় মঞ্চে ধর্মভাব দেখানোর রেওয়াজ আগেকার চাইতে অনেক বেশী বেড়েছে। লেখিকার সিদ্ধান্তটি প্রণিধানযোগ্য, তাই একটু বড় ক'রেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি— তর্জমায়।

> দেখা যাচ্ছে যে নাচিয়েদের মধ্যে একদিকে যেমন ব্যক্তিগতভাবে আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধ মানা কমছে (যেমন ঋতুসংক্রান্ত নিষেধের ক্ষেত্রে), অন্যদিকে তেমন দর্শকদের সামনে ধর্মভাবের আড়ম্বরপ্রদর্শন বাড়ছে। এই আপাতদৃষ্টিতে অন্তর্বিরোধী বিবর্তনের কার্যকারণ বোঝা যায় যখন আমরা মনে রাখি যে আজকাল যে-সব তরুণী নাচছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পাশ্চাত্য ছাঁদের শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁদের নর্তকী-জীবনের গণ্ডির বাইরে তাঁদের গোষ্ঠীর ঐতিহ্যপন্থী জীবনধারা থেকে অনেক দূরেই স'রে গেছেন তাঁরা। তাই ভরতনাট্যমের শিল্পী হিসাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার পথে তাঁরা অনুভব করেন তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করার তাগিদ। এটা করা যায় কতগুলি প্রকাশ্য অভিব্যক্তির মাধ্যমে, যেমন মঞ্চে পূজার ক্রিয়া দ্বারা এবং দৃশ্য দেবমূর্তির উপস্থিতির সাহায্যে। নটরাজের মূর্তির সঙ্গে দেবদাসী ঐরকম কোনো সম্পর্ক মেনে চলতেন না। কিন্তু আজকাল ভরতনাট্যমে এ ব্যাপারটা এতটাই মেনে

নেওয়া হয় যে অনেক নাচিয়েদের মনে এমন ধারণা জন্মেছে যে নটরাজমূর্তির উপস্থিতিটা বুঝি দেবদাসীদের উত্তরাধিকার থেকেই এসেছে। তাই, যখন ঐ ধরনের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরকে 'ঐতিহ্যাগত' ব'লে উল্লেখ করা হয়, তখন আমরা যেন ঐ বর্ণনাকে তার আপাতপ্রতীয়মান মূল্যে না নিই। বরং ঐ বিশেষণের ব্যাখ্যা করা উচিত এভাবে: 'একটা পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যিক মূল্যগ্রামের সোচ্চার সমর্থক'। সন্দেহ নেই, ভারতীয় সমাজে ভরতনাট্যম্ আজকে যে-সব ভূমিকা পালন ক'রে থাকে সেগুলির মধ্যে এটা হচ্ছে অন্যতম প্রধান ভূমিকা।

দেখা যাচ্ছে যে ছবি-ভাস্কর্য-সংগীত-সমেত যাবতীয় শিল্পকলার মধ্যে নৃত্যই বাইরের প্রভাব অথবা নতুন উদ্ভাবনের দ্বারা সব থেকে কম প্রভাবিত হয়েছে। সেই কারণে নৃত্যের ক্ষেত্রে হাল আমলের এই অভিব্যক্তিগুলি আমাদের একটা চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি দেয় সেই-সব দোটানা আর অন্তর্বিরোধগুলিকে বুঝতে, যেগুলি তৈরি হয়ে উঠছে পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে বিংশ শতাব্দীর অভিঘাতের ফলে। ভরতনাট্যম্‌কে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ক'রে ফের গ'ড়ে নেওয়ার এই যে-ব্যাপারটা, এটাকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, এবং এই প্রক্রিয়া মেয়েদের সম্মুখস্থ পরম্পরাগত ভূমিকার মডেলগুলিকে দৃঢ়তর ক'রে তোলার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা পালন করবে কিনা— এ-সব প্রশ্নের জবাব কেবল সময়ই দেবে।

একজন বিদেশাগত অবেক্ষক হিসাবে শ্রীমতী গ্যাস্টন যে-সব প্রশ্নকে সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণধাররা কি সেগুলিকে ওভাবে ছেড়ে দিতে পারবেন? ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ ভরতনাট্যমের চেহারাকে ধর্মানুষ্ঠানের আদলে গ'ড়ে নেওয়া হবে কিনা, মন্দিরের সঙ্গে এই নৃত্যশৈলীর যোগসূত্রকে দৃঢ়তর ক'রে তোলা উচিত কিনা, এই নৃত্যের অনুশীলন আধুনিক তরুণীদের সামনে ঐতিহ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি আদর্শ নারীত্বের মডেলকেও নর্তিত করছে কিনা, করলে ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কিনা, এই আর্ট-ফর্মটি যাতে বিবর্তনের সেক্যুলার পথেই এগিয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী কিনা— এই-সব সমস্যা নিয়ে শিল্পী-সমালোচক-দর্শক তথা আর্টের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের সবাইকেই ভাবতে হবে মনে হয়। এই পত্রিকার পাতায় নারীত্বের আদর্শ ও আচরণ সম্পর্কে এবং ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে ধর্মীয়তা আর সেক্যুলারিজ়মের দোটানা নিয়ে যে-সমস্ত আলোচনা হয়েছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অবান্তর নয়। এজন্যেই আমার এই বক্তব্যের অব্যবহিত প্রেক্ষাপট একটি বইয়ের আলোচনা হলেও বিষয়টাকে এতটা জায়গা দিলাম।

বইটির চতুর্থ ও সর্বশেষ অংশের বিষয় মেয়েদের মুক্তিসাধনা ('দ্য পার্স্যুট অফ স্যাল্‌ভেশন')। এই অংশে আছে তিনটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে সতীদাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সম্পাদিকা স্বয়ং। তিনি প্রশ্ন করেছেন: যে-সব মেয়েরা সতী হয় তারা কি সর্বাংশেই 'ভিক্টিম', বলিস্বরূপ, না কি কোনো অর্থে 'ভিক্টর', অর্থাৎ বিজয়িনীও বটে? বুঝতে চেয়েছেন অত্যাচারী ইডিওলজির দাপটের সঙ্গে তারা কিভাবে মোকাবিলা করে, কিভাবে উৎপীড়নের গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে খুঁজে বের করে এমন একটা রাস্তা, যে-পথ দিয়ে চললে তারা খানিকটা সম্মান আর শক্তির অধিকারিণী হতে পারে। সতী মেয়েকে বলি হিসাবে দ্যাখে এমন দুটি দৃষ্টিভঙ্গি তিনি উপস্থিত করেছেন। দুটিই বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গি, একটি অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি মার্কিন জাহাজের কাপ্তানের, অন্যটি একজন আধুনিক মার্কিন ফেমিনিস্ট মহিলার। এর উল্টো দিকে তিনি তুলে ধরেছেন দুটি দেশী দৃষ্টিভঙ্গিকে, প্রথমতঃ রূপ কানওয়ারের উদ্দেশে নিবেদিত বিপুল শ্রদ্ধাগুলিকে, দ্বিতীয়তঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাগুল্লিখিত টেক্সট্ *স্ত্রীধর্মপদ্ধতি*-কে। আঠারো শতকের পণ্ডিতমহাশয়ের তর্কগুলি, বলা বাহুল্য, নিয়মনির্মাতা পুংজাতীয় এলিট্ গোষ্ঠীরই তর্ক: তাদের সাহায্যে সেকালের মহিলারা নিজেরা ঠিক কী ভাবতেন তা বোঝা যাবে না— কেবল এইটুকু বাদে, প্রতিপক্ষ একটা না থাকলে তর্কের অবতারণাই বা কেন? আর রূপ কানওয়ারের আত্মবিলোপকে নিয়ে রাজপুত সমাজের একাংশে যেমন আত্মপ্রসাদ সুস্পষ্ট, তেমনি ঐ ঘটনার বিরুদ্ধে আধুনিক মেয়েদের প্রতিবাদও বাস্তবতারই একটা দিক। মূল্যায়নে কোন্‌টাকে কতটা গুরুত্ব দিতে হবে, সে-বিষয়ে সূক্ষ্ম তর্কের মধ্যে যান নি শ্রীমতী লেস্‌লি। তাঁর বক্তব্য: রূপ কানওয়ারের আচরণ ত্র্যম্বকযজ্বনের পরামর্শের সঙ্গেই খাপ খায়। ভারতের আধুনিক, নির্মীয়মাণ মিথগুলির প্রতিমারচয়িতারা রূপ কানওয়ার আর তার স্বামীর সুপার-ইম্পোজ়-করা ফোটোগ্রাফের সাহায্যে মেয়েটিকে পরিণত করেছে পূজার্হা দেবীতে। রাজপুত কাল্‌চারের মধ্যে এই নির্মাণের প্রতি দৃঢ় সমর্থন আছে। শ্রীমতী লেস্‌লির সিদ্ধান্ত: 'এটাই হচ্ছে সতীদাহপ্রথার শক্তিদাত্রী ভূমিকা: যে-পৃথিবীটা তোমাকে খাটো করে সেখানে আত্মসম্মান অর্জনের একটা কৌশল। ট্র্যাজেডিটা এই যে রূপ কানওয়ার আর কোনো কৌশল খুঁজে পায় নি।' এখানে আমার মনে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন জাগে। যে-বিশ্লেষণটাকে অতীতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ব'লেই মনে হয় তা আজকের দিনের একটি শিক্ষিত তরুণীর ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কতটা প্রযোজ্য? শ্রীমতী লেস্‌লি কি এখানে অতীতসংক্রান্ত একটা বৈধ বিশ্লেষণকে নকশামাফিক বিশ্লেষণের খাতিরে খানিকটা জোর ক'রেই মেয়েটির মনস্তত্ত্বের উপরে চাপাচ্ছেন না? আধুনিক অ্যাকাডেমিক নির্মাণের খাতিরে বিদ্যাজগতের একজন প্রতিমারচয়িত্রী-রূপে তিনি কি তাঁর ব্যাখ্যাকে মৃতার অজ্ঞাত মানসলোকের উপরে সুপার-ইম্পোজ় করছেন না? কেননা মেয়েটির চারপাশের কাল্‌চারের আদর্শ অনেকটাই বোঝা গেলেও সে নিজে যে কী চেয়েছিলো তা কিন্তু সমস্ত বিবরণ পড়ার পরও ঝাপসাই থেকে যায়। তাই এই বইয়ের শুরুতে যে-চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছিলো, এই সমালোচনার প্রারম্ভেই যা উদ্ধার করেছি, তার সঙ্গে ঠিক মোকাবিলা হয় না।

প্রশ্নটা তুলছি সতীদাহের বিষয়ে আমি নিজে অনেক ভেবেছি ব'লেই। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের বৃটিশ ভারতপ্রবাসীদের ডায়েরি ও স্মৃতিচারণা সম্পর্কে আমার যে-গবেষণাগ্রন্থটি[৪] আছে, তার ১০০-১০৬ পৃষ্ঠায় শ্রীমতী লেস্‌লির বিশ্লেষণের সমীপবর্তী ও সমধর্মী একটি বিশ্লেষণই পেশ করা হয়েছে। সেকালে যে-সব মেয়েরা সতী হতেন তাঁদের সকলকেই যে ইডিওলজির অসহায় শিকাররূপে চিহ্নিত করা যায় না, তাঁদের কারও কারও সংকল্পের ও আচরণের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির এক অদম্য প্রকাশকেও যে জ্ব'লে উঠতে দেখা যায়, এই ব্যাপারটা ওখানে আলোচিত হয়েছে। মেয়েদের কেবলই কোনো অত্যাচারী ইডিওলজির নিষ্ক্রিয় বলি হিসাবে না দেখে তাদের নিজস্ব নির্মাণসমূহের সক্রিয় কর্ত্রী-রূপে দেখার তাগিদ আমিও গভীরভাবেই অনুভব করেছিলাম, আর মদত পেয়েছিলাম আমার পর্যালোচিত কোনো কোনো লেখকের বিশ্লেষণ থেকেই। বিশ্লেষণের সূত্র তো আমরা কোনো শূন্য থেকে চয়ন করি না, পাই সামনের উপাদানের নিহিত নকশার সঙ্গে অন্যদের এবং নিজেদের চিন্তার বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গের একটা চলিষ্ণু মিথক্রিয়া থেকে। আমিও কিছু সূত্র পেয়েছিলাম আমার সমীপবর্তী সত্তরের দশকের ফেমিনিস্ট চিন্তার কাছ থেকে, কিছু পেয়েছিলাম ঐ বৃটিশ পর্যবেক্ষকদের লেখার মধ্যেই। এঁদের সকলেই কিছু সরল ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হন নি। উইলিয়ম হেনরি স্লীম্যান বা মার্কোয়েস্ অফ হেস্টিংস্, যাঁদের লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আমার বইটার ঐ জায়গায় দেওয়া হয়েছে, কাঁচা পর্যবেক্ষক ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের অবেক্ষিত বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবেই ভেবেছিলেন: বিষয়টা তাঁদের ভাবিয়েছিলো। সতী মেয়েদের মনস্তত্ত্বের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা, এবং তাঁদের বিশ্লেষণ যথেষ্ট অন্তর্ভেদী। যাই হোক, আমি দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে সতীদাহের একটা দিক ছিলো 'নারীর ইচ্ছাশক্তির, জড়ের উপরে চিত্তের ঈশিত্বের ... চূড়ান্ত একটা অভিব্যক্তি'; এও বলেছিলাম যে ইচ্ছার এই প্রবল অভিব্যক্তি যে দেখা যেতো ঐরকমের একটা 'নঞর্থক প্রসঙ্গে— আত্মহত্যার অধিকারে— তা থেকে বোঝা যায়, বাঁচবার এবং কাজ করবার সদর্থকতর ক্ষেত্রগুলিতে [মেয়েদের] আত্মপ্রকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি ছিলো বাধাগ্রস্ত'। শ্রীমতী লেস্‌লি কি এইরকমেরই একটা বিশ্লেষণ রূপ কানওয়ারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন না? তিনি অবশ্য আমার বই থেকে পাওয়া কোনো সূত্রের উল্লেখ করেন নি, যদিও আমি জানি যে বইটা তাঁর আছে এবং আমার সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক আগেই তিনি সেটা পড়েছেন। তাঁর এই বইখানা বেরোবার এগারো বছর আগে আমার বইটা বেরিয়েছে। যাবতীয় কৃতজ্ঞতাকে অবাধে স্বীকার করাকেই বিদ্বজ্জনের কর্তব্য ব'লে এককালে জানতাম, কিন্তু দেখতে পাই যে আজকালকার প্রখর প্রতিযোগিতার আঙিনায় সকলে অত-সব কানুন মানেন না। একজনের কাজ থেকে সূত্র নিয়ে যথোপযুক্ত ঋণস্বীকার না ক'রে আরেকজন দিব্যি প্রবন্ধ লিখে ফেলছেন, এটা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। সে যাই হোক, আমার বই থেকে কোনো সূত্র পেয়ে সেটাকে শ্রীমতী লেস্‌লি স্বীকৃতি দিলেন কিনা সেটা একটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন; সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়; কিন্তু আমার যে-জিজ্ঞাসাটা থেকেই যায় সেটা হলো: আঠারো বা উনিশ শতকের মেয়েদের ক্ষেত্রে যে-

বিশ্লেষণটা প্রাসঙ্গিক, সেটা কি বিশ শতকের একটি লেখাপড়া-জানা মেয়ের বেলাতেও প্রাসঙ্গিক, এবং তা যদি হয়, তবে তা ভারতীয় সমাজের প্রগতি সম্বন্ধে আমাদের কী বলে ? রূপ কানওয়ারও কেন সদর্থক উপায়ে আত্মসম্মান অর্জনের কোনো কৌশল খুঁজে পেলো না ?

এই মেয়েটির মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাগুলির মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক মিথের আত্মপ্রাপ্তির বা আত্মপূর্ণতালাভের ব্যাপার যেমন আছে, তেমন এটাও মানতে হবে যে ঐ ব্যক্তি-মেয়েটির মনের ভিতরকার ঘরে আমরা ঢুকতে পারি নি, সেটার চাবি আমাদের কাছে নেই। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিতার একটা মাত্রা আছে, যেটা আমাদের ভুললে চলবে না। আর পাঁচটা আত্মঘাতী মানুষের মতো তারও ডিপ্রেশন হয়ে থাকতে পারে, সেদিকে তার একটা প্রবণতা ছিলো এমন হতে পারে, তার উপরে অন্যায়ভাবে চাপসৃষ্টি করা হয়ে থাকতে পারে— আমরা জানি না।[৫] অর্থাৎ এ ধরনের একটি-দুটি-তিনটি ঘটনা থেকে কোনো সামাজিক সামান্যীকরণে পৌঁছনো হঠকারিতাও হতে পারে। সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথের মতো কৃতী, বিদগ্ধ মেয়েই বা আত্মহত্যা করেছিলেন কেন ? তিনিও কি সদর্থক উপায়ে আত্মসম্মান অর্জনের কোনো কৌশল খুঁজে পান নি ?

আমার বিশ্বাস, এ ধরনের বিশ্লেষণে পরিচিত, আকর্ষক নকশাদের প্রতি আনুগত্য আরেকটু কমিয়ে আরও বাস্তবতা ও সূক্ষ্মতা আনা দরকার। যেমন, ভারতসম্পর্কিত বিশ্লেষণে ভারতের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যদের প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। তার জন্য ভাষাজ্ঞানকে প্রয়োজনমতো বিচিত্রতর ও গভীরতর করা চাই। নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মধ্যে অগণিত সাংস্কৃতিক অণুবিশ্ব আছে, যেগুলি মিথস্ক্রিয় বটে, পরিবর্তনশীলও বটে। খুব খুঁটিয়ে না দেখলেও, মোটা বিচারেও কতগুলো বড় বড় আঞ্চলিক পার্থক্য চোখে পড়বেই। যেমন, এই বইটা থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের জীবনে ভরতনাট্যমের অনুশীলন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে, বা রাজপুত মেয়েদের মনের কোণে সতী হওয়ার আদর্শটা কিভাবে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। বাঙালী মেয়েরাও ভরতনাট্যম্ শেখেন, বাঙালী মেয়েরাও এককালে কম সতী হন নি, কিন্তু ও দুটো জিনিসকে ঘিরে বাঙালী সমাজে এ মুহূর্তে যদি কোনো 'ইশ্যু' দেখতে না পাওয়া যায়, তা হলে তা এই মুহূর্তের বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলে বৈকি। আমার তো মনে হয়, 'হিন্দুত্ব'কে কোনো বিশাল, নিত্য সত্তা হিসাবে না দেখে তেমন একটা অস্থির, আঞ্চলিক, আপেক্ষিক ব্যাপার হিসাবে দেখাই বেশী কার্যকর, যার সীমারেখা তথা অভ্যন্তরীণ উচ্চাবচতা ও খুঁটিনাটি সদাপরিবর্তমান।

বইয়ের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখেছেন সংযুক্তা গুপ্ত। ভক্তিমার্গের সাধনার ক্ষেত্রে একদিকে শৈব-শাক্ত ঐতিহ্যের তিনজন নারী কবি-সাধিকা ও অন্যদিকে বৈষ্ণব ঐতিহ্যের তিনজন নারী কবি-সাধিকা, এই ছ'-জনের একটি তুলনামূলক আলোচনা ক'রে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে প্রথম দলের মহিলারা স্বাতন্ত্র্য এবং সাধনাসার্থকতা অর্জনে বেশী সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন, কারণ তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্বের প্রভাবে তাঁরা

আত্মবিকাশের পক্ষে অনুকূলতর পরিপার্শ্ব পেয়েছিলেন। বৈষ্ণবদের তাত্ত্বিক কাঠামো মেয়েদের স্বাধীন আধ্যাত্মিক সাধনাকে তেমন মদত দেয় না। শিবের শক্তির মতো বিষ্ণুর শক্তির স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই। চিত্রে বা ভাস্কর্যে লক্ষ্মীর ভয়ংকরী-রূপ নেই, একাকিনী-রূপ বিরল। তিনি আদর্শস্থানীয় হিন্দু স্ত্রীরই আদর্শায়িততর মূর্তি ; অনন্তশয়নে শায়িত বিষ্ণুর প্রেমময় সেবাই তাঁর নিত্যকর্ম। বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ; বৈষ্ণবদের প্রেক্ষাপটে স্ত্রীজাতীয়া অন্য যে-গুরুত্বপূর্ণ মডেলটি আছেন সেই কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রবন্ধটির অন্তর্গত হলে আরও ভালো হতো। শিবের শক্তির সঙ্গে একাত্মবোধ মেয়েদের সামনে স্বকীয় সাধনার যে-পথ খুলে দেয় রাধার সঙ্গে একাত্মবোধ তা খুলে দেয় না কেন, মেয়েদের পক্ষে রাধার ভাবমূর্তির সাফল্য-অসাফল্য কোথায় এবং কেন— এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁর কিছু চিন্তা লেখিকা যদি আমাদের দিতেন, তা হলে তাঁর আলোচনা পূর্ণতর হতো এবং আমরা আরও উপকৃত হতাম।

গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধে লিন্ টেস্কি ডেন্টন (Lynn Teskey Denton) একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন বারাণসীর সেই-সব মেয়েদের বিষয়ে, যাঁরা সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য, অথবা তন্ত্রসাধনার পথে মুক্তিসন্ধানী। এঁদের জীবন আদর্শ হিন্দু জায়া-জননী-গৃহিণীর শাস্ত্র-অনুমোদিত জীবনের থেকে একেবারে আলাদা হয়েও হিন্দু আধ্যাত্মিকতার চালচিত্রের অন্তর্গত মোটিফ, তার বাইরের ব্যাপার নয়। বামাচারী তান্ত্রিক পথও যে মেয়েদের জন্য রুদ্ধ নয়— হিন্দু ব্যবস্থায় মেয়েদের নানা প্রতিবন্ধের পাশাপাশি এই তথ্যটাও নিশ্চয় মনে রাখবার মতো।

সন্দেহ নেই, জিজ্ঞাসু পাঠকরা এই বইটিতে চিন্তার অনেক খোরাক পাবেন। সর্বসমেত উনিশটি সাদা-কালো ছবি বইটির আকর্ষণ বাড়ায়। সম্পাদনার কাজে সম্পাদিকার মনোযোগিতা ও শ্রমস্বীকারের ছাপ সুস্পষ্ট। আমি বলতে বাধ্য যে বৃটিশ সংস্করণটির দাম বৃটেনেই খুব বেশী ; ভারতীয় সংস্করণের দাম মতিলাল বারাণসীদাস কিরকম রাখবেন জানি না। তবু ভারতীয় বিদ্বৎকুলে বইটির প্রচার কাম্য। দুঃখের বিষয়, বইটির টেক্স্‌ট্ যে-ধরনের টাইপে ছাপা হয়েছে সেখানে অক্ষরগুলি এত কৃশতনু যে আমার অন্ততঃ পড়তে রীতিমতো কষ্ট হয়েছে। মলাটে একটি ত্রুটি ঘটেছে: জুলিয়া লেস্‌লি যে সমগ্র গ্রন্থের রচয়িত্রী নন, সম্পাদিকামাত্র, তা বলা হয় নি ; মলাট তথা শিরদাঁড়া দেখে মনে হয় সমস্ত বইটাই তিনি লিখেছেন। বইয়ে অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটা স্বস্তিজনক হতে পারে না। আশা করি ভারতীয় সংস্করণে এই ভুল শোধরানো হবে বা হয়েছে। ...

১ Julia Leslie, *The Perfect Wife: The Orthodox Hindu Woman according to the Stridharmapaddhati of Tryambakayajvan*, Oxford University Press, Delhi, 1989.

২ Anne-Marie Gaston, *Siva in Dance, Myth and Iconography*, Oxford University Press, Delhi, 1982.

৩ দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য : কারিন কাপড়িয়া, 'দক্ষিণ ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতিতে স্ত্রীলিঙ্গের ইডিওলজি' (ইংরেজী থেকে অনূদিত প্রবন্ধ), *জিজ্ঞাসা* ১৩ :২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯।

৪ আমার বইটির নাম : *A Various Universe: A Study of the Journals and Memoirs of British Men and Women in the Indian Subcontinent*, 1765-1856, Oxford University Press, Delhi, 1978; re-issued in 2002.

৫ আসলে রূপ কানওয়ারের আত্মাহুতি (১৯৮৭) আমাকে খুবই আলোড়িত করেছিলো, সে-বিষয়ে কিছু পড়াশোনাও করেছিলাম, এবং মেয়েটির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমি নিজে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেছিলাম। আমার প্রথম নাটক *রাতের রোদ*-এর প্রথম দৃশ্যে রূপ কানওয়ারের সহমরণের কাহিনী ব্যবহার করেছি। ১৯৯২ সালে এই প্রবন্ধটি যখন লিখি তার দু' বছর আগেই নাটকটি লেখা হয়ে গেছে। এবং ১৯৯২ সালে 'সংবর্ত' নাট্যগোষ্ঠীকে তার অভিনয়ের অনুমতিও দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সংকোচবশতঃ এখানে তার উল্লেখ করি নি, সম্ভবতঃ নাটকটি তখনও ছাপা হয় নি ব'লে। নাটকটি ১৯৯৪ সালে মঞ্চস্থ হয় এবং দে'জ পাবলিশিং কর্তৃক ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। কৌতূহলীরা *রাতের রোদ*-এর ৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা দেখে নিতে পারেন। আরও বলি, শ্রীমতী লেস্‌লি-সম্পাদিত *স্ত্রীধর্মপদ্ধতি* থেকে ত্র্যম্বকযজ্বনের কিছু শ্লোকও ঐ নাটকের সংলাপে ব্যবহার করেছিলাম, এবং সেজন্য তাঁর ঐ বইটি আমার নাটকের শেষে উল্লেখপঞ্জীতে বরাবরই স্বীকৃতি পেয়ে আসছে,— ছাপা নাটকে তো বটেই, যখন তা টাইপ-করা 'স্ক্রিপ্ট' হিসাবে অভিনেতাদের হাতে হাতে ঘুরতো সেই সময় থেকেই।

একটি কূটনৈতিক ব্যায়াম : বিষয়— ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো

দিল্লীতে আর্জেন্টিনার দূতাবাস থেকে স্বয়ং ওখানকার রাষ্ট্রদূতের কার্ড-সহ বিমান-ডাকে আমার কাছে পৌঁছেছে একটি বইয়ের সৌজন্য-কপি। বইটি* মূলতঃ কতগুলি সেমিনার-প্রদত্ত পেপারের সংকলন। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের নভেম্বরে দিল্লীতে, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা আই-সি-সি-আর-এর যৌথ উদ্যোগে। বস্তুতঃ, এই আলোচনাসভায় আমার উপস্থিত থাকার কথা ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। সে-গল্পও এখানে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

বইয়ের সর্বপ্রথম পেপার মণি চাড্ডা-র (আশা করি বানান ঠিক হলো, ইংরেজীতে Chadha), যিনি, জানা যাচ্ছে, ছিলেন এই সভার অন্যতম সভাপতি। তাঁর বিষয়বস্তু ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার একটি চেনা চারণক্ষেত্র। মনটা গোড়াতেই দ'মে যায় যখন দেখি যে পেপার আরম্ভই হচ্ছে ভিক্তোরিয়ার দেওয়া চেয়ারটিকে নিয়ে ৬ এপ্রিল ১৯৪১ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য কবিতাটির একটি ইংরেজী অনুবাদের টুকরো দিয়ে, যা শুরুতেই ত্রুটিযুক্ত। 'আরো একবার যদি পারি/ খুঁজে দেব সে আসনখানি/ যার কোলে রয়েছে বিছানো/ বিদেশের আদরের বাণী'— এই লাইনগুলির মানে কি এই ?— 'How I wish/ I could once again/ find my way/ to that foreign land/ where waits for me/ the message of love!' মৃত্যুর অল্প আগে লেখা এই লাইনগুলি নাকি 'শূন্য চেয়ার' নামে একটি কবিতার অন্তর্গত এবং 'were to be among the last of the Gurudev. They express his longing for the brilliant and beautiful Victoria Ocampo ...' — জানিয়েছেন লেখক।

যাক, অন্ততঃ দিল্লীর সভায় দাঁড়িয়ে সুন্দরী ভিক্তোরিয়ার প্রতি কবির মনোভাবকে 'লংগিং' ব'লে চিহ্নিত করা যায়, পিটুনি না খেয়ে ; যদিও 'দ্য গুরুদেব' ব্যাপারটা বুঝলাম না, বুঝলাম না 'দ্য'-প্রয়োগের সার্থকতা। 'দ্য বুদ্ধ'র মতো ব্যাপার কি ? এক এবং অদ্বিতীয় ? এবং লংগিং-এর মুহূর্তেও তিনি দ্য গুরুদেবই থাকেন ? অসময়ে 'গুরুদেব' শব্দটির ব্যবহার মানানসই নয়, কিন্তু বেশী বিরক্তিকর কবিতার অশুদ্ধ অনুবাদ, যার কোনোই প্রয়োজন ছিলো না। মনে হয় না এ তর্জমা চাড্ডা নিজে করেছেন। বস্তুতঃ, আমার মনে হয় এরকম

* *Victoria Ocampo: An Exercise in Indo-Argentine Relationship*, compiled and edited by Embassy of Argentina in India & Susnigdha Dey, B. R. Publishing Corporation [A Division of D. K. Publishers Distributors (P) Ltd.], Delhi, 1992, Rs. 110.

একটা রূপ রিসার্চ করার সময়ে কোনো আর্কাইভ্‌সের কোনো-একটা ফাইলে আমার চোখে পড়েছে, কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। হয়তো খুঁজলে বেরোবে। কিন্তু কয়েকটা বাংলা লাইনের বক্তব্য যদি দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে, তা হলে আর্জেন্টিনাকে ছোঁবে কী ক'রে? হয়তো এই কবিতাটির একটি অনুবাদ আমি নিজে করেছি ব'লে (আমার সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্র-অনুবাদ সংকলন *আই ওন্ট লেট ইউ গো*-র অন্তর্গত) এই ভ্রমাত্মক অনুবাদ আমাকে এত বিরক্ত করছে। তা ছাড়া *শেষ লেখা*-র কোনো কবিতার শিরোনাম নেই।

আর্জেন্টিনায় ভারতের এককালীন রাষ্ট্রদূত চাড্ডা জানান যে ঐ আশ্চর্য মহিলার অসাধারণ কীর্তিগুলি সম্পর্কে ভারতের লোকেরা যথেষ্ট জানেন না। কী মুশকিল! আমার তো ধারণা যাঁরা প্রকৃতপক্ষে কৌতূহলী তাঁরা ইতোমধ্যে খানিকটা জেনেছেন। আর যাঁরা কৌতূহলী নন, তাঁদের সে-সম্পর্কে জানাতে চাইলেও তাঁরা জানতে চাইবেন না। এর পর লেখক জানান যে সৌভাগ্যক্রমে তিনি 'came to befriend this remarkable personality'। ইংরেজী 'বিফ্রেণ্ড' ক্রিয়াপদটির অর্থ হলো কারও প্রতি বন্ধুরূপে ব্যবহার করা, তাকে সাহায্য করা, অনুগ্রহ দান করা। এটা তো স্পষ্ট যে ঐ অসাধারণ রমণীই ভারতের রাষ্ট্রদূতকে 'বিফ্রেণ্ড' করেছিলেন, উল্টোটা নয়। ভিলা ওকাম্পোয় ভিক্তোরিয়ার সঙ্গে আলাপকালে লেখকের বার-বারই মনে হয়েছে সেই ১৯২৪-এর বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথ ঐ ঘরে, ঐ বাগানে কত না কথা বলেছেন, কত না *হেঁটেছেন*। 'She pointed out the bench on which the Gurudev was photographed with Victoria at his feet— perhaps the best known picture of his Argentine sojourn— ...': তাই কি? আমাদের খুবই চেনা সেই ছবিটাতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটা বেতের চেয়ারে ব'সে আছেন। বেঞ্চে বসা ছবিও তাঁর আছে, কিন্তু সেখানে ভিক্তোরিয়া কবির পাশে ব'সে আছেন, পায়ের কাছে নয়। বিশ্বভারতী সম্পর্কে চাড্ডার ধারণা যে সেই প্রতিষ্ঠান নাকি 'was founded with Tagore's inspiration'; কিন্তু আমি তো জানতাম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন, অর্থাৎ 'ফাউণ্ডেড বাই টাগোর'-ই বলতে হবে তাকে!

বইয়ের ১১ নং পৃষ্ঠায় এসে আমাকে থমকে যেতে হয় নিজের নাম দেখে। রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া সম্পর্কে আমার ইংরেজী বই *ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন* সম্পর্কে তিনি বলেন:

> The book ... was written after extensive research. While one might differ on conclusions drawn by the author on matters of detail, it is a comprehensive work. However, it contains a notable error of fact which needs to be corrected.
>
> Contrary to the impression conveyed in the book, the house in which Tagore stayed in San Isidro unfortunately no longer exist [*sic*]. It was demolished many years ago (even before I arrived in Argentina to live there in 1974) to make way for new construction. Prof. Cura confirms this.

কিন্তু অধ্যাপিকা কুরা যা খুশি তাই বললেই তো হবে না। এই গেলো বছরই কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে এক ট্যাক্সিচালক অম্লানবদনে আমাকে বললেন যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ব'লে কোনো জায়গা যে আছে তা তিনি জানেন না। মনে করুন আর্জেন্টিনা থেকে আগত কোনো রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু ঐ খবরটুকু পেয়েই নিশ্চিন্ত মনে স্বদেশে ফিরে গেলেন এবং প্রচার করলেন যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ব'লে কোনো পদার্থ নেই। কলকাতার ট্যাক্সিচালকরা যে প্রয়োজনমতো কতটা সৃষ্টিশীল (বা মতান্তরে বিনষ্টিশীল) হতে পারেন তা তো তিনি জানেন না। এও তেমনি।

যতদূর মনে পড়ে, এখন থেকে দু' বছর আগে (১৯৯০ সালে) মণি চাড্ডা কলকাতার *স্টেট্‌সম্যান* পত্রিকায় একই কথা লিখেছিলেন। কাটিংটা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও গোঁজা আছে, ফেলে তো দিই নি, কিন্তু এখন খুঁজে বার করতে গেলে সময় নষ্ট হবে। বস্তুতঃ, আলোচ্য পেপার অন্য দিক দিয়েও সেই প্রাক্তন রচনার কতটা অনুসারী তা এই কারণেই বলতে পারছি না। কিন্তু মিরাল্‌রিও-নামক বাড়িটার মহতী বিনষ্টির বৃত্তান্ত এমনই একটা ডিটেল যা ভুলবার নয়। বলা বাহুল্য, *স্টেট্‌সম্যান* কাগজে আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলাম, এবং তা ছাপাও হয়েছিলো, যদিও *স্টেট্‌সম্যান* (যেন তামাশা ক'রেই) আমার সে-প্রতিবাদের পাশাপাশি মিরাল্‌রিওর ছবি না দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ছেপে দিয়েছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের সেই ভিলাটির ছবি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া মিলিত হয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। (এই বাড়িটির দুটি ছবি আমি আমার ইংরেজী বইটির জন্য অনেক পরিশ্রম ক'রে ফ্রান্স থেকে সংগ্রহ করেছিলাম।)

দেখা যাচ্ছে যে চাড্ডা আমার সে-জবাবকে গ্রাহ্য করেন নি, এবং সভাস্থলে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে একটি অলীক ধারণার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই বইয়ের সম্পাদকরাও কোনোরকমের অনুসন্ধান না ক'রে তা ছেপে দিয়েছেন।

আমার আলোচ্য বইটার ভূমিকায় অ-দ্ব্যর্থক ভাষায় বলা হয়েছে :

> Thanks to the owners of Miralrío, the Lafuente family, especially to Gloria, the present mistress, and her daughter Mariana, I spent an unforgettable day at Miralrío, where Tagore and Elmhirst had stayed as Victoria Ocampo's guests. It was from Gloria's father-in-law Ricardo de Lafuente Machain that the villa had been rented in 1924. Dining at the table where Tagore and Elmhirst would have dined, looking at the study, the bedrooms, the famous balcony facing the river, the *tipa* tree under which they used to sit, I felt I had come on a pilgrimage. Many useful items of information were gathered by me from this visit and from the family.
>
> (*In Your Blossoming Flower-Garden*, Preface, p. xvii)

বইয়ের অন্যত্রও একাধিকবার এই বাড়ি সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষদর্শী-অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। অপিচ বইয়ে ব্যবহৃত মিরাল্‌রিওর একাধিক ছবির মধ্যে দুটি (বইয়ের ৫ ও ৬ নং ছবি) লাফুয়েন্তে পরিবারের দেওয়া পুরোনো পিক্‌চার পোস্টকার্ড থেকে ডেভেলপ্‌ করা হয়েছে; তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে-ক্ষেত্রে আমি পরিষ্কারভাবেই বলছি যে বাড়িটাতে আমি গিয়েছি, সেখানে একটি দিন কাটিয়েছি, সে-ক্ষেত্রে আমি ভুল করেছি বললে কী বলা হয়? হয় লাফুয়েন্তে পরিবার আমাকে একটা অবিশ্বাস্যরকমের ভেলকিবাজি দেখিয়েছেন— বাগান, তিপা গাছ ইত্যাদি সহ অবিকল মিরাল্‌রিওর মতো দেখতে একটা আস্ত দোতলা বাড়িকে প্লাতা নদীর কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে; নয় আমি মিথ্যা কথা বলেছি; কিংবা আমি ছিটগ্রস্ত, উল্টোপাল্টা কথা ব'লে থাকি; অথবা আমি দিবাস্বপ্ন বা অমূল প্রত্যক্ষ দেখে তাকে প্রত্যক্ষ দর্শন ব'লে চালাচ্ছি। সে-ক্ষেত্রে বুয়েনোস্‌ আইরেসের সর্বাগ্রগণ্য দৈনিক পত্রিকা *লা নাসিয়ন*-ও একটি মিথ্যাচরণ করেছেন, কারণ তাঁরা ১ এপ্রিল ১৯৯০ তারিখে (অর্থাৎ ভিক্তোরিয়ার জন্মশতবার্ষিকীর দিনকয়েক আগে) একটি রবিবাসরীয় রঙিন ক্রোড়পত্রে মিরাল্‌রিওর একাধিক আধুনিক রঙিন ছবি-সহ আমার বইয়ে বিবৃত রবীন্দ্র-ওকাম্পো কাহিনীকে নিয়ে একটি 'কাভার স্টোরি' করেন। আধুনিক ছবি-তিনটির আলোকচিত্রী আলেখান্দ্রো কুরোপাত্‌ওয়া (Alejandro Kuropatwa)। ইনিও কি দিবাস্বপ্ন অথবা অমূল প্রত্যক্ষ দেখেছেন? সে-সব অভিজ্ঞতা ক্যামেরাতে ধরা যায়?

কোনো বাজে কথা ছাপা অক্ষরে বললেই তা সত্য হয়ে যায় না, সে-বই কোনো দূতাবাস বা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক ছাপ-মারা হলেও না। আর্জেন্টিনার সামরিক একনায়কত্বের কালে নাগরিকদের গুম্‌ ক'রে দেওয়ার একটা রীতি ছিলো। তরুণতরুণীরা অফিস বা কলেজ থেকে বেরিয়ে আর ঘরে ফিরে আসতো না। এই হারিয়ে-যাওয়া মানুষদের বলা হতো 'desaparecidos', অন্তর্হিত মানুষ। ১৯৮৫ সালে আমি যখন আর্জেন্টিনায় যাই, তখনও এই ভয়ংকর ব্যাপারের বিরুদ্ধে মহিলাদের নীরব প্রতিবাদের মিছিল বেরোতো। মিরাল্‌রিওকে কি সেইভাবে একটা 'অন্তর্হিত বাড়ি' ক'রে দেওয়া হচ্ছে? তাই কি *নাসিয়ন*-এর লেখক জানিয়ে দেন যে বাড়িটা 'এখনও বিদ্যমান'?

আমি বলতে বাধ্য যে ১৯৮৫-তেও মিরাল্‌রিওর অস্তিত্ব আমাকে অনুসন্ধান ক'রে বার করতে হয়েছিলো। ওকাম্পো-আর্কাইভ্‌সের তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীমতী কুরা আমাকে বলেছিলেন যে ওরকম কোনো বাড়ি নেই। ভারতীয় দূতাবাসের লোকেদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ ভিলা ওকাম্পোতেই ছিলেন। দেখলাম তাঁদের এই ধারণাটাকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী কুরা মিরাল্‌রিওর অস্তিত্ব নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো আলোচনায় নামতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমি জেদ ক'রে বার-বার প্রশ্ন করার পর কুরার অনুপস্থিতিতে আদেলা-নাম্নী তাঁর সহকর্মিণী আমাকে বললেন, 'আপনি ঐ বাড়িটার বিষয়ে ভিলা ওকাম্পোর পরিচারিকা ক্লারাকে জিজ্ঞেস করবেন।' ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ১৩ মে ১৯৮৫ তারিখে ভিলা ওকাম্পোয় গেলাম। সেখানে ক্লারা-নাম্নী মহিলাটি বললেন, 'তাগোর যে-বাড়িটাতে ছিলেন সেটাকে একটি সন্ত্রাসবাদী মেয়ে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে একটা নতুন

বাড়ি উঠেছে।' কথাটা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। এরকম একটা ঘটনা ঘটলো, আর আমরা কোনো খবর পেলাম না? ফেরার পথে ইউনেস্কোর ড্রাইভারকে কয়েকবার অনুরোধ করলাম বাড়িটার খোঁজ করতে— নিশ্চয় কাছে-পিঠেই কোথাও হবে— কিন্তু ইউনেস্কো থেকে যে-মহিলাটি বাড়ি দেখাতে এসেছিলেন তিনি আমার কথায় বড় একটা কান দিলেন না, বললেন, 'সে তো নেই, শুনলেনই।' একবার আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে নতুন বাড়িটা।' আর ড্রাইভার স্রেফ গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা শহরে ফিরে এলাম। আমার মেজাজ তখন বেশ খারাপ।

ফিরে এসেই টেলিফোনে তদন্ত আরম্ভ ক'রে দিলাম। এদুয়ার্দো পাস্ লেস্টন বললেন, 'কই, বাড়িটা বোমায় উড়ে গেছে এরকম কোনো কথা তো আমরা শুনি নি।' তাঁর ধারণা বাড়িটা অস্তিত্ববান। বললেন, 'দাঁড়ান, লাফুয়েন্তে পরিবারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।' সেই দিনই অনেক রাতে শ্রীমতী গ্লোরিয়া লাফুয়েন্তের টেলিফোন পেলাম। ইনি মিরাল্‌রিওর বর্তমান স্বত্বাধিকারী রামিরো লাফুয়েন্তের পত্নী। রামিরোর বাবা রিকার্দো ছিলেন ভিক্তোরিয়ার এক মাসতুতো বোনের স্বামী। এই রিকার্দো লাফুয়েন্তের কাছ থেকেই ১৯২৪ সালে নবনির্মিত ভিলা মিরাল্‌রিও ভাড়া করেছিলেন ভিক্তোরিয়া।

গ্লোরিয়া বললেন, তাঁর স্বামী মাদ্রিদে, তাঁর একটি ছেলের ফ্লু হয়েছে, তার খুব জ্বর, তাই ফোন করতে রাত হলো। ঠিক হলো, তার পরের রোববার, ১৯ মে তারিখে তিনি নিজে আমাকে গাড়িতে ক'রে মিরাল্‌রিওতে নিয়ে যাবেন। একটু বাদে ফের ফোন ক'রে বললেন, 'যাবেনই যখন, ওখানে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবেন।' নির্দিষ্ট দিন যাত্রা করলাম, সঙ্গে ছিলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরতা তরুণী কন্যা মারিয়ানা।

অন্য কথা পাশে রেখে আমার কাছে চিরস্মরণীয় সেই আশ্চর্য দিনটির কথা এখানে একটু বলতে ইচ্ছে করছে। কিছু স্মৃতিচারণা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দক্ষিণ গোলার্ধের সেই হেমন্তদিনটি ছিলো উজ্জ্বল এবং মধুর। পুরোনো ফোটোগ্রাফগুলিতে বাড়িটাকে আমরা যেমন দেখি, মোটের উপর বাড়িটার চেহারা এখনও তেমনি আছে। ক্যাক্টাস-উদ্যানটা কেটে ফেলা হয়েছে, কাঁকরের বদলে ঘাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্লোরিয়া বললেন তিনিই এগুলো করেছেন, বাচ্চাদের খেলাধুলোর পক্ষে এই ব্যবস্থা বেশী সুবিধাজনক ব'লে।

পৌঁছেই গ্লোরিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়লেন লাঞ্চের আয়োজনে। শহর থেকে কিছু খাবার কিনে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, মিরাল্‌রিওর রান্নাঘরে গরম ক'রে নেবেন ব'লে। কী খেয়েছিলাম মনে আছে। একটার পর একটা 'এম্পানাদা'— বিশাল আকারের মাংসের শিঙাড়া বলা যায় তাকে— লাল মদিরা সহকারে। প্রথমটা খেতে গিয়েই টাকরা পোড়ালাম, এত গরম ছিলো শিঙাড়ার ভেতরটা। তাও পর-পর অনেকগুলো খেয়ে ফেললাম, তালব্য জ্বলুনি সত্ত্বেও, এত উপাদেয় ছিলো এম্পানাদাগুলো। গ্লোরিয়া বললেন, রবীন্দ্রনাথ আর এল্‌ম্‌হার্স্ট ঐ ঘরে ঐ টেবিলে ব'সেই খেয়ে থাকবেন। আমার উত্তেজনা অনুমেয়। মিষ্টি

পদ ছিলো ফ্রুট ক্রাম্বল্‌, লেমন ক্রীম সহকারে। ক্রীমটা তালুতে ঠেকিয়ে জ্বলুনি কমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

বাগানে ব'সে কফি খেয়েছিলাম আমরা। কড়া তেতো কালো কফিটার প্রতি চুমুকে টাকরা টন্‌টন্‌ করছে তখন। বোমার গল্পটার বিষয়ে গ্লোরিয়াকে প্রশ্ন করলাম। তিনি জানালেন, হ্যাঁ, বোমা একটা ফেটেছিলো বটে, তবে এই বাড়িতে নয়, ঐ পাড়ারই অন্য একটা বাড়িতে।

এর পর আমরা আবার বাড়ির ভেতরে গেলাম। গ্লোরিয়া একটা পড়ার ঘর খুলে দেখালেন। সেখানে পোর্তুগীজ স্টাইলের সুন্দর কাঠের চেয়ার। রবীন্দ্রনাথ নাকি ঐ ঘরে ব'সে কখনও কখনও লেখার কাজ করতেন। ঘরটার ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে বিরাট একটা বংশলতিকার কাগজ খুলে তরুণী মারিয়ানা আমাকে সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিলেন ভিক্তোরিয়াদের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক।

আমরা উপরে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ আর এল্‌ম্‌হার্স্ট যে-দুটি দোতলার ঘরে পাশাপাশি ছিলেন সে-দুটিতে সেকালের ভারী আলমারি আজও দাঁড়িয়ে আছে। এসে দাঁড়ালাম সেই বিখ্যাত অলিন্দে। একটু দূরে স'রে গেছে 'রুপোর নদী', রিও দে লা প্লাতা, কিন্তু এখনও সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, চিত্ত-অভিভবকারী প্যানোরামা। হেমন্তের মিষ্টি রোদে প্লাবিত সেই অপরাহ্ণে সমুজ্জ্বল জলবক্ষে দেখা যাচ্ছিলো দু'-একটি পাল-তোলা নৌকো। নদীর ওদিকে উরুগুয়ে। বুঝতে পারলাম ভিক্তোরিয়া কেন বলেছিলেন, এইটেই ছিলো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একমাত্র যোগ্য উপহার। জীবনের কোনো কোনো মুহূর্তে সকলেরই মনে হয়, তীর্থে এসেছি, অবশেষে পৌঁছেছি। ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে, ঐ নদীর উদার মোহানার দিকে তাকিয়ে আমারও ঐরকমই মনে হয়েছিলো। আরও মনে হয়েছিলো, শিবনারায়ণদা আমাকে ঐ দুজনের চিঠিপত্র সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত না করলে এই জায়গাটাতে আমার তো কোনো দিনই আসা হতো না, এই দৃশ্য কখনো দেখা হতো না। সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলাম। বৃটেনের আর ভারতের সব আত্মীয়বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একা আমার একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আর সামনের ঐ জলপথ ছেদহীন করিডর ধ'রে চ'লে যায় দূরতর দূরতম তীর পর্যন্ত, যেখানে আমার পরিচিতজনেরা রয়েছে : ভাবছিলাম এই সব কথা। সে এক অবর্ণনীয় অনুভব। মারিয়ানা ব'লে উঠলেন, 'বাবা এখানে থাকলে আপনাকে নৌকো ক'রে নদীতে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, আমাদের আছে একটা নৌকো।' গ্লোরিয়া এক ফাঁকে আফসোস প্রকাশ করলেন, 'ইস্‌, আমাদের কারও কাছে একটা ক্যামেরা নেই কেন!'

আমার অবশ্য কোনো কালেই ক্যামেরা নিয়ে ঘোরার অভ্যেস নেই; স্মৃতিতে খুঁটিনাটি ধ'রে রেখে শব্দদের মাধ্যমে যে-সাক্ষ্য দিই, সাধারণতঃ পাঠকরা তা বিশ্বাসই ক'রে থাকেন; তবে এখন মনে হয় আমি যে ওখানে গেছিলাম তার একটা ফোটোগ্রাফিক চিহ্ন যদি থাকতো তা হলে এই পৃথিবীর মণি চাড্ডা আর মারিয়া রেনে কুরাদের চোখের সামনে মেলে ধরা যেতো। অবশ্য সেই ফোটোগ্রাফে যে সুপার-ইম্পোজিশনের কোনো কারসাজি

করা হয় নি, সেটাও প্রমাণ করতে হতো। একলা আমার ছবিতে প্রমাণ যথেষ্ট হতো না বোধ হয়। হয়তো আমার সঙ্গিনীদ্বয়ের সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ানো কোনো ছবি থাকলে বোঝানো যেতো যে ঐ বাড়ি ১৯৭৪ সালের আগেই 'ডিমলিশ্ড্' হয়ে থাকতে পারে না। অবশ্য শ্রীমতী কুরা তো ঐ তল্লাটেই থাকেন। বাড়িটার অস্তিত্ব যে-কোনো সময়েই পরখ করতে পারেন তিনি। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন এবং জানেন যে বাড়িটা বিদ্যমান, তবু ভ্রান্তিজনক প্রচার চালিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন !

গ্লোরিয়া এক ফাঁকে নীচে নেমে গেলেন বাগানের পরিচর্যা করতে। রবীন্দ্রনাথ যে-তিপা গাছটার নীচে বসতে ভালোবাসতেন তার বাকল থেকে পরজীবী উদ্ভিদ (প্যারাসাইট) তুললেন। শহরের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য বাগান থেকে কিছু ফুল কেটে নিলেন। বারান্দাটা ছেড়ে চ'লে আসতে আমার একটুও ইচ্ছে করছিলো না। অনেকক্ষণ ওখানে ব'সে ছিলাম, একটা চেয়ারে, আলোকিত জলের দিকে চোখ মেলে। আমি পারলে গভীর রাত পর্যন্ত ওখানে ব'সে থাকতাম। কিন্তু যেতে হয়, আমাকেও যেতে হলো। হেমন্তের সন্ধ্যা হ্রস্ব হয়, সামনে দীর্ঘ ড্রাইভও বটে, রওনা তাই হতেই হলো।

পরে এক সন্ধ্যায় আমি ওঁদের শহরের অ্যাপার্টমেন্টে ডিনার খেয়েছিলাম। বৃষ্টির মধ্যে পৌঁছলাম। গ্লোরিয়া প্রথমেই তোয়ালে হাতে 'মাথা মুছুন, চুল আঁচড়ে নিন' ইত্যাদি ব'লে আমাকে বাথরুমের আয়নার দিকে ঠেলে দিলেন। সারা সন্ধ্যা তুমুল বৃষ্টি চললো। রাস্তায় জল দাঁড়ালো ঠিক কলকাতার মতন। আড্ডাটা কিন্তু জমেছিলো ভালো। গ্লোরিয়ার একটি ছেলে বললেন, 'আমার হেপাটাইটিস-বি হয়েছিলো, আমাকে সারা জীবন তার ক্যারিয়র হয়ে থাকতে হবে।' এরকম ছোট-ছোট কত টুকরো কথাই তো আমাদের মনে থাকে, যাদের বুনটে তৈরি হয়ে ওঠে আমাদের স্মৃতি-নামক পশ্চাৎপটটা। অনেক রাতে সেই ছেলেটিই আমাকে গাড়িতে ক'রে বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে গেছিলেন। গাড়ি তখন বাধ্য হয়েই জলযানে পরিণত হয়েছে। পরের দিন গ্লোরিয়া ফোন ক'রে বললেন, 'আপনার চিরুনিটা বাথরুমে ফেলে গেছেন।' সেটা ফেরতও পেয়েছিলাম।

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরেও ডঃ রামিরো দে লাফুয়েন্তের সঙ্গে আমার পত্রবিনিময় হয়েছে। তত দিনে তাঁর *ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন* বইটা পড়া হয়ে গেছে। আমাকে লিখেছিলেন, 'আরও দু' কপি পাঠান, বন্ধুদের দেবো।' দাম দিয়ে কিনেছিলেন সে-দুটো। বিশের দশকের মিরালরিওর আরও দুটো পিক্চার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন আমার সংগ্রহকে সম্পূর্ণ করবার জন্য। বাড়িটাকে যে তাঁরা গত তিন বছরের মধ্যে 'ডিমলিশ্' ক'রে ফেলেছেন তা তো মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ বাড়ির সম্পর্ক নিয়ে কত গর্ব তাঁদের।

এত সব অকিঞ্চিৎকর কথা কেন বলছি। এই আশায় যে অন্ততঃ এই লাইনগুলি যাঁরা পড়ছেন তাঁরা বিশ্বাস করবেন যে আমার বইয়ে আমি মিথ্যে কথা বলি নি। এগুলো বানানো গল্প নয়। লাফুয়েন্তে পরিবার এবং তাঁদের প্লাতা নদীর তীরবর্তী বাগানবাড়ি সম্বন্ধে আমার প্রতিবেদন যদি মিথ্যা হয়, তা হলে আমি আমি নই। কিছু খুঁটিনাটি আরও বিশেষ

ক'রেই মনে আছে এই জন্যে যে তারা আমার একটা কবিতাতেও ঢুকেছে। আর্জেন্টিনা থেকে ফিরে এসে সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একগুচ্ছ কবিতা লিখেছিলাম,— ইংরেজীতে। সেই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে মিরাল্‌রিওতে বেড়াতে যাওয়া বিষয়ে একটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি আজও অপ্রকাশিত,[১] যদিও কিছু কিছু কাউকে কাউকে চেপে ধ'রে প'ড়ে শুনিয়েছি। মনে পড়ছে, মিরাল্‌রিও সম্বন্ধে কবিতাটি ১৯৮৯ সালে কলকাতার বৃটিশ কাউন্সিল-আয়োজিত একটা আসরে পড়েছিলাম।

বাড়িটা বোমায় উড়ে গেছে, বা তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে,— ছুটো গল্পই সেই জনপ্রিয় সাহিত্যিক জঁারটির অন্তর্গত, যার নাম 'ল্যাটিন-আমেরিকান ফিক্‌শন'। এ হেন কিভাবে লতিয়ে ওঠে কোন্ প্রক্রিয়ায় ডালপালা বিস্তার করে, তার উপর গল্পছুটো আলোকপাত করে। মিরাল্‌রিও আর নেই, এই বিশেষ ফিক্‌শনটির প্রয়োজনীয়তা কী তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। মিরাল্‌রিও লাফুয়েন্তে পরিবারের সম্পত্তি। তা কোনো কালেই ওকাম্পো এস্টেটের অন্তর্গত ছিলো না। লাফুয়েন্তে পরিবার প্রচারবিমুখ। তাঁরা কোনো দিন 'তাগোর-কানেক্‌শন'টাকে ব্যবহার ক'রে নাম কেনার বা টাকা করার চেষ্টা করেন নি। অথচ এই বাড়িটাই আর্জেন্টিনার প্রকৃত রবি-তীর্থ। ভিক্তোরিয়াদের পারিবারিক ভিলায় রবীন্দ্রনাথ বেড়াতে গিয়েছেন, সেখানকার বাগানে তাঁর ছবি তোলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে তিনি কখনো রাত কাটান নি। এল্‌ম্‌হার্স্ট আর তিনি মিরাল্‌রিওতেই রাত কাটিয়েছেন। মিরাল্‌রিও যদি অস্তিত্ববান হয়, তবে তা ভিলা ওকাম্পোর প্রতিযোগী তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়ায়, প্রয়োজনে আর্থিক মদতেরও দাবিদার হয়ে উঠতে পারে। ভিলা ওকাম্পোর অর্থসাহায্যের প্রয়োজন আছে, অতএব এই প্রতিযোগী বাড়িটার অস্তিত্বকে চেপে দিতে পারলে, তাকে 'ডিমলিশ্‌' অথবা বোমার ঘায়ে 'দেসাপারেসিদো' ক'রে দিতে পারলে পথের কাঁটা দূর হয়। দেখা যাচ্ছে এই বইয়ের সম্পাদকরাও সেই বিনাশ অথবা অন্তর্ধানকে মেনে নিয়েছেন।

আরও একটি কথা এখানে যোগ করা প্রয়োজন মনে করি। মিরাল্‌রিও নেই, এই কথাটার প্রচার যে বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই করা হয়েছে তার একটি প্রমাণ আছে। ভিক্তোরিয়ার *তাগোর এন্‌ লাস্‌ বার্‌রাংকাস্‌ দে সান ইসিদ্রো* বইটির প্রথম সংস্করণে (১৯৬১) মিরাল্‌রিওর একাধিক ছবি ছিলো। (এই সংস্করণের একটি কপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে আছে, অনুসন্ধিৎসুরা দেখে নিতে পারেন।) দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৮৩), যা খুব সম্ভব অধ্যাপিকা কুরার তত্ত্বাবধানেই ছাপা হয়েছে, মিরাল্‌রিওর একটিও ছবি নেই: সব ক'টি ছবি নির্মমভাবে নিষ্কাশিত হয়েছে। টেক্সটে মিরাল্‌রিও আর তার অলিন্দের কথা ঠিকই আছে, সেখানে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেন নি কেউ। কিন্তু ঐ বাড়ির দৃশ্য মূর্তিগুলোকে বর্জন করা হয়েছে, হয়তো এই বিশ্বাসে যে যাঁরা স্প্যানিশ টেক্সট্‌টা পড়তে পারবেন না তাঁরা আর ঐ বাড়িটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, ক্রমশঃ ঐ বাড়িটার স্মৃতি মুছে যাবে। আজকাল অনেক লোকই বই পড়েন না, কেবল পাতা উল্টে যান, আর ছবিগুলো দেখে নেন। সম্ভবতঃ দূতাবাসের অধিকাংশ কর্মী এই বর্গভুক্ত। আমি যখন আর্জেন্টিনায় গবেষণা করছিলাম, তখন ওখানকার ভারতীয় দূতাবাসের কেউই মিরাল্‌রিওর নাম শোনেন নি।

তাঁদের সকলেরই ধারণা ছিলো এই যে রবীন্দ্রনাথ ভিলা ওকাম্পোতেই উঠেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা বই পড়েন না, এবং চিত্রমাধ্যমিক প্রচারটি সফলই হয়েছে।

§

চাড্ডার পেপারের অন্যত্রও তথ্যদের ডৌল স্পষ্ট নয়, ঝাপসা। *পূরবী* বইটি সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে ভাসা-ভাসা ব'লেই মনে হয়। তিনি লেখেন :

> The poems that Tagore wrote in quick succession in the heady Argentine spring were numerous; hė translated many of them into English for Victoria. These were later included in *Purabi*, an anthology published in the Bengali language in the following year (1925) and dedicated to "Vijaya", to whom they include allusions. Much later, it appeared in its Spanish version under the title *Canto del Sol Poniente* (Song of the Setting Sun).

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ভিক্তোরিয়াকে *পূরবী*-র মাত্র তিনটি কবিতার অনুবাদই দিয়েছিলেন। আরও কিছু অনুবাদ খাতায় করেছিলেন, কিন্তু ভিক্তোরিয়াকে দেন নি। *পূরবী*-র কোনো কবিতায় বিজয়া সরাসরি স্বনামে উল্লিখিত নন, এবং এই বইয়ের মাত্র কয়েকটি কবিতাই স্প্যানিশ রূপে বার হয়েছে, এবং তাও বাংলা থেকে সরাসরি অনুবাদে নয়, ইংরেজী অনুবাদের মধ্যস্থতায়।

শ্রীযুক্ত চাড্ডা আরও বলেন :

> Ms. Dyscn in her book feels that the poem "Foreign Flower", unlike the rest of the poems in *Purabi*, actually refers to a flower rather than Victoria, and points to what she feels is an incongruity in its publication on the death of Victoria Ocampo in 1979. Does it really matter? It was, as I know personally from Victoria, her favorite of all of Tagore's Argentine poems. Going by some of the other poems, it might as well have been written for her.

বেশ মজাদার তর্ক এটা। *পূরবী*-র 'আর সব কবিতাই' ('দ্য রেস্ট অফ দ্য পোয়েম্‌স্') যখন ভিক্তোরিয়াকে নিয়ে লেখা, তখন ডাইসন-নামাঙ্কিত মহিলাটি কেন এঁড়ে তর্ক করছেন যে একটা কবিতা নেহাৎ একটা ফুলকে নিয়ে লেখা, ভিক্তোরিয়াকে নিয়ে লেখা নয়। মুশকিল এই, *পূরবী*-নামধেয় বাংলা বইটির ভেতরে যে কী আছে, আর কী নেই, সে-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চাড্ডার ধারণা ভাসা-ভাসা ; আর সে-বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য আমার বইটাতে ডিপ্লম্যাট-গ্রাহ্য ইংরেজী ভাষায় বিশদভাবে দেওয়া থাকলেও বইটা তিনি ঠিক ক'রে পড়েন নি। আপনারা যাঁরা এই লাইনগুলি পড়ছেন তাঁরা জানেন যে *পূরবী*-র সমস্ত কবিতা

ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে লেখা এই কথা আদপেই সত্য নয়। এবং তথ্যদের চেহারা একজন গবেষকের কাছে 'ম্যাটার করে' বৈকি। আমি তো 'ল্যাটিন-আমেরিকান ফিক্‌শন' লিখতে বা তার ভিত্তিতে মিথ রচনা করতে বসি নি। বিদেশী ফুলকে নিয়ে কবিতাটি লেখা হয় রবীন্দ্রনাথ মিরাল্‌রিওতে পৌঁছনোর পরের দিন, এবং এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমার বইয়ে পরিষ্কার ক'রেই বলা হয়েছে :

> ... although the shadow of Victoria Ocampo may certainly have fallen across this poem when it was conceived and written, it is nevertheless primarily addressed to a foreign flower,— to a flower, not to a woman,— and the presentation of its Spanish version in the issue of *Sur* paying homage to Victoria Ocampo (no. 346, January-June 1980), signposted as having been written in San Isidro on 12 November 1924 *and* headed by the invented dedicatory phrase 'A Vijaya', i.e. 'To Vijaya', gives a wrong impression of the poet's intentions. Ambiguity crept into the poem retrospectively, because of subsequent events,— probably even in the poet's mind,— but Victoria might not have become 'Vijaya' by 12 November and the poem was certainly not directly addressed to her.

আমার ভাষা কি এখানে এত বেশী সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে একজন রাষ্ট্রদৌত্যজীবী তার অর্থ বুঝতে অপারগ হবেন? আমার কাছে বিশেষ আপত্তিজনক মনে হয়েছিলো *সুর* পত্রিকা-কর্তৃক কবিতাটির মাথায় 'বিজয়ার প্রতি' এই শব্দদুটি জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। এর কোনো ভিত্তি নেই, এবং *পূরবী*-র কোনো বাংলা সংস্করণে যে এরকম করা হয় না সেই কথাটা যাঁরা বাংলা না জেনে *পূরবী*-কে নিয়ে আলোচনা করেন তাঁদের জানানো দরকার বৈকি। এই ধরনের অনধিকারচর্চাকে কি মুখ বুঁজেই সহ্য করতে হবে?

এর একটু বাদে চাড্ডা লেখেন :

> The comfortable chair that Victoria gave him ... inspired not only his poems but also his painting. Of course, it was always to serve him as a reminder of Victoria. "The Empty Chair" was one of Tagore's last poems.

যতদূর জানি, রবীন্দ্রচিত্রকলায় চেয়ারের মোটিফ লক্ষ্য ক'রে তার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার দেওয়া চেয়ারটি সম্পৃক্ত করা— এ কাজ আমিই প্রথম করি। চাড্ডা কিন্তু এখানে আমার বইয়ের কোনো উল্লেখই করেন নি। অর্থাৎ তিনি বিরূপ সমালোচনা করার সময়ে আমার নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমার একটা চিন্তাকে গ্রহণ করার সময়ে আমার নামটা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, এমনভাবে লিখেছেন যেন চিন্তাটা তাঁরই। তা ছাড়া আবারও বলতে হয় যে 'শূন্য চেয়ার' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা নেই। *শেষ লেখা*-র কবিতাগুলি

কেবলমাত্র সংখ্যা-চিহ্নিত, এবং আলোচ্য চেয়ারটিকে নিয়ে পর-পর দুটি কবিতা আছে (৪ এবং ৫ নম্বর)। এ-সব কথা না জেনে যে কেউ সভায় দাঁড়িয়ে অথবা ছাপা অক্ষরে ঐ কবিতাগুলিকে নিয়েই আলোচনা করতে পারেন, এমন কি সেই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করতে পারেন, তা আমি ভাবতে পারি না।

§

পরবর্তী পেপার শ্রীমতী মারিয়া রেনে কুরার। তার বিষয়বস্তু: 'India in Victoria Ocampo: Gandhi-Tagore-Nehru-Indira'।

এখানে ভারতের সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার যোগাযোগের কাহিনী-বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের চাইতে গান্ধীর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করার একটা লক্ষণীয় চেষ্টা করা হয়েছে। এই ন্যারেটিভে ১৯১৪ সালে ভিক্তোরিয়ার *গীতাঞ্জলি*-আবিষ্কারের মর্মস্পর্শী কাহিনীটা জায়গা পায় নি। তার বদলে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে ১৯২৪ সালের ঘটনাগুলির উপর। ঐ বছরের নভেম্বরে *নাসিয়ন*-এ রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর প্রবন্ধ বেরোয়, কবির সঙ্গে দেখাও হয়; তার আগে মার্চ মাসে ঐ একই কাগজে বেরিয়েছে গান্ধীর উপর তাঁর প্রবন্ধ। এই কালক্রমকে একটা গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যেন। কিন্তু ভিক্তোরিয়া তো নিজেই বরাবর বলেছেন, ১৯১৪-তে *গীতাঞ্জলি*-আবিষ্কারই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। মিরাল্‌রিওর অস্তিত্বের মতো এটাও কি চেপে দিতে হবে?

এই কর্মসূচীরও একটা কারণ আন্দাজ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী। এই মানুষটির সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার আদানপ্রদানের ইতিহাসে একটা আলো-আঁধারি আছে। কুরা সাহিত্যের ছাত্রী নন। তিনি বাংলা জানেন না, ইংরেজীতেও বড় একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না। এই ভাষাদুটো জানা না থাকলে রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার কাহিনীটা অনুধাবন করা শ্রমসাধ্য। অপরপক্ষে গান্ধীর সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার কখনো আলাপ হয় নি। একবারই মাত্র গান্ধীর বক্তৃতা তিনি শুনেছেন। গান্ধীর বিষয়ে ভিক্তোরিয়ার সমস্ত প্রতিবেদন স্প্যানিশ টেক্সটে প্রাপ্তব্য, আর উল্টো দিকের ইতিহাস ব'লে কিছু নেই। এঁরা দুজনে পরস্পরের প্রেমে পড়েছিলেন এমন গুজব কোথাও শোনা যায় নি। গল্পটা ঢের বেশী 'স্ট্রেইটফরওয়ার্ড'। হয়তো তাই এ ব্যাপারে কুরা অধিক স্বস্তি অনুভব করেন।

যাই হোক, কুরা ওকাম্পোর জীবনে রবীন্দ্রনাথের স্থানকে অস্বীকার করেন না। এমন কি এ কথাও মানেন:

> And when Victoria admired, her love came simultaneously. Yes, she loved. In the widest and most complete sense of the term.

তবে তিনি কেন ১৯৯১-এর নভেম্বরে ভারতে থাকাকালীন প্রেস সাক্ষাৎকারে এমন সব কথা বলেছিলেন, যাদের ফলে কাগজে বেরোলো : 'প্রেম থাকলে ছিলো রবীন্দ্রনাথের, ভিক্তোরিয়ার নয়', তা বোঝা গেলো না।

শ্রীমতী কুরার মূল পেপারটি ছিলো স্প্যানিশ ভাষায়। বইয়ে পেশ করা হয়েছে ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদে কিছু অর্থহানিকর ত্রুটি ঘটেছে। 'রবীন্দ্রনাথ পড়বার আনন্দ' প্রবন্ধনামটিতে pleasure শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও একই প্যারায় ভিক্তোরিয়ার জবানিতে এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে : 'I say happiness and not pleasure'। মূল 'আলেগ্রিয়া' শব্দটির অনুবাদে বাংলায় 'আনন্দ' আর ইংরেজীতে 'জয়' বা 'হ্যাপিনেস'ই সঙ্গত, 'প্লেজ়ার' যথাযথ নয়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অগাস্ট ১৯৪১-এ লেখা ভিক্তোরিয়ার প্রবন্ধটি আমি বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম। *জিজ্ঞাসা* পত্রিকাতেই প্রথম বেরিয়েছিলো সেটা, পরে *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে* বইটার অন্তর্ভুক্ত হয়। স্প্যানিশ থেকে বাংলায় সেই আমার প্রথম অনুবাদের চেষ্টা। হয়তো সে-কারণেই মূল প্রবন্ধের কবিতাধর্মী লাইনটা আমার মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে আছে :

Rabindranath Tagore ha muerto, en su India.

আমি বাংলা করেছিলাম : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেছেন, তাঁর ভারতবর্ষে।' এই পেপারে তর্জমা দেখছি :

Rabindranath Tagore is dead in his native country.

'has died' আর 'in his India' কেন অমনোনীত হলো বুঝতে পারছি না।

ছিন্নপত্র থেকে টুকরো পরিবেশনেও একটা দৃষ্টিকটু ভুল ঘটেছে, কিন্তু মারাত্মক ভুল ঘটেছে নেহরুর প্রতি ভিক্তোরিয়ার চিঠি থেকে উদ্ধৃতিতে। যা হওয়া উচিত your (আপনার), তা হয়ে গেছে his। স্প্যানিশে দুটোই su। অনুবাদক তফাৎ করতে পারেন নি। ফলে অর্থবিপর্যয় ঘটেছে— দু'-দুবার।

আনুষঙ্গিক অন্যান্য ভুলও আছে। ইংরেজী *চিত্রা*-কে শ্রীমতী কুরা বলেছেন 'আ ডান্স-ড্রামা'। কিন্তু ঐ *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য। ভিক্তোরিয়া থেকে উদ্ধৃতির অনুবাদে একই ভুল করা হয়েছে। ওখানে ভিক্তোরিয়া নিজে কিন্তু ভুল করেন নি। তিনি যেখানে লিখেছিলেন 'una breve y poética obra teatral', সেখানে লেখা হয়েছে 'a small and poetic dance-drama'। ভালো হতো 'a short and poetical work for the theatre'। যিনি ইংরেজী অনুবাদটা করেছেন তিনি ইংরেজীটাও ভালো লেখেন না, কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*-কেও চেনেন না।

§

ভিক্তোরিয়া আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটু ভিন্ন ধরনের একটি আলোচনা করেছেন শ্রীমতী মালবিকা ভট্টাচার্য। তাঁর পেপারের বিষয়বস্তু *জিজ্ঞাসা*-র পাঠকদের কাছে ঔৎসুক্যজনক হতে পারে, তাই একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করা যাক। তাঁর উত্থাপিত মূল প্রস্তাবটি হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ ভিক্তোরিয়াকে ঠিক বোঝেন নি : তাঁর আর্জেন্টাইন অনুপ্রেরণাদাত্রী তাঁর কাছে রহস্যময়ী বিদেশিনীই রয়ে গেছেন। কথাটা এক দিক দিয়ে সত্যিই, কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন শিল্পীকে যে অনুপ্রেরণা দেয় সে-মানুষ প্রায় সংজ্ঞা অনুসারেই রহস্যে ভরা, শিল্পীর স্বজাতীয় হলেও তার সত্তা চেনা-অচেনায় মেশানো এক এলাকা।

মালবিকার তর্কের বিভিন্ন লাইনগুলোকে কিছু দূর অনুধাবন করা যেতে পারে। তিনি প্রথমে তুলেছেন লাতিন-মার্কিন দুনিয়ায় আপন কাব্যের অভিঘাত সম্পর্কে কবির অজ্ঞতার প্রসঙ্গটি। এ নিয়ে অবাক হবার তেমন কিছু নেই বোধ হয়,— তিনি তো সত্যিই স্প্যানিশ জানতেন না। তা ছাড়া স্প্যানিশভাষী জগতে হিমেনেথ-দম্পতির অনুবাদগুলির তৎকালীন অভিঘাত যদিও তর্কাতীত, তবু এক অর্থে ঐ জগৎও অদ্যাবধি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় পায় নি। ঐ-সমস্ত অনুবাদই ইংরেজী থেকে করা, এবং কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে ইংরেজী রূপগুলি যে ঠিক মূলানুগ নয় সে-কথা তো আমরা জানি। কাজেই স্প্যানিশভাষী জগৎ আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার জগতের মধ্যে মেজাজ-মর্জির, মরমী অনুপ্রেরণার, চিত্রকল্প-প্রয়োগের কিছু কিছু সমধর্মিতার কারণে ঐ অনুবাদগুলির একটা প্রাথমিক অভিঘাত হয়ে থাকলেও পরে লাতিন-মার্কিন কবিরা দূরে স'রে গেছেন— মিস্ত্রালও, নেরুদাও ; বর্হেসও বাঁকা বাঁকা কথা বলেছেন। এই পেপার লেখার সময়ে মালবিকা আমার বইদুটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না ব'লেই মনে হয়, কিন্তু আমরা দুজনেই মেক্সিকান কবি অক্তাভিও পাস্‌-এর একই প্রবন্ধ থেকে লাতিন-মার্কিন দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে কিছু খবর সংগ্রহ করেছি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ যে এককালে হিস্পানিক জগতে 'কাল্ট ফিগার'-এ পরিণত হয়েছিলেন তা ঠিক, কিন্তু তবুও স্বীকার্য যে অক্তাভিও পাস্‌ও যদি বাংলা না জানেন তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।

মালবিকার তর্কের দ্বিতীয় লাইনটি এইরকম : ভিক্তোরিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন পাশ্চাত্য জগতের ব্যক্তি-মূর্তিরূপে ('পার্সনিফিকেশন অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড'), এবং পারস্পরিক আকর্ষণ সত্ত্বেও এই জিনিসটা তাঁদের মধ্যে একটা 'অদৃশ্য দেয়াল' রচনা করে, কেননা নানা কারণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইয়োরোপ এবং সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হতে আরম্ভ করে। তাঁর এই মনোভাব প্রথম পরিস্ফুট হয় *ন্যাশনালিজ্‌ম্‌*-বক্তৃতামালাতে। তার পর রাজদত্ত খেতাব ত্যাগ ক'রে তিনি যখন বৃটেনে আমেরিকায় শীতল সংবর্ধনা পান তখন তাঁর ঐ বিযুক্তিবোধ দৃঢ়তর হয়। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি বিশেষভাবেই পশ্চিম থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। এবং এই সূত্রেই, মালবিকার মতে, ঘটে একটা বোঝার বিপর্যয় :

রবীন্দ্রনাথ লাতিন আমেরিকাকে পশ্চিমের সঙ্গে এক ক'রে দেখেছিলেন এবং এখানেই তিনি ভুল করেছিলেন।

> But Tagore's mistake was in identifying Latin America with the West. Geographically Latin America is very much a part of the western hemisphere, but ideologically it was (and still is) very different. This vast continent comprising of Central and South America has nothing in common with North America or with Europe. Having been a victim of colonization, it is closer to Asia and Africa with whom it shares a common history of subjugation, exploitation and under-development. What Tagore failed to notice was that psychologically we Indians are not very different from the Latin Americans. Victoria Ocampo's anglicized and europeanized ways must have misled Tagore. Beneath this superficial veneer there must have existed within her the true Latin American spirit which so spontaneously responded to the spirituality in Tagore's poems. It is a pity that Tagore did not recognize Victoria's true inner self.

তর্কের এই লাইনে আমি অনেকগুলি অসুবিধা দেখতে পাই। এখানে তাদের আভাসমাত্র দিতে পারি, তবে সেটুকু দেওয়ার চেষ্টা করছি।

উত্তর আমেরিকা ও ইয়োরোপের থেকে লাতিন আমেরিকা নিশ্চয়ই ভিন্ন, কিন্তু ঐ দুই মহাদেশের সঙ্গে তার কিছুই 'ইন কমন' নেই, এ কথা বলা যায় কী ক'রে? স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজ 'বিজেতা'দের সূত্রে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার এক বিরাট উত্তরাধিকার স্থানীয় 'ইণ্ডিয়ান' সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক নতুন মিশ্র স্বাদের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। কোথাও কোথাও আফ্রিকা থেকে আগত উপাদানেরও একটা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। ইয়োরোপের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার যদি কিছুই 'ইন কমন' না থাকবে, তা হলে তাকে আদৌ 'লাতিন' বলা হচ্ছে কেন? স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজ ভাষাদুটিই তো এদের একটা বিশাল সাধারণ সম্পদ, যা এদের মধ্যে 'ইন কমন'। আর ইয়োরোপীয় উত্তরাধিকারের সূত্রেই, ইয়োরোপীয় জাতিদের উপনিবেশবিস্তারের ইতিহাসের সূত্রেই উত্তর আমেরিকার সঙ্গেও লাতিন আমেরিকার অনেক কিছুই 'ইন কমন' থাকছে। দুই অঞ্চলেই ইয়োরোপীয়রা বসতিস্থাপন করেছে, দুই অঞ্চলেই ঘটেছে ইণ্ডিয়ানদের উপরে অবিচার-অত্যাচার। দুই অঞ্চলেই অত্যাচারীদের বংশধররাও ঐ সভ্যতারই অন্তর্গত। দুই অঞ্চলেই রয়েছে রক্তে তথা সংস্কৃতিতে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আগত উপাদানের উপস্থিতি।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম ও লাতিন আমেরিকাকে একেবারে এক ক'রে দেখেছিলেন, অথবা ১৯২৪ সালে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিশেষভাবেই শ্রদ্ধাহীন ছিলেন, তাকে (মালবিকার ভাষায়) 'in the worst possible light' দেখেছিলেন, এ কথা ঠিক নয়। এ-সমস্ত বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ যে কতটা সূক্ষ্মদর্শী ছিলো তা বোঝা যায় যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি বুয়েনোস আইরেসে পৌঁছনোর অব্যবহিতপূর্বে আন্দেস্ জাহাজে

তাঁর ক্যাবিনে শয়ান অবস্থায় *নাসিয়ন* পত্রিকার এক বা একাধিক প্রতিনিধিকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের দিকে। কৌতূহলীরা এ বিষয়ে আমার রবীন্দ্র-ওকাম্পো-বিষয়ক ইংরেজী বইয়ের ৭৩-৭৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রতিবেদন প'ড়ে নিতে পারেন। তা ছাড়া পুরো সাক্ষাৎকারটাই আমি বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম উজ্জ্বল মজুমদার-সম্পাদিত *রাতের তারা দিনের রবি* সংকলনগ্রন্থটির জন্য।[২]

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে সমগ্রতঃ প্রত্যাখ্যান করেন নি, তার ভারসাম্যহীনতার সমালোচনা করেছিলেন। লাতিন আমেরিকাকেও তিনি পশ্চিমের সঙ্গে একেবারে এক ক'রে দেখেন নি, বরং আশা করেছিলেন যে লাতিন আমেরিকার নতুন দেশগুলি তাদের মিশ্র উত্তরাধিকারের জোরেই ইয়োরোপীয় সভ্যতার তৎকালীন ভারসাম্যহীনতাকে অতিক্রম করতে পারবে। তা ছাড়া ভিক্তোরিয়াকেও তিনি বৃহত্তর অর্থে পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যক্তি-মূর্তি হিসাবে দেখেন নি, দেখেছিলেন লাতিন আমেরিকার আত্মারই শরীরী রূপ হিসাবে। ভিক্তোরিয়াকে লেখা তাঁর ১৩ জানুয়ারি ১৯২৫ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য (আমার ইংরেজী বইয়ের ৩৯০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে)।

'লাতিন আমেরিকার আত্মার শরীরী রূপ' সেই তরুণী ছিলেন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে নিষ্ণাত বিদগ্ধ একটি মেয়ে। রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিকতায় তিনি সাড়া দিয়েছিলেন জ়িদ-এর ফরাসী অনুবাদ প'ড়ে! কেবল তাঁর চিত্তের লাতিন-মার্কিন দিকটাই যদি সে-আবেদনে সাড়া দিয়ে থাকবে, তা হলে এককালে ইয়েট্স্-পাউণ্ড-জ়িদ থেকে শুরু ক'রে ইয়োরোপ-আমেরিকার অনেকেই সে-আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন কেন তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার ধারণা এঁরা একটা বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিকতার সূত্রেই সাড়া দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ছুঁতে চেয়েছে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণবৃত্ত পরিচিতির ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবের মনের তারকে।

লাতিন-মার্কিনরা যে-পরিমাণে খৃষ্টীয় রোমান ক্যাথলিক ঐতিহ্যেব অন্তর্গত সেই পরিমাণেই ইয়োরোপীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সপ্তদশ শতকের মেক্সিকোর বিদুষী সন্ন্যাসিনী-কবি ভগিনী হুয়ানা ইনেস্ দে লা ক্রুথ কি ইয়োরোপীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত নন? হাজার হোক, অধিকাংশ স্প্যানিশভাষী লাতিন-মার্কিন পাঠক রবীন্দ্রনাথকে যে-টেক্স্‌টে জানলেন তা হচ্ছে হিমেনেথ-দম্পতির প্রস্তুত টেক্স্‌ট্। তার মধ্যে মিশে আছে স্পেনীয় আর উত্তর-মার্কিন দক্ষতা তথা ঐ দুই ভাবনাজগতের উত্তরাধিকার। এ প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসুরা দাশ ও গঙ্গোপাধ্যায়ের *শাশ্বত মৌচাক : রবীন্দ্রনাথ ও স্পেন* (প্যাপিরাস, ১৯৮৭) দেখে নিতে পারেন।

অর্থাৎ প্রেক্ষাপটটা এত জটিল যে কোনো সরলীকৃত সূত্রের সাহায্যে তাকে বোঝা যাবে না। ভিক্তোরিয়া নিজেই তাঁর ইয়োরোপীয় উত্তরাধিকার সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। কবির এবং তাঁর মধ্যে একটা টেনশনের সৃষ্টি হয় ঠিক এই কারণেই। লাতিন আমেরিকার নিজস্ব একটা পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ জানতেই চেয়েছিলেন। তিনি রওনা হয়েছিলেন পেরু যাবেন এই অভিপ্রায়েই। পেরুর সংস্কৃতিতে 'ইণ্ডিয়ান' উপাদান প্রবল।

ঘটনাচক্রে তাঁকে পেরুর বদলে সময় কাটাতে হলো আর্জেন্টিনায়, যেখানকার শিক্ষিত সমাজের কাল্চারে তুলনামূলকভাবে ইয়োরোপীয় উপাদানের প্রাধান্যই লক্ষণীয়। আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ের কাল্চারের মধ্যেও লাতিন-মার্কিনতার যে-নিজস্ব স্বাদ আছে তার একটা পরিচয় রবীন্দ্রনাথ বরং পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক হাডসনের রচনার মাধ্যমেই। এই অঞ্চলের ইতিহাসের কাহিনীকার হিসাবে হাডসন মোটেই ফ্যালনা লেখক নন। রবীন্দ্রনাথের যে হাডসন পড়া আছে, তিনি যে আর্জেন্টিনার পরিচয় পেয়েছেন হাডসনেরই লেখা থেকে, এই কথাটি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত *নাসিয়ন* কাগজের প্রতিবেদনে গুরুত্ব সহকারেই ছাপা হয়েছিলো। কিন্তু বুয়েনোস আইরেসের চারপাশে হাডসন-বর্ণিত জগৎটাকে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান নি, কারণ রাজধানীর মধ্যে এবং তার সংলগ্ন এলাকায় সেই দুনিয়াটা তখন লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। বিশের দশকের বুয়েনোস আইরেস ছিলো আধুনিক বিশ্বনাগরিকতার লক্ষণগুলি দ্বারা প্রবলভাবেই আক্রান্ত। সেই শহরটার মেজাজ, তার সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, ইয়োরোপের সঙ্গে তার দৃঢ় বন্ধনগুলি : এগুলি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে আমার ইংরেজী বইটার ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায়। ভিক্তোরিয়া চেয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক বুয়েনোস আইরেসের কাল্চারকে জানুন।

ভিক্তোরিয়ার জবানবন্দির জন্য মালবিকা নির্ভর করেছেন তাঁর দীর্ঘ ইংরেজী প্রবন্ধটির উপরে ('টাগোর অন দ্য ব্যাংক্স্ অফ দ্য রিভার প্লেইট')। কিন্তু রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিল্লী থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই লেখাটি ভিক্তোরিয়ার অভিপ্রেত বক্তব্যের পূর্ণ রূপ বহন করে না। তার জন্য আমাদের যেতে হবে তাঁর স্প্যানিশ টেক্সটের দিকে, তাঁর বই *তাগোর এন্ লাস্ বার্রাংকাস্ দে সান ইসিদ্রো*-র কাছে। ইংরেজী পাঠ আর স্প্যানিশ পাঠ সমান্তরাল নয়। ইংরেজী প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ততর। স্প্যানিশ বইটিই পূর্ণতর। মালবিকাকে অনুরোধ করবো এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়টি ('এল্ সলিতারিও দে পুন্তা চিকা') একটু দেখে নিতে। বিশেষভাবে একটি অংশের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি— যেটি বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে পড়ছে ৬৯-৭০ পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথ রোম্যাঁ রলাঁর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে লিখেছিলেন যে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে তাকিয়ে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। সেখানে লোকেরা হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের আত্মাকে আবিষ্কার করবার সময় ক'রে উঠতে পারে নি তখনও। দেখে দুঃখ হয় যে তাদের চিন্তাভাবনার জন্য তারা সম্পূর্ণভাবেই ইয়োরোপের উপর নির্ভরশীল। ভাবনাগুলো তাদের কাছে আসে একেবারে তৈরি হয়েই। যে-কোনো স্টাইল নকল ক'রেই, ইয়োরোপ থেকে সংস্কৃতি খরিদ ক'রেই ওরা গর্ব অনুভব করে। এর জন্য ওরা লজ্জিত নয়। ক্ষুব্ধ ভিক্তোরিয়া শুধান— তাঁর মূল স্প্যানিশ থেকে সরাসরি অনুবাদ করছি—

> কিন্তু আর কোথা থেকেই বা আমাদের সংস্কৃতিকে খরিদ করবো আমরা, যদি তা না করি সেই-সব দেশ থেকে, যেখান থেকে আমরা এসেছি, যেখানকার আমরা সন্তান এবং আবশ্যিকভাবেই উত্তরাধিকারী? ইয়োরোপের সংস্কৃতি কি

> আমাদেরও নয় ? আমরা কি নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি কিচুয়া, গুয়ারানি অথবা কোমেচিন্‌গন ইণ্ডিয়ানদের সংস্কৃতির মধ্যে ? আমেরিকার দেশগুলিতে এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কী বস্তু জন্ম নেবে তা ভাবী কালই বলবে। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত গোটা আমেরিকা নিজেকে অস্বীকার না ক'রে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ইংল্যাণ্ডের মুখোমুখি ভারতের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন।

অর্থাৎ তাঁর আত্মপরিচয়ের মধ্যে ইয়োরোপীয় উত্তরাধিকার এক বিরাট স্থানই অধিকার ক'রে আছে। অপিচ এটা তাঁর অপরিণত বয়সের চিন্তা নয়, ৬৮ বছর বয়সের অভিমতই বটে। বিষয়টা আমার পূর্বোল্লিখিত ইংরেজী বইয়ের ১৮৫-১৮৭ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষের *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ*-এর প্রাসঙ্গিক অংশগুলিও দ্রষ্টব্য।

এই সমস্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, 'কঙ্কাল' কবিতাটির অনুবাদের কাহিনীর মধ্যে মালবিকা তাঁর প্রস্তাবের জন্য যেভাবে সমর্থন খুঁজেছেন তার মধ্যে আমি নানা অসুবিধা দেখতে পাই। রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার ভাববিনিময়ের পথে বাধা যথেষ্টই ছিলো : ঐটুকু সময়ের মধ্যে পরস্পরকে বুঝে নেওয়া তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই সহজ ছিলো না। কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই বেশী দোষী করা যায় না। ১৯২৪-এ প্রবীণ রবীন্দ্রনাথই গভীরতর অর্থে বিশ্বপর্যটক, বিশ্বভাবুক। কেবল ইয়োরোপ-আমেরিকার নয়, জাপান-চীনের অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়ে গেছে। ওদিকে ভারত সম্বন্ধে ভিক্তোরিয়ার জ্ঞান তখন (এবং পরেও) মুখ্যতঃ বই থেকে গৃহীত, বাকিটা আহৃত ব্যক্তিগত মিথস্ক্রিয়া থেকে। ভারতের মাটিতে তিনি কখনো পা-ই দিলেন না সারা জীবনে।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'কঙ্কাল'-এর ইংরেজী অনুবাদটা মোটেও ততটা খারাপ নয়। আমার ধারণা এটা ভিক্তোরিয়ার সমালোচনার পর কবি-কর্তৃক সংশোধিত রূপই বটে। এ বিষয়ে আমার বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে আমার ইংরেজী বইটার ১৬২-১৬৬ পৃষ্ঠায়। আলোচ্য প্রসঙ্গে ভিক্তোরিয়ার সর্বপ্রথম প্রতিবেদন প্রাপ্তব্য তাঁর ১৯২৫-এর রচনা 'আল্‌গো সোব্রে রবীন্দ্রনাথ তাগোর'-এ। 'কঙ্কাল'-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদনটির গুরুত্বের প্রতি আমিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ঠিকই, এই কবিতার একটা অংশের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ একটু সংক্ষেপে সেরেছেন, কিন্তু মালবিকা যেমন বলছেন ততটা সংক্ষেপে নয়। মূল বাংলা লাইনগুলির পাশাপাশি ইংরেজী লাইনগুলি ঈষৎ সংক্ষিপ্ততর, কিন্তু শোচনীয়ভাবে নৈরাশ্যজনক বলতে পারি না তাদের। নৃত্যের ইমেজটি বাদ পড়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু কবির মনের নৃত্যের মধ্যে ('আমার মনের নৃত্য...') ঐ মুহূর্তে শিবের মহাজাগতিক নৃত্যকে দেখতেই হবে কি, যেমন ইঙ্গিত করেছেন মালবিকা ? এই একটি নৃত্য-উল্লেখের মধ্যে 'লাইটমোটিফ অফ দ্য কস্‌মিক ডান্স' (মালবিকা যেমন বলেছেন) কিভাবে পাওয়া যায় ? 'লাইটমোটিফ' পাশ্চাত্য

সংগীতের একটি টেকনিকাল শব্দ : তার মধ্যে পুনরাবৃত্তির ধারণাটি রয়েছে। যতদূর বুঝি, পুনরাবৃত্তি ব্যতীত 'লাইটমোটিফ' হয় না। তাই হিন্দু পুরাণের ভাবানুষঙ্গের কারণেই রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের ছবিটা বাদ দিয়েছেন, বা সামগ্রিকভাবে কবিতাটির অনুবাদে তিনি 'যাবতীয় দার্শনিক চিত্রকল্পকে নির্মমভাবে সরিয়ে ফেলেছেন' (মালবিকার মন্তব্য)— এমন কথা বলা যায় না। বরং মানতেই হবে যে অনুবাদেও কবিতাটি প্রবলভাবেই দার্শনিক। এবং এই কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতার কোনো বিরোধও নেই। খৃষ্টধর্মও মৃত্যুকেই পরিসমাপ্তি ব'লে স্বীকার করে না। খৃষ্টানও অমৃতপিয়াসী, স্বর্গরাজ্যের অভিযাত্রী। *গীতাঞ্জলি*-সমেত কবিকৃত সব আত্ম-অনুবাদই ওরকম সারাংশ-ঘেঁষা। পাশ্চাত্য জগতে তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির অভিঘাত ঐ ধরনের সারাংশ-অনুবাদের মাধ্যমেই হয়েছিলো। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদের রীতিকে খুব একটা আলাদা বলা যায় না। প্রসঙ্গতঃ বলি যে এই 'কঙ্কাল' কবিতাটিরও একটি অনুবাদ আমি করেছি: কৌতূহলীরা সেটি আমার সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্র-অনুবাদ সংকলনে পেয়ে যাবেন।

এর পর মালবিকা এনেছেন বোদলেয়র-প্রসঙ্গ। ভিক্তোরিয়া যে বোদলেয়রের কোনো দার্শনিক তত্ত্ব ('দ্য ফিলজফি অফ দ্য ফ্রেঞ্চ পোয়েট') রবীন্দ্রনাথকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন তা তো আমরা জানি না। আমরা কেবল জানি যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বোদলেয়রের কবিতা পড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। এবং আমাদের কারও কারও ধারণা, 'কঙ্কাল' কবিতাটির পিছনে বোদলেয়রের 'Une Charogne' কবিতাটির একটি প্রচ্ছন্ন ভূমিকা আছে।

তখন অথবা তার পরে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রয়োজনবোধে পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি, তেমনি এও তো অনস্বীকার্য যে তার মধ্যে যা-কিছুকে তিনি মনে করেছেন ভালো বা বড়, তার প্রতি তিনি বরাবর উন্মুক্ত থেকেছেন। ১৯২৪-এর পরেও তিনি দু'-দুবার ইয়োরোপে ভ্রমণ করেছেন, অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালা দিয়েছেন, নিজের আঁকা ছবি নিয়ে ঘুরেছেন প্যারিস-বার্লিন থেকে মস্কো-নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত। পশ্চিমের ভালোবাসা ও সমাদরকে তিনি কখনোই তুচ্ছ মনে করেন নি। এমন কি, এও বলেছেন, তাঁর ছবি দেশের লোকেরা বুঝবে না, পশ্চিমের লোকেরাই বেশী ভালো বুঝবে। বিশ্বভারতী হোক পুব আর পশ্চিমের মিলনের আঙিনা, এটাই ছিলো তাঁর কাম্য। পশ্চিমের রাজনীতি সম্পর্কে তিনি নির্মোহ হয়েছিলেন,— বেঁচে থাকলে স্বাধীন ভারতের রাজনীতির নানা দিক সম্পর্কেও কি নির্মোহ হতেন না?— কিন্তু পাশ্চাত্য বন্ধুদের তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করেন নি। রোটেনস্টাইনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিয়েছিলেন, এল্‌ম্‌হার্স্ট শেষ অবধি তাঁর সুহৃদ ছিলেন। কাজেই আর্জেন্টিনার মেয়েটির সঙ্গে লেনদেনে পশ্চিমবিমুখতা যে একটা বড় অন্তরায় হয়ে উঠেছিলো তা আমার মনে হয় না। কতবারই তো তিনি ভিক্তোরিয়াকে শান্তিনিকেতনে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছেন। ভিক্তোরিয়াই গিয়ে উঠতে পারেন নি।

আর পাশ্চাত্য পালিশের নীচে ভিক্তোরিয়ার প্রকৃত লাতিন-মার্কিন সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ সনাক্ত করতে পারেন নি এই অবস্থানটা রাখা যায় না এই কারণে যে স্বয়ং ভিক্তোরিয়া বার-বার নিজেকে 'পাশ্চাত্য' ব'লে চিহ্নিত করেছেন, তাঁর 'পাশ্চাত্য-তা' আর 'লাতিন-মার্কিন-তা'র মধ্যে কোনো বিরোধ তিনি দেখেন নি। তাঁর রবীন্দ্রবিষয়ক বইটির শেষে তিনি অদ্ব্যর্থক ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে 'পাশ্চাত্য ও মার্কিন' ('occidental y americana') হয়েও রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীর মতো মানুষদের কাছে তিনি ঋণী। আসলে বিশ্বনাগরিকতার একটা উদার আদর্শই রবীন্দ্রনাথ, ভিক্তোরিয়া আর এল্‌ম্‌হার্স্টের বন্ধুত্বের প্রকৃত প্রেক্ষাপট ও স্থিতিমাপ।

অসুবিধা কিছু ছিলো বৈকি, কিন্তু আমার ধারণা সেগুলো অন্য গোত্রের— ব্যক্তিগত, ইডিওলজিগত নয়। এ ব্যাপারে আমি বেশী গুরুত্ব দেবো রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার মধ্যবর্তী ভৌগোলিক ও প্রজন্মগত ব্যবধানকে, স্ত্রীপুরুষঘটিত মিথস্ক্রিয়ার আবশ্যিক জটিলতাকে। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে কবি-শিল্পী। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো নামে মেয়েটি যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন সেই কবি-শিল্পীর কাছে এইটেই বড় কথা নয় যে মেয়েটি পাশ্চাত্য অথবা লাতিন-মার্কিন। তাঁর কাছে ভিক্তোরিয়ার সব থেকে বড় পরিচয় এই যে তিনি কবির গুণমুগ্ধ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একজন নারী। তিনি যে নারী এইটেই কবির কাছে তাঁর সর্বাগ্রগণ্য পরিচয়। 'প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী'— ভিক্তোরিয়ার প্রতি কবিহৃদয়ের এটাই প্রথম উচ্চারণ। সেই নারীর সেবাব্যাকুলতার মধ্যে, হৃদয়ের ভাব নিবেদনের মধ্যে ছিলো একটা সংরক্ত তীব্রতা, একটা দুর্বার প্রাবল্য। সেটাই ছিলো তাঁর স্বভাব। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাধ্য কি অনুপ্রেরণার উৎস এই অযাচিত উপহারকে উপেক্ষা করেন? তা হলে যে তাঁর শিল্পী-অস্তিত্বের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। সাড়া তিনি দিলেন। এর পর সেই মেয়েটিরই বা সাধ্য কি রবীন্দ্রনাথের মতো একজন দীপ্ত ব্যক্তিত্বের পুরুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে সাড়া না দিয়ে থাকেন? তিনিও দ্বিগুণ আবেগের সঙ্গে কবির মনের দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন। সমস্ত সাক্ষ্য এই কথাই বলে। আর এতে অবাক হবার কিছুই নেই। স্ত্রীপুরুষের বিনিময় তো হামেশাই এই পথ ধ'রে এগোয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে সময় ছিলো কম, খুব কম। ভিক্তোরিয়ার ব্যক্তিগত জীবনে জটিলতা ছিলো, ছিলো মার্তিনেসের সঙ্গে একটা বাঁধন। ১৯২৬-এ ইয়োরোপে তিনি আসতে পারলেন না। ইতালীয় ভিলার প্ল্যানটা গেলো ভেস্তে। (রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পশ্চিমবৈমুখ্য যদি প্রবল হয়ে থাকবে, তবে ভিক্তোরিয়ার সঙ্গে ইতালীয় ভিলাতে মিলিত হবার পরিকল্পনাটা কেন করেছিলেন?) ভিক্তোরিয়া শান্তিনিকেতনেও এলেন না, বছরগুলিকে চ'লে যেতে দিলেন, জড়িয়ে পড়লেন কর্মজীবনের তথা প্রণয়জীবনের উত্তরোত্তর বর্ধিত জটাজালে। এই সমস্ত কারণে দৈনন্দিন বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের বন্ধুত্বটা পূর্ণতর হয়ে উঠবার সুযোগ পেলো না। কিন্তু দূর থেকে হলেও তাঁরা যে-যার কাজের মধ্যে সম্পর্কটাকে একটা রূপ দিতে পেরেছিলেন, এইখানেই তাঁদের জিৎ। আশ্বস্ত

হই এই দেখে যে এই ব্যাপারটা মালবিকা অস্বীকার করেন না। তাঁর পেপারের শেষ অংশে সেটা স্পষ্ট।

§

শ্রীমতী সোনিয়া সুরভি গুপ্তর পেপারটির মূল প্রসঙ্গটি ঔৎসুক্যজনক— স্পেনীয় লেখক আয়ালা-র সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার বন্ধুত্ব। কিন্তু আমার বেশ খটকা লেগেছে একটা জিনিস দেখে। পেপারের গোড়াতেই কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কারকে তিনি মেনে নিয়েছেন 'মানবেতিহাসের মহত্তম ঘটনা' ব'লে। এটা অন্য একজনের অভিমত, কিন্তু এটাকে তিনি মেনে নিয়েছেন, এবং কারণ দেখিয়েছেন এইভাবে: '১৪৯২ সালে আরম্ভ হয় এক নূতন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা গোটা মহাদেশ আর তার অধিবাসীদের ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যদের অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া'। সে-ক্ষেত্রে মহাদেশের আদিবাসীদের কাছেও এটা 'মানবেতিহাসের মহত্তম ঘটনা' হতে পারে কি?

এই পেপারে ভিলা ওকাম্পোকে বার-তিনেক 'ফার্ম-হাউস' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বর্ণনা যথাযথ নয়। ভিলা ওকাম্পো একটি অভিজাত প্রাসাদোপম সৌধ, 'ফার্ম-হাউস' বলতে ইংরেজীতে যা বোঝায় তা নয়। বোধ করি লেখিকা ভেবেছেন 'এস্তান্সিয়া'র কথা। কিন্তু ভিলা ওকাম্পো প্রকৃত দক্ষিণ-মার্কিন অর্থে এস্তান্সিয়াও নয়। খাঁটি এস্তান্সিয়া ছিলো ভিক্তোরিয়ার ঠাকুর্দার। ভিলা ওকাম্পো 'ফরাসী-ভিক্টোরীয়' আদলের বুর্জোয়া স্থাপত্য।

পেরুর কবি-সমালোচক খাভিয়ের সোলোগুরেন-এর (Javier Sologuren) পেপারটিতে ভিক্তোরিয়ার রচনাশৈলী সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক ও রসগ্রাহী মন্তব্য আছে, যেগুলির সঙ্গে আমি একমত। ভিক্তোরিয়া সম্বন্ধে এই ধরনের আলোচনা আরও বেশী থাকলে বইটি আরও চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান হতো।

আর্জেন্টিনার ফের্নান্দো সাঞ্চেস্ সরোন্দো-র (Fernando Sánchez Sorondo) পেপারটিতে দু'-একটি জিনিস বুঝলাম না।

> It was [*sic*] not Tagore alone to whom we ought to pay our homage as a proof of the East's enlightening gift to Victoria; Keisserling [*sic*] and other illustrious people also touched our soil to be with her in her San Isidro house.

ব্যাকরণ ও বানানের বিপর্যয়ের জন্য কে দায়ী, লেখক না তাঁর কোনো অনুবাদক, তা জানি না, কিন্তু এই বাক্যের যুক্তি আমাকে এড়িয়ে যায়। কাইজারলিংকে কি প্রাচ্য দুনিয়ার লোক বলা যায়?

ইনি আরও বলেন যে সাম্প্রতিক কালের দুটি ঘটনা ভিক্টোরিয়াকে আনন্দ দিতো: বার্লিনের প্রাচীরের পতন এবং আমেরিকা আবিষ্কারের পঞ্চশতবার্ষিকী। আর্জেন্টিনায় সামরিক শাসনের অবসানকে এই তালিকায় না দেখে বিস্মিত বোধ করছি। 'আমেরিকা আবিষ্কার' শব্দদুটি জানান দেয় যে তিনি ইয়োরোপের দৃষ্টিভঙ্গিটাই ব্যবহার করছেন, দিশি ইণ্ডিয়ানদের পরিপ্রেক্ষিতটা নিচ্ছেন না। অর্থাৎ এঁর দক্ষিণ-মার্কিন চেতনাও প্রবলভাবেই ইয়োরোপ-মুখো।

দুর্গা শিরালির ('সিরালি' ? রোমান হরফে Shirali) পেপারটিতে একটি ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছে। ইনি যদিও কোথাও আমার নাম উল্লেখ করেন নি, তবুও এঁর ভাষা কখনও কখনও আমার ভাষার প্রতিধ্বনি করে। দু'-একটি দৃষ্টান্তকে বাদ দিচ্ছি, কেননা সেগুলি হয়তো ঘটেছে আমরা দুজনেই একই উৎস ব্যবহার করেছি ব'লে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আমরা দুজনেই *তেস্তিমোনিয়োস্* সপ্তম খণ্ডের 'আন্তিমেমোরিয়াস্' নামক প্রবন্ধ থেকে উপাদান সংগ্রহ করার ফলে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু ভাষাগত সাদৃশ্য ঘটেছে। তফাৎ এই যে আমি সূত্রোল্লেখ করেছি, ইনি করেন নি। বস্তুতঃ এঁর প্রবন্ধের শেষে কোনো উল্লেখতালিকাই নেই। কিন্তু সে-কথা থাক।

তবে ইনি যখন লেখেন: 'Ocampo's pet definition of love as hunger for unity...', তখন কি তিনি আমার বইয়ের এই অংশের প্রতিধ্বনি করছেন না— '... *hunger for unity*, which was Ocampo's pet definition of love...' (*ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন*, পৃঃ ২৪৯)? কেবল যে ঐ 'পেট্ ডেফিনিশন অফ লাভ্' শব্দগুলির মধ্যে আমার নিজের শব্দপছন্দের টিপছাপকে সনাক্ত করতে পারছি তাই নয়, ভিক্টোরিয়াকে ঐ মুহূর্তে কেবল পদবী দ্বারা চিহ্নিত করার ব্যাপারেও তিনি সম্ভবতঃ আমার ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কেননা আমি নিজে যদিও হামেশাই ওরকম ক'রে থাকি, দুর্গা কিন্তু তাঁর সমগ্র পেপারে মাত্র আরেকবারই এ কাজ করেছেন! তিনি সাধারণতঃ লেখেন হয় পুরো নামটা, নয় কেবল প্রথম নামটা; একবার 'মাদাম ভিক্টোরিয়া' ব'লে সম্বোধনও করেছেন ভিক্টোরিয়াকে। আমার বইকে কোথাও স্বীকার না করলেও আমার ভাষার দ্বারা তিনি যদি সম্মোহিত হয়ে থাকেন তা হলে আমার বোধ হয় খুশী হওয়াই উচিত, কিন্তু উদ্বেগ বোধ করি যখন দেখি যে এই সম্মোহন তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে বিপদের দিকে। *সুর* পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তা হচ্ছে: 'a paradigm of Vishwabharati— the Universal University founded much earlier by Tagore. The cosmopolitan ideals of Vishwabharati in a way fit in with the objectives of *Sur*,...'। এই ভাষাব্যবহারে তিনি সম্ভবতঃ অনুপ্রাণিত হয়েছেন আমার বইয়ের কিছু কিছু উক্তি দ্বারা:

> ... it was Ortega who chose for it the name *Sur* ..., but what is perhaps not apparent to Western scholars is that Ocampo may also have been influenced to some degree by the cosmopolitan ideals of Tagore's university, 'where the world becomes one nest'... (p. 32)

> ... *Sur* paralleled the cosmopolitan cultural ideals of Visvabharati. (pp. 345-346)
>
> ... Visvabharati played the role of a distant paradigm for *Sur*. (p. 347)

আমার ধারণা *সুর* আর বিশ্বভারতীর মধ্যে এ ধরনের তুলনা আমিই প্রথম করেছি, কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুর্গা বোঝেন নি 'প্যারাডাইম' শব্দটার যথাযথ অর্থ ও প্রয়োগ। বিশ্বভারতী আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, *সুর* তার পরে। অতএব *সুর* বিশ্বভারতীর 'প্যারাডাইম' হতে পারে না, বিশ্বভারতীই *সুর*-এর 'প্যারাডাইম' হতে পারে। ভুল আমাদের সকলেরই হতে পারে, কিন্তু একটা সেমিনারের পেপার যখন পঠিত-আলোচিত-সম্পাদিত হয়ে অবশেষে ছাপাখানায় পৌঁছয়, তখন তো তার অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাবার কথা : এই ভুল যে কোনো পর্যায়েই কারও চোখে পড়ে নি সেটাই বিস্ময়কর।

এই লেখিকার সর্বশেষ বক্তব্যটি অভিনব। নারীর অধিকার বিষয়ে ভিক্তোরিয়ার সংগ্রামকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়ে তার পর তিনি ভারতে মেয়েদের গৌরবময় ভূমিকার একটি স্তবগান করেছেন। এটি থেকে মনে হয় যে বৈদিক আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সব সময়েই নারীপুরুষসাম্যই ভারতের নিত্য প্রথা। ভারতের মেয়েদের স্পষ্টতঃই কোনো সংগ্রাম করতে হয় নি, হচ্ছে না, কেননা—

> She is the central figure of the home, the lamp of auspiciousness for the society, the dexterous mother of the future architects of the nation. The attribute of mother to the woman is the corner stone of the attitude towards her.

এই অবস্থান 'ডিভাইন মাদার শ্রী রমাদেবী' থেকে একটি উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এই অংশে লেখিকার চিন্তা তথা ভাষা আমার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

§

ওকাম্পো-সেমিনারের অন্যতম আহ্বায়ক জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন অধ্যাপকের পেপার এই সংকলনে জায়গা পেয়েছে। প্রত্যেকটির মেজাজ স্বতন্ত্র। অধ্যাপক আর. নারায়ণনের পেপারটি এই সংকলনের অন্য সব পেপারের থেকে স্বতন্ত্র এই অর্থে যে এটির মধ্যে ভিক্তোরিয়ার প্রতি সশ্রদ্ধ গুণগ্রাহিতার মেজাজটি স্ফুরিত হয়ে ওঠে নি। গোড়াতেই ভিক্তোরিয়ার 'সৃজনশীল অবদানগুলি'র প্রতি একটা মামুলী মাথা-নাড়া স্বীকৃতি তিনি জানিয়ে রেখেছেন বটে, কিন্তু তার পর থেকে *সুর* পত্রিকার উদারপন্থী পরিচালিকার প্রতি এবং ঐ পত্রিকার কৃতিত্ব বিষয়ে লেখকের কড়া সমালোচনার মনোভাবটাই প্রকট হয়ে

উঠেছে। পেপারের শেষের দিকে কতগুলি দ্ব্যর্থক আলংকারিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি সত্ত্বেও এটা বেশ বোঝা যায় যে ভিক্তোরিয়ার স্যুর-মাধ্যমিক কৃতিত্বকে ইনি ততটা মূল্য দেন না। ভিক্তোরিয়ারই জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় এই বিবাদী স্যুর বিসদৃশ ঠেকেছিলো কিনা জানি না, তবে দেখতে পাচ্ছি অপর এক অধ্যাপক এ ব্যাপারে ভিক্তোরিয়ার পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করেছেন।

নারায়ণন্ যে-বিষয়ে লিখেছেন সে-বিষয়ে আমার সাধ্যানুযায়ী আমি আলোচনা করেছি আমার ইংরেজী বইটার ৩১-৩৭ পৃষ্ঠায়। প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা সম্পর্কে তিনি স্পষ্টতঃই যথেষ্টই ওয়াকিবহাল, কিন্তু সেই বায়ুমণ্ডলের শিবিরবিভাজিত পরস্পরবিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে ভিক্তোরিয়ার জীবনের সংগ্রামকে যে বোঝা যায় এমন আমি মনে করি না। স্যুর পত্রিকা যে ডান-বাঁ দু' দিকেরই চরমপন্থীদের দ্বারা হিংস্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে তা ইতিহাস। যে-মূল্যগ্রামের প্রতি আনুগত্যে ভিক্তোরিয়া লোকসান স্বীকার ক'রেও বছরের পর বছর তাঁর পত্রিকাটি চালিয়ে গেছেন, তার প্রতি নারায়ণনের বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভিক্তোরিয়া-কর্তৃক মিত্রপক্ষ সমর্থন সম্পর্কে তিনি লেখেন:

> So strident was Ocampo's view in support of the Allies [*sic*, Allied?] cause that the British Foreign Office in a dispatch dated 13 December 1945 described her as an important political figure who can be used for British war propaganda efforts. In the dispatch it stated:
>
> The Braden campaign can resolve itself into an attempt to unite against Perón the estanciero class, who have much to lose, and intellectual Radicals (especially the rich ones like Victoria Ocampo) whose leftist tendencies unite with their life of ease in their desire to keep out fascism.
>
> FORJA [Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina] critics of Ocampo such as importantly Arturo Jauretche therefore have argued that Ocampo's *Sur* was the "cultural handmaiden" of the dominant economic class and that its European "orientation" was not to be treated in purely "universalist" literary terms. It certainly had a political mission and message to offer during the war years.

ভিক্তোরিয়া ফ্যাশিস্ট ছিলেন এইরকম একটা অভিযোগ কলকাতার কোনো মহলে একবার তোলা হয়েছিলো। দেখা যাচ্ছে ফ্যাশিজ্‌ম্-বিরোধী হয়েও মহিলাটির নিস্তার নেই! তাঁর ফ্যাশিজ্‌ম্-বিরোধিতার জন্যই এখানে তাঁকে বিদ্রূপাত্মক 'স্ট্রাইডেন্ট' বিশেষণে ভূষিত করা হলো। দলীয় মনোবৃত্তি যখন এই রূপ নেয় তখন তার সঙ্গে তর্ক বেশী দূর এগোয় না। এই

জাতীয় যুক্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথের খেতাব-ত্যাগ বা বিশ্বভারতী-পত্তনকেও শ্রেণীস্বার্থপোষণ ব'লে নস্যাৎ ক'রে দেওয়া যায়। যে-কোনো সরকারের বৈদেশিক দপ্তরই আপন শক্তিকে সংঘবদ্ধ করবার জন্য এবং শত্রুপক্ষকে প্যাঁচে ফেলবার জন্য গোপন ফাইলে মন্ত্রণা করতে পারে, কিন্তু সেই দলিল অথবা তারই প্রতিক্রিয়া থেকে জাত সমানভাবে দলীয় অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি কি কোনো শ্রদ্ধেয় মানুষের জীবনকর্মের মূল্যায়নের মানদণ্ড হতে পারে? পৃথিবীর রাজধানীগুলিতে আমাদের কার কার উপরে কী কী গুপ্ত ফাইল জড়ো হচ্ছে আমরা তার কী জানি, সে-বিষয়ে কী-ই বা করতে পারি?

বৃটিশ বৈদেশিক দপ্তরের দলিলটিতে ভিক্তোরিয়াকে দেখা হয়েছে একজন বৌদ্ধিক র‍্যাডিকাল হিসাবে, যিনি আবার ধনীও বটে— যিনি এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ, যাঁদের মধ্যে বামপন্থা-প্রবণতা আয়েসী জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁদের ফ্যাশিজ্‌ম্‌-বিরোধী ক'রে তোলে! তিনি বৌদ্ধিক র‍্যাডিকাল, ধনী, বামপন্থা-প্রবণ, ফ্যাশিজ্‌ম্‌-বিরোধী— সবই। কূটনীতিজ্ঞদের উপযুক্ত বিশ্লেষণ বটে, কিন্তু বৌদ্ধিক র‍্যাডিকালদের বামপন্থা-প্রবণতা এবং তাঁদের আরামের জীবন থেকে প্রসূত ফ্যাশিজ্‌ম্‌-বিরোধিতা যদি হারাম হয়, তবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীরাই কি পার পাবেন? নির্মাণ-ভাঙন (ডি-কনস্ট্রাক্‌শন) প্রায়শঃ এমন এক স্পোর্ট যেখানে খেলোয়াড়দের নিজেদের অবস্থানটা যে কোথায় তা বোধগম্য হয় না।

নারায়ণনের পেপারটির প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। *সুর* পত্রিকার সঙ্গে আর্জেন্টাইন সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে খুঁটিয়ে গবেষণা ক'রে অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট পেয়েছিলেন জন কিং। তাঁর থিসিসটি আমি যত্ন ক'রে পড়েছিলাম এবং সেখান থেকে সংগৃহীত কিছু উপাদান আমার ইংরেজী বইটাতে ব্যবহারও করেছিলাম। তিনি তার পর ওয়ারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে যান এবং তাঁর থিসিস-ভিত্তিক বইটি ১৯৮৬ সালে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বার হয়। নারায়ণনের উল্লেখপঞ্জীতে কোথাও কিং-এর কোনো কাজের নাম কিন্তু দেখতে পেলাম না। *সুর*-এর ইতিহাস যিনি বিবেচনা করছেন কিং-এর বইটি তাঁর দেখে নেওয়া উচিত ছিলো। এইখানে তাঁর বিবলিওগ্রাফিতে উল্লেখযোগ্য ফাঁক থেকে গেছে। এ কি ইচ্ছাকৃত, না অজ্ঞতাপ্রসূত? অথচ খটকা লাগছে তাঁর পেপারের এই জায়গাটা প'ড়ে:

> With the flow of articles from Europe declining because of the war, *Sur* during these critical years practised what may be described as "cultural import substitution". More Argentine intellectuals admittedly figured in the columns of *Sur* along with the members of the Spanish and French literary community in exile.

এখানে কিং-এর কথার প্রতিধ্বনি কর্ণগোচর হচ্ছে যেন। আমার নিজের বইটার ৩৩ পৃষ্ঠায় কিং-এর থিসিস থেকে এইরকম উদ্ধৃতি আছে:

> ... the war interrupted the flow of contributions from Europe and caused a situation which might be described, in the language of economists, as cultural import-substitution. These were the years in which Borges emerged as the finest prose writer in Argentina:...

কিং এই থিসিস ১৯৮২ সালের শেষের দিকে জমা দিয়েছিলেন। নারায়ণন্ কাউকেই কোনো স্বীকৃতি দেন নি। সূত্রের অভাবে বুঝতে পারছি না তিনি আর কিং দুজনেই অপর কোনো বিশ্লেষকের কাছে ঋণী কিনা।

§

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক অধ্যাপক অপরাজিত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পেপারটি শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষের *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ* এবং আমার *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে* এই দুটি বইকে নিয়ে। শিরোনাম জানাচ্ছে যে এই দুটি বইয়ের 'ক্রিটিকাল অ্যাসেসমেন্ট'ই এই পেপারের লক্ষ্য, এবং পেপারের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে বইদুটির 'অ্যানালিটিকাল স্টাডি'ই তার অভিপ্রেত। স্বতঃই কৌতূহল জেগেছে মনে, কিন্তু বিষণ্ণ হয়েছি যখন দ্বিতীয় অণুচ্ছেদেই লেখক এই ধারণা প্রকাশ করেন যে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটি ভিক্তোরিয়াকে নিয়ে লেখা।

> The name "Vijoya" and the famous song "Ami Chini go chini tomare ogo bideshini" are glowing tributes of Tagore to this young Argentine philosopher-friend.

হায়, শঙ্খ ঘোষের যে-বইটির বিচার তাঁর অন্যতম লক্ষ্য, সেটির প্রথম পাতাতেই 'বিদেশিনী'-নামাঙ্কিত আলোচনায় এই গানটির উল্লেখ আছে, এবং টীকায় গানটির বিশদ পরিচয় দেওয়া আছে। এটি লেখা হয় শিলাইদহে ১৮৯৫ সালে; সুদূর আর্জেন্টিনায় ভিক্তোরিয়া তখন পাঁচ বছরের শিশুমাত্র। এই গানের বিদেশিনী-প্রতীকের উৎস কবির ছেলেবেলায় শোনা গান 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে'। কীর্তন-গানে আমি নিজে শুনেছি রাধার দূতী যখন ছদ্মবেশে মথুরায় গেছে কৃষ্ণের খবর নিতে, তখন তাকে 'বিদেশিনী' ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে— যে কিছুটা চেনা, কিছুটা অচেনা। যৌবনে লেখা এই গানটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ ক'রে ভিক্তোরিয়াকে দেখতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভিক্তোরিয়ার ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিলো যে এটি *পূরবী*-র কবিতা (*তাগোর এন্ লাস্ বার্‌রাংকাস্* ইত্যাদি, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৯৩)। সেটি কেউ কখনো সংশোধন করেন নি।

শঙ্খ ঘোষের বইটির 'টেক্সট্‌গত ইতিহাস' দেবার সময়ে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় যদি বইয়ের 'স্বীকৃতি'-নামাঙ্কিত অংশটুকু দেখে নিতেন তা হলে কিছুটা প্রকাশবিভ্রান্তি এড়াতে পারতেন। 'বার্‌রাংকা' শব্দটির অনুবাদে 'শিখর' যে ঠিক লাগসই নয় এই নিয়ে আমার

বইয়ের একটি টীকায় মন্তব্য আছে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এটিকে কঠোর সমালোচনা বিবেচনা ক'রে 'শিখর'-এর সমর্থনে লিখেছেন।—

> Ketaki Kushari in her work was critical of the Bengali translation by saying that "Shikhar" is not the adequate word equivalent to the Spanish word "barrancas". As I see it, Sankho as a poet has deliberately used the word "Shikhar", probably to mean Rabi's (Sun) rise over the cliff of San Isidro in a metaphorical manner.

বেশ কল্পনা করতে পারছি, শঙ্খদা তাঁর চ্যাম্পিয়নের লেখা লাইনগুলি প'ড়ে মুচকি হাসি হাসছেন। চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম ক্রিয়াপদে অতীত কাল ব্যবহার করেছেন কেন?

সমান অপ্রয়োজনীয়ভাবে চট্টোপাধ্যায় আমার কল্পিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গেছেন থেনোবিয়া কাম্প্রুবি হিমেনেথকে :

> It is a well-known fact that Victoria translated some of Tagore's poems into Spanish through Gide's translation for which she always had a lot of admiration. Ketaki Kushari while commenting upon Victoria's rendering in Spanish language had said that qualitatively this is better than Camprubí Jiménez's translation. Personally I feel that Ketaki Kushari has been unfair to Camprubí and one is inclined to think also whether Ketaki's ignorance of Spanish version *La Obra escogida* has contributed to such remarks. If the translation done by Camprubí lacks in anything, this is due to the fact that probably English as an intermediary language has created some hindrance in transferring the beautiful lines of Tagore from Bengali into Spanish. It is obvious that the translation done by Victoria was also affected as it was done from a text in another intermediary language. In any case the readers would have been delighted if Ketaki had given concrete examples comparing the two translations.

চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজী ব্যাকরণ সম্পর্কে না-ই বা মন্তব্য করলাম। বক্তব্যটুকুর উপর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ ক'রে তার মধ্যে পরিপ্রেক্ষিতের পীড়াদায়ক অভাব দেখতে পাচ্ছি। চলতি বাংলায় একে বলে মশা মারতে কামান দাগা। ভিক্তোরিয়ার ১৯৪১-এর রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধটির পরিপ্রেক্ষিতে একটা পথ-চলতি মন্তব্য করেছিলাম। সেখানে তিনি 'পাশ্চাত্য' *গীতাঞ্জলি*-র যে-টুকরোগুলি পরিবেশন করেছেন সেগুলি হিমেনেথ-দম্পতির পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি যে ঠিক মেলে না। তখন বুঝতে পারি যে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজস্ব অনুবাদ। তিনি যে-অংশগুলো উদ্ধৃত করেছেন কেবল সেগুলোর কথাই হচ্ছে। তিনি যে কখনো কোমর বেঁধে 'জিদের মাধ্যমে' ব্যাপকতর রবীন্দ্র-অনুবাদে নেমেছিলেন এমন কিন্তু শুনি নি। আমার বক্তব্য ছিলো এইরকম :

হিমেনেথ-দম্পতী ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'-র যে স্প্যানিশ অনুবাদ করেছিলেন (*Ofrenda Lirica*), ভিক্তোরিয়া সে-পাঠ ব্যবহার করেন নি, সর্বত্র ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজস্ব স্প্যানিশ অনুবাদ, যদিও কখনও কখনও অবশ্যই তাঁরা ব্যবহার করেছেন একই বাক্যাংশ। হিমেনেথদের অনুবাদগুলি মনোজ্ঞ, কিন্তু আমার থেকে থেকে মনে হয়েছে যে ভিক্তোরিয়ার টুকরোগুলি যেন আরও একটু ছন্দঃস্পন্দিত, আরও একটু নৃত্যধর্মী। তাঁর যে কবির কান ছিলো সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সংগীতরসিক। প্রসঙ্গত আমার একটি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করি। হিমেনেথদের রবীন্দ্র-অনুবাদ— আমি দেখেছি তাঁদের দ্বারা প্রস্তুত রবীন্দ্রনাথের 'নির্বাচিত রচনাবলী', 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদটিও যেখানে মুদ্রিত হয়েছে,— তথা ভিক্তোরিয়ার টুকরোগুলি অনুধাবন ক'রে আমার এ কথা বারে বারেই মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ইংরেজীর চাইতে স্প্যানিশে ঢের বেশি খোলে।...

নির্বাচিত রচনাবলী-ই ওব্রা এস্‌কোখিদা, যার খুঁটিনাটি আমার টীকাতে দেওয়া হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় কেন ভাবলেন যে বইটা না দেখেই অজ্ঞের মতন আমি যা-তা একটা মন্তব্য করেছি? তা ছাড়া হিমেনেথদের অনুবাদকে তো আমি খাটো করি নি, তাকেও মনোজ্ঞই বলেছি। আলোচ্য সব অনুবাদই অন্য ভাষার মধ্যস্থতায়। থেনোবিয়া ইংরেজী জানতেন; তিনি ইংরেজী রূপ থেকে স্প্যানিশ খসড়া তৈরি করতেন। হিমেনেথ সেই খসড়াগুলোকে কবিতার চেহারা দিতেন। ভিক্তোরিয়ার সামনে নিশ্চয়ই ছিলো জ়িদের পুনরনুবাদ; ইংরেজী *গীতাঞ্জলি*-ও হয়তো ছিলো। তাঁর টুকরোগুলো যদি আমার কানে আরেকটু ছন্দোময় *ঠেকে* থাকে,— এবং কেবল সেইটুকুই আমি বলেছি, তার বেশী নয়,— সেই ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াটুকুর প্রকাশ কি আমার অধিকারভুক্ত নয়? আমার বক্তব্য এবং সমালোচকের মন্তব্য পাশাপাশি তুলে দেওয়া হলো। পাঠকরাই বিচার করবেন এই ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণের কোনো প্রয়োজন ছিলো কিনা।

কিন্তু অপরাজিত চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী আক্রমণটি আরোই অহৈতুক:

> According to Ketaki, Doris Meyer's *Victoria Ocampo, Against the Wind and the Tide* is the only authentic biography of Victoria Ocampo. However, Alba Omil, the Argentine writer in the preface of her book *Frente y perfil de Victoria Ocampo* tells us that "This book reached Victoria's hands two weeks before her death, when she was fighting bravely for her life every time with reduced energy. Nevertheless, she went through it minutely, commenting every now and then, revising and correcting." Those who have read this book would agree how Alba Omil narrates in great details the various facets of Victoria Ocampo. It is rather surprising that Ketaki Kushari

> who has had the opportunity of consulting archives of *Sur* did not include this work even as a reference book or perhaps her anglosaxon bias made her depend more on Doris Meyer than on Alba Omil?

অন্যায় আক্রমণের একটা সীমা থাকা উচিত। আমার বাংলা বইটার একটা বিশেষ গঠনপদ্ধতি আছে। সেখানে কাহিনীর নায়িকা ডরিস মায়ারের বইটি আবিষ্কার ক'রে তার রিভিউ লিখছে। সেই রিভিউ-এর আদিরূপ প্রকাশিত হয়েছিলো *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার ২ : ১ সংখ্যায়। অনামিকা লেখে : 'অবশেষে ইংরেজী ভাষায় ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর ... একটি প্রামাণ্য জীবনচরিত লিখেছেন ডরিস মায়ার, ... শ্রীমতী মায়ারের বইটিই ভিক্‌তোরিয়ার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত।' অনামিকা প্রত্যেকটা কথা মেপে বলেছে। 'ইংরেজী ভাষায় ... একটি প্রামাণ্য জীবনচরিত' আর 'ভিক্‌তোরিয়ার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত'— দুটোই ভেবে বলা। 'ওন্‌লি অথেন্টিক বায়োগ্রাফি' তো সে বলে নি। তার দুটো বক্তব্যই তথ্যভিত্তিক। ডরিস মায়ারের বইটি বেরোয় নিউ ইয়র্ক থেকে ১৯৭৯ সালে। আল্‌বা ওমিলের বইটি বেরোয় তার পরের বছর, বুয়েনোস আইরেস থেকে ১৯৮০ সালে। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো মৃত্যুর আগে বইটার পাণ্ডুলিপি দেখে সংস্কারসাধন ক'রে থাকবেন। সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।

নিউ ইয়র্কের বই বিলেতের লাইব্রেরিতে দ্রুতই পৌঁছে যায়। আর্জেন্টিনার বই এখানকার গ্রন্থাগারে পৌঁছতে অনেক বেশী সময় নেয়। আমার বাংলা বইটা লেখা হয় ১৯৮১-১৯৮২ সালে। সে-খবর মুখবন্ধে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া আছে। তখনও আমি রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার চিঠিপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব পাই নি, আর্জেন্টিনায় পা দিই নি, *সুর* সংস্থার আর্কাইভ্‌স্‌ও বলা বাহুল্য দেখি নি। আমার বাংলা বইয়ে আমি কোথাও দাবি করি নি যে আমি *সুর*-এর আর্কাইভ্‌স্ দেখেছি। অক্সফোর্ডের গ্রন্থাগারে *সুর* পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলো দেখেছি, কিন্তু লাইব্রেরিতে কোনো পত্রিকার 'ব্যাক ইশ্যু' দেখা আর তৎসংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্কাইভ্‌স্ দেখা এক জিনিস নয়। *সুর*-এর আর্কাইভ্‌স্ তখন দক্ষিণ আমেরিকায়, অনামিকা কী ক'রে তা দেখবে?

আল্‌বা ওমিলের বইটা সে-সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির শেল্‌ফে দেখতে পাই নি। তা ছাড়া বৃটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে তৎকালীন সামরিক সংঘর্ষের দরুন ওদেশের বইপত্র এখানে অনেক দিনই ঠিকমতো পাওয়া যায় নি। সেই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতও তো আমার বইয়ের কাহিনী-অংশের অঙ্গীভূত, তাই না?

মুখবন্ধে স্পষ্ট ক'রে বলেছি: 'এই বইয়ের রচনাকাল ১৯৮১-৮২; ১৯৮২ সালের নভেম্বরে রচনা শেষ করি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়ার চিঠিপত্র সম্পাদনা করতে বিশ্বভারতী-কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আরও যে-গবেষণা করেছি ও করছি তা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।' ১৯৮২-র নভেম্বরে সমগ্র পাণ্ডুলিপি কলকাতায় চ'লে যায়। তার পর আমি ঐ পাণ্ডুলিপিতে কোনো নতুন তথ্য যোগ করি নি, যোগ করতে চাইও নি,

কেননা তা করলে ঐ বইটার বিশেষ স্ট্রাক্‌চারটা নষ্ট হয়ে যেতো। ঐ বইয়ে একটি মেয়ে কিভাবে একটু একটু ক'রে তার বিষয়বস্তুকে আবিষ্কার করছে তা বর্ণিত হয়েছে। ২৪২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে তার ওকাম্পো-আত্মজীবনীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আবিষ্কার: সে খেয়াল করে যে এতদিনে বইদুটো বৃটেনের লাইব্রেরিতে পৌঁছেছে। তখনই সে বইদুটো ধার নেয়।

আমার মনে আছে, ঐ বইদুটোই লাইব্রেরিতে প্রথম পৌঁছয়। ওমিলের বই তখনও চোখে দেখি নি, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত নই। পৌঁছে থাকলেও সম্ভবতঃ অ্যাক্‌সেশন হয় নি। কিংবা স্বয়ং গ্রন্থাগারিক সর্বাগ্রে পড়তে নিয়েছেন, বা অধীর জন কিং-কে পড়তে দিয়েছেন। ১৯৮২-র ঐ অক্টোবর-ডিসেম্বরের টার্মেই কিং তাঁর থিসিস সাবমিট করেন। এইজন্য আমার বাংলা বইয়ে তাঁর কাজেরও কোনো উল্লেখ নেই। সেটি আমি পড়লাম ১৯৮৩-তে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে।

আমার বাংলা বইটা ১৯৮৩-তেই ছাপতে যায়, কিন্তু আমার পক্ষে অপ্রতিবিধেয় কারণে বইটা নাভানা থেকে ছেপে বেরোতে পুরো দু' বছর লেগে যায়। ভাগ্যের চক্রান্তে এই বইয়ের সর্বশেষ প্রুফ আমাকে দেখতে হয় বুয়েনোস আইরেসে ব'সে। প্রুফ-চেকিং-এ ওখানকার একজন বাঙালী মহিলার সাহায্য পেয়েছিলাম। তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মুখবন্ধে দুটি নতুন বাক্য যোগ করি এবং 'বুয়েনোস আইরেস/ এপ্রিল ১৯৮৫' এই স্থানকালনির্দেশ জুড়ে দিই। বলা বাহুল্য ততদিনে আমার পরবর্তী বইটার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু সে-গবেষণা থেকে বাংলা বইয়ের মূল শরীরে কোনো নতুন তথ্য সংযোজন করা সম্ভব ছিলো না, এবং তা আমার অভিপ্রেতও ছিলো না। এ-সব এখন ইতিহাস। বিদ্বজ্জনদের সভায় একটা বই নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বইটার 'টেক্সচুয়াল হিস্ট্রি' সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে বৈকি।

অপরাজিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর পেপারের শেষ অণুচ্ছেদে আমার ইংরেজী বইটার উল্লেখ ক'রে বলেন যে সেটা হচ্ছে 'an improved and more detailed version of her earlicr work in Bengali'; বইখানা ঠিক হাতে ধ'রে দেখেছেন কিনা বোঝা যায় না। যদি হাতে নিয়ে উল্টে দেখতেন, তা হলে নির্দেশিকায় ছ'-বার আল্‌বা ওমিলের উল্লেখ পেতেন, এবং দেখতে পেতেন ওমিলের মতামতকে আমি কতটা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি, কতটা মূল্য দিয়েছি। আল্‌বা ওমিলের বইটা থেকে নেওয়া চোদ্দ পাতা নোট এখনও আমার

বলতে চাইছি যে সভায় অথবা ছাপা অক্ষরে আমাকে বেধড়ক আক্রমণ করার আগে আমার ওকাম্পো-বিষয়ক দ্বিতীয় বইটা তাঁর দেখে নেওয়া উচিত ছিলো। কেবলই ওমিলের বই নয়, আরও অনেক লাতিন-মার্কিন উৎস-উপাদান ওখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে তিনি আনছেন স্প্যানিশ বিষয়ে অজ্ঞতা আর অ্যাংলো-স্যাক্সন পক্ষপাতের অভিযোগ! আমিও কি বলতে পারি না, ১৯৯১-এর নভেম্বরে দিল্লীর সভায় দাঁড়িয়ে ঐ পেপার পড়ার আগে ঐ দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমি থেকেই জানুয়ারি ১৯৮৮-তে প্রকাশিত

ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন বইখানা কি তিনি উল্টেপাল্টে দেখে নিতে পারতেন না? তিন বছরের বেশী সময় তিনি হাতে পেয়েছেন।

বস্তুতঃ তাঁর পেপারটি শোচনীয়ভাবেই দায়সারা-গোছের। শঙ্খ ঘোষের আর আমার বইদুটোর কোনো 'ক্রিটিকাল অ্যাসেসমেন্ট' বা 'অ্যানালিটিকাল স্টাডি' ওখানে নেই। কিছু প্রশংসা, কিছু নিন্দা, কিছু টুকরো মন্তব্য এলোমেলোভাবে সাজিয়েই তিনি কাজ সেরেছেন। শঙ্খ ঘোষের বইখানার উপর তাঁর সমালোচনার কাজ এইরকম :

> Sankho Ghosh, in his work *Ocampor Rabindranath* mentioned that Tagore and Victoria met for the last time in May, 1930 and not in June, 1930 as Victoria had claimed earlier. Sankho is right in saying so. However, Sankho made a mistake while translating the expression "asturiana" attributed to Fanny, the nurse of Victoria. Instead of putting it as a woman proceeding from the Asturias province of Spain he translated it as an Austrian woman.

একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারে এভাবেই স্কুলবালকের মতো জোড়াতাড়া লাগিয়ে পেপার খাড়া ক'রে প'ড়ে দেওয়া যায়? আর এ-সব টুকরো তথ্য কি ওকাম্পোর জন্মশতবার্ষিক সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বলবার মতো কিছু? তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি, খবরদুটো জোগাড় করতে তাঁকে তো কোনো পরিশ্রমই করতে হয় নি। দুটোই তিনি পেয়ে গেছেন আমার বাংলা বইটার ৬২ পৃষ্ঠায়, ৬৭ এবং ৭১ নং টীকায়, পান নি? আমারই ফুটনোট ঘেঁটে খবর বার ক'রে— এবং সেজন্যে আমাকে কোনো স্বীকৃতি না দিয়ে— তিনি দিব্যি একবার শঙ্খদার পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন, আরেকবার তাঁর ভুল ধরেছেন।

পেপারের সমাপ্তিতে লেখক এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে আমাদের বইগুলি যেন স্প্যানিশে তর্জমা হয়। অনুবাদক কোথায়? বিশেষতঃ বাংলা থেকে? আলোচ্য সংকলনে স্প্যানিশ থেকে ইংরেজী অনুবাদেরই যে-হাল দেখছি তা থেকে বিশেষ ভরসা পাওয়া যায় না।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হচ্ছেন *শাশ্বত মৌচাক : রবীন্দ্রনাথ ও স্পেন*-এর অন্যতম লেখক। ইনি তাঁর পেপারে প্রথমে পূর্বোক্ত নারায়ণনের সুর-বিষয়ক সমালোচনার জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর জবাব বেশ সুন্দর হয়েছে। এর পর তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যে ভিক্তোরিয়ার প্রতিধ্বনি বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। এখানে শঙ্খ ঘোষের আর আমার কাজকে তিনি মূল্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে ওকাম্পোর প্রতিধ্বনিকে তিনি কেন 'এ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত কম-জানা দিক' বলেছেন তা বুঝলাম না। আমার ইংরেজী বইয়ের ৩০৭-৩০৯ পৃষ্ঠায় কিন্তু

বিষয়টা আলোচিত হয়েছে। তিনি *সানাই*-এর 'আসা-যাওয়া' কবিতাটির গীতরূপের উল্লেখ করেছেন। এটি আমার আলোচনাতেও উল্লিখিত হয়েছে। 'আসা-যাওয়া' কবিতাটি আমার মনে এতটা দাগ কাটে যে এটির একটি অনুবাদও আমার রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদ-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

গঙ্গোপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়ার গল্পটা ভারতে ভিক্তোরিয়ার নিজস্ব ব্যক্তিমূর্তির অভিক্ষেপকে কিছু পরিমাণে রাহুগ্রস্ত করেছে। নারীকে তার আপন কীর্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার মতো মন ভারতে এখনও বেশী লোকের হয়েছে কি? তাকে কোনো পুরুষের পরিচয়ের সঙ্গে সংলগ্ন-রূপে দেখতেই ভারতীয় মন ভালোবাসে। সে কার কন্যা, কার পুত্রবধূ, কার পত্নী, সে পতিপ্রাণা কিনা— ভারতে এখনও পর্যন্ত এগুলোই একজন মেয়ের সম্বন্ধে সর্বাগ্রগণ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে ভারতীয় মন ভিক্তোরিয়াকে রবীন্দ্রসূর্যের বৃত্তের অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রহ বা উপগ্রহ হিসাবে দেখতে চাইবে। কিন্তু ভিক্তোরিয়া যে নিজের জোরেই একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, বিশ শতকের দক্ষিণ আমেরিকার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র— এই তথ্যটার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার দুটো বইয়ে আমি তো কম পরিশ্রম করি নি। ইংরেজী বইটার তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার ও কৃতিত্বের একটা সামগ্রিক ছবি তুলে ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। এখন, কেউ যদি না শোনে সে অন্য কথা! আমার ধারণা, দুটো ব্যাপার পরস্পরসম্পৃক্ত, একই সুতোয় গাঁথা! অর্থাৎ ভিক্তোরিয়ার চ্যাম্পিয়ন আমি নিজে যে একজন মেয়ে বটি, সেটাই হয়তো আসল কারণ যেজন্যে অন্য স্কলাররা আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন না এবং ভিক্তোরিয়ার কীর্তিপ্রচারে আমার প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট স্বীকৃতি না দিয়ে ব'লে যাচ্ছেন: 'হায় হায়, ভিক্তোরিয়াকে ভারতে কেউ ঠিক ক'রে জানলেন না।' আমিই যদি একজন হোমরাচোমরা পুরুষ অধ্যাপক হতাম,— ধরা যাক, আমার এতদ্‌বিষয়ক বাংলা-ইংরেজী বইদুটোর রচয়িতার নাম অধ্যাপক "ক",— তা হলে হয়তো শোনা যেতো: 'ভিক্তোরিয়ার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিষয়ে আমরা আগে কত কম জানতাম, কিন্তু অধ্যাপক "ক"-র বইদুটো বেরোনোর পর থেকে এই আর্জেন্টাইন নারীর বিষয়ে আমরা কত-কী জেনেছি, অধ্যাপক "ক"-র পরিশ্রমী গবেষণার ফলে ভিক্তোরিয়ার নিজস্ব মূর্তি আমাদের চোখের সামনে দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে...' ইত্যাদি ইত্যাদি!

ভিক্তোরিয়ার শান্তিনিকেতনে না-আসা যে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছিলো এটা ছিলো ইংরেজী বইটাতে আমার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। গঙ্গোপাধ্যায় এই বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন দেখে ভালো লাগছে। ভিক্তোরিয়া যদি শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি কিছু দিন থাকতেন, সেই আবহের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতেন, তা হলে তাঁর রবীন্দ্রনাথকে জানা যে আরও অনেক পূর্ণ হয়ে উঠতে পারতো সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিছু কিছু ভ্রান্তিও নিশ্চয় দূর হতো। গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানে আমি একমত।

§

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চতুর্থ যে-অধ্যাপক এই সংকলনে অবদান রেখেছেন তিনি এই বইয়ের অন্যতম সম্পাদক সুস্নিগ্ধ দে। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো আর অক্তাভিও পাস্ এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে 'আমি' আর 'অপর'-এর সংঘাতে বিনিময়ে, 'কেন্দ্র' আর 'পরিধি'র অভিস্থিতিতে ('কন্‌ভার্জেন্স' অর্থে) লাতিন-মার্কিন সংস্কৃতির আত্মপরিচয়ের বোঝাপড়া কিভাবে ধরা পড়ে, সেই কেতাদুরস্ত প্রশ্নটা নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেছেন। আলোচনা ঔৎসুক্যজনকই হয়েছে, বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষরও স্বীকার্য। অবশ্য ভাষাগত একটা ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছে। ৫৩ পৃষ্ঠায় 'biography consisting of a hundred twentyeight papers' অদ্ভুত ইংরেজী। সংখ্যাবাচক শব্দটিকে 'a hundred and twenty-eight' এই রূপে দেখতেই অভ্যস্ত আমরা, আর শেষ শব্দটি কি 'pages' হবে না? এঁর পেপারটি কি প্রথমে স্প্যানিশে লিখিত হয়ে পরে ইংরেজীতে রূপান্তরিত হয়েছে? সে যাই হোক, আমার প্রধান প্রশ্ন: এই সংকলনের যৌথ সম্পাদনার যে-দায়িত্ব, তার কতটা নিয়েছিলেন তিনি নিজে, কতটা ছেড়ে দিয়েছিলেন দিল্লীতে আর্জেন্টিনার দূতাবাসের উপরে? এ ব্যাপারে কোথায় ছিলো তাঁর অবস্থান, 'কেন্দ্রে', না 'পরিধি'তে?

রচনাগুলির মান অসমান; সম্পাদনা অমনোযোগী, কার্যতঃ অনুপস্থিত; এদিকে ওদিকে বিস্তর ভুলভ্রান্তি ছড়ানো। ছাপার ভুল কম হয় নি। বেশ কয়েক জায়গায় কবিতার টুকরোর লে-আউট ঠিক হয় নি। আমার নিজের নামটাও কতরকমভাবেই না ছাপা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, এটা একটা মজার ব্যাপার বটে— আমার নামটা ছাপা হয়েছে অনেকবারই: স্পষ্টতঃ, সভায় আমি উপস্থিত না থাকলেও আমার কাজের অস্তিত্বকে একেবারে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। আমার কাজ অন্ততঃ চারটি পেপারে উল্লিখিত হয়েছে; অন্যত্রও তার অস্বীকৃত ছায়া পড়েছে। আমাকে 'পরিধি'তে রেখে 'কেন্দ্র' থেকে তাক্ ক'রে আমার কোনো কোনো বক্তব্যকে নস্যাৎ করার চেষ্টাও করা হয়েছে। আমি ওখানে উপস্থিত থাকলে কী হতো বলতে পারি না। কোনো কোনো বক্তব্যের চেহারা বদলাতো কি?

আমার সেই না-যাওয়ার গল্পটা এখানে খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত সুস্নিগ্ধ দে-র কাছ থেকে একটা প্রাথমিক আহ্বান পেয়েছিলাম। তা থেকে জেনেছিলাম যে আই-সি-সি-আর এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁরা কখনো তা করেন নি। দে মহাশয়কে এবং আই-সি-সি-আর-এর কর্ত্রীকে আমি জানিয়ে দিই যে আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করতে আমি আগ্রহী। সুস্নিগ্ধবাবু লিখলেন যে তিনি আই-সি-সি-আরকে আবারও আমার কাগজপত্র পাঠাচ্ছেন। এর পর দিল্লী একেবারে নীরব হয়ে গেলো। অন্য সূত্রে খবর পেলাম, হ্যাঁ, আই-সি-সি-আর আমাকে ঐ সভায় নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে যাবেন এটা স্থির হয়েছে বটে। কিন্তু কার্যতঃ নিমন্ত্রণটি কোনো দিনই পেলাম না। লণ্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনের সংস্কৃতি বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে এ বিষয়ে খবর নিতে অনুরোধ করলাম। জবাব পেলাম না। ব্যাপারটা হাই কমিশনার মহাশয়ের গোচরে আনার চেষ্টাও করেছিলাম। তিনিও আমার চিঠির জবাব দেন নি। অগত্যা ঐ সভায় উপস্থিত থাকার আশা

ছেড়ে দিতে হয়, এবং সুস্নিগ্ধবাবুকে তা জানিয়ে দিই। তিনি কিন্তু বললেন না, আপনি না এলেও পেপার পাঠিয়ে দিন! যাক, ভেবেছিলাম আমি, নতুন ক'রে পেপার খাড়া করার দায়িত্ব থেকে তো মুক্তি পেলাম।

শেষের দিকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একটা বিচিত্র পরোক্ষ চেষ্টা দিল্লী থেকে করা হয়েছিলো। দিল্লীর কোনো দপ্তর থেকে কেউ টেলিফোন করেছিলেন লণ্ডনের এক বাঙালী মহিলাকে। সেই মহিলা ফোন করেছিলেন আমাকে। তত দিনে আমার না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত মোটামুটি নেওয়া হয়ে গেছে। দিল্লীর হিস্পানিক কন্‌ফারেন্সটি (ওকাম্পো-সেমিনার যার অন্তর্গত ছিলো) আরম্ভ হতে যখন আর ঠিক তিন দিন বাকি, তখন লণ্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনের সংস্কৃতি-অফিসার (যিনি আগে আমার চিঠির জবাব দেন নি) আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। কিন্তু তিন দিনের নোটিসে কি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাওয়া যায়? তিনি কয়েকবার বলেছিলেন, 'আপনাকে ভিসা দেবার সময় আছে।' কিন্তু ভিসা পাওয়াটাই বড় প্রশ্ন ছিলো না! তত দিনে আমি অন্য কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে ফেলেছি, এবং ভারতের ভিসা আমার নেওয়া হয়েই গেছে! ঐ কনফারেন্সের পরের সপ্তাহেই আমি রবীন্দ্রনাথের বর্ণদৃষ্টি-সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রে কলকাতায় পৌঁছই, অর্থাৎ আই-সি-সি-আর-এর কাছ থেকে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ পেলে দিল্লী আমি অনায়াসেই ছুঁয়ে আসতে পারতাম। কলকাতায় পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুনি, শ্রীমতী কুরা প্রচার করেছেন, 'প্রেম থাকলে ছিলো রবীন্দ্রনাথের, ওকাম্পোর নয়' ইত্যাদি। মিরাল্‌রিওর অনস্তিত্ব যে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হয়েছে সে-খবর আমার কানে পৌঁছতে আরও অনেক দিন কেটে যায়। এই ঘোষণার সুবিধার্থে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যই কি আমাকে এমনভাবে বাদ দেওয়া হয়, যাতে বলা যেতে পারে, 'আমরা তো ওকে ডেকেইছিলাম, ও-ই তো দেমাক ক'রে এলো না'? না কি সেটা বড্ড বেশী 'কনস্পিরেসি থিওরি' হয়ে যায়? আমি কি বাদ প'ড়ে যাই নিছক আমলাতান্ত্রিক কারণে— প্রথমে শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রিতা, তার পর হুড়মুড় ক'রে কাজ করার ব্যর্থ চেষ্টার পরিণামে? কে জানে? তবে ঘটনা এই যে আই-সি-সি-আর, যাঁরা একদা আমাকে আর্জেন্টিনা যাবার প্লেনভাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে এই সেমিনারের ব্যাপারে কোনো চিঠিই আমি পাই নি। অথচ আমার ওকাম্পোবিষয়ক ইংরেজী বইটা সাহিত্য আকাদেমির, অর্থাৎ ভারত সরকারেরই প্রকাশন, এবং আমি ঐ সভায় উপস্থিত থাকলে হিস্পানিক কনফারেন্সের আগন্তুকদের মধ্যে বইটার একটু প্রচার হতে পারতো, তাতে প্রকাশকেরও লাভ হতো ..., কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা (তথা পরিদেবনা)।

অনেকেই জানেন, ভিক্তোরিয়ার ব্যক্তিত্বের আমি অনুরাগিণী। তা আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাঁকে বোঝার জন্য জীবনের মধ্যপথে স্প্যানিশ পড়ার চেষ্টা আরম্ভ করি। জীবনের অনেকগুলি বছর এই চর্চায় নিয়োগ করি। বিশেষতঃ রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার চিঠিপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর সেই গবেষণা শেষ করবার জন্য আমাকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব আমি সসম্মানে পালন করেছি। আমাকে ঐ সভায় ডেকে নেওয়ার একটা অ্যাকাডেমিক দায়িত্ব কি উদ্যোক্তাদের ছিলো না?

আমি সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকলে অন্ততপক্ষে মিরাল্‌রিও নেই এই মিথ্যে কথাটার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করতে পারতাম। তার বদলে আমাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রেই ছেপে দেওয়া হলো যে আমার বইয়ে একটি 'notable error of fact' আছে। এ কি একরকমের মানহানির চেষ্টা নয়? বুঝতে পারছি না, ঐ লেখাটা ছাপতে পাঠাবার আগে সুস্নিগ্ধবাবু আমাকে একটিবার জিজ্ঞেস ক'রে নিলেন না কেন, 'ব্যাপারটা আসলে কী, আপনারা দুজনে দুরকম কথা বলছেন কেন?' সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কি কৌতূহলও হলো না এ বিষয়ে? তবে সে কেমনধারা সেমিনার? অমিতাভ চক্রবর্তী মশাই, একেই কি ফরাসী দেশে আপনারা বলেন 'বুদ্ধিযাজকদের বিশ্বাসঘাতকতা'?[৩]

এরকম একটা আন্তর্জাতিক সভা ডেকে তার পর বই ছাপতে খরচ নিশ্চয় নেহাৎ মন্দ পড়ে না। প্রশ্ন করা যেতে পারে নিশ্চয়ই, এ ক্ষেত্রে সত্যিই কি কিছু এগোলো? হ্যাঁ, জিনিসটা 'অ্যান এক্সারসাইজ ইন ইন্দো-আর্জেন্টাইন রিলেশ্যনশিপ' হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এই দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক ব্যায়াম ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর মর্যাদা রক্ষা করেছে এমন বলতে পারি না। জিনিসটা তাঁর যোগ্য হতো, যদি উদ্যোক্তারা একটা আন্তরিক চেষ্টা করতেন প্রকৃত ওকাম্পো-স্কলারদের দিল্লীতে ডাকতে, যদি এক জায়গায় জড়ো করতে পারতেন ডরিস মায়ারকে, জন কিংকে, আল্‌বা ওমিলকে। লণ্ডনে প্যারিসে বুয়েনোস আইরেসে আরও দু'-চারজন যাঁরা ওকাম্পোর উপর কাজ করছেন তাঁদের ডেকে নিতে পারলে কত ভালো হতো। অবশ্যই সাদরে আহ্বান করা উচিত ছিলো শঙ্খ ঘোষকে। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি যদি যেতে অসম্মত হতেন, তবু তাঁর কাছ থেকে একটি পেপার কি আদায় ক'রে নেওয়া যেতো না? অর্থাৎ একটি নন্‌-সেমিনারের ব্যায়ামের আখড়া না হয়ে দিল্লী হয়ে উঠতে পারতো ওকাম্পোর উপর একটি প্রকৃত অ্যাকাডেমিক সেমিনারের অঙ্গন। সেই সুযোগ সে হেলায় হারিয়েছে।

কোনো কাজ যদি করার যোগ্য হয়, তবে তা ঠিক ক'রে, প্রাণ দিয়ে করা উচিত, অশ্রদ্ধা ক'রে, হেলাফেলা ক'রে নয়। প্রশ্ন তো করাই যেতে পারে, একটা ব্যয়সাধ্য অ-সভা ডাকার আর একটা ভুলে ভর্তি অ-পুস্তক ছাপতে দেওয়ার সার্থকতাটা কী? হয়তো সেই একই খরচে মদত পাবার যোগ্য চারটা রিসার্চ প্রজেক্টকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেওয়া যেতো। আগে তো রিসার্চ, তার পর তো সেমিনার, তাই না? আমার মতো আরও অনেকেই আছেন, যাঁদের প্রতিষ্ঠানের 'পরিধি'তে বা স্রেফ তার বাইরে অবস্থান ক'রে গবেষণার বা সৃষ্টির কাজ করতে হয়,— অনেক অসুবিধার সঙ্গে লড়াই ক'রে। চলতি সময়েই আমি অনুদানের জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত ক'রে এক মাসের মধ্যে আটটা নঞর্থক জবাব পেয়েছি। আর্জেন্টিনাতে কাজ করতে যাবার জন্য আমি যখন মরিয়া হয়ে মদত খুঁজছিলাম তখন একটি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র থেকে আমাকে বলা হয়েছিলো যে তাঁদের টাকাকড়ি সভা ডাকার জন্য বরাদ্দ হয়ে আছে, গবেষণাকে সাহায্য করার জন্য নয়। আজকাল এই এক ফ্যাশন হয়েছে— সৃজনমূলক অথবা গবেষণামূলক প্রকৃত কাজের পোষণের পরিবর্তে সভা ডাকার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা। অর্থনীতির দিক দিয়ে এই সব অ-কাজ সত্যিকারের কাজের

প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যারা নাচার হয়েই বৌদ্ধিক জগতের ফ্রী-লান্সার, তারা এই অনাচারকে কী উপায়ে রুখবো ভেবে পাই না। একটা প্রতিষ্ঠান দরকার পড়লে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরোতে পারে ; একজন ব্যক্তি তা পারে না। হিংস্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যূথবদ্ধ পৃথিবীতে ফ্রী-লান্সারদের লড়াই কেবলই কঠিনতর হচ্ছে। এই ধরনের কূটনৈতিক ব্যায়াম তাই আমাদের কাছে প্রহসন ব'লে মনে হয়। এবং আমরা সভয়ে তাকিয়ে দেখতে পাই, এ-জাতীয় কূটনৈতিক ব্যায়াম মূল্যবান আন্তঃসাংস্কৃতিক কাজগুলিকে একের পর এক 'টেইক-ওভার' করছে।

বলতাম, ব্যায়াম স্বাস্থ্যের দিকে এগিয়েছে, যদি এমন একজন আর্জেন্টাইনের দেখা পেতাম, যিনি কিনা আমার 'দর্পণ-প্রতিবিম্ব', অর্থাৎ যিনি রবীন্দ্রনাথ নামে বিরাট মানুষটাকে বোঝার জন্য একটু কষ্ট ক'রে বাংলা-নামক একটা ভাষা শিখতে প্রয়াসী হয়েছেন। নয়তো ওকাম্পোর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি তো সত্যি ঘটা না ক'রে ছোট আয়তনেও নিবেদন করা যায়। অক্সফোর্ডের সেন্টার ফর ক্রস্-কাল্‌চারাল রিসার্চ অন উইমেন-এর সহযোগিতায় ওকাম্পোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৯০ সালেই একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। অনেক লোক এসেছিলেন। ঘরে দাঁড়াবার জায়গা ছিলো না। চলতি বছরে (১৯৯২) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনেও ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সহযোগিতায় ও নতুন উপাচার্য মহাশয়ের আগ্রহে একটি ছোট্ট ওকাম্পো-স্মারক সভা ডাকা সম্ভব হয়েছিলো। আর সত্যিই তো ভিক্তোরিয়াকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তিনি যে-মূল্যবোধগুলির জন্য লড়াই করেছিলেন সেগুলোর জন্যই ল'ড়ে যাওয়া— নিজের এবং নিজেদের কাজের মাধ্যমে। এই আলোচনাও তারই চেষ্টা,— যদিচ 'কেন্দ্রের' মানুষদের মনে হতে পারে, 'পরিধি'র কাগজের সমালোচনায় তাঁদের কী এসে যায়।

এই রচনা গ্রন্থসমালোচনার প্রথাসিদ্ধ আয়তনকে ছাড়িয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের মতো দীর্ঘ হয়েছে। তা হোক। কিছু বলার, কিছু দেখানোর ছিলো। তাই জায়গা নিলাম। প্রতিপাদনের যোগ্য কোনো ইশ্যু থাকলে সেই প্রতিপাদনক্রিয়ার জন্য জায়গা লাগবেই। বুদ্ধির প্রকৃত চর্চা সেই স্পেস দাবি করে। সেখানেই এ-জাতীয় পত্রিকার সার্থকতা।

১ এই কবিতাগুচ্ছ বহুকাল পরে আমার তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী কবিতাসংকলনের (*Memories of Argentina and Other Poems*, Virgilio Libro, 1999) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২ লেখাটি বর্তমান বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৩ দ্রষ্টব্য অমিতাভ চক্রবর্তী, 'ফরাসী অ্যাঁতেলেক্‌ত্যুয়েল্ : জন্ম ও মৃত্যু ?', *জিজ্ঞাসা* ১৩ : ২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯। আমি এই সংখ্যাটির অতিথি-সম্পাদক ছিলাম। জুলিয়্যাঁ বঁ্যাদা-র (Julien Benda) লেখা *La Trahison des clercs* এই গ্রন্থনামটি কিভাবে অনূদিত হওয়া উচিত সে-বিষয়ে অমিতাভ আর আমার মধ্যে কিছু চিন্তাবিনিময় হয়েছিলো। তার ভিত্তিতে আমি একটি ' ' টীকা যোগ ক'রে দিয়েছিলাম। সেটি এইরকম :

-ফরাসী *clerc*, ইংরেজী *clerk* ও *cleric*, ফরাসী *clergé*, ইংরেজী *clergy*: সবই এসেছে লাতিন *clericus* থেকে। অনুসন্ধিৎসুরা অভিধান খুললে জানতে পাবেন কিভাবে *clerk* শব্দটির অর্থধারা মূল ধর্মীয় উৎস থেকে নানাভাবে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান কালের কেরানীত্বে পৌঁছেছে। ক্লার্ক প্রথমে পুরোদস্তুর চার্চম্যান, পরে নিম্নতর কোঠার চার্চসেবক, চার্চের অনুষঙ্গ থেকে যে লেখা-সংক্রান্ত কাজকর্ম করে (যেহেতু এককালে কেবল চার্চের লোকেদেরই ছিলো সাক্ষরতা), এমন কি লেখাপড়া-জানা, রীতিমতো বিদ্বান লোকও, এবং অবশেষে আধুনিক অর্থে করণিক। প্রবন্ধে উল্লিখিত জুলিয়ঁ্যা বঁ্যদা-র গ্রন্থনামটির মধ্যে তাই অনেক দ্যোতনা প্যাক্ করা আছে। জনৈক ভাষ্যকারের মতে দার্শনিক, শিল্পী, সেইসব বিজ্ঞানী যাঁরা বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসার জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন (মা ফলেষু কদাচন)—এঁরাই বঁ্যদার চোখে আধুনিক নাগরিক সভ্যতার *clercs*। গ্রন্থনামটির অর্থ তা হলে দাঁড়ায় এ-জাতীয় বুদ্ধিজীবী এলিট শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা। অমিতাভ জানতে চাইলেন, বাংলায় 'বুদ্ধিযাজকদের বিশ্বাসঘাতকতা' চলতে পারে কিনা। তর্জমা হিসাবে এটা তো আমার বেশ লাগসই লাগছে।

প্রাচীনা ও নবীনা

গত বছর *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় শ্রীযুক্তা গৌরী আইয়ুব হঠাৎ ক'রেই আমার রবীন্দ্র-ওকাম্পো-বিষয়ক বইদুটির দীর্ঘ এবং কড়া সমালোচনা লিখে ফেললেন। বিস্ময় বোধ করি যখন দেখি যে কয়েক বছর আগে প্রকাশিত বইদুটিকে নিয়ে এখনও তর্ক হচ্ছে। জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলাম : 'যে-দুই প্রতিন্যাসের বিরোধিতার ফলে তর্কের ঝড়টা উঠছে তাদের উভয়ের গাত্রে কিছু সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক চিহ্ন আছে। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে সূত্রাকারে বলা যায়: একটি দিক সেকেলে, অন্য দিক একেলে। এই দুই পক্ষের ধাক্কাধাক্কিতে একদিন না একদিন প্রথম পক্ষ পিছু হটতে বাধ্য।' আমাদের ঐ বিনিময় স্পষ্ট ক'রে চিহ্নিত করেছে চলতি কালের একটা পরাক্রান্ত টানাটানিকে।

সত্যি বলতে কি, একটা সমাজ যদি তার স্বাভাবিক জঙ্গমতাকে পুরোপুরি খুইয়ে না বসে, তা হলে আকাশে কান পাতলে সেকেলেদের আর একেলেদের তর্কের একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি সব সময়েই শ্রুতিগোচর হবে ব'লে আমার ধারণা। তবে কোনো কোনো যুগ আছে যখন ঘটনাদের টানাহেঁচড়ায় সামাজিক পরিবর্তনের গতিটা বিশেষভাবেই ত্বরিত হয়ে ওঠে। তেমন সময়ে সেকেলে-একেলের দ্বন্দ্ব একটা তীব্র রূপ নেয়।

তখন একেলেরা দিগন্তে কোনো বরণীয় নূতনের সম্ভাবনাকে দেখতে পেয়েছে। তারা চায় অ্যাক্সিলরেটরে পা রেখে দ্রুত বেগে তার দিকে এগিয়ে যেতে। সেই নূতনকে তারা তাদের জীবৎকালের মধ্যে ঠিক ক'রে পেতে চায়, আপনার ক'রে নিতে চায়। সেকেলেরা ঘাবড়ে যায়, চায় ব্রেক কষতে। একেলেরা চেঁচায় : 'প্রতিক্রিয়াশীল! আমাদের চলতে দাও!' সেকেলেরা প্রতিবাদ করে : 'তোমরা রসাতলে যাচ্ছো! গাড়িটা স্কিড্ করবে, ডিগবাজি খাবে।'

বাঙালীদের ইতিহাসে এইরকম একটা সময় গেছে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম প্রবল অপ্রতিরোধ্য অভিঘাত ফেনিল নোনতা জোয়ারজলের মতো আছড়ে পড়েছিলো আমাদের সমাজের বেলাভূমিতে। সেকালের যে-সেকেলে-একেলে দ্বন্দ্ব, তাকে বেশ সুন্দরভাবে সূত্রাকারে রূপ দেয় সত্যজিৎ রায়ের *চারুলতা*-র সংলাপে অমলের প্রশ্ন : 'মন্দা বোঠান, তুমি কি প্রাচীনা, না নবীনা?'

অনেকে আপত্তি ক'রে থাকেন যে সত্যজিতের ছবিটা রবীন্দ্রনাথের গল্পটাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে না। মনে রাখতে হবে যে একজন প্রতিভাবান পরিচালকের হাতে যে-কোনো পূর্বপ্রকাশিত গল্পের সিনেমা-রূপই একটা পুনঃসৃষ্টি হতে বাধ্য। সেখানে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি নূতন এক সত্তার সৃজনশীলতার তাগিদে পুরাতন কাহিনীটার নবজন্মলাভ। ঠিকই, সত্যজিতের ছায়াছবির চরিত্রদের মিথস্ক্রিয়াগুলি 'নষ্টনীড়'-এর

চরিত্রদের মিথস্ক্রিয়াগুলির থেকে কোথাও কোথাও একটু ভিন্ন স্বাদের। সত্যজিতের নায়িকা পরিশীলিত, সূক্ষ্মভাবে সংবেদনশীল। সত্যজিৎ তাকে কল্পনা করেছেন; সেই কল্পনার জোরে সে আমাদের কাছাকাছি। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের নায়িকা তার আপন সময়ের; তার মধ্যে আরেকটু সাবেক ঘরানার কুচুটেপনা আছে। মন্দার সঙ্গে অমলের ঘনিষ্ঠতায় ঈর্ষান্বিতা চারু ভূপতির কাছে তার প্রতিযোগিনীর নামে এই ধরনের ভাষায় নালিশ করতে দ্বিধা করে না: 'কিছুদিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না। ... অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লজ্জা হয়। ... বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।' রবীন্দ্রনাথের নায়িকার কণ্ঠস্বর এখানে সত্যজিতের নায়িকার কণ্ঠস্বরের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। আর মজা এই যে এখানে রবীন্দ্রনাথের চারু তার নবীন সত্তার ক্রিয়াকলাপকে বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্যেই প্রাচীনার কণ্ঠস্বর অবলম্বন ক'রে কথা বলছে। ভারী উপভোগ্য এই আয়রনি, তার এই কামুফ্লাজ।

এখন থেকে একশো বছর আগে লেখা ঐ গল্পটা যে কী-আন্দাজ সেকালের একেলে গল্প তা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের ঐতিহাসিক বোধকে জাগ্রত রাখা দরকার। কবির চারুলতা

> নির্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, "অমল, অমল, অমল!" সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।"

আপনারা ভুলবেন না যে এই সময়ে প্রবাসী অমলের 'ম্যারিটাল স্টেটাস'ও বিবাহিতেরই বটে। সেকালের প্রাচীনারা কি এই বেহায়াপনায় শিউরে উঠতেন না?

রবীন্দ্রনাথের সেয়ানা নায়িকা চাকরকে দিয়ে গোপনে বাজারে গয়না বন্ধক রাখতে পাঠায়। সেই টাকা দিয়ে সে অমলকে বিলেতে প্রি-পেইড তার পাঠায়। যতদূর বুঝি, রিটার্ন টেলিগ্রাম ফেরত আসবার তারিখটা পর্যন্ত হিসাব ক'রে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে সে ভূপতিকে ছুতো ক'রে শ্যালীসন্দর্শনে চুঁচড়োয় পাঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু একালের মতো সেকালেও 'হাবড়া-স্টেশন-অভিমুখে' যেতে প্রতিবন্ধক থাকায় 'একসার গোরুর গাড়ি'র যানজটে চারুর সুরচিত প্ল্যানটা ভণ্ডুল হয়ে যায়। টেলিগ্রামটা নির্জনে তার হাতে না প'ড়ে পড়ে ভূপতিরই হাতে।

সন্দেহ নেই, 'নষ্টনীড়'-এর চারু সেকালের একজন উদীয়মানা নবীনা, যেমন ছিলেন তাঁর নিজের জীবনে ও সমাজে তরুণী ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো। তফাৎ এই— চারুর প্যাশনকে সহমর্মী স্বীকৃতি দিলেও সেটাকে তার কানা গলির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার কোনো উপায় রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান নি, আর ভিক্তোরিয়া তাঁর স্বামীর তুতো ভাইয়ের

সঙ্গে অনেকগুলি বছর ধ'রে 'অ্যাফেয়ার' করেছিলেন, কিন্তু তা করেছিলেন গোপনে, কেননা বাবা-মা-সমেত তাঁর সমাজের প্রাচীন-প্রাচীনাদের সঙ্গে সম্মুখসমরে তিনি নামতে চান নি। এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে একালের মতো সেকালেও নারীর আর পুরুষের আচরণের নৈতিকতা এক মানদণ্ডে মাপা হতো না। যে-পিতার মনে আঘাত দেবার ভয়ে সেকালের নবীনা ভিক্তোরিয়া তাঁর অসামাজিক প্রেমকে আড়ালে রাখলেন, শুনেছি সেই পিতাই প্যারিসে 'রক্ষিতা' রাখতেন। ধনী আর্জেন্টাইন পুরুষদের জীবন ঐরকমই ছিলো। পত্নীরা তা মেনেই নিতেন।

আবারও আমাদের সময়ে তীব্র হয়ে উঠেছে সেকেলে-একেলের একটা দ্বন্দ্ব। মন্দা-বোঠান চারু-বোঠানদের সময় থেকে আধুনিকীকরণের বেশ কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে আমরা এসে পড়েছি আরেক যুগের দেহলীতে, যখন অগ্রবর্তী প্রজন্মের আধুনিকতম আধুনিকতাও আমাদের এখনকার জীবনের সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় আশানুরূপ সুফল দিচ্ছে না। ঘরে-বাইরে যান্ত্রিক প্রযুক্তিকে যেমন মধ্যে মধ্যে বদলে ফেলার দরকার হয়, তেমনি আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও একেকসময়ে নতুন ধরনের ম্যানেজমেন্ট-নৈপুণ্যমালা দরকারী হয়ে পড়ে। এ কথা যাঁরা বুঝতে পারেন তাঁরাই একটা সময়ের নবীন-নবীনা, বয়স তাঁদের যেমনই হোক না কেন। যাঁরা এই পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান না, আধুনিকতা যাঁদের কাছে প্রতিভাত হয় এখনই হাতে-পেয়ে-যাওয়া অচঞ্চল একটা নকশার মতো, যেখানে প্রতিসাম্য সম্পূর্ণ, যার মধ্যে শেষ টানগুলো যোগ করা হয়ে গেছে, তাঁরা যুবকযুবতী হলেও মনের দিক দিয়ে প্রাচীন-প্রাচীনা।

বর্ধিত আয়ুষ্কাল, হ্রাসপ্রাপ্ত জন্মহার, জনসংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখবার স্বীকৃত প্রয়োজনীয়তা, কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশিল্পের কমবেশী যন্ত্রায়ন, গণমাধ্যমগুলি-সমেত আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিস্তার, স্ত্রীপুরুষের সাম্যের দিকে যাত্রা করার একটা প্রয়াস, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আর্থিক স্বনির্ভরতা থেকে শুরু ক'রে শিক্ষা-সংস্কৃতি-অবসরের একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে এই তত্ত্বের অন্ততঃ একটা প্রাথমিক স্বীকৃতি, ব্যক্তির বৃদ্ধির প্রতি একটা অঙ্গীকারবদ্ধতা : এই-সমস্ত ঘটনার পরস্পরসহযোগী ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া অনবরত যে-সব নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে তাদের মুখোমুখি আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলির পরিচালনা যে নতুন নতুন নিপুণতা দাবি করবে না এইটে মনে করাই মানসিক প্রাচীনতার লক্ষণ। আপনি কি মা হয়ে আপনার ছেলেটির বোতাম সেলাই, জামা ইস্ত্রি থেকে টিফিন প্যাক ক'রে দেওয়া আর জলখাবার এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ হয় নিজে ক'রে দেন, নয়তো অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেন? তা হলে আপনি প্রাচীনা, এবং নিজের হাতেই ছেলেটির পা মচকাবার গর্ত খুঁড়ছেন। পরশ্রমমুখাপেক্ষী যে-মানসতা নিয়ে সে যুবকত্বে পৌঁছবে তা তার ভাবী জীবনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে। হয়তো মনে মনে ভাবছেন, আপনার রত্নোপম পুত্রটি 'পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট' ক'রে এত ভালো একটা চাকরি বাগাবে, এত এত টাকা মাইনে পাবে যে তার জন্য খাটবার লোকের অভাব হবে না, তাই আপাততঃ সে উদয়াস্ত পড়াশোনাই করুক, পরীক্ষার পর পরীক্ষায় প্রতিযোগীদের শীর্ষে থাকার চেষ্টা

করুক, বাজে কাজে সময় নষ্ট না ক'রে। অবশ্যই আপনার এই চিন্তায় অনেক রকমের গোঁজামিল আছে। প্রত্যেকেই শীর্ষস্থান অধিকার করবে না। প্রত্যেকেই মোটা মাইনের চাকরি পাবে না। কাজের লোক পাওয়া ক্রমশঃ সহজতর হবে না, কঠিনতরই হবে। দেশের উন্নতির মানেই তাই। সমাজের বিভিন্ন থাকের লোকেদের যে-অন্যোন্যজীবিত্ব আপনাদের দৈনিক জীবনকে সচল রাখে তা কোনো নিত্য বস্তু নয়। তা যে কখন কিভাবে বিপন্ন হবে তা আগে থেকে বলা যায় না। এই আমাদের অল্প বয়সেই মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে পুরুষ ভৃত্য দেখেছি। আজ পরের সেবা করার প্রায় পুরো বোঝাটাই এসে পড়েছে মেয়েদের ঘাড়ে। তাদের মধ্যে বাড়ির মেয়েরা আছে, কাজের মেয়েরাও আছে। কাছের বস্তি, দূরের গ্রাম, বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে নিঃস্ব মেয়েরা বরাবরই ঠিকে খাটতে আসবে এমন প্রত্যাশা না রাখাই ভালো।

সব চেয়ে গোলমেলে ব্যাপারগুলো ঘটবে আপনার পুত্রের জীবনের ভিতরমহলে। সে যত উচ্চশিক্ষিত হবে, ততই নিজের পছন্দ অনুসারে সঙ্গিনী নির্বাচন করবে। সেই মেয়েটিরও উচ্চশিক্ষিত হবারই সম্ভাবনা। সে প্রথম দিকে যেমনই ভাবুক বা বলুক না কেন, সে মোটেও আপনার পুত্রের সেবায় তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করতে সম্মত হবে না, তা সে আপনার ছেলের যত অনুরাগিণীই হোক না কেন। সম্ভবতঃ সন্তানবতী হবার আগে থেকেই সে দুরূহতর সার্থকতার অন্বেষণে চঞ্চল হয়ে উঠবে। তা ছাড়া অধিকাংশ পরিবারে তার রোজগারের টাকাটাও নিতান্ত দরকারী হতে পারে। সংক্ষেপে, ঘর থেকে তাকে বেরোতে হবেই, এবং গৃহকর্মে তথা শিশুপালনে আপনার ছেলের কাছ থেকে ঠিক সময়ে ঠিক সহযোগিতাটুকু না পেলে একদিন না একদিন সে তাকে কথা শোনাবেই। মেয়েরা অনেক দিন পর্যন্ত মুখ বুঁজে কাজ করে, কিন্তু তাদের চাপা ক্ষোভ একদিন না একদিন ছিটকে পড়বেই। এ কথা লিখে দেওয়া যায়।

দেখতেই পাবেন, আপনার নিজের মেয়েটিও অবিকল একই পথ ধ'রে চলেছে। সে যা করছে তা যদি অনুমোদন করেন, তা হলে ছেলের বৌয়ের বেলায় কোনো আপত্তি খাটাতে পারবেন না। মেয়ের বেলায় এক নিয়ম, পুত্রবধূর বেলায় অন্য নিয়ম— তেমন মুদ্রা চালাতে চাইলেও চলবে না।

আর যদি মনে মনে ভেবে থাকেন, পোড়া দেশটার সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে আপনার হীরের টুকরোটি (ছেলে অথবা মেয়ে) আমেরিকায় গিয়ে সোনার খনির গা ঘেঁষেই বাসা বাঁধবে, তা হলে তো আপনার হিসাবে গোড়া থেকেই শোচনীয় গলদ হয়ে আছে। সে-ক্ষেত্রে আপনার সন্তানটিকে অনেক আগেই যথাসাধ্য স্বাবলম্বী ক'রে গ'ড়ে তোলা উচিত ছিলো, তাকে দেওয়া উচিত ছিলো ঘরে-বাইরে বিচিত্র কর্মনিপুণতা অর্জনের অবাধ অধিকার। তার সুখসন্তোষ, কর্মসংস্থান, চাকরির চুক্তি, দাম্পত্য স্বাচ্ছন্দ্য— কোনোটাই যে সে-ক্ষেত্রে কোনো অক্ষয় শান্তিপারাবারের উপর দিয়ে পাল তুলে ভেসে যাবে এমন আশা মনে পুষবেন না। পুষলে নিজের প্রৌঢ় জীবনে আশাভঙ্গের দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না।

বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে এক নব্য পৌত্তলিকতা। একে বলা যেতে পারে একরকমের সোনার পাথরবাটিতে বিশ্বাস। পাশ্চাত্য সভ্যতার জড়সম্পদগুলি তাদের টানছে। একই সঙ্গে তারা দুরাশা পোষণ করছে যে পাশ্চাত্য জীবনের জটিলতাগুলিকে এড়িয়ে কোনো সনাতন ভারতীয় সত্যশিবসুন্দর সামঞ্জস্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। যদি আপনার মধ্যে এই আত্মছলনা থাকে তা হলে আপনি প্রাচীন বা প্রাচীনা। সমস্যাদের পাশ কাটাবার ওরকম কোনো ঈস্টার্ন বাইপাস্ জীবনে মেলে না। আপনার অন্তর্বিরোধী আকাঙ্ক্ষাদের জাতক কোনো বিস্ফোরক সংকটের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

হয়তো আপনি এমন পরিশীলিত মনের অধিকারী যে জড়সম্পদের প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণকে চেতন অথবা অবচেতন মনে স্বীকার করেন না। আপনার আস্থা ন্যস্ত হয়ে আছে উচ্চশিক্ষা, সূক্ষ্ম রুচি, কর্মসাফল্য ও ব্যক্তিগত বৃদ্ধির উপরেই। সে-ক্ষেত্রে আপনার পক্ষে আরোই বেশী জরুরী হবে নিজেকে নবীন রাখা— কখন যে কোন্ অ্যাডজাস্টমেন্টটার প্রয়োজন হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। নিজের স্বার্থেই আপনাকে হয়ে উঠতে হবে নবীন বা নবীনা। ত্বরিত পরিবর্তনের যুগে উত্তরণের রহস্য নিহিত নমনীয়তার মধ্যেই।

§

সৌদি আরব দেশের একটি উচ্চশিক্ষিত তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, যিনি তাঁর দেশের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক বিদ্যুন্নিভ নবীনা যে আমাদের চোখ ঝলসে যায়। ইনি বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, একেবারে ডক্টরেট পর্যন্ত। আপাততঃ তার পরবর্তী পর্যায়ের গবেষণায় লিপ্ত আছেন। অশনে বসনে কেশচর্চায় একজন পাশ্চাত্য নারীর সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্যই দেখা যায় না। বড় জোর বলা যায় যে তিনি গড়পড়তা পাশ্চাত্য মেয়ের চাইতে আরেকটু শৌখিনভাবে সাজেন, আরও দামী পোশাক পরেন। মাথায় কাপড় দেন না, গেট্-টুগেদারে দু'-এক পাত্র মদিরাও প্রত্যাখ্যান করেন না। নিজে গাড়ি চালিয়ে লণ্ডন আর অক্সফোর্ডের মধ্যে যাতায়াত করেন, বেতার-টেলিফোনের সাহায্যে খবর নিয়ে নেন বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরেছে কিনা। তাঁকে বিয়ে করবার জন্য তাঁর পাকিস্তানী স্বামীকে সৌদি আরব দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সেখানে ব্যবসা আরম্ভ করতে হয়েছে, নয়তো ঐ বিয়ে সৌদি রাষ্ট্রের অনুমোদন পেতো না। দেশের আইনের বাইরে বিয়ে করলে মেয়েটি বহিষ্কৃত হতেন এবং দেশে আসা-যাওয়া আর করতে পারতেন না। এখন তিনি লণ্ডনে থেকেও প্রায় প্রত্যেক মাসেই একবার ক'রে বাপের বাড়ি যান— টাকাটা তাঁদের জীবনে স্পষ্টতঃ কোনো সমস্যাই নয়। এই ধরনের একটি কৃতী নবীনার আনাগোনা তাঁর আপন সমাজের আত্মীয়মহলে যে কী হারে নানা নবীনতা আমদানি ক'রে চলেছে তা কল্পনা ক'রে নেওয়া যায়। সুর্মা-আঁকা বড় বড় কালো চোখদুটি মেলে, আল্লার নামাঙ্কিত

চৌকো আকারের কর্ণাভরণ দুলিয়ে তিনি যখন ব্যাখ্যা করতে থাকেন কিভাবে পারিবারিক পার্টিতে চাদরে হাত আর ঠোঁট আড়াল ক'রেও পুরুষ অতিথিদের সামনে খাদ্যগ্রহণ করা সম্ভব, তখন আমরাও চোখ বিস্ফারিত ক'রে তাঁর কথা শুনি, যেন রূপকথা শুনছি। তিনি দেখতেও এমন অসাধারণ সুন্দরী, কথাবার্তা বলেনও এমন চমৎকার, যে আমরা চোখ ফেরাতে পারি না। দু' পাত্র মদিরা সেবনের পর একবার তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর স্বামী যদিও নানাভাবেই তাঁর সহযোগী, তবু তাঁর পতিসুলভ স্বত্বাধিকারবোধ তাঁকে মধ্যে মধ্যে পীড়া দেয় ...। তাঁর কাছে শুনেছি, সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা আর ছেলেরা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ক্লাস করে। পুরুষ অধ্যাপকদের বক্তৃতা মেয়েরা শুনতে পারে কেবল টেলিভিশনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রযুক্তির আবার একটা নিজস্ব ন্যায় আছে। টেলিফোন-নামক যন্ত্রটি সৌদি সমাজে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। ছেলেদের দেখা পাওয়া কঠিন হলেও সৌদি মেয়েরা আজকাল ছেলেদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলছে। 'ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আপনার প্রেমিকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব, সে-ঘরে আপনার স্বামী থাকলেও— ব্যাপারটাকে 'আজকাল এভাবেই বলা হয়ে থাকে,' জানালেন তিনি। টেলিফোনের ছিদ্রপথে এই রক্ষণশীল সমাজে বন্যার মতো যে-পরিবর্তন প্রবেশ করছে তাকে কি আর রোখা যাবে?'

§

আরেক পরিপার্শ্বে অন্যরকম অবস্থার দুঃসহ চাপ যে কিভাবে একটি আত্মপ্রতারণায় অনিচ্ছুক, জিজীবিষু মনের ত্বরিত নবীনায়নের সহায়ক হতে পারে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের তসলিমা নাসরিন। ইনি পেশায় ডাক্তার। কবিতা-উপন্যাসও লেখেন, যদিও সে-সব দেখার সুযোগ আমার হয় নি। আমি তাঁকে জানি কেবল একটি বইয়ের মাধ্যমে। সেটি হচ্ছে তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত গদ্যরচনার সংকলন *নির্বাচিত কলাম* (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২)। ইনি এমন এক নবীনা, যাঁর লেখা প'ড়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা করে।

তসলিমার অবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং তাঁর স্পষ্টবাদিতা আমাকে যতটা আনন্দ দিয়েছে, ততটাই বিষণ্ণ করেছে তাঁর কলমের আগায় ফুটে ওঠা বাংলাদেশের সমাজের মর্মান্তিক ছবিটা। বিশেষতঃ বিষণ্ণ করেছে এই কারণে যে আমি অবিভক্ত বাংলায় জন্মেছিলাম এবং আমার পারিবারিক শিকড়বাকড় এককালে প্রোথিত ছিলো পূর্ববঙ্গেরই মাটিতে। যদিও সাতচল্লিশ সালের পর আমি ওদিকে কখনো যাই নি, তবু 'জন্মভূমি' বলতে একজন মানুষ যা বোঝে বাংলাদেশ আমার কাছে তারই অন্তর্গত এলাকা। আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। না ভেবে পারছি না, তিনি আজকে বেঁচে থাকলে এই বইটা প'ড়ে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হতো।

মাত্র কিছু দিন আগেই একটি মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী মেয়ে আমাকে বলছিলেন, বাংলাদেশের মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের মতো হাতকাটা ব্লাউজ প'রে রাস্তায় চলাফেরা

করতে পারেন না। কথাটা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছিলো আমার, যদিও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে জানি যে একটা সীমানার এপারে আর ওপারে সামাজিক অবস্থায় উল্লেখযোগ্য তফাৎ হয়, হয়ে থাকে। জন্মনিয়ন্ত্রণ আর গর্ভপাতের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডে আর আয়ার্ল্যাণ্ডে যেমন তফাৎ। বাংলাদেশের মেয়েদের পক্ষে বাহু অনাবৃত রেখে চলাফেরা করা যে নিরাপদ নয়, তসলিমার বইখানার প্রথম পাতাতেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেয়ে চমকে উঠতে হলো।

অবাক হতে হয়েছে নানা খুঁটিনাটিতেই। পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা কি ভাবতে পারেন যে বাসে চড়লে কণ্ডাক্টর সোজাসুজি ভাড়া না চেয়ে জিজ্ঞেস করবেন, আপনার সঙ্গের লোক কই? যে বাংলাদেশের ছেলেরা বিয়ের আগে হবু বৌয়ের সঙ্গে শর্ত করতে পারেন, বিয়ের পরে গান গাওয়া চলবে না? যে কোনো স্বামী গর্ব ক'রে বলতে পারেন, বিয়ের পর তিনি তাঁর স্ত্রীর নাচা বা ছবি আঁকা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন? তসলিমা বলছেন যে মেয়েদের তাস খেলাও বারণ। হায় হায়, মন্দা-বোঠান চারু-বোঠান কত দিন আগেই তাস খেলার অধিকার অর্জন করেছিলেন!

কিন্তু এগুলো তো একটা রোগের ছোট ছোট উপসর্গমাত্র। তসলিমার প্রতিবেদন যদি বিশ্বাস করতে হয় তা হলে বলতে হবে যে নারীর বর্বরতম অবদমন এবং নির্মমতম নিপীড়ন প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের কাল্‌চারের একেবারে মজ্জার ভিতরে। যেন তাঁদের যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার জন্য সে-দেশের পুরুষরা মেয়েদের উপরেই প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই ব্যাপক হীনবীর্য হীনম্মন্যতার ছবি পাঠককে বিষণ্ণ না ক'রে পারে না। আর তসলিমার সাক্ষ্যের একটা বড় মূল্য হচ্ছে এই যে সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে মেয়েদের শারীরিক-মানসিক দুরবস্থাকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

এই হিংস্র নারীদমনে ধর্মীয় গোঁড়ামির কলঙ্কময় ভূমিকাকে লেখিকা যেভাবে নিরাবরণ করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। তৃতীয় দুনিয়ার ইসলাম-শাসিত দেশে ধর্মের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে সাল্‌মান্‌ রুশ্‌দির *শয়তানী পদাবলী*-র চাইতে এই ধরনের বই স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে ঢের বেশী প্রাসঙ্গিক। রুশ্‌দির বইখানাতে যত চাতুর্যই থাক, তা ইংরেজীশিক্ষিত আন্তর্জাতিক এলিটের দিকে দৃষ্টি রেখে, তাদের কাছ থেকে হাততালি কুড়োবার আশায় লেখা। তাতে দন্তস্ফুট ক'রে তার ভিতর থেকে সাহিত্যরস তথা সমাজসমালোচনাকে নিংড়ে বার ক'রে নেওয়া সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য পাঠকের পক্ষেও কোনো সহজ কাজ নয়। তা ছাড়া রুশ্‌দির নিজের মূল্যবোধের কোনো কোনো দিক সম্পর্কে আমরা মোটেও নিশ্চিত নই। তাঁর লেখায় মেয়েদের প্রতি কোনো কোমল অনুভূতি ফুটে তো ওঠেই না, বরং একটা অবজ্ঞা আর ঘৃণার ভাবই প্রতীয়মান হয়। তাঁর বই বাংলাদেশের মতো দেশের গড়পড়তা শিক্ষিত পাঠকের মনের দরজায় পৌঁছনোর ক্ষমতা রাখে না, কেবল জনশ্রুতির উত্তেজনায় অন্ধ প্রতিক্রিয়াকে দৃঢ় করতে পারে। তসলিমার এই বই প্রবলতর অভিঘাত সৃষ্টি করতে সমর্থ। এ বই তো পোড়াবার আগে প'ড়ে নেওয়া যাবে। বুঝে নেওয়া যাবে প'ড়ে চোখে জল আসে কিনা। এখানে নেই কোনো জটিল রূপকের

কারসাজি। এর মানে এই, ওর মানে ঐ— এভাবে বীজগণিত ক'ষে ক'ষে তাৎপর্য বার করতে হবে না। এই বইয়ের প্রত্যেক পাতা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি বেত্রাঘাত।

নারীদমনে ইসলাম অবশ্যই একক নয়। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় অনুশাসন তথা আচার-অনুষ্ঠানও একই ভূমিকা পালন করে। তসলিমাও তা জানেন এবং উদ্ধৃতিসহকারে দেখিয়েছেন।[২] তবে মনে রাখা ভালো যে ধর্মে পুরুষতন্ত্রের অধিষ্ঠান কিন্তু একদিনে হয় নি। এককালে সৃষ্টিরহস্যের ধারয়িত্রী হিসাবে স্ত্রীশক্তিই পূজিতা ছিলো। দেবীদের প্রাধান্যকে হটিয়ে তবেই পুরুষ দেবতারা এবং তাদের প্রবক্তারা মঞ্চ দখল করেছে। একটা রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস ওখানে চাপা প'ড়ে আছে। পুরুষরচিত নারীবিদ্বেষী শাস্ত্রবাক্য আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে সেই চাপা-দেওয়া ইতিহাসের পিঠের উপর দিয়ে। একেশ্বরবাদ দ্বারা আরব দেবীদের দমনের একটা ইতিহাসকে তাঁর *শয়তানী পদাবলী*-র অন্তর্গত করা রুশ্‌দির অভিপ্রেত, কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি এত সব কায়দা অবলম্বন করেছেন যে সে-চেষ্টা থেকে অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে কোনো ফায়দা হয় না। দেবীদের উত্তরাধিকারের অবশিষ্ট কিছু উপাদান প্রায় সব ধর্মীয় ঐতিহ্যের ফাঁকে-ফোকরেই লুকিয়ে থাকে। পুরুষতন্ত্রের প্রতিরোধে তাদের একটা গুরুত্ব আছে এবং ফেমিনিস্ট বিশ্লেষণে তাদের একেবারে পাশ কাটানো সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কেননা এগুলি নারীত্বের কিছু বিকল্প চিত্রকল্পকে জীইয়ে রেখেছে এবং সেগুলি মধ্যে মধ্যে মেয়েদের কাজে লেগেছে। এগুলি থেকে প্রয়োজনমতো অনুপ্রেরণা ও শক্তি সংগ্রহ করা যায়। বিশেষতঃ বাঙালীদের ক্ষেত্রে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি দেবীপূজার প্রবল উপস্থিতি বাঙালী হিন্দুদের কাল্‌চারের একটি বৈশিষ্ট্য। এই সহাবস্থান যে-টেন্‌শন সৃষ্টি করে তা অবশ্যই এই সংস্কৃতিকে নারীমুক্তির অভিমুখে একটা মানসিক উন্মুক্ততা দেয়। আমরা যারা এর ফল ভোগ করেছি তারা কথাটা অস্বীকার করতে পারি না।

সে যাই হোক, তসলিমার অনেক বিশ্লেষণই ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও খুবই প্রাসঙ্গিক, এবং পশ্চিমবঙ্গেও বইটির ব্যাপক প্রচার কাম্য। তাঁর ভাষার ধার তাঁর বক্তব্যকে অব্যবহিত প্রতিষ্ঠা দেয়। কিছু উদাহরণ দিই।

> এদেশে নানা জাতের অসাধু পুরুষ আছে, এদের মধ্যে পীর অন্যতম। (পৃঃ ৩১)

> মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে পরখ করে দেখি এই দেয়াল। দেখি তা কতটুকু অবৈধ লোহা আর অশ্লীল কংক্রিটে শক্ত হয়েছে এত। আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করে ভাঙে কিনা, পৃথিবীর সকল জিনিসই তো ভাঙে, সকল নিয়মই তো বদলায়। (পৃঃ ৫৫)

> আমাদের সমাজে মেয়েমানুষ হচ্ছে ডিসপোসেবল স্যানিটারি ন্যাপকিনের মত। এক-পুরুষ দ্বারা ব্যবহৃত হলেই সে অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে, আপাদমস্তক অযোগ্য হয়ে ওঠে। (পৃঃ ১২৩)

> সম্প্রতি এদেশের এক মেয়ে এবং ভারতের ছয় গরুর বিনিময় হচ্ছে চোরা পথে। ... আমার মনে হয় মেয়ে নিয়ে ওরা বরং ঠকেই যাচ্ছে। মেয়েমানুষের যেখানে দু' পয়সা মূল্য নেই, সেখানে ছয় গরু দিয়ে তাকে যারা সম্মান জানালো, আমি তাদের, সেই চোরাচালানীদের কাছে কৃতজ্ঞ। (পৃঃ ১৪৭)

> সর্বত্র বিরাজমান 'পতিত' পুরুষদের 'পতিত' বলবার রীতি শুরু হোক আজ থেকে। 'পতিত'দের চিহ্নিতকরণ এসময় খুব জরুরী। কারণ 'পতিত'রা নির্মূল না হলে 'পতিতা' জন্মাবেই। (পৃঃ ১৭৫)

আবার কখনও তাঁর ভাষা কবিতার মতো। এটা অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ কবিতা তো তিনি লেখেনই।

বুঝতে পারছি, কোনো কোনো সীমাবদ্ধ পাঠক বলবেন, তসলিমা একজন তিক্ত পুরুষবিদ্বেষী। বিশেষতঃ তিনি যখন স্পষ্ট ক'রেই অথচ কবিতা ঘেঁষে বিলাপ করেন, '... এই শহরে আমার যোগ্য একটি পুরুষও নেই। ... এই শহরে একটি সামান্য পুরুষও নেই যাকে আমি হৃদয়ের শেকড়-বাকড় উপড়ে বলতে পারি ভালোবাসি' ইত্যাদি। কিন্তু বুঝতে পারছি বেদনার কী সংরক্ত প্রাবল্য থেকে এই বিলাপ উচ্ছ্বসিত। আসলে তসলিমা তিক্ত নন, তিনি ক্রুদ্ধ ও বেদনার্ত।[৩] কতগুলো ন্যায্য কথাকে তিনি এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে উপস্থিত করেন যে তন্দ্রালুদের মন চোখ রগড়ে উঠে বসবে।

> সৎ এবং সততার সঙ্গে 'সতী' শব্দটির যদি সামান্য সম্পর্ক থেকে থাকে তবে আমি মনে করি একটি মেয়ে দশটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও 'সতী' থাকতে পারে এবং একটি মেয়ে কেবল একটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও 'অসতী' হতে পারে। (পৃঃ ১৭)

> পশুর মত আচরণকে পাশবিক বলা হয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত, চার পশু একত্র হয়ে যত নিচেই নামুক, এত নিচে নামে না— যত নিচে পুরুষেরা নামে। তাই, এ ধরনের অত্যাচারকে 'পুরুষিক' অত্যাচার বললে অত্যাচারের নির্মমতা ভাল আন্দাজ করা যায়। (পৃঃ ১০৫)

দুই ব্যাপারেই আমি তাঁর সঙ্গে একমত। তসলিমা দুঃখ ক'রে লিখেছেন, আর যাঁরা লেখেন তাঁরা কেউ তাঁর মতো একা নন। তাঁকে জানাই, তিনি একা নন, আরও অনেকেই তাঁর সঙ্গে আছেন। বস্তুতঃ তাঁর নানা চিন্তার সঙ্গেই আমার নিজের চিন্তার অনুরণন আছে। আমার লেখার সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে তিনি হয়তো তা জানেন না। তাঁকে জানাই, পুংলিঙ্গ 'বন্ধ্য' বিশেষণটি আমি নিজে ব্যবহার ক'রে থাকি। আমার কবিতার বই *সবীজ পৃথিবী*-র ৪২ পৃষ্ঠায় দেখবেন একটি লাইন আছে: 'বন্ধ্য বৃষ্টি পাখা ঝাপ্টাচ্ছে'। ওটা সচেতন প্রয়োগ। অসম্ভব আয়রনির সঙ্গে তিনি যখন সব পুরুষদের 'দেবো' শব্দটি বর্জন করতে বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারি। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না। সে তেমন কোনো গাছের ফল নয় যে কেউ কাউকে পেড়ে হাতে ধরিয়ে দিতে পারে। স্বাধীনতা লিঙ্গনির্বিশেষে প্রত্যেককে তিলে তিলে অর্জন করতে হয়। তাঁকে আরও জানাই, কবি এডিট্ স্যোডারগ্রান সম্পর্কে আমার একটি আলোচনা আমার প্রবন্ধসংকলন *ভাবনার ভাস্কর্য*-এ তিনি দেখতে পাবেন।

মলাটের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তসলিমার বইটি তাঁর নিজেরই নানান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত। কতগুলি ব্যক্তিগত উপাদানকে খাঁটি ব্যক্তিগত উপাদান হিসাবেই মেনে নিচ্ছি। সেগুলি প্রায় স্বীকারোক্তির মতন, এবং তাঁকে বুঝতেও আমাদের সাহায্য করে। স্পষ্টতঃ বুদ্ধির চর্চার প্রতি তাঁর আনুগত্যকে তিনি পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে, যদিও সে-লালনের মধ্যে মিশে ছিলো একধরনের কঠোর শাসনও, যার মধ্যে আমরা পিতৃতন্ত্রের একটা অবদমনাত্মক দিককেও দেখতে পাই, যাকে মানতে ইচ্ছে করে না। সেই দিকটা কি তসলিমার মনে কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি?[৮] তাঁর পিতা-কর্তৃক পাথর মেরে বালিকা কন্যার হাত থেকে দু'ডজন কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলার দৃশ্যটা কিন্তু মর্মান্তিক এবং দ্ব্যর্থক। তসলিমা নিশ্চয় তা বোঝেন। বুঝেই লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আমার *জলের করিডর ধ'রে* বইটির অন্তর্গত 'চুড়ি' কবিতাটি প'ড়ে দেখতে পারেন। কবিতাটি পশ্চিমবঙ্গে অনেকে পছন্দ করেন।

হাবিব নামে ছেলেটির জন্য (বা তার অন্তরালে যে আছে তারই জন্য) আমাদের কিছুটা কষ্ট না হয়ে পারে না। পাঁচ বছরের বন্ধুত্বের পর বিবাহের প্রস্তাব ক'রে সে বেচারা তো সত্যিই কোনো অপরাধ করে নি। প্রস্তাবটা করেছে ব'লেই কি তার সঙ্গে চিরজীবনের মতো কথা বন্ধ ক'রে দিতে হবে? (না কি তাঁর ঐ ছাপা স্বীকারোক্তি একরকমের নতুন কথা-বলা, একজাতীয় 'দেতাঁত্'?) একটা নেতির মনোভাব তাঁকে এ প্রসঙ্গে *ঠেলে* দিয়েছে নৈরাশ্যের দিকে: '... ছেলে-মেয়েতে আসলে বন্ধুত্ব হয় না ... ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে আসলে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক হয় না। আত্মীয়তা এক ধরনের সংস্কারমাত্র।' কিন্তু এত দূর নিরাশ হবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এর উল্টো কথা বলে।

স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে নানা স্বাদের বন্ধুত্ব এবং নানা গোত্রের স্থায়ী সম্পর্ক সম্ভব, কিন্তু তাদের বিকাশের জন্য একটা অনুকূল পরিপার্শ্ব, স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই একটা সংস্কারমুক্ত

মানসতা লাগে। বন্ধুত্বের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক প্রাকৃত আকর্ষণ দেখা তো দিতেই পারে। দেখা দিলেই বন্ধুত্বটা অমনি 'নষ্ট' হয়ে যায় না। সে-উপাদান বন্ধুত্বের কোনো ক্ষতি না ক'রে বরং তাকে সমৃদ্ধতরই করতে পারে, যদি আমরা তাকে স্বাভাবিকভাবে, সহজভাবে নিতে শিখি। আমাদের সামাজিক লালনের ফলে যৌন ব্যাপারে আমাদের মনের মধ্যে অনেক রকমের সংস্কার দৃঢ়মূল হয়। সেগুলি স্ত্রীপুরুষের বন্ধুত্বের স্ফুরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সরাতে এক ধরনের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লাগে। সেই আবিষ্কারের পর 'নতুন পুরুষ' আর 'নতুন নারী' সমৃদ্ধতর 'অর্থে পরস্পরের বন্ধু হতে পারে। কিন্তু কোনো স্থায়ী সম্পর্কের মধ্যে বন্ধুত্বটাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের মধ্যে এই কারণেই অসুবিধা দেখতে পাই যে তা যৌন স্বত্বাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, বন্ধুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই স্বত্বাধিকার যুগোচিত নয় এবং আমাদের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে, আমাদের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। তসলিমা বাংলাদেশের পুরুষদের বহুগামী বিবাহের যে-ছবি এঁকেছেন তা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। তা স্পষ্টতঃই এক প্রকারের পুরুষতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার। কিন্তু আধুনিক হিন্দুরা যাকে গ্রহণ করেছে সেই খৃষ্টীয় স্টাইলের একগামী বিবাহও যৌন স্বত্বাধিকারের উপরই প্রতিষ্ঠিত— একজনের উপরে আরেকজনের স্বত্বাধিকারের উপর। এই মডেলও ত্রুটিযুক্ত। তা আধুনিক নারীপুরুষদের বৃদ্ধির চাহিদা মেটায় না। তাই আমরা কেউ কেউ এ-সব বিষয় নিয়ে নতুন ক'রে চিন্তাভাবনা করছি। আমাদের ধারণা, আবশ্যিক একগামিতা আর সুবিধাবাদী লাম্পট্য এ দুটোই আমাদের সামনে একমাত্র বিকল্প নয়। অন্য পথও আছে। অবশ্যই সে-পথ খুঁজে বার করতে এবং তাতে চলতে সাহস লাগবে। নবীনতার অন্তর্গত সেই সাহস।

ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। কাল্‌চারের ছোট ছোট অণু-পরিবর্তন থেকেও যে কিভাবে বড় বড় তাৎপর্যপূর্ণ পরিণাম ঘ'টে যায় তা ইতিহাস তো আমাদের বলেই, তা ছাড়া আমরা যারা একাধিক কাল্‌চারের মধ্যে ঘোরাফেরা করি বা নৃতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করি তারা নিয়তই এর উদাহরণ দেখতে পাই। বস্তুতঃ পরিবর্তনই একটা জীবন্ত মনুষ্যসমাজের ধর্ম। কয়েকটা ছোট উদাহরণ দিই। তসলিমা লিখেছেন, ওঁদের ওখানে ছেলেদের চুড়ি পরা টাবু, আভাস দিয়েছেন যে পুরুষের প্রসাধনচর্চা ওখানে তেমন প্রশ্রয় পায় না। বিলেতে অনেক ছেলে কেবল যে লম্বা চুল রাখে তাই নয়, রীতিমতো বেণীও বাঁধে। গলায় হার, কানে মাকড়ি, নাকে নথ, কব্জিতে ব্রেসলেট— কী না পরছে তারা আজকাল। স্বর্ণকাররা এর সুবিধাও নিচ্ছে। এলিজ়াবেথ ডিউক নামে এ দেশে নাম-করা জুয়েলার্স আছে: তাদের সংগ্রহে 'রবার্ট'-নামাঙ্কিত হারের লকেট, 'রিচার্ড', 'এডওয়ার্ড', 'ড্যানিয়েল' ইত্যাদি নামাঙ্কিত ব্রেসলেট যে আছে তা তাদের ক্যাটালগ থেকেই জানতে পারছি। অর্ডার দিলেই যে-কোনো নাম খোদাই ক'রে দেবে। এ-সব ফ্যাশনেরই ব্যাপার। বঙ্গেও 'স্বপন', 'তপন', 'হাবিব' ইত্যাদি নামাঙ্কিত আভরণ প্রচলিত হবার পথে কোনো বাধা নেই। চালালেই চলবে। বস্তুতঃ আমার তো ধারণা পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা কেশবেশ ও প্রসাধনচর্চার প্রতি মনোযোগ দিয়েই থাকে; বাংলাদেশ সম্পর্কে তসলিমার

অন্যরূপ প্রতিবেদনে আমার খটকাই লাগছে। সুগন্ধি দ্রব্যের কথা যদি বলেন তো বিলেতে এখন তার জয়জয়কার, এবং এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়েই অত্যন্ত মনোযোগী। এ ব্যাপারে একটা মূল পরিবর্তন এই যে তিন দশক আগেও শীতের দেশের লোকেরা স্নান করতো কম, এবং ধনী মেয়েরা স্নানাভাবের অসুবিধা মোচন করতো দামী সুরভির সাহায্যে। কিন্তু জীবনযাত্রার উন্নততর মানের ফলে অধুনা স্নানাধিক্যই রেওয়াজ। ফলে দেশ জুড়ে সাবান, শ্যাম্পু, কণ্ডিশনার, ত্বকের উপযুক্ত স্নেহপদার্থ ইত্যাদির প্লাবন বইছে। এ-সব সামগ্রীর উৎপাদকরা নিশ্চয়ই আনন্দে আছে। রাস্তা দিয়ে এক ঝাঁক ছেলে হেঁটে গেলে তাদের প্রি-শেইভ আর আফটার-শেইভের গন্ধে ফুটপাথ ম-ম করে।

এই ঘটনাগুলো নেহাৎ আপতিক নয় ; এদের একটা তাৎপর্য আছে। এদের অর্থ এই যে কোমলতা ও সৌন্দর্যচর্চা ছেলেদের পক্ষে এখন আর নিষিদ্ধ নয়, যার পরিণাম দূরপ্রসারী। এ-সমস্ত হলো গত দু' দশকের নারীবাদী আলোড়নের ফল। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, আমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকলে আজকালকার ছেলেদের 'মেয়েলীপনা' সম্বন্ধে অনেক কৌতুকমিশ্রিত 'প্রাচীন' শৈলীর মন্তব্য করতেন।

বলতে চাইছি যে পরিবর্তনে আমাদের আস্থা হারানো উচিত নয়। পরিবর্তনের স্রোত বইছেই। তসলিমা শুনে সুখী হবেন, কোনো মেয়ের পক্ষে 'বিয়ে করা' ক্রিয়াপদটা পশ্চিমবঙ্গে মোটেও অপ্রযোজ্য নয়, হামেশা ব্যবহৃত হয়ে থাকে,— 'বিয়ে বসা'টাই বরং একেবারে সেকেলে,— আর বিবাহের ভিতরে ধর্ষণ বিলেতে এখন অপরাধ ব'লে গণ্য।

মানুষকে না ভালোবেসে কিন্তু তাকে ভালোর দিকে ফেরানো যায় না। ভালোবাসতে হবে, কিন্তু অন্ধভাবে নয়, ভালোবাসাকে বুদ্ধির দ্বারা শোধিত ক'রে নিয়ে। প্রত্যেক নবীনা যদি অন্ততঃ একজন পুরুষকে 'নবীন পুরুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করেন, তা হলে বোধ হয় অনেকটা দূরই অগ্রসর হওয়া যায়। যাঁদের আত্মবিশ্বাস বেশী তাঁরা না-হয় দু'-তিনজনকে সাহায্য করবার দায়িত্ব নিন।

বলছি না যে ক্ষমতার কাঠামোগুলোর সঙ্গে লড়াইকে স্থগিত রাখতে হবে। তা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। তবে কাঠামো ভাঙার লড়াই এত সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য যে তা থেকে নৈরাশ্য জন্মাতে পারে। নৈরাশ্য এড়ানোর জন্য ছোট ছোট ব্যক্তিগত মাপের লড়াইগুলোকেও অব্যাহত রাখতে হবে, যেখানে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। কেবলই দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নয়, সংগ্রাম লাগবে একাধিক ফ্রন্টে : নবীনাদের প্রতি এইটেই আমার পরামর্শের ব্লুপ্রিন্ট।

অনুমান করি তসলিমাও পরিবর্তন আনতে চান, নয়তো এ-সব কলাম লিখবেন কেন। এবং এখানে বলি, তাঁর বইটির প্রথম প্রকাশক কে, টুকরোগুলি সর্বপ্রথম কোন্ কোন্ কাগজে প্রকাশিত হয়, এ-সব খবর পেলে আমি খুশী হতাম। ঝুঁকি নিয়েও কেউ কেউ তাঁর সাহসী লেখা প্রকাশ যখন করেছেন, তখন তসলিমা পুরোপুরি নিঃসঙ্গ নন। নবীন মনোভাবের আরও কেউ কেউ নিশ্চয় ওখানে আছেন।

মেয়েরা সর্বদাই শিকার বা বলি নন। প্রতিরোধও তাঁরা করতে পারেন, এবং করছেন। এবং পুরুষদের মধ্যে তাঁদের সহকারীরাও রয়েছেন। বাঁদীদের উপরে প্রভুত্ব করার চাইতে নবীনাদের সঙ্গে সমকক্ষ সৌহার্দ্য ঢের বেশী মজার, এইটে যখন পুরুষরা টের পান. তখন তাঁরা নবীনাদের সহযোগীই হয়ে ওঠেন। পুরুষদের বোঝাতে হবে যে এতে তাঁদেরও লাভ। নবীনায়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য বটে, তবে বিদ্যায়তনের কাগজ-কলমের শিক্ষাটাই বড় কথা নয়। ডিগ্রী-ডিপ্লোমাগুলোর মধ্যে কোনো পরশপাথর নেই। ডক্টরেট-পাওয়া বহু প্রাচীন-প্রাচীনা জীবনে দেখেছি। নবীনায়নের আসল কলকব্জা হলো জ্ঞানের প্রয়োগ, বাস্তব জীবনে বৌদ্ধিকতার সজীব ব্যবহার।

১ এই মহিলা এখনও লণ্ডনে আছেন। সৌদি আরব রাষ্ট্রের রাজনীতি এবং সামাজিক অন্তর্বিরোধগুলি সম্পর্কে তাঁকে মধ্যে মধ্যে বিশেষজ্ঞরূপে মতামত দিতে দেখি টেলিভিশনে।

২ এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা থেকে ঋণস্বীকার না ক'রে কিছু উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, এ নিয়ে সে-সময়ে সঙ্গত কারণেই কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তসলিমা সম্প্রতি এ ব্যাপারে তাঁর গাফিলতি স্বীকার করেছেন।

৩ বিরানব্বই সালে শুধু ঐ একটি বই *নির্বাচিত কলাম* প'ড়ে এ কথা লিখেছিলাম। তার পর তাঁর অন্যান্য লেখা— কবিতা, উপন্যাস, আত্মজীবনীর বিভিন্ন খণ্ড— প'ড়ে আমার মনে হয়েছে যে তিনি তিক্ততা অথবা পুরুষবিদ্বেষ দ্বারা আক্রান্ত নন এ অবস্থান আর বজায় রাখা যায় না। তাঁর ক্রুদ্ধ এবং বেদনার্ত হবার অধিকার আমি স্বীকার করি। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা তাঁকে সেই ক্রোধ এবং বেদনা প্রকাশ করার এক্তিয়ার দিয়েছে। কিন্তু জীবন যেমন আমাদের খানিক গড়ে, আমরাও তেমনি আমাদের জীবনকে গ'ড়ে-পিটে যথাসাধ্য নির্মাণ ক'রে নিই, নিতে হয়। 'বিপরীত খেলা'র মতো কবিতাকে বা *ফরাসি প্রেমিক*-এর মতো উপন্যাসকে পুরুষবিদ্বেষী বললে সত্যের অপলাপ হয় না। তসলিমার রচনা সম্পর্কে আমি পরবর্তী কালে বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু-কিছু লিখেছি। সেগুলি আমার প্রবন্ধসংকলনের কোনো আগামী পর্যায়ে সংকলিত হবে।

৪ আজ মনে হয়, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রেখে গেছে। তসলিমার আত্মজীবনীর বিভিন্ন খণ্ডের সাক্ষ্য অনুধাবন করার পর এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।